কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দ্বিতীয় খন্ড

কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

০২

কিরীটী অমনিবাস

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

দ্বিতীয় খন্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

অষ্টম মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪০৪
—আশি টাকা—

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন : আশু বন্দ্যোপাধ্যায়
মুদ্রণ : অটোটাইপ

KIRITI OMNIBUS VOL. II
An anthology of detective fictions by Niharranjan Gupta published
by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd.
10, Shyama Charan Dey Street, Calcutta - 700 073

Price Rs. 80/-

ISBN : 81-7293-156-5

মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রা: লি: ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩
হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও অটোটাইপ ১৫২ মাণিকতলা
মেন রোড কলিকাতা-৫৪ হইতে তপন সেন কর্তৃক মুদ্রিত

সূচীপত্র

ভূমিকা	শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র	i
দুটি কথা	নীহাররঞ্জন গুপ্ত	vi
হলুদ শয়তান	...	১
ডাইনির বাঁশী	...	৪৩
ড্রাগন	...	১১৯
মোমের আলো	...	১৯৫
বসন্ত রজনী	...	২৬৭
কালো পাখী	...	৩২৫

ভূমিকা

বর্তমান শতাব্দীর কর্মব্যস্ত মানুষের বই পড়ে চিন্তা করার—কি অনেকখানি সময় নিয়ে রসিয়ে রসিয়ে পড়ার মতো অবসর নেই। তাই আজ পৃথিবীর সর্বত্রই গোয়েন্দা কাহিনীর জনপ্রিয়তা বেড়ে গেছে, যাচ্ছেও। শেক্‌স্‌পীয়র শেলী ওআর্ডস্‌ওআর্থ ডিকেন্‌স্‌ স্কট থ্যাকারের দেশে আজ আগাথা ক্রিস্টীর একাধিপত্য। তাও, তিনি তো তবু নির্ভুল 'কুইন্‌স্‌ ইংলিশ' লেখেন—আগাথা ক্রিস্টী যথেষ্ট সংখ্যক বই লিখতে পারছেন না বলে আমেরিকা থেকে মার্কিন-ইংরেজী লেখক গার্ডনার এলেরী কুইন প্রভৃতিকে আমদানি করতে হচ্ছে।

আজই বা বলি কেন—এডগার ওয়ালেস তাঁর পরমায়ুর শেষ পাদে পৌঁছে প্রতি শব্দের জন্যে এক পাউণ্ড হিসাবে অগ্রিম পেয়ে গেছেন প্রকাশকদের কাছ থেকে। মার্কিন প্রযোজকদের কাছ থেকে লক্ষ ডলার অগ্রিম নিয়ে আমেরিকার মাটিতে পা দিয়েছেন তাঁদের ছবির জন্যে গল্প লিখতে। এঁদের কথা বাদ দিলেও ইংরেজী কথ্যভাষায় যাকে বলে lesser fry—ওপেনহেম, লি-কোয়ে, ডরোথি এল, সেয়ার্স, স্যাপার প্রভৃতিও জনপ্রিয়তা ও অর্থোপার্জনে কম যান নি। (আমেরিকান লেখক এডগার য়্যালান পো এঁদের মধ্যে ক্ষণজন্মা পুরুষ ছিলেন। যদিচ তাঁকে ঠিক গোয়েন্দাকাহিনীর লেখক বলে চিহ্নিত করা যায় না কোনমতেই, আসলে তিনি ভয়ঙ্কর ও উদ্ভট রসের রসিক।) ঝোঁকটা এদিকে এত বেশী যে প্রাবন্ধিক সমালোচক চেষ্টারটন গোয়েন্দা ফাদার ব্রাউনের স্রষ্টা হিসাবেই বেশী বিখ্যাত এ যুগে।

অবশ্য গোড়াতেই একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে—বর্তমান শতাব্দী শব্দটা ব্যবহার করা। সাহিত্যের এই বর্ণান্তর শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দী থেকেই। ফরাসী লেখক এমিল গ্যাবেরোর চোর গোয়েন্দা আর্সিন লুপিন ও আর্থার কোনান ডয়েলের শার্লক হোমসই নাকি প্রধানত পাঠকদের এই রুচি-পরিবর্তনের জন্য দায়ী। পাঠকসাধারণ যখন সমস্যায় ভারী, কান্নায় ভেজা বড় বড় বই পড়ে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, শিল্প-বিপ্লবের ফলে বেকার ভদ্রলোকশ্রেণী ক্ষীয়মান হয়ে এসেছে, খেটে খেতে হচ্ছে বেশির ভাগ লোকদের, মানুষের এই সব মূল্যবান সাহিত্যপাঠ বিলাসে দাঁড়িয়েছে—তখনই এই দুই শক্তিধর লেখকের আবির্ভাব ঘটে। একসঙ্গে দুজনের নাম করা একটু অন্যায়ই হচ্ছে হয়ত—কারণ কোনান ডয়েল যুগন্ধর লেখক, তাঁর সঙ্গে এঁদের কারুরই তুলনা হয় না, তবে এমিল গ্যাবেরো যে সেই সময় গোয়েন্দা কাহিনীকে জনপ্রিয় করে তুলতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর L' Affaire Lerouge প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশেবিদেশে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল।

আর্সিন লুপিন, শার্লক হোম্‌স্‌, ডঃ থর্নডাইক এঁরা সকলেই বিগত শতাব্দীর লোক, একমাত্র হার্কুল পোয়ারো ও মিস মার্পলকেই পুরোপুরি* বিংশ শতাব্দীর ফসল বলা যায়। অবশ্যই পেরী ম্যাসন, সেন্ট্‌ জেমস বণ্ড বা এলেরী কুইনকে এ পংক্তিতে বসাচ্ছি না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা অনেকদিন ধরেই চলছিল। বিপুল প্রতিভাধর ডিকেন্‌স্‌-এর সব দিকেই দূরদৃষ্টি ছিল। তিনি বোধ করি গোয়েন্দা-সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ দেখেছিলেন তাঁর মানস

---

* দুটিই আগাথা ক্রিস্টীর অভিনব সৃষ্টি।

পুনর্বীনে—তাই তাঁর ব্লীক হাউসের মতো ধ্রুপদী উপন্যাসেও এই ধরনের শাখা কাহিনী নিয়ে পরীক্ষা করেছেন! গোয়েন্দা কাহিনী ও অর্ধমানবিক রহস্যকাহিনী বীজাকারে তাঁর অনেক উপন্যাসেই ছড়িয়ে আছে। তবু শার্লক হোম্‌স্ কাহিনী ও টেল্‌স্ অফ টুইলাইট য্যাণ্ড আনসীনের স্রষ্টা কোনান ডয়েল সাহিত্য রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ না করা পর্যন্ত এ ধরনের সাহিত্য পুরোপুরি জাতে ওঠে নি। বোধ করি এই বিশাল সম্ভাবনার ক্ষেত্র এমনি শক্তিমান লেখকেরই প্রতীক্ষায় বসে ছিল পাষাণী অহল্যার মতো।

শার্লক হোম্‌স্ পাঠক-সমাজকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে গেলেন, সাহিত্যক্ষেত্রে এক বিপর্যয় ঘটালেন। গোয়েন্দা কাহিনী যেমন জাতে উঠল—বিশুদ্ধ কথাসাহিত্যের তেমনি অধঃপতন শুরু হয়ে গেল। স্কট ডিকেন্‌স্ জেন অস্টেনের দেশে বিশুদ্ধ কথাসাহিত্যের দীপশিখাটি জ্বালিয়ে রাখার মতো লেখক আজ আর বোধ করি একজনও নেই। এতদিন তবু সমার্সেট ম্যম টিমটিম করছিলেন, আকবরের সিংহাসনে বাহাদুর শা বসার মতো—তাও আর নেই, ও পালা একেবারেই চুকে গেছে।

শার্লক হোম্‌স্-এর বিপুল জনপ্রিয়তা অন্য দেশের সাহিত্যকেও প্রভাবিত করবে এটা স্বাভাবিক। চারিদিকেই নতুন ধরনের নতুন জাতের গোয়েন্দা দেখা দিতে লাগলেন। ইংল্যাণ্ডের তো কথাই নেই—কেউ ডাক্তারের ল্যাবরেটরীতে বসে হত্যারহস্যের সমাধানের চেষ্টা করেন, কেউ বা য্যাটর্নী, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ পাদরী। একমাত্র লেখক এডগার ওয়ালেসই পুলিসের প্রতি কিছু সুবিচার করেছিলেন; শৌখীন গোয়েন্দা নয়—তাঁর বেশির ভাগ কাহিনীর নায়কই হলেন পুলিসের বড় অফিসার বা দারোগা। বিশেষ করে তাঁর জে. জি. রীডার গোয়েন্দা-সাহিত্যে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যদিচ রীডার পুরোপুরি পুলিসের লোক নন, পুলিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য সরকারী দপ্তরের কর্মচারী।

শার্লক হোম্‌স্-এর প্রভাব সুদূর নিভৃত বঙ্গদেশেও এসে পৌঁচেছিল বৈকি। তিনি নিজেও এসেছেন। পাঁচকড়ি দে সম্পাদিত গ্রন্থের গোবিন্দরাম শার্লক হোম্‌স্-এরই বাঙালী-পোশাক পরা মূর্তি। হত্যারহস্য, হত্যাকারী কে প্রভৃতি বইগুলি কোনান ডয়েলের কাহিনীরই খড়-মাটিতে অন্য রঙ লাগানো। তবে তাঁর প্রধান যে বইগুলি 'মায়াবী' 'মনোরমা' 'মায়াবিনী' 'নীলবসনা সুন্দরী' বা 'জীবন্মৃত রহস্য'র মূলে কোন বিদেশী গল্প আছে কিনা তা আজও জানি না। সম্ভবত আছে। জনশ্রুতি তাঁর 'সম্পাদিত' ও 'সঙ্কলিত' মার্কা বইগুলিতে স্বর্গত ধীরেন্দ্রনাথ পালের অনেকখানি হাত ছিল। আশালতা ও ভ্রমরের লেখক ধীরেন পাল নিজে তো শক্তিমান লেখক বটেই, তাঁর ইংরেজী পড়াশুনোও বিস্তর। সে যুগেই ম্যাকমিলান কোম্পানী তাঁর ইংরেজী বই 'লাইফ অফ শ্রীকৃষ্ণ' প্রকাশ করেছিলেন, লক্ষ্য কপি বিক্রির বই রাজভাষাও নাকি তাঁরই লেখা—কয়েকটি রজতমুদ্রার বিনিময়ে দত্তক দিয়েছিলেন। সুতরাং তাঁর পক্ষেই 'শার্লক হোম্‌স্'কে অত দ্রুত এদেশে আনয়ন করা সম্ভব বলে মনে হয়। প্রসঙ্গত বলা যায়—তাঁর পুত্র যতীন্দ্রনাথ পাল যাকে ভার্সাটাইল লেখক বলে তাই ছিলেন। ছেলেদের ছড়া, ইতহাসের বই থেকে যৌনতত্ত্ব—সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি ছিল। পিতার মতো দ্রুতও লিখতে পারতেন। ৩৬/৩৭ বছর বয়সে মারা যান, তখনই তাঁর নামে-বেনামে লেখা বইয়ের সংখ্যা আশির ওপর। 'যমুনা' সম্পাদক ঔপন্যাসিক ফণীন্দ্রনাথ পাল ধীরেন পালেরই ভ্রাতুষ্পুত্র।

অবশ্য পাঁচকড়ি দে মশাইয়ের কিছু আগে খাঁটি স্বদেশী জিনিস নিয়ে একজন দেখা দিয়েছিলেন। প্রিয়নাথবাবু ছিলেন পুলিসের লোক—ইন্‌স্পেক্টার পদবীর, পরে সম্ভবত আরও

পদোন্নতি হয়েছিল। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে লেখা সত্য অথচ চমকপ্রদ ঘটনার সমষ্টি 'দারোগার দপ্তর' কয়েক খণ্ডে প্রকাশিত হয়—সে-ই বোধ হয় প্রথম 'সিরিজ'-বদ্ধ বইও এদেশে। তার আগে বা পরে এমন খাঁটি স্বদেশী মাল আর কেউ বাজারে ছেড়েছেন বলে জানা নেই। শরদিন্দুবাবুর কাহিনীগুলি হয়ত ইংরেজীর বর্ণান্তর নয়, কিন্তু তাতে বিদেশী বুদ্ধির বিদেশী ঢঙের প্রভাব আছে বৈকি।

প্রিয়নাথবাবুর যে সত্যিকার সাহিত্যরসবোধ ছিল তার প্রমাণ দপ্তরের প্রথম যে কাহিনীটি নির্বাচন করেছিলেন তা তাঁর আনাড়ীপনা তথা হাস্যকর নির্বুদ্ধিতারই পরিচায়ক। সবে চাকরিতে ঢুকেছেন, অপরাধী ধরার জন্য উৎসাহ উদ্যম ঔৎসুক্যের অবধি নেই—একটা 'বোমা' শব্দ শুনেই ছুটেছিলেন (স্বদেশী?) ডাকাত পাওয়া গেল মনে করে বেলেঘাটার চালের আড়তে—পরে দেখা গেল সেটা বস্তা থেকে চালের নমুনা বার করার অতি নির্দোষ একটা যন্ত্র মাত্র। রসিক না হলে ব্যর্থতার নমুনা দিয়ে কাহিনী শুরু করতেন না।

তখনকার বইয়ের বাজারের তুলনায় পাঁচকড়ি দের বইগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয় হলেও এ পথে চলার মতো শক্তিমান লেখক তেমন কেউ এগিয়ে এলেন না এদেশে। সর্বাগ্রে যাঁর নাম করতে হয়—দীনেন্দ্রকুমার রায়—তিনি রূপান্তর বা বর্ণান্তরের চেষ্টা না করে সোজাসুজি ভাষান্তরে মন দিলেন অর্থাৎ অনুবাদ করেই ইংরেজী গল্পগুলি আমদানি করতে লাগলেন বাংলায়। তাঁর মূল উৎস ছিল বড় দুর্বল, চার পেনি বা তিন আনা সিরিজের নিম্নস্তরের পাঠকদের জন্য রচিত বই থেকে তাঁর কাহিনী নির্বাচিত করতেন। (নইলে অবশ্য পাবেনই বা কোথায় এত গল্প? উল্লেখযোগ্য যা—তার তো ছায়াবলম্বন—'না বলিয়া'—হয়েই গেছে!) সেক্সটন ব্লেক সিরিজের দু-একখানা বই আমি পড়েছি, শুনেছিও দেশের 'শপগার্ল' বা দোকানে-চাকরি-করা মেয়েদের দু-পয়সা বাড়তি রোজগারের জন্যেই ঐ সিরিজ, অবসর সময়ে তারাই ঐ সব বই লেখে সামান্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে (কেউ বলেন চার পাউণ্ড কেউ বলেন আরও কম, অবশ্য আমি সেকালের কথা বলছি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর। তখন পাউণ্ডের দাম ছিল)। সে তুলনায় অনুবাদক অনেক উঁচুদরের লেখক ছিলেন। ভাষান্তর করার সময় তিনি কিছু কিছু ঘষে-মেজে দিতেন বলেই মনে হয়।

এরপর প্রথম উল্লেখযোগ্য গোয়েন্দা যা বঙ্গসাহিত্য-ভূমে দেখা দিলেন তা হল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের জয়ন্ত, আর তাঁর বোকা অনুচর বা 'ওয়াটসন' মানিক। জয়ন্ত আর মানিকের গল্প পড়ে আমাদের অল্প বয়সে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেছে। আমাদের তখন যে বয়স তাতে ঠিক ছেলে বলা না গেলেও আমরাও পড়েছি এবং খুশী হয়েছি। তবে তার আগেই—স্কুল-জীবনেই শার্লক হোম্স্ প্রভৃতি শেষ করায় অপর ছেলেদের মতো 'থ্রিল' বা উত্তেজনার শিহরণ অনুভব করি নি।

অতঃপর বা ইতিমধ্যেই যে অসামান্য মানুষটির আবির্ভাব ঘটল তিনি হলেন—সত্যান্বেষী ব্যোমকেশ বক্সী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণীয় সৃষ্টি। গোয়েন্দা বা ডিটেক্টিভ বলে পরিচয় দিতে যাঁর ঘোরতর আপত্তি, নিজেকে যিনি সত্যান্বেষী বলেই মনে করেন এবং পরিচয় দেন--সেই ব্যোমকেশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি, দীপ্ত বুদ্ধি, সজাগ ইন্দ্রিয় এবং অসাধারণ সাধারণ জ্ঞান অনেক জায়গায় শার্লক হোম্স্কে স্মরণ করিয়ে দেয়। বস্তুত এর আগে এমন মৌলিক গোয়েন্দা-কাহিনী এবং মৌলিক সত্যান্বেষী এ দেশের সাহিত্যে আর দেখা দেয়নি। আরও বৈশিষ্ট্য এই যে, গোয়েন্দা তো নিজেকে যে নামই দিন না কেন, চোর-ডাকাত ধরেন, বেশির ভাগ খুনীর সঙ্গে কারবার—কিন্তু মামুলী গোয়েন্দাদের মতো এঁর কানের পাশ দিয়ে গুলি বেরিয়ে যায়

না, অথবা বার বার মরো-মরো হয়ে বেঁচে ওঠেন না। সেদিক দিয়েও ইনি শার্লক হোম্‌স্‌ বা হাক্লান পোয়ারোর সগোত্র। দীনেন্দ্রকুমার রায় অপকৃষ্ট বিলিতী মাল আমদানি করে বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যের যে অনিষ্ট করে গিয়েছিলেন—হেমেন্দ্রকুমার রায় তার থেকে উঁচুদরের গোয়েন্দা-কাহিনী লিখলেও প্রধানত কিশোরপাঠ্য বলে বিজ্ঞাপিত হওয়ায়—সম্পূর্ণ সে ক্ষতি পূরণ করতে পারেন নি। বলতে গেলে শরদিন্দুবাবুই বাংলাদেশে আবার এই গোয়েন্দা সাহিত্যকে জাতে তুললেন।

আমার দুর্ভাগ্য এই—এঁদের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় কিরীটী রায় যখন রঙ্গমঞ্চে দেখা দিলেন তখন আমাদের রীতিমতো যৌবনকাল। আশেপাশে দেখতুম ছেলেরা 'কালোভ্রমর' 'রক্তমুখী ড্রাগন' 'ডাইনীর বাঁশী' বই পড়ে মাতামাতি করছে, উত্তেজনা আর আনন্দ তাদের চোখে-মুখে উপচে উঠছে—খুশির সীমা নেই, সত্যই কাড়াকাড়ি করে পড়ছে—কিন্তু ওরা ঐ রকম উন্মত্ত হয়ে উঠছে বলেই আমরা অগ্রাহ্য করেছি, ভেবেছি ওগুলো নিতান্তই ঐ ছোটদের বই, ওদের জন্যে লেখা, ছেলে-ভুলনো আজগুবী গল্প যাকে বলে। আমাদের ঢের বয়স হয়েছে, আমরা এ সবের ঊর্ধ্বে—এ সব বই কী পড়ব? আরও সত্যি কথা বলতে কি—তখন নিজেই তো কখানা ডিটেকটিভ বই লিখে ফেলেছি। ভাগ্য ভাল যে সেগুলো সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে গেছে—সে খবরও আজকালকার পাঠক রাখেন না। আসলে বয়সটা কাঁচা—নিজেকে ঐ সব কিশোর পাঠদের থেকে সুপিরিয়র কল্পনা করাই তো স্বাভাবিক।

কিন্তু পরবর্তীকালে দেখেছি এই মিথ্যা প্রবীণতার কমপ্লেক্সে নিজেই বঞ্চিত হয়েছি। আর সেইখানেই নীহাররঞ্জন গুপ্তর আসল কৃতিত্ব। তিনি এমনভাবেই এই গোয়েন্দা-কাহিনীগুলি লিখেছেন যাতে সেগুলি অনায়াসে কিশোরপাঠ্য বলে চালানো যায় অথচ বড়দের এমন কি বুড়োদের পড়তেও বাধা নেই। তারা সমানই আনন্দ পাবে, কে জানে কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত বেশী। আর সত্যিই তো, অপরাধী ও গোয়েন্দার বুদ্ধির যুদ্ধই যে গল্প-উপন্যাসের উপজীব্য সেখানে কোন পাঠক-বয়সের গণ্ডী না থাকাই তো উচিত। মিছিমিছি অকারণে যৌন-আবেদন আমদানি করে কতক গুলো লোককে (সম্ভাব্য খদ্দের) বঞ্চিত করে লাভ কি?

কিরীটী রায়ের এই সব কীর্তি-কাহিনীর মধ্যে বিদেশী গল্পের ছাপ কিছু যদি এসে থাকেও, নীহারবাবু এগুলির কোন ক্ষেত্রেই পুরোপুরি বর্ণান্তর বা ভাষান্তর করেন নি। মিলিয়ে মিশিয়ে, নিজের কল্পনাযুক্ত করে সম্পূর্ণ নতুন গল্পেরই স্বাদ এনে দিয়েছেন এই সব কাহিনীতে। তাছাড়া আর একটি অভিনব আকর্ষণ যা এর মধ্যে আনতে পেরেছেন—তা হল গল্পের গতি। অকারণ বাগাড়ম্বর নেই, অনাবশ্যক দীর্ঘ বর্ণনা নেই, মিথ্যা প্রেমকাহিনী বয়নের চেষ্টা নেই--মূল গল্প তর-তর করে বয়ে চলেছে, এক ঘটনা থেকে আর এক ঘটনায়, প্রত্যেকটি চরিত্রের আগমন-আবির্ভাবই তাৎপর্যপূর্ণ—পাঠকরা এদিকেও যেমন নিঃশ্বাস ফেলার সময় পান না ওদিকেও তেমনি কোন অংশ 'স্কিপ্' করে বা লাফিয়ে বাদ দিতে পারেন না। বাহুল্য অংশ এমন একটুও নেই যেখানে পাঠকরা একান্ত মনোযোগ শিথিল করে একটু হাঁপ ছাড়তে পারেন।

আজ আমাদের জীবনে যে সব সমস্যা, আর তার জন্য অহর্নিশি যে দুশ্চিন্তা, অবিরাম যে জীবনযুদ্ধ—তাতে এই শ্রেণীর বইয়েরই বুঝি একান্ত প্রয়োজন ছিল। সে চাহিদা ব্যোমকেশ বক্সীও সম্পূর্ণ মেটাতে পারেন নি—তিনি বরাবরই একটু ইন্‌টেলেকচুয়াল ধরনের হয়ে রইলেন, তাই বহুল পরিমাণে জনপ্রিয় হলেও কিরীটী রায়ের মতো জনতার প্রিয় হতে পারে নি। বাংলাদেশের দুর্ভিক্ষপীড়িত সাহিত্যের হাটেও কিরীটী রায়কে নিয়ে যে কাড়াকাড়ি—এই

বাজারেও যে পরিমাণে বিক্রি ও চাহিদা তাতে এই সত্যটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে কিরীটী রায়ের মাথায় বাইরের ধ্বজাপতাকা যত থাক না থাক—আবালবৃদ্ধবনিতা, সব বয়সের সব রকমের অগণিত সাধারণ পাঠকের চিত্ত জয় করবার মতো অস্ত্র বর্ম তাঁর আছে। তিনি আমাদের ঘরের লোক, আমাদের মনের মানুষ হয়ে গেছেন।

—গজেন্দ্রকুমার মিত্র

Get Bangla eBooks

আরো বাংলা বইয়ের জন্য

নিচের লিংকে

ক্লিক করুন

www.banglabooks.in

।। দুটি কথা ।।

১৩৬১ সনে 'রক্তমুখী ড্রাগন' নামে একটি কাহিনী রচনা করি—কিরীটীকে নিয়ে। পর পর কতকগুলো মুদ্রণ হয় পুস্তকটির, তারপরই কাহিনীটা আদ্যোপান্ত নতুন করে লিখি। কিন্তু সেটা আর ছাপা হয়ে ওঠে নি, কারণ সংশোধিত পুস্তকটি প্রকাশক ছাপাতে রাজী হন নি। কাজেই পাণ্ডুলিপিটা ১৯৬৩ সন থেকে দীর্ঘ ১৬ বৎসর আমার ফাইলের মতই ধীরে ধীরে জীর্ণ হয়েছে। অধুনা যখন অমর সাহিত্য প্রকাশন 'কিরীটী অমনিবাস' বের করতে শুরু করলেন তখন কিরীটী ও কৃষ্ণার প্রথম পরিচয়ের ব্যাপারটা যাতে পাঠক-পাঠিকারা পড়তে পারেন, জানতে পারেন—তাই সেই সংশোধিত পূর্বলিখিত পুস্তকটি এই 'হলুদ শয়তান' নামে সর্বপ্রথম ছাপার অক্ষরে দীর্ঘ ষোল বৎসর পরে কিরীটী-কাহিনী-পারম্পর্য রক্ষার জন্য কিরীটী অমনিবাসে সংযোজিত হল। এবং কিরীটী কৃষ্ণার পরবর্তী কাহিনী যা বহুকাল পূর্বে "ডাইনীর বাঁশী" নামে প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্যে কিরীটী কৃষ্ণাকে বিবাহ করে, সেটা পরে "ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি" নামে নতুন ভাবে লিখিত হয়েছিল—তার মধ্যে কিরীটী কৃষ্ণার বিবাহের ব্যাপারটা বাদ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে বহু পাঠক-পাঠিকা কিরীটী কৃষ্ণার কবে বিয়ে হয় জানতে চেয়েছেন আমাকে পত্র দিয়ে, তাঁদের সে জবাব আমি দিই নি, কেন দিই নি তাও আজ বলব। ডাইনীর বাঁশীতে যখন আমি জানালাম কিরীটী ও কৃষ্ণার বিবাহ হল, বহু পাঠক-পাঠিকা আমাকে পত্রাঘাত করেছিলেন, কেন আপনি একজন পার্সী মেয়ের সঙ্গে কিরীটীর বিবাহ দিলেন, কি অধিকার আছে আপনার অমন একটা বিবাহ দেবার, বাংলাদেশে কি মেয়ের অভাব ছিল? কিরীটী রায়ের গলায় যে কোন মেয়ে মালা দিত, বলেছেন কখনও কোন মেয়েকে সে কথা? তাঁদের একবার জবাব দেবার ইচ্ছা হয়েছিল কিরীটী যদি কৃষ্ণাকে বিয়ে করে তো আমি কি করতে পারি! আমার হাতে কলম আছে বলেই তো আমি বিধাতাপুরুষ নই, যা খুশি তাই করতে পারি না, আর আমি নিষেধ করলেই বা কিরীটী শুনবে কেন?

তাছাড়া পার্সির ঘরে জন্মেছে বলেই কি কিরীটীর সঙ্গে কৃষ্ণার বিবাহটা দোষণীয় হবে? তারা তো ভালবেসেই পরস্পরকে বিবাহ করেছিল।

* * *

আজ বোধ হয় আর কারও কোন অভিযোগ নেই ঐ সম্পর্কে—কারণ কৃষ্ণাও আজ পুরোপুরি একটি বাঙালী মেয়েই। অনেক বছর তো তার এ দেশে কাটল। আর আমি জানি অনেকেই আজ কৃষ্ণাকে ভালবাসে। তাই পুরাতন ডাইনীর বাঁশী থেকে কিরীটী কৃষ্ণার বিবাহের ব্যাপারটা 'কিরীটী অমনিবাসে'র ২য় খণ্ডে—ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবি'র শেষ পৃষ্ঠায় সংযোজিত হল এবং 'ডাইনীর বাঁশী' পূর্ব নামটাই নতুন করে রাখা হল, ইস্কাবনের সাহেব হরতনের বিবির মধ্যে কৃষ্ণা নির্বাসিতা হয়েছিল আপনাদের জন্যই—তাকে আজ আপনারাই--পাঠক-পাঠিকারা—আবার আপনাদের ভালবাসা দিয়ে উদ্ধার করলেন। কিরীটী আর কৃষ্ণা এ সংবাদে খুব খুশী হবে।

—নীহাররঞ্জন গুপ্ত

হলুদ শয়তান

।। এক ।।

মিঃ চিদাম্বরম্ তাঁর শয়ন-কক্ষ থেকে রহস্যজনক ভাবে এক রাত্রে অদৃশ্য হবার পর খানাতল্লাশী করতে গিয়ে সিংহল পুলিস তাঁর ডাইরীটা পেয়েছিল। সেই ডাইরীতেই কথাগুলো লেখা ছিল শেষ পৃষ্ঠায়।

স্পষ্ট একটা খস্খস্ আওয়াজ। ঘরের মধ্যে কেউ এসেছে নিশ্চয়ই! ঘরের আবছা অন্ধকারে তারই সাবধানী পায়ের মৃদু ক্ষীণ শব্দ। কী এক ভৌতিক বিভীষিকায় মন মর্মায়িত হয়ে ওঠে। কে?

ঘুম আর হল না। উঠে বসলাম। অন্ধকারে রেডিয়াম-দেওয়া ঘড়ির ডায়ালটা চিক্-চিক্ ক'রে জোনাকির আলোর মত জ্বলে।

ঘড়িতে রাত্রি দুটো। আজ তিন রাত্রি ধরে প্রত্যহই ঠিক এমন সময় আমার ঘুমটা ভেঙে যাচ্ছে। শুনতে পাই একটা অস্পষ্ট লঘু পায়ে চলার শব্দ যেন ঘরের মধ্যে অন্ধকারে চলে বেড়ায়। ক্ষীণ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে।

আমার গায়ের ভিতরটা সিরসির করে। ভয়ের একটা তরল স্রোত যেন রক্তের নলীতে-নলীতে ছড়িয়ে যায়। সমস্ত দেহটাকে অসাড় ও পঙ্গু করে দেয়।

আজ নিয়ে পর পর তিন রাত্রি ঐ শব্দ শুনে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়েছি। সুইচ্ টিপে আলোটা জ্বেলেছি, তার পর শয্যার উপর বসে থেকেছি। আর আর একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম, হয়ত আমার মনের ভুলও হ্‌তে পারে, মশারীটা যেন ক্রমশ নীচের দিকে ঝুলে পড়ছিল। আর ঘুম আসেনি—আজো আমার না জানি—

খালি ঘর। ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। দরজার হাতল ধরে টেনে দেখেছি প্রতি রাত্রেই, দরজা পূর্বের মতই বন্ধ।

জানলার নেটের পর্দা দু'পাশে টেনে সরিয়ে দেখেছি, কোথাও কিছু নেই—

তবে কি সবটাই আগাগোড়া একটা দুঃস্বপ্ন!

পুলিসের রিপোর্ট থেকে মিঃ চিদাম্বরমের সম্পর্কে যা জানা যায়, মিঃ চিদাম্বরমের বয়স এমন বেশী কিছু নয়, চল্লিশের কোঠা সবে ছাড়িয়েছিলেন। সংসারে আপনার বলতে একটি মাত্র ভাইপো—রূপম্। বয়স তার তেইশ কি চব্বিশ। ভারতের দক্ষিণ দেশের লোক, ভাষা তামিল। গত পনের বৎসর ধরে মুক্তা ও রবারের ব্যবসায়ে চিদাম্বরম্ আজ প্রায় কোটিপতি। সিংহলে মুক্তা ছাড়াও মস্তবড় রবারের কারবার ছিল। সমস্ত পৃথিবী জুড়ে মুক্তা ও রবার চালান যেত তাঁর।

স্থানীয় পুলিসের রিপোর্ট থেকে জানা যায় আবার—চিদাম্বরমের শয়ন-ঘরে শয্যাই কেবল খালি ছিল না তা নয়—মশারীটাও ছিল না। আর শয্যার উপর চাদরটা এলোমেলো হয়ে ছিল আর সারা ঘরের বাতাসে যেন একটা কেমন মিষ্টি অথচ উগ্র গন্ধ ছড়িয়ে ছিল অনেকটা ক্লোরোফরমের মত।

জংলী চায়ের কাপটা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

লেপের ভিতর হতে মাথাটা একটু বের করে কিরীটী বললে, জংলী, আজকের খবরের

কগজটা দিয়ে যাস।

খবরের কাগজ তো অনেকক্ষণ রেখে গেছি বাবু ; ঐ যে টি-পয়ের ওপর।

হাত বাড়িয়ে কিরীটী সেদিনকার সংবাদপত্রটা তুলে নিল।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। সংবাদপত্রের ভাঁজটা খুলতে খুলতে কিরীটী বললে, সুব্রত আসছে, যা, আর এক কাপ চা নিয়ে আয়।

সুব্রত ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, উঃ! কী শীত রে বাবা! জমাট বেঁধে গেলাম!

কিরীটী খবরের কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বললে, গরম গরম চা খেয়ে আবার গলে যাও! তারপর কি হে, সক্কালবেলাতেই!

শীতের বাজারটা একেবারে মন্দা চলছে! এমনি করে আর বেশী দিন বসে থাকলে গেঁটে বাত ধরবে দেখছি!

কিরীটীর দিক থেকে বিশেষ কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। জংলী আর এক কাপ চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল।

সুব্রত চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বললে, দেখছি তোর রহস্যভেদের ছোঁয়াচ বোধ হয় আমারও লেগেছে, দিনরাত কেবল রহস্যেরই স্বপ্ন দেখছি। রাতের অন্ধকারে জেগে জেগে কান পেতে অশরীরীর পায়ের শব্দ শোনবার জন্য চেষ্টা করি। রাজু তো যেখানে যত ডিটেকটিভ বই আছে সব কিনে এনে একটার পর একটা শেষ করছে।

কিরীটীর কোন সাড়া-শব্দ নেই। চায়ের কাপটা নিঃশেষ করে টি-পয়টার উপর রাখতে রাখতে সুব্রত বললে, কি হে, ব্যাপার কি? 'স্পিকটি নট' যে! নতুন খবর আছে নাকি কিছু সংবাদপত্রের মধ্যে? ওদিকে চা যে ঠাণ্ডা হতে চলল!

তথাপি কিরীটীর দিক থেকে কোন জবাব এল না। চায়ের কাপের দিকে হাতও বাড়াল না। তারপর এক সময় খবরের কাগজটা পাশে রেখে চায়ের কাপটা তুলে চুমুক দিতে দিতে বললে, আবার ড্রাগন! এবারে কালো নয়, রক্তমুখী!

ড্রাগন! কোথায় ড্রাগন?

কিরীটী আবার বললে, ড্রাগন!

ড্রাগন-ড্রাগনই তো বলছিস তখন থেকে, কিন্তু কোথায় ড্রাগন?

ড্রাগন! রক্তমুখী ড্রাগন! বিশ্বাস হচ্ছে না? এই কাগজটা পড়ে দেখ্—

কিরীটী খবরের কাগজটার একটা জায়গায় আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে বললে, পড়্।

সুব্রত কাগজটা হাতে তুলে নিয়ে নির্দিষ্ট জায়গাটার উপর ঝুঁকে পড়ল।

কলম্বোয় রক্তমুখী ড্রাগনের দ্বিতীয় শিকার!!
মুক্তা ও রবার ব্যবসায়ী লক্ষপতি ধনী
মিঃ চিদাম্বরম অদৃশ্য!

গত শনিবার কলম্বোর প্রসিদ্ধ মুক্তা ও রবার ব্যবসায়ী ক্রোড়পতি চিদাম্বরম তাঁর শয়নকক্ষ হতে অদৃশ্য হয়েছেন। তাঁর শয়নঘরে শয্যার উপর একখানি অতি সাধারণ সাদা রংয়ের খাম পাওয়া গেছে। তাতে এক ড্রাগনের প্রতিমূর্তি আঁকা। মূর্তির দেহটা কালো রংয়ের ও মুখটা ঘোর রক্তবর্ণের। মাসখানেক পূর্বে (পাঠক বর্গের মনে থাকতে পারে) বম্বের একজন

ধনী মৎস্যব্যবসায়ী তাঁর শয়নকক্ষ হতে একই ভাবে অদৃশ্য হন। তাঁরও শূন্য শয্যার উপর অবিকল ঐরূপ একটি রক্তমুখী ড্রাগনের মূর্তি-আঁকা খাম পাওয়া গিয়েছিল। সমগ্র কলম্বোবাসী, বিশেষতঃ ধনী ব্যবসায়ীরা আতঙ্কে ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছে! সবাই ভাবছে, না জানি এবার কার পালা। পুলিশ তদন্ত করেও আজ পর্যন্ত কিছু করে উঠতে পারেনি। আমরা জনসাধারণের দিক হতে পুলিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এই বিষয়ে ভালভাবে তদন্ত করে দেখবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আশা করি তাঁরা এদিকে একটু নজর দেবেন।

এক নিঃশ্বাসে সুব্রত আগাগোড়া সবটা লেখা পড়ে ফেললে।

কিরীটী বললে, কি মনে হয়?

বেশ একটা যেন মিস্ট্রির গন্ধ পাচ্ছি—

ঠিক। যাবি?

কোথায়?

সিলোনে।

সে কি!

চল্ না—সিলোনও বেড়ানো হবে—রহস্যটা পরিষ্কার করা যায় কিনা তাও চেষ্টা করে দেখা যাবে।

আপত্তি নেই, কিন্তু—

জানি সেখানে গিয়ে সেখানকার পুলিসের বড়কর্তার কাছ থেকে অবিশ্যি একটা পারমিশন নিতে হবে—এখানকার আই. জি.-র একটা রেকমেণ্ডেশন থাকলে সেটা হয়ত কষ্টসাধ্য হবে না।

যদি সত্যি যাস তো বল—

বললাম তো যাব।

ঠিক আছে, আজই আই. জি.-র সঙ্গে দেখা করব।

কিরীটী বাক্স থেকে একটা চুরোট নিয়ে ধরিয়ে নিল এবং নিভন্ত দেশলাইয়ের কাঠিটা অ্যাশট্রের উপর ফেলে দিয়ে, চুরোটটা টানতে টানতে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল।

দিনপাঁচেক বাদে এক সন্ধ্যারাত্রে ওরা ট্রেনে উঠে বসল। কিরীটী, সুব্রত ও রাজু। রাজুও সঙ্গে চলেছে।

কলম্বোয় হোটেলে উঠবি তো? সুব্রত শুধায়।

না—

তবে?

আছে—লোক আছে।

কে লোক?

জীবন সেনগুপ্ত—ওখানকার একজন বড় অফিসার। তাকে টেলিগ্রাম করে দিয়েছি গতকালই। বম্বে থেকে যে জাহাজ যায় তাতে চাপলে তিন দিনের দিন সকালে কলম্বো পৌঁছানো যায়।

কলম্বো।

সাগরের কোল ছুঁয়ে একেবারে দাঁড়িয়ে শহরটি। এখানে সমুদ্র ভারী অশান্ত বলে ৪২০০

ফুট লম্বা এক বাঁধ তৈরী করে সমুদ্রের গতি রোধ করা হয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীঃ প্রিন্স অব ওয়েল্‌স এই বাঁধের প্রথম প্রস্তরটি স্থাপন করেন। ১৮৮৪ খ্রীঃ সেই বাঁধের গাঁথুনি সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ও পূর্ব-দক্ষিণ কোণ দিয়ে সমুদ্র থেকে বিপদ আসবার তখনও যথেষ্ট সুযোগ রয়ে গেল এবং সেই কারণেই আবার একটি নতুন বাঁধ তৈরী করা হয়। শেষোক্ত বাঁধটি দৈর্ঘ্যে ৮০০ ফুট ও প্রস্থে ৭০০ ফুট।

কলম্বোয় পৌঁছে ওরা জাহাজ থেকে নেমে একটা ট্যাক্সি নিল, ভিক্টোরিয়া পার্কের অল্প দূরে কিরীটীর বন্ধু জীবন সেন থাকেন। সরকারী দপ্তরে তিনি বেশ মোটা মাহিনার চাকরি করেন। কিরীটীরা সকলে সেইখানেই গিয়ে উঠল।

রাজু ও সুব্রতর ইচ্ছা হোটেলেই ওঠে, কিন্তু জীবনবাবু প্রবল ভাবে আপত্তি জানালেন —না, না, সে কেমন করে সম্ভব?

অগত্যা রাজু ও সুব্রতকেও জীবনবাবুর ওখানেই উঠতে হল। জীবনবাবুর সাহায্যেই পুলিস কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে কিরীটী তাঁর একটা পারমিশন্ নিয়ে নিল ঐদিনই সন্ধ্যায়।

পরের দিন ভোরবেলায়ই সুব্রতকে নিয়ে কিরীটী বেরুলো মিঃ চিদাম্বরমের বাড়ির খোঁজে। মিঃ চিদাম্বরম্ কলম্বোর একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তাঁর বাড়িটি খুঁজে বের করতে তাদের কিছুমাত্র অসুবিধা হল না।

মিঃ চিদাম্বরমের প্রাইভেট সেক্রেটারী মিঃ রামানুজম্ তাদের পরিচয় পেয়েই মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। কিরীটী তাদের আসবার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বিস্তৃত ভাবে সব কিছু জানতে চাইল।

মিঃ রামানুজম্ বললেন, তাহলে আপনাদের একটু অপেক্ষা করতে হয়, আমি একবার পুলিস ইন্‌স্পেক্টর মিঃ রামিয়াকে ফোন ক'রে এখানে আনিয়ে নিচ্ছি। ঘটনা সম্পর্কে যা কিছু তদন্ত হয়েছিল, তিনি তা করেছিলেন। আমার মনে হয়, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ রেখে অনুসন্ধান করলে সম্ভবতঃ আপনার কাজের সুবিধাই হবে।

কিরীটী বললে, তাহলে তো খুব ভালই হয়।

মিঃ রামানুজম্ তখনই ইনস্পেক্টর মিঃ রামিয়াকে ফোন করে জানালেন, কলকাতার বিখ্যাত গোয়েন্দা মিঃ কিরীটী রায় এখানে এসেছেন ; তিনি মিঃ চিদাম্বরমের কেস্‌টা সম্পর্কে interested। আপনার সাহায্য তাঁর বিশেষ আবশ্যক। আপনি দয়া করে যদি একবার আসেন, তাহলে বিশেষ খুশী হব।

মিঃ রামিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলেন এবং বললেন, এখুনি আসবেন তিনি।

আধ ঘন্টার মধ্যেই ইন্‌স্পেক্টর মিঃ রামিয়ার মোটরবাইক চিদাম্বরমের বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। হর্নের আওয়াজ হতেই রামানুজম্ এগিয়ে গিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে এল। পরস্পর আলাপ-পরিচয় ও আদর-অভ্যর্থনার পর মিঃ রামিয়া বললেন, মিঃ রায়, আমাকে গতরাত্রে কমিশনার আপনার কথা বলেছেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমরা তো এই কেস্‌টার কোন কূল কিনারাই করতে পারিনি। কাজেই এতে আপনার যদি কোন সাহায্য পাই, তবে সেটা একটা সৌভাগ্য বলে মনে করব।

কতদূর সফল হব জানি না—তবে চেষ্টা করব। কিরীটী বললে।

আপনার কথায় খুবই খুশী হলুম মিঃ রায়। আমি আপনাকে সর্বান্তঃকরণে সাহায্য করতে প্রস্তুত। তাহলে চলুন আমাদের অফিসেই যাওয়া যাক। কারণ চিদাম্বরমের এই কেসটার যা-কিছু তদন্ত করা হয়েছে, তার সবই সেখানে গেলেই আপনাকে দেখাতে পারি।

বাড়িতে কে কে তখন জবানবন্দি দিয়েছিল, কি ভাবে তিনি নিখোঁজ হয়েছিলেন, আর ঐ ব্যাপারে আজ পর্যন্ত পুলিস যা-কিছু জানতে পেরেছে, সব কিছুই পুলিস-অফিসে ফাইলে দেখতে পাবেন।

ফাইলের কাগজপত্র দেখে-শুনে আপনি যদি আর কোন ভাবে তদন্ত করতে চান, তখন তাই করা যাবে।

কিরীটী বললে, চলুন, তাহলে এখনই একবার আপনার সঙ্গে গিয়ে কাগজপত্রগুলো দেখে আসি।

সকলেই উঠে দাঁড়াল। মিঃ রামানুজম্ বাড়ির মোটরগাড়িখানা তাদের ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিলেন।

মিঃ রামিয়ার মোটর-বাইক ও মিঃ চিদাম্বরমের গাড়িখানা তাদের নিয়ে হর্ন দিতে দিতে পুলিস অফিসের উদ্দেশে বের হয়ে গেল।

।। দুই ।।

পুলিস-ফাইল অনুসন্ধান করে দেখা গেল—মিঃ চিদাম্বরমের মাথার ওপর একটা বিপদ যে কয়েকদিন আগে হতেই খাঁড়ার মত ঝুলছিল তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন।

নিখোঁজ হওয়ার কয়েকদিন আগে তাঁর কাছে একখানা চিঠি আসে। চিঠিখানার ওপরেই একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—তার খামখানা খুব বড় আকারের, আর ঠিকানাটা খুব বড় বড় লাল কালিতে লেখা।

মিঃ চিদাম্বরমের স্বভাব ছিল—সব চিঠি তিনি নিজেই খুলতেন। খুলে প্রয়োজন বোধ করলে তিনি তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারীর হাতে দিতেন, নতুবা নিজেই সেগুলির জবাব দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে দিতেন।

অন্যদিনের অভ্যাসমত সেদিনের চিঠি তিনি নিজের হাতে খোলেন—সকলের আগেই খুললেন সেই লাল চিঠিখানা। কিন্তু চিঠিখানা পড়ামাত্র তাঁর মুখের ওপর কে যেন একরাশ ছাই ঢেলে দিল—মুখ তাঁর শুকিয়ে গেল।

সেই থেকে সর্বদাই তিনি অন্যমনস্ক থাকতেন, আর একটা দুশ্চিন্তা ও নিরুৎসাহ ভাব যেন তাঁকে অভিভূত করে রেখে দিত।

এই ভাবে গেল আরও সাত-আট দিন। তারপর এল আরেকখানা চিঠি। এবারকার চিঠিখানার ঠিকানাটা লাল কালিতে লেখা না হলেও কি যেন একটা বৈশিষ্ট্য তার ভিতর থেকে ফুটে বেরুচ্ছিল।

মিঃ চিদাম্বরম্ চিঠিখানা খুলে পড়লেন। পড়তে পড়তে স্পষ্ট বোঝা গেল, তিনি কাঁপছেন। প্রাইভেট সেক্রেটারী রামানুজম্ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, চিঠিতে কোন দুঃসংবাদ আছে কি?

তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন, হুঁ।

যাহোক, পড়ে চিঠিখানা তিনি একটি পাথর চাপা দিয়ে টেবিলের উপরেই রেখে দিলেন, আর তখনই শোবার ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সেদিন দু'বার তিনি কেবল কফি চেয়ে খেয়েছিলেন। রাত আটটার সময় বাবুর্চি শেষবার যখন তাঁকে কফি দিয়ে যায়, সে গিয়ে মিঃ রামানুজম্‌কে বলেছিল, কর্তার ঘরে বেশ মিষ্টি

অথচ একটা উগ্র গন্ধ পাওয়া গেল। গন্ধটা কিসের জানি না। কিন্তু কর্তা তো মনে হল জেগেই রয়েছেন। আমার যেন কি রকম মনে হচ্ছে।

সেক্রেটারী মিঃ রামানুজম্ কেমন যেন একটু সন্দিহান হয়ে ঘরে ঢুকতেই মিঃ চিদাম্বরম্ তাঁকে গম্ভীর ভাবে আদেশ করলেন, আমি একটু একা থাকতে চাই, মিঃ রামানুজম্। আমাকে একা থাকতে দিন।

তাঁর কথায় তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে তৎক্ষণাৎ সেই কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন। রামানুজমের জবানবন্দি থেকে জানা যায়—ঘরের সেই গন্ধটা রামানুজমকেও আকৃষ্ট করেছিল। এবং সেটা কোন দুর্গন্ধ বা আপত্তিকর গন্ধ ছিল না। কাজেই রামানুজম্ পরক্ষণেই তা ভুলে গিয়েছিলেন, মনে রাখবার বা অনুসন্ধান করবার মত প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি।

চিদাম্বরমের পাশের ঘরেই থাকতেন রামানুজম্।

অনুমান রাত একটার সময় চিদাম্বরমের শোবার ঘরের ভিতর একবার যেন মৃদু খস্‌খসানি শব্দ শোনা যায়। শব্দ শুনে মিঃ রামানুজম্ বিছানায় একবার উঠে বসেছিলেন। তারপর কিছুক্ষণ কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে তিনি ফের শুয়ে পড়েন ও ঘুমিয়ে পড়েন। কিন্তু ঘণ্টাখানেক যেতে-না-যেতেই আবার একটা শব্দ শুনে তিনি জেগে ওঠেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল কারা যেন মিঃ চিদাম্বরমের ঘরে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন আর কাদের কথাবার্তার চাপা আওয়াজ যেন শোনা যাচ্ছিল।

মিঃ রামানুজম্ তখনই ঘর থেকে বের হয়ে ব্যাপারটা কি দেখবেন বলে দরজা টানতেই বুঝলেন তাঁর নিজের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। মিঃ রামানুজম্ তখন ঘরের ভিতর থেকেই হাঁকডাক করতে থাকেন। কিন্তু অত রাত্তিরে সকলেই ঘুমিয়ে ছিল ; কাজেই বাড়ির লোকজন ছুটে এসে তাঁকে বের করতে সময় গেল অনেকটা।

মিঃ রামানুজম্ মুক্তি পেয়ে তাঁর মনিবের ঘরে এসে দেখেন—ঘর খালি। মিঃ চিদাম্বরম্ কোথাও নেই।

দেখা গেল—ঘরের জিনিসপত্র সবই ঠিক আছে, কিছুই তছনছ হয়নি। সেই উগ্রগন্ধী চিঠিখানার খামটি তখনও টেবিলের ওপরে পড়ে আছে, কিন্তু ভিতরে চিঠিখানি নেই, তার বদলে খামের ভিতরে রয়েছে একটুকরো সাদা কাগজ—তাতে রক্তমুখী ড্রাগনের একটা ছবি আঁকা।

পরের দিন সংবাদ পেয়ে মিঃ রামিয়া তাঁর দলবল নিয়ে অকুস্থানে এসে অনুসন্ধান করে দেখতে পেলেন যে, মিঃ চিদাম্বরমের ঘরখানির উপরদিকের একটা স্কাইলাইট থেকে একগাছা সুতো ঝুলছে আর তাঁর ঘরের দক্ষিণ দিকের দরজার সামনে কতকগুলো পায়ের দাগ রয়েছে। তার মধ্যে একজোড়া পায়ের ছাপ খুবই ছোট ছোট—মানুষের পায়ের ছাপ ব'লে মনে হয় না। আর পাওয়া গিয়েছিল মিঃ চিদাম্বরমের ডাইরীটা তাঁর লেখার টেবিলের ড্রয়ারে।

পুলিস এরপর এখানে সেখানে নানা জায়গায় খানাতল্লাশ করেছিল এবং কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছিল ; কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাদের সবাইকে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

সিংহলের পুলিস এর বেশী আর কিছু করতে পারেনি।

পুলিস তো পারেনি, কিন্তু কিরীটী রায় যে পারবে তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? ব্যাপারটা এত ঘোরালো, আর এমন সুনিপুণ ভাবে কাজটা হাসিল করা হয়েছে যে, তদন্তের সূত্র কোথাও যেন কিছুমাত্র নেই।

কি ভাবছেন মিঃ রায়?

দুটো দিন আমাকে ভাবতে দিন মিঃ রামিয়া।

কিরীটী রামিয়ার কাছ থেকে অতঃপর বিদায় নিল।

কিরীটী সুব্রতকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে আসবার পথে গাড়ির মধ্যে বসে তন্ময় হয়ে কেবল তাই ভাবছিল।

হঠাৎ চলতে চলতে গাড়িটা একবার যেন একটু কেঁপে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার বিদ্যুৎবেগে ব্রেক কষে গাড়িখানা দাঁড় করিয়ে ফেলল, আর চিৎকার করে কাউকে গাল দিয়ে উঠল, এই শুয়ার।

কিরীটীর চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ মুখ বাড়িয়ে বলল, কি ব্যাপার ড্রাইভার?

ড্রাইভার তেমনি ঝাঁজালো কণ্ঠে বলল, একটা ছোকরা কোত্থেকে যেন গাড়ির সুমুখে লাফিয়ে পড়েছিল। লোকটা মরতে মরতে বেঁচে গেছে!

কিরীটী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল।

কিন্তু কি আশ্চর্য! যাকে নিয়ে এত কাণ্ড, সেই ছোকরাটা চট্ করে মাটি থেকে উঠে পড়েই কিরীটীর কাছে এগিয়ে এল। তারপর কিরীটী কোন কিছু বোঝবার আগেই সে হাত বাড়িয়ে তাকে একখানি চিঠি দিয়ে বলল, আপনার একখানি চিঠি স্যার, এই নিন।

চিঠিখানি সে কিরীটীর হাতে একরকম গুঁজে দিয়েই, পরমুহূর্তে রাস্তার অপর পাশে ছুটে গেল যেন।

কিরীটী দেখতে পেল, ছোট একখানা মোটরগাড়ি রাস্তার উল্টোদিকে অপেক্ষা করছিল। ছোকরাটি তাড়াতাড়ি গাড়ির ভিতর উঠে বসতেই গাড়িটা যেন বায়ুবেগে দেখতে দেখতে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কিরীটী আবার নিজের গাড়িতে উঠে বসল, ঐ ছোট গাড়িখানাকে তাড়া করে অনুসন্ধান করা সম্পূর্ণ বৃথা—এই সহজ সত্যটা স্পষ্ট অনুভব করে ড্রাইভারকে আবার গাড়ি চালাতে বলল।

ড্রাইভার জীবনবাবুর বাড়ির দিকে গাড়ি চালিয়ে দিল।

সুব্রত বললে, চিঠিখানা পড়লে না কিরীটী?

কিরীটী জবাব দিল, ও আমি দেখে নিয়েছি তক্ষুনি। চিঠিখানায় আমাকে একটু শাসানো হয়েছে। দেখতে চাও? দেখ।

কিরীটী চিঠির ভাঁজখানা খুলে ফেলল। সুব্রত দেখল, চিঠিতে লেখা রয়েছে :—

মিঃ রায়,

তুমি সুচতুর গোয়েন্দা জানি। তবু তোমাকে অনুরোধ করছি—এসব ব্যাপারে তুমি নিজেকে জড়িত করো না। আরো একটা কথা, তোমার বোধ হয় জানা ভাল—তুমি যার বিরুদ্ধে তদন্ত করতে যাচ্ছ, সে আর কেউ নয়—সে রক্তমুখী ড্রাগন। এর পরেও যদি তুমি চিদাম্বরমের ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাতে যাও, তবে জেনে রেখো 'রক্তমুখী ড্রাগন' তোমাকেও ক্ষমা করবে না।

সুব্রত খানিকটা চিন্তিতভাবে বলল, তাহলে কি করবি?

গাড়ি তখন দোরগোড়ায় এসে পড়েছিল। কিরীটী নামতে নামতে বলল, ভয় পেলি নাকি সুব্রত? তুই তাহলে বাড়ি ফিরে যা!

সুব্রত লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল।

।। তিন ।।

দিনচারেক পরের কথা। রাত তখন প্রায় নটা কি সাড়ে-নটা। জীবনবাবুর বসবার ঘরে কিরীটী সুব্রত ও রাজু গল্প করছিল, এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল—ক্রিং ক্রিং..

জীবনবাবু উঠে গিয়ে রিসিভারটা কানের কাছে তুলে ধরলেন, হ্যালো!...কে, কিরীটী রায়? ...ডেকে দেবো?...ধরুন!...

রিসিভারটা কাত করে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে জীবনবাবু বললেন, ওহে কিরীটী, পুলিস-ইনস্পেক্টর মিঃ রামিয়া তোমায় ফোনে ডাকছেন।

কিরীটী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে ফোন ধরল।

মিনিট পনেরো ধরে ফোনে কি-সব কথাবার্তা বলে কিরীটী ফোন রেখে রাজুর সামনে এসে দাঁড়াল।

আমি একবার বাইরে বেরুব জীবন।

ব্যাপার কি বল তো? এত রাত্রে আবার কোথায় যাবে?

কিরীটী বলল, মিঃ রামিয়ার ওখানে।

তারপর রাজুর দিকে ফিরে বলল, সুব্রত থাক, তুই চল আমার সঙ্গে।... কথাটা বলে ওপরে নিজের ঘরে কাপড় বদলাতে চলে গেল কিরীটী।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ল। গাড়িতে চলতে চলতে একসময় কিরীটী বললে, মিঃ সুন্দর দাস এখানকার একজন মস্তবড় মার্চেন্ট। তাঁকে তাঁর অফিস-ঘরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং তাঁর ঘরের সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের ওপরে 'রক্তমুখী ড্রাগন' আঁকা একটা খাম পাওয়া গেছে। মিঃ রামিয়া সেখান থেকেই আমাকে একটু আগে ফোন করেছিলেন।

আমরাও কি সুন্দর দাসের ওখানেই যাচ্ছি?

হ্যাঁ।

বড় রাস্তার উপরেই মিঃ সুন্দর দাসের প্রকাণ্ড তিনতলা বাড়ি—মার্বেল রক।

রাতের অন্ধকার তখন চারিদিকে বেশ ঘন হয়ে এসেছে, রাস্তার দু'পাশের ইলেকট্রিক বাতি থাকায় চারিদিক বেশ আলোকিত।

মার্বেল রকের সামনেই দু'জন পুলিস মোতায়েন ছিল। কিরীটী ও রাজুকে এগিয়ে আসতে দেখে তাদেরই একজন জিজ্ঞেস করে, আপনি কি মিঃ কে. রায়?

কিরীটী মৃদুস্বরে বললে, হ্যাঁ।

আসুন আমার সঙ্গে, ইনস্পেক্টর সাহেব ওপরে আছেন।

কিরীটী ও রাজু লোকটার পিছু পিছু এগিয়ে যায়।

সুন্দর দাসের বাড়িতে অফিস-ঘরটা দোতলায় দক্ষিণ কোণে।

একটা লম্বা টানা বারান্দায় পর পর খান-পাঁচেক ঘর, সর্বশেষের ঘরখানাই সুন্দর দাসের অফিস-ঘর।

অফিস-ঘরের পিছনদিকে, নীচে ছোট একটা গলিপথ, সেই গলির অপর পাশে একটা দোতলা বাড়ি। কিরীটীর নজরে পড়ল।

বাড়িটার দরজায় তালাবন্ধ। জানালা-দরজা সব ভিতর হতে বন্ধ।

দুটো বাড়ির ব্যবধান মাত্র হাত-তিনেক।

পুলিসের পিছু পিছু কিরীটী ও রাজু ঘরে এসে প্রবেশ করল।

মিঃ রামিয়া ঘরের সেক্রেটারিয়েট টেবিলের উপরকার কাগজপত্রগুলো নাড়াচাড়া করে দেখছিলেন।

গুড্ ইভনিং মিঃ রামিয়া—

কিরীটীর কণ্ঠস্বরে মিঃ রামিয়া মুখ তুলে তাকালেন।

গুড্ ইভনিং, আসুন, এই ঘরের মিঃ সুন্দর দাসের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। ঐ সুন্দর দাসের মৃতদেহ।

কিরীটী প্রথমেই একবার নিঃশব্দে চোখ বুলিয়ে ঘরটা দেখে নিল।

অতি আধুনিক কায়দায় ঘরখানি সাজানো-গোছানো। মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট বিছানো। দেওয়ালে দামী দামী সব ল্যাণ্ডস্কেপ বিদেশী চিত্রকরদের। সিলিং থেকে ঝোলানো সাদা ডিম্বাকৃতি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক আলোয় সমস্ত ঘরখানি ঝলমল করছে।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলের একপাশে গদি-মোড়া একখানি রিভলভিং চেয়ার ; তারই একপাশে সুন্দর দাসের মৃতদেহ মেঝেয় কার্পেটের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। কিরীটী নীচু হয়ে মৃতদেহটা পরীক্ষা করে দেখল। মৃতদেহে ক্ষতের চিহ্নমাত্র নেই। কোনরূপ গুলির দাগ বা ছোরাছুরি দিয়ে কাটা কোন ক্ষত পর্যন্ত নেই।

মিঃ রামিয়া বললেন, কোন ইনজুরি বা কিছুই মৃতদেহে নেই।

কিরীটী কোন জবাব দিল না।

মৃতদেহের পজিশানটা আর একবার ভাল করে দেখে কিরীটী আবার ঘরের চারিদিকে তাকায়। বেশ প্রশস্ত ঘরটা। ঘরের মধ্যে যাতায়াত করবার মাত্র একটিই দরজা। বারান্দার দিকে দুটো জানালা, তাতে কাঁচের শার্সি আঁটা।

রাস্তার দিকে গোটা-তিনেক জানালা, তারও দুটো বন্ধ, একটা খোলা। জানালাগুলোর কোনটাতেই গরাদ নেই। দামী নেটের পর্দা টাঙানো।

গলির দিকে কোন জানালা নেই। শুধু ওপরে দেওয়ালে দুটো স্কাইলাইট। একটায় কাঁচ আটকানো, অন্যটায় কোন কাঁচই নেই।

কিরীটী এগিয়ে এসে টেবিলটার সামনে দাঁড়াল।

সেই খামটা কই? মিঃ রামিয়া, ফোনে যে খামের কথা বলেছিলেন?

ইন্সপেক্টর খামখানা এগিয়ে দিলেন। পার্চমেন্ট-পেপারে তৈরী একখানি চৌকো খাম। সাদা রংয়ের অতি সাধারণ দেখতে। খামটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে দেখতে কিরীটী বলল, কোন কিছুই তো আঁকা দেখছি নে!

ইনস্পেক্টর অল্প একটু হেসে খামের ভাঁজে ভাঁজে খুলে ফেললেন।

খামের ভিতরে একটা অতি বীভৎস ড্রাগনের প্রতিচ্ছবি আঁকা। ড্রাগনের রং কালো, মুখখানা রক্তবর্ণের।

ঘরে ঢোকার পর থেকেই একটা সূক্ষ্ম অস্পষ্ট গন্ধ যেন কিরীটীর নাকে এসে লাগছিল। গন্ধটা যে ঠিক কি ধরণের বলা শক্ত। খুব কটু নয়, অথচ সমস্ত গা-টা ঘিন্‌ঘিন্ করে।

খামটার ভাঁজ খোলার সঙ্গে সঙ্গে গন্ধটা যেন আরো স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে নাকে এসে লাগল কিরীটীর।

কিরীটী খামটা নাকের কাছে তুলে ধরে শুঁকলো। রাজু পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে জিজ্ঞাসা করল, কি?

শুঁকে দেখ। কিরীটী বলল।

রাজু খামটা শুঁকতে শুঁকতে বললে, কিসের যেন একটা গন্ধ পাচ্ছি।

খামটা নিতে পারি ইনস্‌পেক্টর? কিরীটী বললে।

স্বচ্ছন্দে। ও খাম কিন্তু মৃত্যুর দূত। রামিয়া হাসতে লাগলেন।

কিরীটী মৃদু হেসে খামখানা পকেটের মধ্যে রেখে দিল। তারপর সমস্ত ঘরটা ঘুরে ঘুরে আবার দেখতে লাগল।

হঠাৎ ওপাশের দেয়ালে একটা সুতোর মত কি কিরীটীর চোখে পড়ল। এগিয়ে এসে হাত দিয়েই কিরীটী বুঝল, অতি সূক্ষ্ম কিন্তু বেশ শক্ত একটা রেশমী সুতো। সুতোটা টান দিয়ে দেখল, সেটা স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে গলে এসেছে এবং সুতোটা টেনে বুঝতে পারল, সেটার অপর প্রান্ত কোথাও আটকানো। সঙ্গে সঙ্গে কিরীটীর মনে হল সেই চিদাম্বরমের কেসটা।

চলুন ইনস্‌পেক্টর।

কিরীটী ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় গেল।

বারান্দার শেষপ্রান্তে এসে নীচের গলিপথ বেশ স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে।

সুন্দর দাসের প্রাইভেট সেক্রেটারী একজন বাঙালী অল্পবয়সী ছোকরা। নাম—মহিম রায়।

কিরীটী মহিম রায়কে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা মহিমবাবু, গলির ওপারের বাড়িটা কার?

ওটা একজন পাঞ্জাবী ডাক্তারের, মাসখানেক হল উনি সপরিবারে দেশে ভাটিণ্ডায় গেছেন। বাড়িটা বর্তমানে তালা-বন্ধই আছে।

বাড়িতে কেউ থাকে না তাহলে?

বাইরে শুধু দারোয়ান থাকে।

গলির মধ্যে যেতে হলে বড় রাস্তা দিয়ে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে, না?

হ্যাঁ। মহিম বললেন।

চলুন না, একবার গলিটা ঘুরে আসি।

চলুন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে কিরীটী জিজ্ঞাসা করে, আচ্ছা মহিমবাবু, সন্ধ্যার পর ঠিক কটা হবে যখন আপনি মিঃ দাসের ঘরে যান?

সাড়ে সাতটা কি পৌনে-আটটা হবে। ঘরের দরজা ভেতর থেকে ভেজানো ছিল, অল্প একটু ঠেলতেই খুলে গেল। অন্ধকার ঘর। একটু অবাক হলাম। কেননা আমি জানতাম মিঃ দাস ঘরেই আছেন। আমায় তিনি পৌনে আটটার সময় ঘরে গিয়ে ব্যবসা-সংক্রান্ত কয়েকটা আবশ্যকীয় কাগজপত্র চেয়ে নিয়ে আসতে বলেছিলেন ; আজ রাত্রে একটা পার্টির সঙ্গে জরুরী কনসালটেশন ছিল, কাগজপত্রগুলো সেই সংক্রান্তই। ঘর অন্ধকার দেখে ভেবেছিলাম প্রথমে, মিঃ দাস হয়ত ঘরে নেই—কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল মিঃ দাস তো কখনও দরজায় চাবি না দিয়ে অফিস-ঘর ছেড়ে যেতেন না। তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে আলো জ্বাললাম। দেখি ঘরের মধ্যে মিঃ দাস উপুড় হয়ে পড়ে আছেন।

শেষ আপনার কখন মিঃ দাসের সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

বিকেলে তিনটে সাড়ে-তিনটের সময়।

তখন তিনি কোথায় ছিলেন?

তাঁর অফিস-রুমে।

তারপর?

আমি প্রথমটা যেন থমকে গেলাম। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে ঠেলা দিয়ে ডাকলাম, স্যার! স্যার! ... কিন্তু কোন সাড়া-শব্দ পাওয়া গেল না। চিৎকার করে চাকরবাকরদের ডাকলাম। পুলিসেও খবর দেওয়া হল।

আপনি তো সারাটা দুপুর আপনার ঘরেই ছিলেন?

হ্যাঁ, অফিস-রুমের পাশেই আমার বসবার ঘর।

আচ্ছা কোনরকম শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন? কিংবা তিনটে থেকে সাতটার মধ্যে কেউ মিঃ দাসের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, বলতে পারেন?

আমি ঠিক পাঁচটা সাড়ে-পাঁচটার সময় মিনিট পনেরোর জন্য নীচে টিফিন খেতে গিয়েছিলাম, সেই সময় যদি কেউ এসে থাকে তো বলতে পারি না। মিঃ দাসের বেয়ারা সুখলাল বলতে পারে।

কিরীটী লক্ষ্য করে দেখল, গলিতে গ্যাসলাইট থাকলেও বেশ অন্ধকার, আর মিঃ দাসের অফিস-ঘরের পিছনের এ-পাশের বাড়ির একটা খোলা ছাদ আছে। ছাদের প্রাচীরের ওপর একসার ফুলের ও পাতাবাহারের টব। অন্ধকারে গাছের পাতাগুলো অল্প অল্প হাওয়ায় থেকে থেকে কেঁপে উঠছে।

রাজুকে ছাদের দিকে নজর রাখতে বলে কিরীটী মহিমবাবুকে নিয়ে ঘুরে ও-বাড়ির গেটের দিকে এগিয়ে গেল।

রাজু অন্ধকার ছাদটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সহসা কার চাপা কণ্ঠস্বরে চমকে পাশে তাকাল।

বাবু?

বছর বারো-তেরোর একটি ছোকরা। দেখলে ভিখিরী বলেই বোধ হয়।

বাবু?

কি রে?

বাবু, এই চিঠিটা আপনাকে দেবার জন্য একজন বাবু দিয়ে গেলেন।

আমাকে? রাজু বিস্মিত হয়ে শুধাল।

হ্যাঁ, বাবু।

রাজু একটু যেন অবাক হয়েই ছেলেটার হাত থেকে চিঠিটা নিল। ছেলেটা চিঠিটা দিয়েই দ্রুতপদে ওদিককার আঁধার গলিপথে অদৃশ্য হয়ে গেল।

দূরের গ্যাসপোস্ট থেকে একটুখানি আলো অস্পষ্ট ভাবে এদিকে এসে পড়েছে। সেই স্বল্পালোকে রাজু খামখানা চোখের সামনে তুলে ধরল।

ঠিক সেই সময় পিছন থেকে একটা অস্পষ্ট চাপা হাসির শব্দে রাজু চমকে পিছন ফিরে তাকাল।

।। চার ।।

ভয় পেলি? আমি কিরীটী।

না।

খামটা দে। ওটা তোমার জন্য নয়। আমার উদ্দেশে ওটা প্রেরিত হয়েছে।

মানে তোমার কথা তো আমি বুঝতে পারছি না কিরীটী!

ঐ খামখানা 'রক্তমুখী ড্রাগন'-এর কাছ থেকে এসেছে। প্রেরক আমার কাছেই খামখানা পাঠিয়েছে এবং এর থেকে একটা দিক আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। শুঁকে দেখ!

কিরীটী খামখানা রাজুর হাত হতে নিয়ে তার নাকের কাছে তুলে ধরল।

ঠিক সেইরকম তীক্ষ্ণ অথচ অস্পষ্ট বিষাক্ত গন্ধ। গা ঘিনঘিন করে। কিরীটী পরক্ষণেই পকেট থেকে সুন্দর দাসের ঘরে পাওয়া ড্রাগন-চিহ্নিত খামখানি বের করে বলল, দুটোর গন্ধ মিলিয়ে দেখ, একই রকম কিনা!

দুটো খামের গন্ধ মিলিয়ে রাজু বলল, তাই তো?

চল, আর একবার মিঃ দাসের মৃতদেহটা ভাল করে দেখতে হবে।

চল—

ওরা আবার সুন্দর দাসের গৃহে এসে প্রবেশ করল।

স্থানীয় পুলিস-সার্জেন সবে তখন মৃতদেহ পরীক্ষা শেষ করে ইনস্‌পেক্টর রামিয়ার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। কিরীটকে ঘরে ঢুকতে দেখে রামিয়া কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললেন, মিঃ রায়, ডাক্তার বলছেন, মিঃ দাস নাকি হার্টফেল করে মারা গেছেন!

কিরীটী ঝুঁকে পড়ে তীব্র আলোয় আর একবার সমস্ত দেহটার ওপর চোখ বুলিয়ে নিল।

ঐ সময়ই তার নজরে পড়ল মৃতদেহের গলার কাছে কয়েকটা ছোট ছোট রক্তের বিন্দুর মত দাগ। দেখতে অনেকটা ছুঁচ কিংবা ঐজাতীয় কোন কিছু দিয়ে বিঁধানোর মত ক্ষত। এছাড়া আর কোথাও তেমন কিছু চিহ্ন পাওয়া গেল না।

মিঃ রায়, আপনার কি মনে হয়? রামিয়া প্রশ্ন করলেন।

আমার? কিরীটী একটা চুরোট ধরাতে ধরাতে নিভন্ত কাঠিটা ফুঁ দিয়ে নিভুতে নিভুতে বলল, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, মিঃ দাস হার্টফেল করে মারা যাননি। তাঁকে খুন করা হয়েছে

আপনার এ অনুমান মিথ্যাও তো হতে পারে? রামিয়া বললেন।

হতে পারে ; কিন্তু সে সম্ভাবনা খুবই কম মনে হয়।

অতঃপর সুখলালকে প্রশ্ন করা হলে সে বললে—বেলা তখন পৌনে-পাঁচটা আন্দাজ হবে, একজন চীনা লোক নাকি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে আসে কি একটা জরুরী চিঠি নিয়ে। চীনাটাকে বাবুর ঘরে পৌঁছে দিয়েছিল সে। সুখলাল বলতে লাগল, লোকটা বাবুর সঙ্গে দেখা করে চলে যাবার পর আমি তখনও সিঁড়ি দিয়ে নীচে নামছি, এমন সময় হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে পেছন ফিরে তাকালাম। দেখি, বাবু দরজা খুলে ছুটে বাইরে আসছেন। সমস্ত চোখ-মুখ জুড়ে যেন একটা ভীষণ আতঙ্ক! আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বাবুকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম, এবং বাবুকে ধরে নিয়ে গিয়ে ঘরের মধ্যে সোফার উপর বসিয়ে দিলাম। বাবু তখন হাঁপাচ্ছেন। আমাকে হাত নেড়ে ঘর থেকে চলে আসতে বললেন। ঘর থেকে বেরিয়ে আসছি, শুনলাম বাবু অস্পষ্ট স্বরে যেন বলছেন, 'লাল বাঁকা'!

আচ্ছা, আজকের সন্ধ্যার এই ঘটনা ছাড়া আর কোনদিন কিছু ঘটেছিল কি সুখলাল?

না, এমন বিশেষ কিছু ঘটেনি। তবে পরশু রাত্রে তখন প্রায় দশটা কি এগারোটা হবে, বাবু অফিস ঘরে কাজ করছিলেন, সেক্রেটারী বাবুও চলে গেছেন—বাবু সাধারণতঃ একটু বেশী রাত পর্যন্ত জেগেই কাজ করতেন। বাবুর কাজ সারা হলে, শোবার পর আমি শুতে যাই—বাইরের বারান্দায় বসে আছি এমন সময় হঠাৎ দরজা খুলে বাবু বেরিয়ে এলেন, মনে

হল তিনি যেন খুব ভয় পেয়েছেন। বাবু বললেন—সুখলাল, আমার ঘরটা একটু ভাল করে খুঁজে দেখতো! মনে হচ্ছে কিছু যেন ঘরের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

কিছু জিনিস, না কোন লোক লুকিয়ে আছে তিনি বলেছিলেন? কিরীটী প্রশ্ন করল।

কিছু জিনিস তিনি বলেছিলেন!

তারপর?

আমি ঘরের মধ্যে ঢুকে সব খুঁজলাম। কিন্তু কোথাও কিছু দেখতে পেলাম না।

মিঃ রামিয়ার গাড়ি বাইরে অপেক্ষা করছিল। রামিয়া কিরীটীর দিকে চেয়ে বললেন, রাত্রি অনেক হয়েছে, মিঃ রায়। আপনাকে একটা লিফ্‌ট্‌ দিয়ে যাব কি?

কিরীটী বললে, যদি অসুবিধা না হয়—

না, অসুবিধা কি। চলুন।

গাড়ির পিছনের সীটে রামিয়া, কিরীটী ও রাজু বসল। গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে।

কিরীটী চাপা স্বরে রাজুকে বলল, পেছনের কাঁচ দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে দেখ তো, কোন গাড়ি আমাদর পিছু নিয়েছে কি?

রাজু দেখল, একটা কালো রংয়ের মোটরগাড়ি মাত্র হাত পাঁচেক তফাতে নিঃশব্দে রামিয়ার গাড়ির পিছু-পিছু আসছে।

মিঃ রামিয়া বললেন, বটে, আমার পিছু লাগা! দাঁড়াও, আমি দেখাচ্ছি মজা!...বলেই তিনি গাড়ি ঘুরিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতে উদ্যত হলেন।

বাধা দিয়ে কিরীটী বলল, সে চেষ্টা করবেন না মিঃ রামিয়া। তাতে বিপদ হ'তে পারে।

বিপদ!

হ্যাঁ। মৃদু হেসে কিরীটী বলল, মিঃ রামিয়া, সাধ করে বিপদ ডেকে এনে কোন লাভ নেই। অতি সহজে যদি কার্যোদ্ধার হয়, তাহলে শখ করে বিপদের মুখোমুখি হওয়ার মানেই হচ্ছে একটা গোঁয়ার্তুমি।

মিঃ রামিয়া বললেন, সহজেই কার্যসিদ্ধি। আমি ঠিক বুঝলাম না আপনার কথাটা।

কিরীটী বলল, গাড়িটার গতি একটু কমিয়ে দিন ; তারপর ঐ গাড়িখানার মাথার ওপর দিয়ে দুটো গুলি ছুঁড়ুন। দেখুন না, ব্যাপারখানা কি হয়!

কিরীটীর কথার কোন প্রতিবাদ না করে মিঃ রামিয়ার পিস্তল দু-দুবার দম্‌ দম্‌ করে গর্জন করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পেছনের গাড়িটা থেমে গেল ; তারপর ক্যাঁচ করে একটা আওয়াজের সঙ্গে গাড়িখানা পেছনে হটে গেল এবং দেখতে দেখতে হঠাৎ মুখ ঘুরিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে তীরবেগে ছুটে পালিয়ে গেল।

কিরীটী বলল, দেখলেন মিঃ রামিয়া! ওটা শত্রুর গাড়ি তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ওর উদ্দেশ্য ছিল কেবল অনুসরণ করা। যখন ধরা পড়ে গেল তখন আর বৃথা বিপদের ঝুঁকি ওই বা নেবে কেন? তাই পালিয়ে গেল।

তারপর কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ।

হঠাৎ কিরীটী নীরবতা ভেঙে বলল, মিঃ রামিয়া, চিদাম্বরমের ব্যাপারটা আপনার মনে আছে তো?

আছে বৈকি! কিন্তু সে-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন, মিঃ রায়?

কিরীটী বলল, চিদাম্বরমের সেই ঘটনা আর সুন্দর দাসের ব্যাপারটা। দুটো ঘটনার মধ্যে

বৈশিষ্ট্য বা সামঞ্জস্য লক্ষ্য করেছেন কি?

কি বলুন তো!

কিরীটী বলল, দুটো ব্যাপারেই ঘরের স্কাইলাইট থেকে একটা সুতো ঝুলছে, দেখা গেছে।

মিঃ রামিয়া বললেন, হ্যাঁ, সে-কথা ঠিক। কিন্তু—

কিরীটী বলল, এই সুতোর ব্যাপার থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, ঐ দুটির নায়ক একই ব্যক্তি সম্ভবতঃ এবং নায়ক যে-ই হোক না কেন, তার এই অপকার্যে তাহাকে সাহায্য করেছে অতি ক্ষুদ্র কোন জিনিস, সে জিনিসটা নির্জীব কোন জড়পদার্থ হতে পারে, অথবা সজীব কোন ক্ষুদ্র প্রাণী—যেমন কোন পোকা-মাকড়ও হতে পারে।

মিঃ রামিয়া বললেন, ঠিক বুঝলাম না—ক্ষুদ্র প্রাণী বা পোকামাকড়—কি বলতে চাইছেন?

মৃদু হেসে কিরীটী বলল, বেশ, তাহলে আরও একটু খুলে বলছি। ওপর থেকে ঘরের ভিতর সুতো ঝুলিয়ে দেওয়াটা—আমার মনে হচ্ছে কোন সজীব বা নির্জীব জিনিস সেই সুতোয় বেঁধে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল ; তারপর যেই কাজ সিদ্ধ হয়ে গেছে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে তুলে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু জিনিসটা তুলে নিয়ে গেলেও সুতোটা থেকে গিয়েছে। হয়ত সুতোটার কথা সে ভাবেনি বা সেটা নিয়ে যাবার কোন প্রয়োজন বোধ করেননি বহুক্ষেত্রেই।

আরও একটু খোলসা করে বলুন মিঃ রায়।

কিরীটী বললে, মনে করুন অপরাধী সুতোর সাহায্যে চিদাম্বরমের বেলায় এমন একটা জিনিস,—সজীব বা নির্জীব,—ঘরের ভিতর নামিয়ে দিয়েছিল যে, যার ফ... চিদাম্বরম অজ্ঞান হয়ে যান, তারপর সেই অচৈতন্য চিদাম্বরমকে কেউ বা কোন একদল লোক চুরি করে নিয়ে গেছে। আর সুন্দর দাসের বেলায় হয়ত সেই সুতোয়-বাঁধা জিনিসটা ঘরে পৌঁছে সুন্দর দাসের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তারপর একটু থেমে বললে, মিঃ রামিয়া এটাও জানেন—ক্লোরোফর্ম জাতীয় জিনিসে লোক অজ্ঞান হয়ে যায়, আর অতি সূক্ষ্ম সাপের কামড়েও লোক মারা যেতে পারে--

মিঃ রামিয়া চিন্তিতভাবে একটা সংক্ষিপ্ত উত্তর দিলেন, তা অবিশ্যি পারে।

খানিক পরে তিনি সহসা নীরবতা ভেঙে জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা মিঃ রায়, তাহলে এই অপরাধীর সম্পর্কে আপনার ধারণা কি? কোন্ জাতীয় লোক সে?

কিরীটী বলল, এই মুহূর্তে তার সঠিক জবাব দেওয়া শক্ত। তবু যতটা মনে হচ্ছে, বলছি। সাধারণ চোর-ছ্যাঁচোড় নয় এমন একজন যার রাসায়নিক চিকিৎসা বা বিষ-বিজ্ঞান (Toxicology) সম্বন্ধে প্রচুর জ্ঞান আছে। শুধু তাই নয়, লোকটার হয়ত প্রাণিবিজ্ঞান সম্পর্কেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি আছে।

ঐ ধারণা কেন আপনার হল বলুন তো? ইনস্পেক্টর মিঃ রামিয়া জিজ্ঞেস করলেন।

কিরীটী বলল, কেন বলছি, শুনুন। পুলিস-রেকর্ডে আপনিই লিখে রেখেছেন যে, চিদাম্বরমের দরজার বাইরে কিছু পায়ের দাগ দেখতে পাওয়া গেছে। কিন্তু সেই পায়ের দাগগুলোর মাঝে একজোড়া পায়ের দাগ ছিল খুবই ছোট—মানুষের পায়ের দাগ বলে মনে হয় না। তাই না মিঃ রামিয়া?

হ্যাঁ।

বেশ, তাহলে কি এই স্বভাবতঃ মনে হয় না যে, তাদের দলে কোন মানুষ ছাড়াও সেই প্রাণীও আছে। এবং ঘরের ছাদ থেকে সুতো বেঁধে যে জিনিসটা নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল,

সে-জিনিসটাও সম্ভবতঃ কোন সজীব জিনিস—অর্থাৎ প্রাণী। কারণ প্রাণী ছাড়া অপর কোন নির্জীব জিনিসের পক্ষে সুন্দর দাসকে হত্যা করা সম্ভব বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ সুন্দর দাসের গলার কাছে ছোট ছোট কয়েকটা রক্তবিন্দুর মত দাগও দেখা গেছে। তা থেকে যদি মনে করা যায় যে, ঐ দাগগুলো কোন প্রাণীর দংশনের দাগ, আর ঐ প্রাণীটাকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল সুতো বেঁধে!

মিঃ রামিয়া আর কোন জবাব দিলেন না। তিনি চুপ করে রইলেন।

গাড়িটা ততক্ষণে জীবনবাবুর বাড়ির দোরগোড়ায় এসে পড়েছিল।

জীবনবাবু তখনও বৈঠকখানায় ওদের অপেক্ষায় জেগে বসে সুব্রতর সঙ্গে গল্প করছিলেন।

কিরীটী ও রাজু ঘরে ঢুকতেই জীবনবাবু বললেন, ব্যাপার কি হে? এর নাম তোমার একটু ঘুরে আসা?

তুমি এখনও আমাদের অপেক্ষায় বসে আছ, জীবন? বড় অন্যায়। কত রাত হয়ে গেছে।

বেশ! অতিথি অভুক্ত, এখনও ফিরল না, আর আমি খেয়ে শুয়ে পড়ব?

চল, আর দেরি করে লাভ নেই।

সকলে খাওয়ার ঘরের দিকে চলল।

।। পাঁচ ।।

পরের দিন রাত্রে।

জীবনবাবুর বাড়িটা রাস্তার একেবারে শেষপ্রান্তে।

বাড়ির পেছনদিকে একটা ছোটখাটো 'সিনামোনে'র বাগান।

বাগানের দিককার একটা ঘরে কিরীটী ও তার বন্ধুদের থাকতে দেওযা হয়েছে। ঘরে গোটা-চারেক জানলা—প্রত্যেকটাই গরাদহীন। বাইরের দেয়ালটা আইভিলতায় একেবারে ছেয়ে গেছে। চারিদিককার দেয়ালে চারটে স্কাইলাইট।

স্কাইলাইটগুলো রেকট্যাঙ্গুলার সাইজের এবং বেশ বড়, একজন মানুষ অনায়াসেই গলে যাতায়াত করতে পারে।

প্রত্যেক খাটে দুজন করে,—দুটো খাটে চারজন শোয়। ঘরের এক কোণে দেওয়াল ঘেঁষে একটা আলমারি বইয়ে একেবারে ঠাসা।

এক কোণে ছোট একটা টেবিল, দুটো সোফা ও গোটা-কয়েক চেয়ার।

সুন্দর দাসের ঘরে কিরীটী যে বিষাক্তগন্ধী খামখানা পেয়েছিল, পকেট থেকে সেখানা বের করে সে টেবিলের উপর রাখল। তারপর সুইচ টিপে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বলল, আজ রাত্রে এটা এই টেবিলেই রইল—দেখা যাক কিছু ঘটে কিনা।

সুব্রত বলল, কি ঘটবে, কিরীটী?

ঈষৎ হেসে কিরীটী বলল, বলিনি বুঝি তোমাকে? আজ আবার 'রক্তমুখী ড্রাগন' আমাকে শাসিয়ে গিয়েছে।

তাই নাকি?

কিরীটী বলল, হ্যাঁ, 'রক্তমুখী ড্রাগন' আজই দুপুরবেলায় একটা লোক মারফৎ একখানা

চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছে যে, সেদিন পিস্তলের গুলিতে যদিও আমরা অনুসরণকারীকে নিরস্ত করেছিলাম, তাহলেও সে আমাদের নাম-ধাম-ঠিকানা সব কিছু জানতে পেরেছে।

সে বলে পাঠিয়েছে যে, প্রায় আমারই চোখের উপর, মানে আমার উপস্থিতির সময়েই সে সুন্দর দাসের দফা শেষ করেছে অথচ আমরা তার কিছুই কূলকিনারা করতে পারিনি, পারবও না। কাজেই সে উপদেশ দিয়েছে, আমরা যেন বাড়ি ফিরে যাই ; নইলে অতি শীগগিরই সে আমাদেরও দফা শেষ করবে।

তারপর একটু থেমে বললে, আমার আশঙ্কা হচ্ছে, 'রক্তমুখী ড্রাগন' আজই আমাদের উপরে একটা attempt নেবে হয়ত। কারণ এমনি ধরনের খুনেদের স্বভাবই এই যে, তারা শাসানি যাকে দেয়, তাকে সময় দেয় খুবই কম,—কখনও বা একেবারেই সময় দেয় না ; শত্রুকে তৈরী হবার সুযোগ দেবার পক্ষপাতী তারা একেবারেই নয়। আজ শাসানি দিয়েছে, হয়ত আজই তা কাজে পরিণত করবার চেষ্টা করবে। কাজেই আমিও আজ পরীক্ষার জন্য তৈরী হয়ে আছি।

কি রকম? কোন পাহারা রাখলে না, কিছুই করলে না—আলোটা পর্যন্ত নিবিয়ে দিলে। অথচ আশঙ্কা করছ, আজই শত্রুপক্ষ কিছু করে ফেলতে পারে! আত্মরক্ষার চেষ্টা করলে কই?

সুব্রতর কণ্ঠস্বর একটু ক্ষুব্ধ।

একটু হেসে কিরীটী বলল, আছে আছে। এই নাও না আত্মরক্ষার জিনিস!

এই বলে সে পকেট থেকে একটা শিশি বের করে, সেই শিশির আরক প্রত্যেকের হাতের পাতায় ঢেলে দিল। আরকের তীব্র ঝাঁঝাল গন্ধে বোঝা গেল, সেটা 'এমোনিয়া সলুসন'।

বেশ করে হাতে ঘষে নাও।

সকলে কিরীটীর কথামত কাজ করল।

আবার সুব্রত বলল, আত্মরক্ষার চমৎকার জিনিস বের করেছ তো কিরীটী!

'রক্তমুখী ড্রাগন'-এর দেওয়া বিষাক্তগন্ধী খামের ষড়যন্ত্র এড়াতে হলে, মনে হয় এই হচ্ছে একমাত্র ওষুধ।

সুব্রত বলল, একটা কথা কিরীটী, অবিশ্যি রক্তমুখী ড্রাগন নামটার মধ্যেই একটা বিভীষিকা ও সেই সঙ্গে রহস্যের ইঙ্গিত আছে এবং চিদাম্বরম্ ও সুন্দর দাস দুজনেই 'রক্তমুখী ড্রাগন'-এর শিকার। রক্তমুখী ড্রাগন তোকে যে চিঠি দিয়ে শাসিয়েছে তাতে করে যেন আমার মনে হচ্ছে এর সব কিছুর পিছনে একটা দুর্ধর্ষ দল আছে এবং তাদের একটা বিশেষ উদ্দেশ্যও আছে।

কিরীটী বললে, ঠিকই অনুমান করেছিস। আমার তো অনুমান তাই।

একটা কথা কিরীটী—

কি?

ঐ বিষাক্ত গন্ধের মধ্যে নিশ্চয়ই কিছুর ইঙ্গিত আছে মনে হয়।

তাই।

কিন্তু গন্ধটা—

অনেকদিন আগে, মনে পড়ে এক পর্যটকের বইতে পড়েছিলাম, তিনি বর্মার জঙ্গলে ঘুরতে ঘুরতে একসময় এক ধরনের অদ্ভুত বুনো ফুল দেখেছিলেন, সেগুলো দেখতে অনেকটা সবুজ রংয়ের। সেই ফুলের গন্ধ ভারী অদ্ভুত ; যেমন তীব্র, তেমনি ন্যক্কারজনক।

সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন যেন এক ঝিম্ ঝিম্ ভাব আনে। এবং ঐ ফুলের গন্ধের এমন একটা আশ্চর্য শক্তি আছে যে, কোন বস্তুতে যদি একবার গন্ধটা লাগে, তার গায়ে যেন একেবারে জড়িয়ে যায়। গন্ধটার একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তিও আছে। এই বিষাক্ত গন্ধেই আকৃষ্ট হয়ে এসে মৃত্যুদূত প্রথমে ছুটে যায় সেই বিষাক্তগন্ধী জিনিসটার দিকে। সম্ভবতঃ বিষাক্ত গন্ধের উত্তেজনায় তার রক্তলালসা জেগে ওঠে, তারপর নিকটবর্তী যে কোন লোকের রক্তপান করবার জন্য সে অতি নিঃশব্দে তার গলদেশে বিষ-দন্ত ফুটিয়ে দেয়—মরণের বিষাক্ত-চুম্বনে সে হতভাগ্য আর কোনদিনই জাগে না।

কথা বলতে বলতে শেষের দিকে কিরীটীর কণ্ঠস্বর কেমন যেন রহস্যময় বলে মনে হয়।

চুরোটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে কিরীটী আবার বলল, মনে পড়ে সুখলাল বলেছিল, দিনতিনেক আগে এক রাত্রে মিঃ দাস হঠাৎ ভয় পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন?...আমার মনে হয় ভয় পেয়েছিলেন ঐ বিষাক্ত গন্ধলোভী কুৎসিত-দর্শন মৃত্যুদূতকে ঘরে চোখের সামনে দেখে।

মৃত্যুদূত?

হাস্-স্-স্।...চুপ্!..

বলেই কিরীটী তার ঠোঁটের ওপর তর্জনী-আঙুলটা রেখে সবাইকে নীরব হবার জন্য সঙ্কেত করল। সকলেই তার সঙ্কেত মেনে তৎক্ষণাৎ চুপ করে গেল।

বাইরে একটা মৃদু খস্খস্ শব্দ। একটা অজানিত আশঙ্কা, একটা অস্বাভাবিক অশরীরী বিভীষিকা যেন অক্টোপাশের মত তার বাহু প্রসারিত করে অন্ধকারে নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে!

নীচের বৈঠকখানার ওয়াল-ক্লকটায় ঢং ঢং করে রাত্রি দুটো ঘোষণা করল।

যে টিবিলটার ওপরে কিরীটী সেই বিষাক্ত-গন্ধী খামখানা রেখেছিল, সেই টেবিলটা তুলে নিয়ে সে নিঃশব্দ পায়ে উঠে বাগানের দিকটার দেয়ালে একটু তফাতে রেখে ফিরে এল।

সব চুপচাপ বসে।

অন্ধকারে প্রত্যেকের নিঃশ্বাসের শব্দ নিঃশব্দে যেন চাপ বেঁধে উঠছে।

আকাশে চাঁদ উঠেছে, তারই আলো এসে স্কাইলাইটের ফাঁক ও খোলা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

একটা অস্পষ্ট শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। বাগানের দিককার দেয়ালে লতিয়ে-ওঠা আইভিলতার পাতায় পাতায় বুঝি একটুখানি মৃদু শব্দ শোনা গেল। তারপরই অস্পষ্ট একটা আবছা কালো ছায়া স্কাইলাইটের উপরে জেগে উঠল। একটা ফ্যাকাশে রংয়ের বিশ্রী কুৎসিত চ্যাপটা মুখ ধীরে ধীরে স্কাইলাইটের ফাঁকে দেখা দিল।

কিরীটীর একপাশে রাজু, অন্যপাশে সুব্রত।...কিরীটী দু'হাতে দু'জনকে ইশারায় চুপচাপ থাকতে বললে।

দেখা গেল সরু সরু প্যাঁকাটির মত আঙুল-বিশিষ্ট একটা ছোট হাত ধীরে ধীরে স্কাইলাইটের শিকটা চেপে ধরল।...ক্রমে আরো একটা হাত তারই পাশে—, নজরে পড়ল ওদের।

একসময় ডানহাতটা সরে গেল, এবং অল্পক্ষণ পরেই সেই হাতটা আবার দেখা গেল। এবারে দেখা গেল, সে হাতে একটা ছোট চৌকো বাক্স ধরা আছে।

আস্তে আস্তে হাতের উপর ভর দিয়ে সেই নিশাচর মূর্তি, বাঁদরের মত অদ্ভুত কায়দায় পাক খেয়ে, ফাঁক দিয়ে মাথা ও দেহের অর্ধেকটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিল।

তারপরই মেঝের উপরে কিছু যেন পড়ার শব্দ পাওয়া গেল।

ঘরের মাঝে যেটুকু চাঁদের আলো এসেছে, তা কম হলেও যথেষ্ট। সেই আলোয় দেখা গেল, বাক্সটা থেকে বের হয়ে একটা অদ্ভুত কুৎসিত-দর্শন ইঞ্চি ছয়েক লম্বা ঘোর লাল রঙের পোকা তার বাঁকানো রোমশ বড় বড় তারের মত সরু সরু ঠ্যাং দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, টেবিলটার পায়ার গা বেয়ে সেই বিষাক্ত-গন্ধী থামটার দিকে চলেছে।

কিরীটী ক্ষিপ্রহস্তে গায়ের জামাটা খুলে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে একটা লাফ দেওয়ার অস্পষ্ট শব্দ পাওয়া গেল। তারপর কিরীটী ছুটে রাস্তার ধারের জানলার দিকে গেল। চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা গেল—একটা কালো রঙের গাড়ি চলে যাচ্ছে।

সুইচ টিপে আলোটা জ্বালতে জ্বালতে কিরীটী বললে, পাখী পালিয়েছে। চল, মৃত্যুদূতকে ভাল করে দেখা যাক।

বলতে বলতে কিরীটী টেবিলের ধারে এগিয়ে গেল এবং টেবিলের জামাটির ওপর একটা লাঠি দিয়ে গোটাকয়েক ঘা দিয়ে জামাটা তুলতেই পরিপূর্ণ আলোকে দেখা গেল, লাল রংয়ের একটা পোকা। পোকাটা একটা বড় পিঁপড়ের মত দেখতে। তার মস্ত মস্ত দুটো শুঁড়। আর সেই শুঁড়ের গায়ে ছোট্ট ছোট সব লোম। মাথার অনুপাতে দেহটা বেশ বড় এবং অসংখ্য সরু সরু কম্পমান পা।

কিরীটী পোকাটার দিকে চেয়ে বললে, এই তাহলে মৃত্যুদূত! যতদূর মনে হয়, এই পোকাটা Scolopendra গ্রুপের। এখন বুঝতে পারছি—মিঃ দাসের চাকর সুখলাল যে বলেছিল, মিঃ দাস অস্ফুট স্বরে বলেছিলেন, 'লাল বাঁকা' বলে একটা কথা—সেটা তিনি 'লাল বাঁকা' বলেননি, বলেছিলেন 'লাল পোকা' এবং সেটা এই রকম একটা পোকা দেখেই।

তাঁর ঘরে যে সিল্কের সুতো পাওয়া গেছল, সেটা দিয়ে এইরকম একটি পোকাকেই নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল তাঁকে মারবার জন্য। কিন্তু প্রথমবারের চেষ্টা নিষ্ফল হয় ; সেইজন্য বোধ হয় দ্বিতীয় চেষ্টা করতে হয়েছিল।

মিঃ দাসের অফিস-ঘর থেকে মাত্র হাত-তিনেক ব্যবধানে গলির অন্য দিকে ছিল সেই পাঞ্জাবী ডাক্তারের বাড়ি। ডাক্তারের বাড়ির দোতলার ছাদে উঠে নিরিবিলিতে স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে এই মরণ-পোকাকে সুতোর সাহায্যে প্রেরণ করা এমন কোন দুরূহ ব্যাপার ছিল না। কিন্তু একটা জিনিস আমার হিসাবে গোলমাল হয়ে যাচ্ছে, মিঃ দাসকে হত্যা করার মধ্যে কি এমন কারণ থাকতে পারে? 'রক্তমুখী ড্রাগন' তো ওঁকে হত্যা না করেও অনায়াসেই কাজ হাসিল করতে পারত, যেমন করে মিঃ চিদাম্বরমকে লুকিয়ে ফেলে কাজ হাসিল করে নিয়েছে!

তার মানে? কি করে জানলে তা? তাছাড়া চিদাম্বরমকে লুকিয়ে রেখেছে, এখবর কি করে জানলে কিরীটী? আগ্রহে উদ্‌গ্রীব হয়ে সুব্রত জিজ্ঞেস করলে।

কিরীটী বললে, মিস্টার রামিয়ার কাছ থেকে আজই সকালে খবর পেয়েছি—চিদাম্বরমের সেক্রেটারীর কাছে রক্তমুখী ড্রাগনের এক পরোয়ানা এসেছে—একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে এক লাখ টাকা না দিতে পারলে, চিদাম্বরমকে তারা পৃথিবী থেকে চিরদিনের জন্য সরিয়ে ফেলতেও পশ্চাৎপদ হবে না, এবং নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে টাকা পেলে, চিদাম্বরমকে তারা

ফিরিয়ে দেবে অক্ষত দেহে ; সে প্রতিশ্রুতিও সেই চিঠির মধ্যে আছে।

।। ছয় ।।

পরদিন সকালবেলা কিরীটী, সুব্রত ও রাজু গতরাত্রের ঘটনা সম্পর্কেই আলোচনা করছিল।

কিরীটী বললে, যে কুৎসিত মুখটা স্কাইলাইটের ফাঁক দিয়ে দেখা দিয়েছিল সেটা মনে হয় একটা বাঁদরের মুখ।

সুব্রত বললে, আমারও তাই এখন মনে হচ্ছে। মুখখানা আমি ভাল করেই দেখেছি। সেটা বাঁদর-জাতীয় কোন প্রাণীর মুখ বলেই মনে হয়।

কিরীটী বললে, আরেকটা কথা সুব্রত—এই দলের যিনি নেতা, অর্থাৎ যিনি মহামান্য 'রক্তমুখী ড্রাগন' নামে পরিচিত, তিনি আমার মনে হচ্ছে হয়ত একজন চায়নীজ—

চায়নীজ!

কিরীটী বললে, তোদের বলিনি—যে বাক্সটার মধ্যে ঐ পোকাটা ছিল—তার মধ্যে একটা কাগজ ছিল?

কাগজ?

হ্যাঁ, চীনা ভাষায় লেখা কাগজটা—তাই আমি ভেবেছি কাগজটার মধ্যে কি লেখা আছে জানতে হবে—আর তাই চীনা ভাষা পড়তে পারে এমন একজন লোকের কথা রামিয়াকে বলেছি—

তারপর একটু থেমে আবার কিরীটী বললে, ঐ রক্তমুখী ড্রাগন যেই হোক, যতই তার কথা ভাবছি মনে হচ্ছে, লোকটা রসায়ন-শাস্ত্রে পণ্ডিত, ইংরেজীতে পণ্ডিত, বাঁদর দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে পারে, বিশালকায় পিঁপড়ের মত জীবকে বিষাক্ত গন্ধে মাতোয়ারা করে মানুষের রক্তপানে লোলুপ করতে পারে। হয়ত কোন ক্ষুদ্র জীবকে ঘরের মধ্যে পাঠিয়ে তাকে বিষাক্ত গন্ধে উন্মত্ত করে ফেলে, এবং তারই কামড়ে নিদ্রিত মানুষকে অচৈতন্য করে দিতে পারে।

দুপুরের দিকে মিঃ রামিয়া এসে হাজির হলেন।

কিরীটী তাঁকে এনে ঘরে বসাল।

কিরীটী বললে, মিঃ রামিয়া, আমি যে একজন শিক্ষিত চীনা লোকের কথা বলেছিলাম, তিনি কোথায়?

তিনি এখুনি আসবেন। কিন্তু তিনি চীনা নন, তিনি একজন জাপানী। চীনা ভাষায়ও তাঁর বেশ দখল আছে। আমাদের পুলিস-স্টাফেরই একজন অ্যাসিস্টাণ্ট কমিশনারের সঙ্গে তাঁর বেশ হৃদ্যতা আছে।

কিরীটী বললে, ঠিক আছে। কিন্তু দেরি না হয়। আমি এর জন্য খুব বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছি। একটু অপেক্ষা করেও তাঁকে যদি সঙ্গে করে—

ঐ সময় মোটরের হর্ন শোনা গেল, সেই সঙ্গে কে একজন চেঁচিয়ে ডাকল, মিঃ রামিয়া! মিঃ রামিয়া এখানে আছেন?

হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন আসুন।

একটু পরেই জাপানী ভদ্রলোকটি এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী কাগজটা ভদ্রলোককে দেখতে দিল।

তিনি কাগজটা পরীক্ষা করে বললেন, এর মধ্যে কয়েকটি নাম আছে—প্রথম দুটি কাটা ও নীচে লেখা ডাঃ ওয়াং।

কাটা নাম!

হ্যাঁ, প্রথমটি চিদাম্বরম্ ও দ্বিতীয়টী সুন্দর দাস—

আর তৃতীয়?

মিঃ ডিবরাজ।

ছাপা কাগজগুলি সাপ্তাহিকি ও মাসিক ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকার অংশবিশেষ। এবং নানা ধরনের সংবাদ রয়েছে তার মধ্যে।

জাপানী ভদ্রলোকটি বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

কিরীটী মৃদুকণ্ঠে কতকটা আত্মগতভাবে বলতে লাগল, রক্তমুখী ড্রাগনের কাগজে ১নং হচ্ছে—মিঃ চিদাম্বরম্ ; ২নং হচ্ছে—মিঃ সুন্দর দাস। তাঁদের কেউ আর এখন আমাদের মাঝে নেই—একজন হয়েছেন অপহৃত, অপরজন নিহত। আর ৩নং নাম হচ্ছে—মিঃ ডিবরাজ!

কে তিনি? তাঁকে জানেন নাকি? কি মিঃ রামিয়া, তিনি এখনও বেঁচে আছেন তো?

আজই সকালে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে।

হঠাৎ কিরীটী বললে, তাহলে মিঃ রামিয়া, রক্তমুখী ড্রাগনের এই ৩ নং শিকার মিঃ ডিবরাজকে বাঁচাবার চেষ্টা আমাদের করতেই হবে।

মিঃ রামিয়া বললেন, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না মিঃ রায়, কি আপনার কথাটা!

বুঝতে পারছেন না? দেখছেন না, এই কাগজখানা হচ্ছে একটা নামের লিস্ট, যে-সব হতভাগ্য রক্তমুখী ড্রাগনের শিকার হবে, এই কাগজখানায় তাদের নাম লেখা রয়েছে। নামের ক্রমিক নম্বর অনুসারে এদের সকলেই রক্তমুখী ড্রাগনের দ্বারা অপহৃত বা নিহত হবে। এদের প্রথম দুটি তো চলেই গেছে, এখন যদি সম্ভব হয় এই ৩ নং ব্যক্তিটিকে রক্ষা করে, বাকী কটাকেও বাঁচানো হয়ত যেতে পারে।

সুব্রত ও রাজু মুগ্ধভাবে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে রইল, আর মিঃ রামিয়া বললেন, ঠিক বলেছেন।

আমার মনে হচ্ছে ঐ রক্তমুখী ড্রাগন নামধারী ব্যক্তিটি আর কেউ নয়—চীনের হলুদ শয়তান ডাঃ ওয়াং।

ডাঃ ওয়াং?

হ্যাঁ, ডাঃ ওয়াং।

এই বলে কাগজের টুকরোটা রামিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে কিরীটী বললে, এই দেখুন মিঃ রামিয়া! প্রায় প্রত্যেকটা কাগজেই ডাঃ ওয়াং-এর স্বাক্ষর। সম্ভবত নিতান্ত অসতর্কভাবে তার চিন্তাকুল মন এমন সাংঘাতিক ইঙ্গিতটা এই কাগজের বুকে লিখে রেখেছে। দেখুন লিস্টটার তলায়ও লেখা রয়েছে—'ডাঃ ওয়াং'। কলম্বোতে 'ডাঃ ওয়াং' নামে বিখ্যাত কোন লোক আছে কি মিঃ রামিয়া? খোঁজ নেবেন তো, এ শহরে ডাঃ ওয়াং বলে কেউ আছে কিনা?

নিশ্চয়ই খবর নেবো।

আর একটা কথা—

কি?

চীন গভর্নমেণ্টের কাছে জরুরী তার করতে হবে। জানতে হবে, এই ডাঃ ওয়াং লোকটির বর্তমান movement সম্পর্কে কিছু জানা আছে কিনা। এবং তার চেহারা, শিক্ষাদীক্ষা, ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি সম্বন্ধে চীন গভর্নমেণ্ট যদি কোন সংবাদ দিতে পারেন।

ইন্‌স্‌পেক্টর রামিয়া একটু নীরব থেকে কি ভাবলেন ; তারপর বললেন, তাহলে চলুন একবার আমাদের বড়কর্তার কাছে যাই। তাঁকে আপনিও সব কথা ভাল করে বুঝিয়ে বলতে পারবেন। তারপর মিঃ ডিবরাজকে পাহারা দেবার বন্দোবস্ত করে আপনাকে আবার এখানে পৌঁছে দিয়ে যাব।

বেশ, চলুন তাহলে।

অতঃপর ইন্‌সপেক্টর রামিয়ার মোটর-কার কিরীটীকে নিয়ে পুলিস-সাহেবের কুঠির দিকে বের হয়ে পড়ল।

সুব্রত ও রাজুকে কিরীটী বলে গেল, তোমরা খানিকক্ষণ এখানেই থাক। সব দিকে নজর রেখো ভাল করে। মনে রেখো, 'রক্তমুখী ড্রাগন' বা 'ডাঃ ওয়াং' হয়ত আমাদের খুব নিকটেই আশেপাশে কোথাও ওৎ পেতে লুকিয়ে রয়েছে।

পুলিসের চীফের সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওরা গেল ডিবরাজের বাড়ি। কিন্তু তিনি বাড়িতে নেই—বাইরে গিয়েছেন—পনের-কুড়ি দিনের মধ্যেই ফিরবেন তাঁর লোকেরা বললে।

।। সাত ।।

চীন-গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে তারের জবাব এসে গেল দিন-পনেরোর মধ্যেই।

চীন-গভর্নমেণ্ট জানিয়েছেন যে, চীনে দুটো দল ছিল। এক দলের নাম 'কুয়োমিং-তান', আর এক দলের নাম 'কম্যুনিস্ট'। আর একটি ছোট দলের নেতা হচ্ছে ডাঃ ওয়াং। কম্যুনিস্ট ও কুয়ো-মিং-তান দল দুটো ও ডাঃ ওয়াং-এর দল পরে একত্রে সঙ্ঘবদ্ধ হয় ; কিন্তু ডাঃ ওয়াং-এর চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের জন্য সে তখন আর তাদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে পারল না। সে নিজেই একটা পৃথক দল গড়ে তুলল।

কিন্তু এই দল গড়ার পর থেকেই তার যে মূল উদ্দেশ্য, দেশের সেবা করা, তা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেল ডাঃ ওয়াং। সে আরম্ভ করল একের পর এক হত্যাকাণ্ড।

হত্যা করতে লাগল একের পর কে বিরোধী দলের নেতাদের। এবং তাদের মৃতদেহে কোথাও কোন বিশেষ ক্ষতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি, কেবল তাদের গলার চারপাশে কয়েকটা রক্তবিন্দুর মত দাগ দেখা গেছে, আর নিহত লোকদের পকেটে পাওয়া গেছে একখানি করে খাম ; তাতে বিষাক্তগন্ধী ভয়ঙ্কর ড্রাগনের ছবি আঁকা ছিল। চীন গভর্নমেণ্ট তখন ডাঃ ওয়াং-এর দলটাকেই 'ড্রাগন কোম্পানী' নাম দিয়েছিলেন।

চীন গভর্নমেণ্ট আরও জানিয়েছে যে, ডাঃ ওয়াং-এর তৎকালীন একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, অর্থ সংগ্রহ করা। এবং বিরোধী দলের নেতারা ছাড়াও দেশের ধনিক সম্প্রদায়ের লোকও কিছু তার হাতে নিহত হয়েছেন। ডাঃ ওয়াং তাঁদের সকলের কাছ থেকেই ভয় দেখিয়ে বেশ মোটা টাকা রোজগারের চেষ্টা করেছে। অনেক ক্ষেত্রে সে কৃতকার্যও হয়েছিল।

ডাঃ ওয়াং উচ্চশিক্ষিত ; রসায়ন-শাস্ত্র ও প্রাণিবিদ্যায় সে সুপণ্ডিত। চীন গভর্নমেণ্টের বিশ্বাস, লোকটা ইচ্ছা করলে হয়ত কাদামাটি দিয়েও কামান-গোলা তৈরী করতে পারে, অথবা

কেঁচো বা কৃমিকে দিয়েও অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারে।

তাকে গ্রেপ্তার করবার জন্য চীন গভর্নমেণ্ট এখনো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তারা সংবাদ পেয়েছে ডাঃ ওয়াং নাকি এখন দক্ষিণে—আরব দেশে অথবা ভারতবর্ষে পাড়ি জমিয়েছে।

চীন গভর্নমেণ্ট সর্বশেষে তার চেহারা ও শিক্ষাদীক্ষার বর্ণনা দিয়ে জানিয়েছে, ডাঃ ওয়াং অতি ভয়ঙ্কর লোক।

ডাঃ ওয়াং-এর সম্বন্ধে এখন সব কিছু জানলেন তো মিঃ রামিয়া? কিরীটী বললে।

একটু হেসে মিঃ রামিয়া বললেন, হ্যাঁ, জানলুম। এখন কি করতে চান মিঃ রায়?

চলুন একবার মিঃ ডিবরাজের বাড়ি যাব,—হয়ত এতদিনে তিনি এসেছেন—

বেশ চলুন—

গাড়িতে যেতে যেতেই মিঃ রামিয়া বললেন, আপনার কথামত মিঃ রায় সেইদিন থেকেই মিঃ ডিবরাজের বাড়ির আশেপাশে পাহারা বসিয়েছি বটে, কিন্তু তিনি তা জানেন না। সাদা পোশাকে কয়েকটা লোক দিনরাত তাঁর বাড়ির দিকে লক্ষ্য রাখছে।

ডিবরাজ লোকটা একটু অদ্ভুত প্রকৃতির। শহর হতে একটু দূরে নির্জন সমুদ্রের ধারে একটা নির্জন বাগানবাড়ি তৈরী করে সেখানে থাকেন।

দূরে সমুদ্রতীরে কতকগুলো পাম বা সুপারি-জাতীয় লম্বা গাছের সারি দেখা যায় বাড়ি থেকে।

সমুদ্রের কোল ঘেঁষে জুয়েলার ডিবরাজের বাংলো-ধরনের বাগানবাড়ি।

বাড়ির চারপাশে নানাজাতীয় ফল ও ফুলের গাছ। বাড়ির সীমানার চারপাশে প্রাচীর নয়, দুর্ভেদ্য কাঁটাতারের জালের বেড়া প্রায় মানুষ-সমান। সেই তারের গায়ে গায়ে লতিয়ে উঠেছে ঘন হয়ে আইভিলতা।

মধ্যে মধ্যে ফুল ধরেছে।

গেট পার হয়েই একটু এগুতেই চোখে পড়ল পশ্চিমমুখী বাংলোর পিছন দিকে—দূরে নীল সাগরের অনেকটা। এবং তার সামনেই সার সার নারিকেল গাছ।

বাংলোতে প্রবেশের মুখেই একটিমাত্র লোহার গেট।

গেটের পাঠান দারোয়ান বন্দুকধারী—সে আগে থাকতেই মিঃ রামিয়াকে চিনত বলে কোন বাধা দেয়নি।

এবং তার কাছেই জানতে পেরেছিল ওরা, মিঃ ডিবরাজ গৃহেই আছেন।

বাংলোর সামনে অনেকখানি জায়গা নিয়ে নানা ধরনের ছোট বড় মাঝারি ফুলফলের গাছ—দূরে আউটহাউস।

হঠাৎ একটা কুকুরের ডাক শোনা গেল—তারপরই দেখা গেল বিরাট ধূসর রংয়ের একটা অ্যালসেসিয়ান ওদের দিকে এগিয়ে আসছে।

ওরা দাঁড়িয়ে পড়ল।

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করছে।

হয়ত ওদের আক্রমণই করত কিন্তু তার আগেই বাগানের একাংশ থেকে একটি বাইশ-তেইশ বছরের তরুণী হন্তদন্ত হয়ে বের হয়ে এল।

সিজার—সিজার—স্টপ্—স্টপ্—

কুকুরটা থেমে গেল।

ওরা নিশ্চিন্ত হয়।

তরুণী আরো একটু এগিয়ে আসে।

রোগা পাতলা চেহারা—গায়ের বর্ণ গৌর—তাতে যেন সামান্য লালচে আভা।

চোখ মুখ যেন শিল্পীর তুলিতে আঁকা।

পরনে সালওয়ার পাঞ্জাবি—বেণীর আকারে মাথার চুল বুকের ওপরে দুলছে। পায়ে চপ্পল।

আপ লোগন কিধার সে আতে হেঁ?

মিঃ ডিবরাজ আছেন? ইংরাজীতে প্রশ্ন করলেন মিঃ রামিয়া।

জী হাঁ—ডাডি পারলার মে হ্যায়—

কিরীটী মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে ছিল তরুণীর দিকে।

আমি ইনসপেক্টার রামিয়া—মিঃ ডিবরাজের সঙ্গে দেখা করব বলে—

আইয়ে—তরুণী আহ্বান জানাল।

চলিয়ে রায় সাব্—রামিয়া ডাকল।

অ্যাঁ—হ্যাঁ চলুন—দুজনের চোখাচোখি হল।

মুহূর্তকাল দুজনে দুজনের দিকে তাকিয়ে থেকে দুজনেই দৃষ্টি নত করল।

আসুন—তরুণী এবারে ইংরাজীতে বললে।

গাড়িবারান্দার সামনে বারান্দা—দু ধাপ সিঁড়ি—তরুণী আগে আগে চলেছে—সঙ্গে সিজার-—আর পিছনে পিছনে মিঃ রামিয়া আর কিরীটী।

পারলারের মধ্যে ওদের নিয়ে তরুণী প্রবেশ করল পর্দা তুলে। ঘরের মধ্যে মিঃ ডিবরাজ একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

তরুণী ডাকল, ড্যাডি—

ইয়েস মাই চাইল্ড—

তোমার সঙ্গে মিঃ রামিয়া পুলিস ইন্‌স্পেক্টার দেখা করতে এসেছেন—

মিঃ ডিবরাজ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালেন, আসুন আসুন ইন্‌স্পেক্টার সাহেব—

যার সঙ্গে কথা বলছিলেন তাকে বিদায় দিলেন মিঃ ডিবরাজ।

মিঃ ডিবরাজের বয়স পঞ্চাশের উপরেই হবে।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা—টকটকে গৌরবর্ণ। মাথার সামনের দিকে সামান্য টাক—পরিধানে পায়জামা ও পাঞ্জাবি।

চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা।

কৃষ্ণা! মিঃ ডিবরাজ ডাকলেন।

ড্যাডি।

ভিতরে গিয়ে কিছু চা-জলখাবার পাঠিয়ে দাও কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা যাবার জন্য ঘুরে দাঁড়াল। কিরীটীর সঙ্গে আবার চোখাচোখি হল। মুহূর্তের জন্য—তারপর ধীরপায়ে সে কক্ষ ত্যাগ করল।

বসুন ইন্‌স্পেক্টার—

আলাপ করিয়ে দিই—মিঃ কিরীটী রায়—কলকাতা শহরের একজন নামকরা বেসরকারী গোয়েন্দা—আর ইনিই মিঃ ডিবরাজ।

নমস্তে। ডিবরাজ হাত তুললেন।

নমস্তে। কিরীটী হাত তুলল।

বসুন—be seated please!

ওরা বসল।

মিঃ ডিবরাজ বললেন, আমি ছিলাম না, ব্যবসার ব্যাপারে হংকং গিয়েছিলাম—এসে শুনলাম আপনি আমার খোঁজে এসেছিলেন। অবিশ্যি আপনি আজ না এলেও আপনার ওখানে আজই একটু পরে আমি যেতাম—

মিঃ ডিবরাজ, কিরীটী বললে, কোন চিঠি পেয়েছেন নাকি আপনি? সেই ব্যাপারেই কি—

হ্যাঁ—কিন্তু আপনি জানলেন কি করে মিঃ রায়? কথাটা এখন পর্যন্ত আমি আমার পার্সোন্যাল সেক্রেটারীকেও বলি নি তো!

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, রক্তমুখী ড্রাগনের চিঠি তো?

হ্যাঁ—কিন্তু জানলেন কি করে?

মিঃ রামিয়া বললেন, সেই ব্যাপারেই উনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন—যদি ওঁর দ্বারা আপনার কোন উপকার হয়—অবিশ্যি পুলিসের সব রকম সাহায্যও আপনি পাবেন।

তা জানি পাব—কিন্তু আমি ভাবছিলাম—

কিরীটী শুধাল, কি?

ওদের ডিমাণ্ড আমি মিটিয়ে দেব। সুন্দর দাসের মত—

কত ডিমাণ্ড করেছে ড্রাগন আপনার কাছে? কিরীটী শুধাল।

এক লাখ টাকা।

কবে দিতে হবে?

আগামী পরশুর মধ্যে—

টাকা কে কি ভাবে কালেকশন করবে? কিরীটী শুধাল।

আজ সকালে একটা ফোন পেয়েছি—ডিবরাজ বললেন।

ফোন!

হ্যাঁ, তাতে আবারও আমাকে শাসানো হয়েছে—টাকা না দিলে নাকি সুন্দর দাস বা মিঃ চিদাম্বরমের অবস্থাই আমারও হবে। আর টাকা দিতে রাজী থাকলে পরশু রাত বারোটায় তার লোক এসে টাকা নিয়ে যাবে—

আপনি বলেছেন দেবেন?

হ্যাঁ।

ঠিক আছে—এবারে যা করবার আমরাই করব।

ঐ সময় কৃষ্ণা বেয়ারাকে সঙ্গে করে একটা ট্রলির উপরে চায়ের সরঞ্জাম ও প্রচুর জলখাবার নিয়ে পারলারে এসে ঢুকল।

আবার কিরীটী ও কৃষ্ণার চোখাচোখি হল।

কৃষ্ণাই ওদের চা পরিবেশন করল।

কিরীটী খাবারের দিকে হাত বাড়ায়নি, চায়ের কাপেই চুমুক দিচ্ছিল।

কৃষ্ণা প্যাসট্রির সামনে তুলে ধরে বললে, প্যাসট্রি নেবেন না?

কিরীটী তাকাল কৃষ্ণার মুখের দিকে, তারপর একটা প্যাসট্রি প্লেট থেকে তুলে নিল।

মিঃ ডিবরাজ কিরীটীর পরিচয় করিয়ে দিলেন কৃষ্ণার সঙ্গে।

মিঃ রায়, আমার মেয়ে—একমাত্র সন্তান কৃষ্ণা। ও বোম্বাইয়ে ওর মামার কাছে থেকে পড়াশুনা করে। ছুটিতে আমার কাছে এসেছে। কৃষ্ণা, উনি মিঃ কিরীটী রায়—মেয়ের দিকে

তাকিয়ে বললেন মিঃ ডিবরাজ, কলকাতা শহরের একজন—

কৃষ্ণা বললে মৃদু হেসে, ওকে চাক্ষুষ না দেখলেও ওঁর পরিচয় আমার জানা আছে ড্যাডি!

কিরীটী তাকিয়ে ছিল কৃষ্ণার মুখের দিকে।

কৃষ্ণা মৃদু হেসে বললে, আপনাকে আমি জানি—আপনার অনেক কীর্তির কথা আমি জানি।

কিরীটী মৃদু হাসল।

ড্যাডি!

ইয়েস!

মিঃ রায় ও মিঃ রামিয়াকে আজ রাত্রে ডিনারে আসতে বল না?

সে তো ভাল কথা—আসুন না আপনারা।

কিরীটী বললে, মিঃ রামিয়া এলে আমিও আসতে পারি—

আসবেন তো তা হলে মিঃ রায়? কৃষ্ণা বললে।

আসব। কিরীটী বললে।

কৃষ্ণা বললে, আর এক কাপ চা দিই আপনাকে মিঃ রায়?

চা!

হ্যাঁ, আপনি তো চা খুব ভালবাসেন।

জানলেন কি করে?

জানি।

বেশ, দিন।

চা ঢেলে দিল আর এক কাপ কৃষ্ণা কিরীটীকে।

ড্যাডি, আমি একটু মার্কেটে বেরুব। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব—

বেশ তো, যাও।

কৃষ্ণা ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

।। আট ।।

ঐদিনই সন্ধ্যার দিকে।

বাংলোর পিছনদিকে পশ্চিমের বারান্দায় মিঃ ডিবরাজ, মিঃ রামিয়া ও কিরীটী বসে গল্প করছিলেন।

কৃষ্ণাও এতক্ষণ ছিল, এইমাত্র ভিতরে গিয়েছে ডিনারের ব্যবস্থা করতে।

পূর্ণিমার রাত বোধ হয়।

মস্ত বড় চাঁদ উঠেছে।

সামনে যতদূর দেখা যায় চন্দ্রালোকিত সাগর মাতামাতি করছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় চাঁদের আলো যেন পিছলে পড়ছে।

কিরীটী বললে, মিঃ ডিবরাজ, পরশু আমরা ঠিক করেছি সন্ধ্যার পরই এখানে আসব।

কিন্তু ওদের ডিমাণ্ড মত টাকা না দিলে—

দিলেও ওদের আপনি নিবৃত্ত করতে পারবেন না। বরং দেখবেন ঐ ড্রাগনের লোভ আরো

বেড়েই গিয়েছে। হলুদ শয়তানকে আপনি চেনেন না!—কিরীটী বললে।

হলুদ শয়তান!

হ্যাঁ, ডাঃ ওয়াং—লোকটা শুধু ক্রিমিন্যালই নয়—মূর্তিমান শয়তান।

কিন্তু—

আপনি কিছু ভাববেন না।

হঠাৎ ঐ সময় সিজারের ক্রুদ্ধ ডাক শোনা গেল দূরে।

সিজার—সিজার অমন করে ডাকছে কেন, বলতে বলতে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন মিঃ ডিবরাজ এবং দ্রুতপায়ে বাড়ির পিছনদিককার বাগানের দিকে চলে গেলেন।

কিরীটীও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ে ওঁকে অনুসরণ করে।

সিজারের ডাক শোনা যাচ্ছে—

কিরীটী ডিবরাজকে বেশীদূর অনুসরণ করতে পারে না, তার আগেই একটা সিনামোনের ঝোপের আড়ালে তিনি চলে গেছেন।

তবু কিরীটী এগুতে থাকে।

মিঃ ডিবরাজ—মিঃ ডিবরাজ যাবেন না—ফিরুন! কিরীটী চেঁচিয়ে ডাকল।

কোন সাড়া পাওয়া গেল না মিঃ ডিবরাজের।

সিজারের ক্রুদ্ধ গর্জন আর একবার শোনা গেল।

তারপরই হঠাৎ যেন সব স্তব্ধ।

কিরীটী তবু এগিয়ে যায়।

হঠাৎ ঐ সময় রাত্রির স্তব্ধতাকে দীর্ণ করে পর পর দুটো গুলির আওয়াজ শোনা গেল।

ইনস্পেক্টার মিঃ রামিয়াও ততক্ষণে তাঁর পিস্তলটা মুঠোয় চেপে ঐদিকে ছুটে আসছেন।

গাছগাছালিতে একেবারে জায়গাটা যেন বেশী দুর্ভেদ্য।

মাথার উপর আবছা আলো থাকলেও নিবিড় গাছ-গাছালির জন্য ঐ জায়গাটায় একটা আবছা আলোছায়া।

ভাল করে নজরে পড়ে না।

কিরীটী তথাপি এগিয়ে যায়।

হঠাৎ সামনে পড়ল একটা দীঘি।

দীঘির চারপাশে বড় বড় ঘাস গজিয়েছে। দূরে সীমানায় তারের বেড়া।

কিরীটী এদিক-ওদিক তাকায়, কিন্তু কোথাও মিঃ ডিবরাজকে দেখতে পায় না।

কুকুরের ডাকও আর শোনা যাচ্ছে না তখন।

কেবল একটানা ঝিঁঝির ডাক।

হঠাৎ নজরে পড়ল কিরীটীর, ডানদিকের ঝোপ থেকে কে একজন বের হয়ে আসছে।

কে? মিঃ ডিবরাজ না? হ্যাঁ, তিনিই—

মিঃ ডিবরাজ? দু'পা এগিয়ে গিয়ে কিরীটী ডাকল।

মিঃ রায়?

সিজার—সিজার কোথায়?

আসুন। ভাঙা গলায় মিঃ ডিবরাজ জবাব দিলেন।

কোথায়?

He is dead!

Dead? কে?

সিজার।

ডিবরাজের সঙ্গে এগিয়ে গেল কিরীটী সামনের দিকে কিছুটা।

একটা পাম-ট্রির নীচে এগিয়ে এসে মিঃ ডিবরাজ বললেন, ঐ যে—

কিরীটী দেখল, সিজারের দেহটা মাটিতে পড়ে আছে।

কিরীটী আরও এগিয়ে গেল।

নীচু হয়ে দেখল।

চাঁদের আলোয় এবারে তার নজরে পড়ল, মৃত সিজারের পেটে একটা লোহার সরু শলার মত কি বিঁধে আছে। পকেট থেকে রুমাল বের করে কিরীটী সিজারের মৃতদেহ থেকে শলাটা টেনে বের করে চাঁদের আলোয় চোখের সামনে তুলে ধরল।

দেড়বিঘৎ পরিমাণ, লোহার শলা নয়—একটা তীর, অগ্রভাগটা সামান্য চেপ্টা, কিন্তু ছুঁচলো।

কিরীটী বললে, মনে হচ্ছে বিষের তীর এটা—

বিষের তীর! ডিবরাজ শুধালেন।

হ্যাঁ, খুব সম্ভব তীরের ফলায় কোন তীব্র মারাত্মক বিষ মাখানো ছিল, যে বিষের ক্রিয়াতেই আপনার সিজারের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় মৃত্যু হয়েছে। চলুন, আর এখানে থেকে কি হবে, ভিতরে চলুন।

মিঃ ডিবরাজকে নিয়ে কিরীটী পশ্চিম দিককার বারান্দায় ফিরে এল।

মিঃ রামিয়া আর কৃষ্ণা দুজনেই বারান্দায় উৎকণ্ঠিত হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

কি হয়েচে ড্যাডি? কৃষ্ণা শুধায়।

কৃষ্ণা, সিজার মারা গেছে! কান্না-ধরা-গলায় মিঃ ডিবরাজ বললেন।

মারা গেছে?

হ্যাঁ!

কী করে?

কিরীটী হাতের তীরটা তুলে ধরে বললে, এই বিষাক্ত তীরে।

কোথা থেকে এল এটা?

সম্ভবত রক্তমুখী ড্রাগনের কোন অনুচরেরই কাজ এটা। কিরীটী বললে।

রক্তমুখী ড্রাগন!

হ্যাঁ কৃষ্ণা, মিঃ ডিবরাজ ভাঙা গলায় বললেন, তোমাকে জানাইনি, রক্তমুখী ড্রাগন আমাকে চিঠি দিয়েছে—

কবে? কখন?

দিনকয়েক আগে।

আহারে আর কারুরই রুচি ছিল না।

সবাই খাদ্যবস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল যেন।

সিজারের আকস্মিক মৃত্যুর বিষণ্ণতা যেন সকলের মনকেই আচ্ছন্ন করে ফেলছিল।

কিরীটী একসময়ে বললে, সিজার থাকলে তাদের সুবিধা হবে না, তাই তারা সিজারকে হত্যা করেছে মিঃ ডিবরাজ!

আর আমার সাহস হচ্ছে না মিঃ রায়। মিঃ ডিবরাজ বললেন।

মিঃ রামিয়া বললেন, ভয় পাবেন না মিঃ ডিবরাজ—আমাদের প্রহরা কাল থেকে আরো কড়া হবে।

কিরীটী কোন কথা বলে না, চুপ করে কি যেন ভাবে।

কৃষ্ণাও চুপচাপ একেবারে।

অনেক রাত্রে ওরা বিদায় নিল।

।। নয়।।

পরের দিন রাত্রে।

রাত তখন প্রায় এগারোটা হবে।

ফোনের একটানা ক্রিং ক্রিং শব্দে সর্বপ্রথম কিরীটীর ঘুমটা ভেঙে যায়।

ব্যাপার কি? এত রাত্রে কার ফোন?

পাশের ঘরেই ছিলেন জীবনবাবু—তাঁরও ততক্ষণে ঘুম ভেঙে গিয়েছে। তিনি রিসিভারটা তুলে নিলেন, হ্যালো, কে—মিঃ রামিয়া! কিরীটীকে ডেকে দেব? জরুরী? হ্যাঁ হ্যাঁ, এখুনি দিচ্ছি।

কিরীটী তার নামটা পাসের ঘরে কানে যেতেই শয্যা থেকে উঠে মধ্যবর্তী দরজাটা দিয়ে জীবনবাবুর শয়নকক্ষে এসে প্রবেশ করল, কে ফোন করছে জীবন?

তোমার ফোন। ইন্‌স্‌পেক্টার মিঃ রামিয়া—

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ফোনটা ধরল, কে মিঃ রামিয়া, আমি কিরীটী। কি—কি বললেন?

ওপাশ থেকে তখন মিঃ রামিয়া উত্তেজিত কণ্ঠে বলে চলেছেন, এইমাত্র ডিবরাজের সামনে যে প্রহরীরা প্রহরায় ছিল তারা আমাকে ফোন করেছে—তিনি খুন হয়েছেন—

কখন? কি করে হল?

জানি না—আমি সেখানে যাচ্ছি—আপনি কি আসবেন?

নিশ্চয়ই যাব।

তাহলে প্রস্তুত থাকুন, যাবার পথে আমি তুলে নিয়ে যাব।

কিরীটী চট্‌পট প্রস্তুত হয়ে নেয়।

সুব্রত ও রাজুর ঘুম ভেঙে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। সব শুনে তারাও বললে যাব।

কিরীটী বললে, না, সকলেই আমরা যাব না। তোরা থাক্—আমি একাই যাচ্ছি। প্রয়োজন হলে তোদের জানাব—

সুব্রত বললে, কিন্তু কিরীটী—

ডাঃ ওয়াং-সেই হলুদ শয়তানের যতটুকু পরিচয় পেয়েছি, তার খরদৃষ্টি নিশ্চয়ই সর্বক্ষণ আমাদের ওপরে আছে। কেবল ডিবরাজকেই হয়ত হত্যা করেনি শয়তানটা, আমার জন্য ফাঁদ পেতে রেখেছে কিনা ইতিমধ্যে সেখানে একটা কে জানে। যদি একটা কিছু ঘটেই দুর্ঘটনা —তোরা বাইরে থাকলে হয়ত কাজে লাগতে পারবি—পুলিস-চীফ মিঃ বন্দরনায়ককে সঙ্গে সঙ্গে জানাবি ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই তিনি সবরকম সাহায্যই করবেন।

সুব্রত আর রাজু আপত্তি করল না।

কিরীটী পকেটে একটা শক্তিশালী পেনসিল টর্চ, একটা পাকানো কর্ড, একটা ছুরি ও অ্যামুনিয়া লোশনের একটা ছোট শিশি নিয়ে নিল।

বাইরে ঐ সময় মিঃ রামিয়ার গাড়ির হর্ন শোনা গেল।

চললাম—অ্যালার্ট থাকিস! কিরীটী বের হয়ে গেল।

•

ঘুমন্ত জনহীনপ্রায় রাস্তা ধরে ভিক্টোরিয়া পার্কটার দিকে মিঃ রামিয়ার গাড়ি পঞ্চাশ মাইল স্পীডে ছুটে চলেছিল।

কিরীটী শুধায়, আপনার প্রহরী আর কোন সংবাদ দিয়েছে?

না।

কিরীটী বললে, দোষটা আমারই মিঃ রামিয়া, আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। তার আস্ফালন যে নিষ্ফল নয়, দুর্বলের বহ্বারম্ভ নয় জানা উচিত ছিল আমার—তাহলে হয়ত আজকের দুর্ঘটনা ঘটত না।

কিন্তু এ যে সত্যিই এক ভয়াবহ বিভীষিকার সৃষ্টি করল হলুদ শয়তানটা মিঃ রায়! মিঃ রামিয়া বললেন।

হ্যাঁ, তা করেছে। তারপর একটু থেমে বললে, তবে আজকের খেলাই তার শেষ খেলা!

বাংলোর মধ্যে গাড়িটা প্রবেশ করতেই পোর্টিকোর সামনে দেখা গেল দুজন প্রহরী দাঁড়িয়ে আছে, তাদেরই একজন ফোন করেছিল মিঃ রামিয়াকে।

লাশ কোথায়? মিঃ রামিয়া জিজ্ঞাসা করলেন।

মিঃ ডিবরাজ তাঁর শয়নঘরেই নিহত হয়েছেন।

কে ফোন করেছিল আমায়?

প্রথম প্রহরী বললে, আমিই।

আর চারজন প্রহরী কোথায়?

দুজন এখনো বাইরে—আমরা তিনজন ভিতরে—

কিরীটী ঐসময় প্রশ্ন করলে, তোমাদের দুজনকেই তো দেখছি, আর একজন কই?

সে ভিতরে মৃতদেহ পাহারা দিচ্ছে।

ওরা ভিতরের দিকে অগ্রসর হল।

পার্লার পার হয়ে অন্দরে পা দিতেই একটা মৃদু কান্নার আওয়াজ কিরীটীর কানে এল। কে যেন গুমরে গুমড়ে কাঁদছে।

কৃষ্ণা কি? কিরীটীর মনে হয়, কৃষ্ণাই হয়ত কাঁদছে। পুওর গার্ল। হ্যাঁ, দেখা গেল আর একটু এগুতেই, ঘরের সামনে বারান্দায় একটা বেতের চেয়ারে বসে চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে কৃষ্ণা।

পরনে তার আজ একটা ক্রীম-কলারের জর্জেট শাড়ি ছিল। মাথার অপর্যাপ্ত কেশ তার অবিন্যস্ত।

মিঃ রামিয়া ডিবরাজের শয়নঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। কিরীটী কিন্তু কৃষ্ণার সামনে এসে দাঁড়াল, কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা মুখ তুলে তাকাল। দুচোখ-ভরা লোনা টলটলে অশ্রু। কান্না-ভেজা গলায় বললে, মিঃ রায়, ড্যাডি—

আমারই বোধ হয় দোষ কৃষ্ণা—

আপনার দোষ! বিস্ময়ে কৃষ্ণা কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ, আমি—আমি যদি আর একটু সাবধান হতাম—কখন ব্যাপারটা ঘটেছে? কখন টের পেলেন?

ড্যাডি বের হয়েছিলেন সন্ধ্যার পর, তাঁরই পার্সোন্যাল সেক্রেটারী রাজীবলোচনের একটা ফোন পান অফিস থেকে, বেরুবার সময় বলে যান, ফিরতে যদি রাত হয় তো আমি যেন ডিনার সেরে নিই, তাঁর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।

আর কিছু বলেন নি মিঃ ডিবরাজ?

না। তবে অর্ধস্ফুট ভাবে বলেছিলেন যেন আমার মনে হল—বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে, রাজীবটা একটা অপদার্থ!

আর কিছু?

না।

রাজীব কতদিন আপনাদের এখানে আছেন?

নতুন লোক—বৎসরখানেক এসেছেন।

আগে কে ছিল?

কৃষ্ণাপ্পা।

সে কি কাজ ছেড়ে দিয়েছে?

না, বাবা তাকে বোম্বাইয়ের অফিসে পাঠিয়েছিলেন—সে সেখানেই আছে—

মিঃ ডিবরাজ কি আজ বাড়িতেই ছিলেন?

হ্যাঁ, আজ বাড়ি থেকে বের হননি।

কেউ আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

না।

এমন কোন ঘটনা কি ঐ সময়ের মধ্যে ঘটেছে, যেটা আপনার মনে আছে?

না, তবে—

বলুন?

বিকেলের ডাকে ড্যাডির নামে একটা ছোট পার্সেল এসেছিল!

পার্সেল? কিসের পার্সেল?

ড্যাডির টেবিল-ক্লকটা হঠাৎ পড়ে গিয়ে টেবিল থেকে দিন-পনের আগে ভেঙে যায়, তাই ড্যাডি লণ্ডনের একটা ওয়াচ্ কোম্পানীতে চিঠি দিয়েছিলেন—ঠিক ঐরকম একটি টেবিল-ক্লক পাঠাবার জন্য—বোধ হয় সেটাই—

পার্সেলটা আপনার ড্যাডিকে খুলতে দেখেছিলেন?

না।

বাড়িতে আপনাদের ক'জন চাকর-বেয়ারা?

দুজন মাদ্রাজী ভৃত্য—কৃষ্ণান আর রামনাথন, আয়া কুট্টি, কুক আব্দুল, ড্রাইভার দেলোয়ার সিং আর দু'জন পাঠান দরোয়ান—হামিদ খান আর হবিবুল্লা খান।

এরা সবাই বিশ্বাসী?

সবাই বিশ্বাসী।

কতদিন কাজ করছে এ বাড়িতে ওরা?

অনেক বছর।

আপনার ড্যাডির নতুন সেক্রেটারী রাজীবলোচনকে আপনার কি রকম মনে হয়?

ড্যাডি তো ওর খুব প্রশংসা করত, বলত লোকটা যেমন স্মার্ট তেমনি কর্মঠ, তেমনি পরিশ্রমী ও বিশ্বাসী।

কত বয়েস হবে তার? তাকে তো দেখিনি আমি!

না, আপনারা যেদিন এসেছিলেন—রাজীব তখন বাংলোতে ছিল না।

এই বাংলোতেই কি সে থাকে?

হ্যাঁ, পারলারের পাশের ঘরটায়।

।। দশ ।।

কিরীটী অতঃপর শুধাল, ব্যাপারটা কখন আপনি টের পেয়েছেন? আজ রাত্রে?

ড্যাডির শোবার ঘরের পাশেই আমার বেডরুম, কৃষ্ণা বলতে লাগল, রাত দশটা পর্যন্ত ড্যাডি এল না দেখে আমি তার অফিসে ফোন করেছিলাম।

ড্যাডি কি বললেন?

ড্যাডি অফিসে ছিল না—

ছিল না?

না। রাজীব ফোন ধরেছিল—সে বললে, ড্যাডি নাকি বিশেষ কি একটা মালের ডেসপ্যাচের ব্যাপারে পোর্টে গিয়েছেন—কাল সকালেই জাহাজ ছাড়বে, সেখান থেকেই বাসায় যাবেন বলে গিয়েছেন। একটু রাত হবে, আমি যেন না অপেক্ষা করি আর তাঁর জন্য—আমাকে খেয়ে শুয়ে পড়তে বলেছেন।

হুঁ। রাজীব কোথায়?

এখনো তো ফেরেনি।

ঠিক জানেন?

হ্যাঁ।

আপনার ড্যাডি কখন ফিরেছেন জানেন?

না, আমি তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, তবে কৃষ্ণান বললে, রাত এগারটায় নাকি সে ড্যাডিকে ফিরে তাঁর শোবার ঘরে ঢুকতে দেখেছে—

তারপর? জানলেন কখন ব্যাপারটা?

রাত তখন সোয়া এগারোটা হবে, কুট্টি এসে আমাকে ঘুম থেকে তোলে—সে ড্যাডিকে ওঠাতে গিয়েছিল—ড্যাডি ডিনার করবে কিনা জানতে। কিন্তু গিয়ে দেখে ভিতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ। অথচ ঘরে আলো জ্বলছিল, সে তখন দরজায় নক্ করে, কিন্তু কোন সাড়া পায় না। ডাকে সাহেবসাহেব বলে, তবু কোন সাড়া নেই। ঠিক সেই সময় ঘরের ভিতরে দড়াম করে কিছু ভারী জিনিস পড়ার শব্দ শুনতে পায়। ব্যাপারটা কি বুঝতে না পেরে কুট্টি তখন কৃষ্ণানকে ডাকে।

তারপর দুজনে মিলে দরজা ধাক্কাধাক্কি করে সাড়া না পেয়ে এসে আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তোলে। আমি গিয়েও ডাকাডাকি করি, দরজায় ধাক্কা দিই, সাড়া পাই না। তখন ভিতরের

জানলার পর্দার ফাঁক দিয়ে আমি দেখতে পেলাম—

কি—কি দেখতে পেলেন?

ড্যাডি উপুড় হয়ে মেঝেতে পড়ে আছেন, সামনেই টেবিলের ওপরে সেই পার্সেলের ডালাটা খোলা—আর—

আর?

দেখলাম সেই পার্সেল থেকে একটা কি ধোঁয়ার মত বেরুচ্ছে। এবং একটা পাতলা সবুজবর্ণের কুয়াশার মত কি যেন ভাসতে ভাসতে ঘরের মধ্যে ক্রমশঃ একটু একটু করে মিলিয়ে যাচ্ছে।

হ্যাঁ, হলুদ শয়তানের গ্যাসীয় মৃত্যুদূত—তীব্র বিষাক্ত কোন গ্যাসজাতীয় পদার্থ খুব সম্ভব ঐ পার্সেলের মধ্যেই ছিল, যেটা পার্সেল খুলতেই বের হয়ে মৃত্যুছোবল হেনেছে!

কিরীটী ততক্ষণে ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছে—সে আর ওখানে দাঁড়াল না। ডিবরাজের ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল।

ছিমছাম সাজানো বেডরুমটি। আকারে বেশ বড়ই হবে। একটা সিঙ্গল খাটে শয্যা বিছানো—শয্যা দেখে বোঝা যায় সেটা কেউ তখনো স্পর্শও করেনি, এক পাশে টেবিলের উপরে একটা ডালা-খোলা পার্সেল।

মিঃ রামিয়া ঘরের চারিদিক পরীক্ষা করে দেখছেন।

কিরীটীকে ঢুকতে দেখে বললেন, funny! ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল—কৃষ্ণন বলছে বাইরের বন্ধ জানলার সার্সী ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করে সে দরজা খুলেছে, বাথরুমের দরজাটাও ভিতর থেকে বন্ধ ছিল—তবে আততায়ী ঢুকল কি করে বলুন তো মিঃ রায়?

কোন মানুষ আততায়ী তো নয় মিঃ রামিয়া!

রামিয়া কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল, তবে ওঁর মৃত্যু হল কি করে?

ডাঃ ওয়াংয়ের প্রেরিত বিষাক্ত কোন গ্যাসে—

গ্যাসে!

কেন, গন্ধ পাচ্ছেন না ঘরে—still there is some smell! ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে আছে।

তাই তো! দুবার নাক টেনে রামিয়া বলেন, একটা pungent smell যেন পাচ্ছি!

হ্যাঁ।

কিন্তু গ্যাস এলো কি করে ঘরে? সব তো বন্ধ ছিল!

গ্যাস এসেছিল আজই বিকেলে।

বিকেলে? কেমন করে?

আঙুল তুলে অদূরে টেবিলের উপরে রক্ষিত পার্সেলটা দেখিয়ে কিরীটী বললে, ঐ পার্সেলে এসেছে। চলুন দেখা যাক—

এগিয়ে গেল ওরা দুজনে। ছোট একটা চৌকো বাক্স। তার মধ্যে কেটা ভাঙা কাচের কেস। তলায় কিছু জুয়েলস্ চকচক্ করছে—

এর মধ্যে ছিল গ্যাস? রামিয়া প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ, কাঁচের কেসের মধ্যে কিছু জুয়েলের সঙ্গে বিষাক্ত গ্যাস সিল করে ভরে দেওয়া ছিল, কাঁচের কেসটা ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই সে গ্যাস বের হয়ে মিঃ ডিবরাজকে মৃত্যুচুম্বন দিয়েছে এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

কি ভয়ঙ্কর! অস্পষ্ট কণ্ঠে বললেন মিঃ রামিয়া।

।। এগারো ।।

কিন্তু বিস্ময়ের তখনো আরও বাকী ছিল।

কিরীটী মৃতদেহটা ওল্টাতে অস্ফুটে বলে ওঠে, এ কে? এ কে?

কে! ঝুঁকে পড়েন মিঃ রামিয়া।

এ তো মিঃ ডিবরাজ নয়!

তাই তো!

কৃষ্ণান, দেখ তো এঁকে চিনতে পার কিনা—দেখেছো আগে কখনো কিনা?

কিরীটীর ডাকে কৃষ্ণান দরজার গোড়া থেকে এগিয়ে এসে মৃতদেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করেই অর্ধস্ফুট কণ্ঠে বললে, এ যে সেক্রেটারি সাহেব!

রাজীবলোচন?

জী।

হঠাৎ কিরীটীর কি মনে হয়। সে মিঃ রামিয়াকে বলে, মিঃ রামিয়া, মিঃ ডিবরাজের অফিস কোথায় জানেন?

জানি।

Quick! এখুনি সেখানে চলে যান—গিয়েই আমাকে জানাবেন মিঃ ডিবরাজ সেখানে আছেন কিনা—

রামিয়া দ্রুতপদে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী মৃতের মুখের দিকে তখনও তাকিয়ে আছে। মুখখানা যেন ফ্যাকাশে, একবিন্দু রক্ত নেই কোথাও বলে মনে হয়। মুখটা সামান্য হাঁ করা, কশ দিয়ে রক্তের লালা গড়িয়ে পড়ছে, চক্ষু দুটি বিস্ফারিত।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে কৃষ্ণার কাছে যায়।

কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা তখনও কাঁদছিল। মুখ তুলে তাকাল কিরীটীর ডাকে।

ও মৃতদেহটা তো মিঃ ডিবরাজের নয়।

নয়?

না।

তবে কার?

সেক্রেটারী রাজীবলোচনের—

তবে ড্যাডি—ড্যাডি কোথায়?

জানি না। মিঃ রামিয়াকে পাঠিয়েছি তাঁর অফিসে খোঁজ নিতে।

আমি যাব—

বসুন, ব্যস্ত হবেন না, ব্যস্ত হয়ে কোন লাভ নেই, কারণ আমার সন্দেহ হচ্ছে—

কি—কি— আপনার সন্দেহ হচ্ছে মিঃ রায়?

তাঁকে হয়ত তাঁর অফিসেও পাওয়া যাবে না।

পাওয়া যাবে না?

সম্ভবতঃ। Still hope for the best!

ঠিক তাই।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মিঃ রামিয়া ফিরে এলেন, বললেন, না, অফিস-ঘরে আলো জ্বলছে, অফিস খোলা, ঘরের দরজায় বেয়ারাটা মরে পড়ে আছে—মিঃ ডিবরাজ অফিসে নেই, আর এই পোশাকগুলো সেখানে পেয়েছি—একটা প্যান্ট, একটা কোট।

হুঁ।

কি ব্যাপার বলুন তো মিঃ রায়? মিঃ ডিবরাজ কোথায় গেলেন?

খুব সম্ভবতঃ হলুদ শয়তানের খপ্পরে—তার হাতেই এখন তিনি।

হলুদ শয়তান তাহলে—

ঠিক বলতে পারছি না মিঃ রামিয়া, তবে আমার অনুমান—হলুদ শয়তান যে করেই হোক রাজীবকে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়েছিল—

বলেন কি!

তাই। এবং রাজীবকে দিয়েই ফোন করিয়ে আজ সন্ধ্যার পর জরুরী কাজের কথা বলে মিঃ ডিবরাজকে তারা তাঁর অফিসে নিয়ে যায়। সেখানে আগে থাকতেই হলুদ শয়তানের অনুচরেরা প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে সঙ্গে মিঃ ডিবরাজকে গায়েব করে অন্যত্র নিয়ে যায়—

কিন্তু রাজীব!

ভগবানের দণ্ড—হ্যাঁ, ভগবানের দেওয়া পাপের দণ্ড তাকে মাথা পেতে নিতে হয়েছে। সে নিশ্চয়ই শুনেছিল বা দেখেছিল পার্সেলটার মধ্যে কাঁচের বাক্সের ভিতর জুয়েলস্‌গুলো আছে। তার লোভ সে সামলাতে পারেনি, সে তাই পরে নিজের পোশাক ছেড়ে মিঃ ডিবরাজের পোশাক পরে সেগুলো হাতাতে এসেছিল। সে তো জানত না যে আমি বারংবার মিঃ ডিবরাজকে সাবধান করে দিয়েছিলাম, কাল কোনরকম পার্সেল বা প্যাকেট কারও হাতে বা ডাকে এলে আমার অনুপস্থিতিতে সেটা না খুলতে। তাই মিঃ ডিবরাজ বোধ হয় কাঁচের বাক্সটা খোলেননি, হয়ত আমাকে কাল সংবাদ দিতেন—

হঠাৎ ঐ সময় ঘরের ফোনটা বেজে উঠল ঝনঝন করে।

মিঃ রামিয়া গিয়ে রিসিভারটা তুললেন।

মিঃ রামিয়া আছেন ওখানে?

কথা বলছি।

আমি পোর্ট থেকে প্রহরী কথা বলছি।

কি ব্যাপার?

আজ বিকেলের দিকেই একটা ছোট সাদা রঙের জাহাজ এসেছিল এবং এতক্ষণ নোঙর করে ছিল। এখন মনে হচ্ছে জাহাজটা ছেড়ে যাবে। আপনি বলেছিলেন নতুন কোন লঞ্চ বা জাহাজ দেখতে পেলে, সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে ফোন করে জানাতে। তাই বাড়িতে আপনার ফোন করে জানলাম আপনি এখানে আছেন—

ঠিক আছে।

বস্তুত কিরীটীই রামিয়াকে গতকাল ঐ নির্দেশ দিয়েছিল, পোর্টে constant ওয়াচ্ রাখবার জন্য। রামিয়া বললেন ফোনের সংবাদ কিরীটীকে।

মিঃ রামিয়া, পুলিসের লঞ্চও আছে নিশ্চয়ই পোর্টে?

হ্যাঁ, জল-পুলিসের লঞ্চও আছে—দ্রুতগামী লঞ্চ গান-বোট।

এখুনি পোর্ট-পুলিসে ফোন করে ঐ সাদা জাহাজটার প্রতি নজর রাখতে বলুন—আমরা

এখুনি আসছি। আরও বললেন, যেন গান-বোট রেডি থাকে।

মিঃ রামিয়া কিরীটীর নির্দেশমত ফোন করে দিলেন।

তারপরেই দু'জনে গাড়ি নিয়ে বের হল।

গাড়িতে বসে কিরীটী শুধাল, সঙ্গে আর্মস আছে তো আপনার মিঃ রামিয়া?

হ্যাঁ, লোডেড পিস্তল আছে।

পোর্টে এসে ওরা জানতে পারল, তখুনি সেই সাদা জাহাজটা ছেড়েছে—বেশীদূর যেতে পারেনি। গান-বোট মেসেজ পেয়ে প্রস্তুতই ছিল।

গান-বোটের কমাণ্ডার ক্যাপ্টেন বালকৃষ্ণ ডেকের উপর দাঁড়িয়ে—একটা লঞ্চ করে ওরা তিনজন—কিরীটী, মিঃ রামিয়া আর রাজু গান-বোটে উঠে বোট ছাড়বার নির্দেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে গান-বোট দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলল—কিছু দূরে চলমান সাদা জাহাজটা লক্ষ্য করে।

যেমন করে হোক ক্যাপ্টেন, ঐ জাহাজটার গতি রোধ করতেই হবে!

ক্যাপ্টেন বললে, একটা ওয়্যারলেস মেসেজ পাঠাব অগ্রবর্তী জাহাজটাকে থামাবার জন্য মিঃ রামিয়া?

কিরীটী বললে, কোন ফল হবে না। ওরা আমাদের মেসেস ইগনোর করবে।

কিন্তু জাহাজের কাছাকাছি হলে ওরা যদি কামান দাগে! মিঃ রামিয়া বললেন।

সম্ভবতঃ ঐ জাহাজে সেরকম কোন অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই। সেরকম হলে আমাদেরই কামান দেগে জাহাজটা ডুবিয়ে দিতে হবে।

আপনার কি ধারণা মিঃ রায়, ঐ জাহাজেই ডাঃ ওয়াং আছে?

নিঃসন্দেহে। কিরীটী বললে, শুধু তাই নয়, মিঃ ডিবরাজকে ও মিঃ চিদাম্বরমকেও ঐ জাহাজেই বন্দী করে নিয়ে যাচ্ছে ডাঃ ওয়াং।

কিন্তু—

ওয়াং বুঝতে পেরেছিল এখানে আর তার সুবিধা হবে না—তাই ওদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। তারপর একটা মোটা রকমের টাকা ওরা ডিমাণ্ড করবে। কিরীটী বললে।

গান-বোট জাহাজটার কাছাকাছি আসতেই কিরীটী চাঁদের আলোয় দেখতে পেল, জাহাজের ডেকে একটা দীর্ঘকায় মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে যেন ছায়ার মত।

কিরীটী বললে, মিঃ রামিয়া, ঐ যে ডেকের উপর একটা লোক দাঁড়িয়ে, দেখতে পাচ্ছেন?

ইয়েস!

ক্যাপ্টেন? এবারে কিরীটী ক্যাপ্টেনকে সম্বোধন করলে।

ইয়েস!

কিন্তু তার আগেই পর পর দুটো গুলি ওই জাহাজটা থেকে ছুটে এল।—সাবধান! ওরা রিভলবার চালাচ্ছে! কিরীটী সকলকে হুঁশিয়ার করে দেয়।

ক্যাপ্টেন ততক্ষণে জাহাজ লক্ষ্য করে গুলি করেছে।

পর পর কয়েকটা গুলি-বিনিময় হল দু'পক্ষের মধ্যে, এবং গুলি করতে করতেই গান-বোট জাহাজের গায়ে এসে ভিড়ল।

জাহাজের ডেকের উপরে তখন চার-পাঁচজন পিস্তল হাতে গুলি চালাচ্ছে, গানবোট থেকেও গুলি চলে।

একটা খণ্ডযুদ্ধের পর জাহাজের ডেক থেকে গুলি ছোঁড়া বন্ধ হল।

জাহাজটা তখনও চলেছে ধীরে ধীরে।

।। বারো ।।

একটা দড়ি জাহাজের রেলিংয়ে গলিয়ে সেই দড়ির সাহায্যেই ওরা একে একে যখন জাহাজের ডেকে উঠে এল—সেখানে ডেকের উপরে চার-পাঁচটি মৃতদেহ পড়ে আছে।

কিরীটী ও মিঃ রামিয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলে, জাহাজের ডেকে আর জনপ্রাণী নেই, ইতিমধ্যে গান-বোট থেকে দশ-বারোজন সৈনিক উঠে এসেছে জাহাজে।

তাদের পাঁচজনকে প্রহরা দিতে বলে বাকী সৈনিক নিয়ে কিরীটী এগিয়ে চলল সিঁড়ি বেয়ে নীচের দিকে।

জাহাজটা কিন্তু তখনও চলেছে।

সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে—সামনেই একটা সরু প্যাসেজের মত—প্যাসেজে আলো ছিল, সেই আলোতেই ওরা এগিয়ে চলল—সর্বাগ্রে একজন সৈনিক রাইফেল হাতে, তার পিছনে কিরীটী ও মিঃ রামিয়া পিস্তল হাতে এবং বাকী সব তাদের অনুসরণ করে। হঠাৎ ওদের নজরে পড়ল একটা কাঁচের দরজা—কাঁজের ভিতর দিয়ে দৃষ্টিপাত করতেই বোঝা গেল—ওটা একটা কেবিনের দরজা। বেশ প্রশস্ত কেবিন—কেবিনের মধ্যে আলো জ্বলছে, আর-

আর সেই আলোয় দেখা গেল—কালো রঙের আলখাল্লা পরিহিত দীর্ঘকায় এক ব্যক্তি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে এবং তার সামনে একটা চেয়ারে বসে মিঃ ডিবরাজ—তাঁর হাত-পা বাঁধা।

ঐ—ঐ তো মিঃ ডিবরাজ! কাঁপা উত্তেজিত কণ্ঠে মিঃ রামিয়া কথাটা বলে শেষ করবার আগেই কিরীটী তাঁর মুখে হাত চাপা দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিল, hush! চুপ।

ও লোকটা কে? দাঁড়িয়ে ফিসফিস করে মিঃ রামিয়া বললেন।

ডাঃ ওয়াং সম্ভবত। কিরীটী চাপাগলায় জবাব দিল।

কোণের আর একটা চেয়ারে আর একজন বসে না? দেখতে পাচ্ছেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ, উনি হয়ত মিঃ চিদাম্বরম।

এখন আমাদের কি কর্তব্য?

ডাঃ ওয়াং সম্ভবত এখনও জানতে পারেনি যে জাহাজ আমরা অধিকার করেছি—কিরীটীর কথা শেষ হল না, ওরা দেখতে পেল, কেবিনের এক কোণ থেকে একটা ছোট বাঁদর লাফাতে লাফাতে এগিয়ে এসে ডাক্তারের সামনে দাঁড়াল, ডাক্তার হাত বাড়াতেই বাঁদরটা তার হাত বেয়ে অবলীলাক্রমে ডাক্তারের কাঁধের উপর উঠে বসল।

ক্যাপ্টেন?

ইয়েস। কিরীটীর ডাকে সাড়া দিলেন ক্যাপ্টেন বালকৃষ্ণ, গান-বোটের কমাণ্ডার।

আপনার লোকদের বলুন জাহাজের ইঞ্জিন-ঘর দখল করতে—যান, চট্‌পট্‌ অর্ডার দিয়ে আসুন!

ক্যাপ্টেন তখনি গিয়ে উপরের ডেকে অর্ডার দিয়ে মিনিট-তিনেকের মধ্যেই ফিরে এল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে ডাঃ ওয়াং ঘুরে দাঁড়াল—

ওরা সকলে সঙ্গে সঙ্গে দরজার দু'পাশে সরে দাঁড়াল।

দরজাটা খুলে ডাঃ ওয়াং বাইরে পা দিতেই কিরীটী ডাঃ ওয়াংয়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

কিন্তু প্রচণ্ড শক্তি ডাঃ ওয়াংয়ের শরীরে। তাছাড়া জায়গাটা অপরিসর—দুজনে জড়াজড়ি করে কেবিনের মধ্যে গিয়ে পড়ল।

রাজুও কিরীটীর সাহায্যে এগিয়ে এল।

এদিকে আরেক বিপত্তি। জাহাজটা যেন একপাশে কাত হয়ে পড়তে শুরু করে, আর কেবিনের আলোটা হঠাৎ দপ করে নিভে গেল কিসের একটা শব্দ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

অন্ধকার। নিকষ আলো অন্ধকার। কিছু চোখে পড়ে না।

তারই মধ্যে কিরীটী লোকটাকে নিয়ে জাপটাজাপটি করছে—জাহাজটা আরও একটু যেন কাত হয়ে পড়েছে ততক্ষণে।

একটা কিসের ঝাঁঝাল গন্ধ নাকে আসছে। মিষ্টি কিন্তু ঝাঁঝাল—

কিরীটী তাড়াতাড়ি অন্ধকারেই লোকটাকে ছেড়ে তাকে একটা ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, রাজু—মিঃ রামিয়া—quick! কেবিনের মধ্যে বিষাক্ত গ্যাস ছড়িয়ে যাচ্ছে—কেবিন থেকে বের হয়ে যান—যান—

কিরীটী ছুটে কেবিনের দরজা দিয়ে বের হয়ে গেল। রাজুও। অন্ধকারে কিরীটী দেখতে পেল না মিঃ রামিয়া কেবিন থেকে বের হয়ে এসেছেন কিনা। কিরীটী ডাকে, রাজু—রাজু!

এই যে আমি—পাশ থেকে বলে রাজু!

দরজাটা কেবিনের তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দেয়—গ্যাস ততক্ষণে বাইরের প্যাসেজেও আসতে শুরু করেছে।

শীগগির চল—ডেকে চল।

দুড়দাড় করে ওরা সিঁড়ি বেয়ে উপরের ডেকে চলে আসে।

সমুদ্রের হাওয়া এসে ওদের চোখেমুখে ঝাপটা মারে, আর ওরা প্রাণভরে শুদ্ধ হাওয়া টানতে টানতে হাঁপায়।

মিঃ রামিয়া—রামিয়া কোথায়? কিরীটী বললে?

মিঃ রামিয়া বোধ হয় মনে হচ্ছে কেবিন থেকে বেরুতে পারেননি!

প্রায় আধঘণ্টা পরে উপরের দিকে উঠে এসে গ্যাসটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। জাহাজ থেমে গিয়েছে অনেকক্ষণ। সৈন্যরা সম্পূর্ণ জাহাজটা অধিকার করেছে। ইঞ্জিনের ঘর তারা আগেই দখল করেছিল।

মুখের রুমাল দু'ভাঁজ করে বেঁধে কিরীটী আর রাজু নীচে নেমে এল—হাতে টর্চ—টর্চের আলো ফেলে ফেলে।

প্যাসেজে ঝাঁজালো মিষ্টি গন্ধটা আর নেই।

কেবিনের খোলা দরজাপথে ওরা ভিতরে প্রবেশ করল—মিঃ রামিয়ার মৃতদেহটা ঠিক কেবিনের দরজার কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে—আর চেয়ারের উপর উপবিষ্ট বদ্ধ অবস্থায় মিঃ চিদাম্বরণ্ ও মিঃ ডিবরাজ—দুজনেই মৃত।

তাঁদের মাথা বুকের উপর ঝুলছে। কিন্তু আর কোন দেহ দেখা গেল না।

All of them are dead, রাজু! কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল। কেবিনের চারপাশে আর একবার নজর করল, কিন্তু ডাঃ ওয়াং—ডাঃ ওয়াং কোথায়? He must be living—we must find him out! এই জাহাজের মধ্যেই সে আছে কোথায়ও।

নিশ্চয়ই পালাতে পারেনি। চল খুঁজে দেখি—

প্যাসেজ ধরে একটু এগুতেই আর একটা কেবিন চোখে পড়ল। ভিতরে অত্যন্ত মৃদু আলো জ্বলছে—ঐ কেবিনের দরজাটাও কাঁচের।

কাঁচের ভিতর দিয়ে কিরীটী ভিতরে দৃষ্টিপাত করল।

আলো বলে কিরীটী যেটাকে মনে করেছিল দেখলো সেটা আলো নয়—কেবিনের মধ্যে একটা কাঁচের পার্টিশান। তারই অপরদিকে সারা দেওয়াল থেকে ম্লান একটা আলোর জ্যোতি যেন ঠিক পড়ছে—

আর—আর দীর্ঘকায় কালো আলখাল্লা পরিহিত সেই ব্যক্তি, যার সঙ্গে তার মল্লযুদ্ধ হয়েছিল—একটা চেয়ারে বসে—

কিরীটী সামান্য চেষ্টা করতেই কেবিনের কাঁচের দরজাটা খুলে গেল—দুজনে ভিতরে প্রবেশ করল।

সঙ্গে সঙ্গে কালো আলখাল্লা পরিহিত লোকটা মুখ তুলে তাকাল। মুখে একটা পাতলা রবারের মুখোশ আঁটা। পরিষ্কার ইংরাজীতে বললে, এস মিঃ কিরীটী রায়, তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম, একসঙ্গেই মরব বলে সবাই মৃত্যু-আসর পেতেছি। এই জাহাজটা ধীরে ধীরে জলের তলায় এবার তলিয়ে যাবে, তোমাদের সকলকে নিয়ে আর আমার মৃতদেহটা নিয়ে। কারণ আমি আমার শরীরে বিষ ইনজেকশন দিয়েছি, আর বিশ মিনিটের মধ্যেই আমার মৃত্যু হবে। ওদিকে চেয়ে দেখছ কি, ওপাশের দেওয়ালে রয়েছে ভাস্বর ছত্রাক—এ তারই আলো। নিজে কালচার করে আমি ঐ 'Empera' ছত্রাকের জন্ম দিয়েছি— কেমন করে কালচার করেছি জান! মরা মাছির গায়ে একরকম সাদা বস্তু জড়িয়ে থাকে, তারই ডিম্বকোষের কালচার থেকে ঐ ভাস্বর ছত্রাকের জন্ম।

কিরীটী অবাক বিস্ময়ে শুনছিল ডাঃ ওয়াংয়ের কথা।

ডাঃ ওয়াংয়ের গলা আবার শোনা গেল, বাঁদিককার দেওয়ালে দেখ। ওগুলোও ছত্রাক, নীলবর্ণের অ্যামেনেশিয়া জাতীয় ছত্রাক—ওর এদিকে আর একটা চেম্বার আছে—বেশীমাত্রায় অক্সিজেনে ভরা চেম্বারটা, সেই অক্সিজেনের সাহায্যেই ঐ ছত্রাক কোটি কোটি সংখ্যায় জন্ম নেয়, আমার তৈরী সবুজ তরল মৃত্যু-বিষাক্ত ক্লোরিন গ্যাস—তার পরিচয় তো পেয়েছ ডিবরাজের বাড়িতে। আমার রক্তলোভী লাল মাকড়সা—যার দংশনে সঙ্গে সঙ্গে অবধারিত মৃত্যু—তারও পরিচয় পেয়েছ, Scolopindra গ্রুপের—

শেষের দিকে ক্রমশঃ গলার স্বরটা যেন নিস্তেজ অস্পষ্ট হয়ে আসছিল ডাঃ ওয়াংয়ের।

ওরা দুজনে মন্ত্রমুগ্ধের মত ডাঃ ওয়াংয়ের কথাগুলো শুনছিল—হঠাৎ পায়ের তলায় জলের স্পর্শ পেতেই ওরা চমকে উঠল।

রাজু, জল ঢুকতে শুরু করেছে জাহাজে! জাহাজ ডুবছে! চল, চল। দুজনে ছুটে কেবিন থেকে বের হয়ে এল।

হু-হু করে জল উঠছে। জল প্রায় একহাঁটু হয়ে যায়। কোনমতে ওরা দৌড়ে গিয়ে সিঁড়িতে ওঠে—তারপর ছুটে ডেকে।

।। তেরো ।।

গান-বোটের উপর দাঁড়িয়ে কিরীটী, রাজু আর গান-বোটের কমাণ্ডার বালকৃষ্ণ। ভোরের আলোয় চারিদিক স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

দিগন্তবিস্তৃত নীল সাগর আথালিপাথালি করছে।

ওদের চোখের সামনে ডাঃ ওয়াংয়ের সাদা জাহাজটা ধীরে ধীরে সমুদ্রের জলের তলে তলিয়ে যাচ্ছে।

ধীরে মাস্তুলটা ডুবে গেল ডাঃ ওয়াংয়ের সব রহস্য নিয়ে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কিরীটী বললে, বিরাট একটা প্রতিভার অপমৃত্যু!

ঐদিনই বিকেলের দিকে কিরীটী গেল ডিবরাজের গৃহে।

কৃষ্ণা আগেই তার পিতার মৃত্যুসংবাদটা পেয়েছিল।

বাইরের ঘরে একটা চেয়ারে কৃষ্ণা বসেছিল স্তব্ধ হয়ে।

পরনে একটা কালো রংয়ের শাড়ি।

মাথার কেশ অবিন্যস্ত।

দুটি চক্ষু অশ্রুতে ফোলা, পাশে দাঁড়িয়ে আয়া কুন্তি।

কৃষ্ণা!

কিরীটীর ডাকে কৃষ্ণা অশ্রুভেজা দুটি চোখ তুলে ওর দিকে তাকাল।

পারলাম না কৃষ্ণা তোমার ড্যাডিকে বাঁচাতে!

কৃষ্ণা কোন কথা বলে না—কেবল দু-ফোঁটা অশ্রু তার গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ল।

আরও দুদিন পরে।

মিঃ ডিবরাজের পারলারে দুজনে বসে মুখোমুখি—কিরীটী আর কৃষ্ণা।

কৃষ্ণা বললে, তুমি কবে ফিরে যাচ্ছ?

কালকের জাহাজে। তুমি কি এখানেই থাকবে কৃষ্ণা?

কিছুদিন তো থাকতেই হবে—ড্যাডির ব্যবসা, এখানকার ঘরবাড়ির একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে—

তা হবে।

ব্যবসা বন্ধ করে দেব!

কেন?

কে দেখবে—আমার তো কোন ভাই নেই!

সেই ভাল। এই বাড়িটা?

এটা বিক্রী করব না—ড্যাডির স্মৃতি এটার মধ্যে রয়েছে।

তারপর বোধ হয় বম্বেতেই ফিরে যাবে?

হ্যাঁ।

তুমি বম্বেতে পৌঁছে আমাকে একটা কেব্‌ল করো।

করব।

তারপরেই কিরীটী উঠে দাঁড়াল—একটু যেন ইতস্তত করল, তারপর কৃষ্ণার পাশে এসে

দাঁড়িয়ে ওর কাঁধে একটা হাত রেখে গভীর স্নেহে ডাকল, কৃষ্ণা!

কৃষ্ণা কোন কথা না বলে তার ডান হাতটা বাড়িয়ে কিরীটীর হাতটা চেপে ধরল।

কৃষ্ণা!

বল?

একটা কথা বলব, যদি অনুমতি কর!

কৃষ্ণা ওর মুখের দিকে তাকাল!

বলতে সাহস হচ্ছে না—

কেন?

যদি তুমি 'না' বলে দাও?

ও-কথা তোমার মনে হল কেন।

কৃষ্ণা—সত্যি—সত্যি বলছ?

কৃষ্ণা মাথাটা নীচু করল।

ডাইনীর বাঁশী

[ইস্কাপনের সাহেব হরতনের বিবি]

।। এক ।।

সরকার লজের সারদা সরকার নাকি নিহত হয়েছেন।

বিখ্যাত জুয়েলার সারদাচরণ সরকার ইদানীং বয়স হওয়ায় ব্যবসা আর দেখাশোনা করতেন না।

বীরভূম জেলাতেই একটি স্বাস্থ্যকর নির্জন স্থানে প্রায় এক বিঘে জমির উপর যে চমৎকার বাড়িটি 'সরকার-ভিলা', ইদানীং বৎসরখানেক যাবৎ সেইখানেই কর্মক্লান্ত জীবনের শেষকটা বছর শান্তিপূর্ণ বিশ্রামের অবসরে কাটাবেন বলে এসেছিলেন সারদাচরণ সরকার।

কলকাতায় বিরাট জুয়েলারী ফার্ম সরকার ব্রাদার্স এবং দিল্লী ও বোম্বাইয়ে তার ব্রাঞ্চ। ঐ অঞ্চলের সরকার-ভিলা ছাড়াও কলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলে বিরাট প্রাসাদোপম অট্টালিকা আছে।

কলকাতার বাড়িতে বর্তমানে সারদাবাবুর ভাইপো মৃতদার বৃন্দাবন সরকার সকন্যা বসবাস করছিলেন। তবে প্রায়ই তাঁকেও সপ্তাহে অন্ততঃ দুবার তো বটেই, সারদাবাবুর কাছে আসা-যাওয়া করতে হত ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা করতে ও পরামর্শ নিতে। এবং কখনও কখনও বৃন্দাবন সরকারকে এখানে এসে থাকতেও হত সরকার-ভিলায় ব্যবসা-সংক্রান্ত ব্যাপারে দু'চারদিন।

সারদাবাবুর স্ত্রী-বিয়োগ অনেক আগেই হয়েছিল এবং তাঁর কোন সন্তান-সন্ততি ছিল না।

ভাইপো বৃন্দাবন ও তাঁর একমাত্র কন্যা রেখাই যে হবেন অদূর ভবিষ্যতে সমস্ত সম্পত্তির মালিক সে কথা সকলেই জানত।

সারদাবাবু ভাইপো বৃন্দাবনকে স্নেহও করতেন খুব বেশী।

সারদাবাবুর বয়স ষাট উত্তীর্ণ হলেও কিন্তু শরীরের বাঁধুনি বেশ ভালই ছিল এবং মাথার চুলগুলো পেকে অধিকাংশই সাদা হয়ে গেলেও শরীরে যেন বার্ধক্য বা জরা দাঁত বসাতে পারেনি তখনও।

বৎসরখানেক ধরে সারদাবাবু সরকার ভিলায় বসবাস করছিলেন এবং সরকার-ভিলাতে তাঁকে ঐ বয়সে আত্মীয়পরিজনদের থেকে দূরে থাকতে হবে বলেই তাঁকে দেখাশোনা করবার জন্য প্রৌঢ় পুরাতন ভৃত্য দশরথ তো ছিলই, মাস আষ্টেক পূর্বে একটি মহিলাকেও নিযুক্ত করেছিলেন তিনি।

শকুন্তলা ত্রিবেদী।

ইউনিভার্সিটির দরজাটা সায়েন্স ইণ্টারমিডিয়েটের বেশী ডিঙোবার অবকাশ না হলেও সারদাবাবুর পড়াশুনা করবার কিন্তু একটা প্রচণ্ড নেশা ছিল।

সরকার-ভিলায় তাঁর নিজস্ব একটি গ্রন্থাগার ছিল এবং সেই গ্রন্থাগারে ইংরেজী ও বাংলা নানাবিধ পুস্তকের চমৎকার একটি সংগ্রহও ছিল।

আর ছিল তাঁর একটি নেশা বা শখ, ফুলগাছের। উক্ত দুটি নেশা নিয়েই প্রৌঢ় সারদা সরকারের অবসর যাপনের দিনগুলো একপ্রকার ভালই কেটে যাচ্ছিল।

শকুন্তলার কাজ ছিল দ্বিপ্রহরে ও রাত্রে সারদাবাবুকে বই পড়ে পড়ে শোনানো ও তাঁর নির্দেশমত মধ্যে মধ্যে হিসাবের টুকিটাকিগুলো দেখা এবং তাঁর চিঠিপত্র লিখে দেওয়া ও তাঁকে সঙ্গ দেওয়া।

কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে তিনজন প্রার্থীর মধ্যে শকুন্তলাকেই মনোনীত করেছিলেন সারদা

সরকার।

শকুন্তলা মানে মিস্ শকুন্তলা ত্রিবেদী।

বয়স শকুন্তলার ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশের মধ্যে এবং বেঁটে রোগাটে ছিমছাম চেহারা।

ঈষৎ মঙ্গোলিয়ান টাইপের মুখখানা ও গাত্রবর্ণ হরিদ্রাভ।

শকুন্তলার মুখেই শুনেছিলেন সারদা সরকার, প্রথমে অর্ফানেজে ও পরে রেঙ্গুনের এক কনভেন্টে সে নাকি মানুষ হয়েছে ও লেখাপড়া শিক্ষা করেছে।

এক ইংরাজ মিলিটারী বাপের ঔরসে ও বর্মী মা'র গর্ভে তার জন্ম।

বরাবর রেঙ্গুন শহরেই সে ছিল, তারপর কিছুদিন এক বিলাতী জাহাজ কোম্পানীতে স্টুয়াড্রেসের কাজও করেছিল। তারপর সে চাকরি ভাল না লাগায় কলকাতায় এসে উঠেছিল অন্য কোন জীবিকার অন্বেষণে।

ঐসময় কাগজে সারদাবাবুর বিজ্ঞাপন দেখে সে একটা দরখাস্ত করে দেয়।

ইন্টারভিউর সময় শকুন্তলার চেহারা দেখে ও তার কথাবার্তা শুনে সারদা সরকার প্রীত হয়েই তাকে দুইশত টাকা মাহিনায় নিযুক্ত করেছিলেন আট মাস পূর্বে।

সেই থেকেই শকুন্তলা ত্রিবেদী সরকার-ভিলাতেই আছে।

ঘটনার সময় শকুন্তলা ত্রিবেদী ও ভৃত্য দশরথ ছাড়াও সরকার-ভিলাতে আরও ছয়জন প্রাণী ছিল।

ঠাকুর হরিদাস, দারোয়ান রামভজন, ভৃত্য নকুল, দাসী পিয়ারী ও মালী জগন্নাথ এবং সম্প্রতি নিযুক্ত বেয়ারা কেতু।

আগেই বলা হয়েছে বই পড়ার নেশা ছাড়াও সারদা সরকারের আর একটি নেশা ছিল, সেটা হচ্ছে ফুলগাছের।

সরকার-ভিলার চৌহদ্দির মধ্যে পশ্চাতের অংশে বিরাট একটি বাগান নিজ হাতেই প্রায় বলতে গেলে তৈরি করেছিলেন তিনি।

নানাজাতীয় দুষ্প্রাপ্য ফল ও ফুলের গাছ তো ছিলই, তবে বিশেষ করে তার মধ্যে বেশী ছিল নানাবিধ ফুলের গাছ এবং তার মধ্যে আবার বেশীর ভাগ হচ্ছে নানা জাতীয় গোলাপের গাছ বাগানটির মধ্যে।

প্রত্যহ ভোরে উঠে বেলা আটটা পর্যন্ত প্রায় ঐ বাগানের মধ্যেই মালীকে নিয়ে কেটে যেত সারদা সরকারের এবং সঙ্গে শকুন্তলাও থাকত প্রায় ঐ সময়টা।

তারপর ঘরে এসে স্নান করে চা পান করতেন।

দ্বিপ্রহর ও রাতটা কাটত তাঁর পড়াশুনা নিয়ে, সে সময় সঙ্গে থাকত শকুন্তলা সর্বক্ষণই প্রায়।

সারদা সরকার বাড়ি থেকে কখনই বড় একটা বেরুতেন না। এবং স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গেও মিশতেন না।

সেই কারণেই গত এক বৎসর ধরে তিনি সরকার-ভিলায় থাকলেও স্থানীয় অধিবাসীদের কাছে সারদা সরকার একপ্রকার অপরিচিতই যেন রয়ে গিয়েছিলেন।

তথাপি সারদা সরকারের আকস্মিক মৃত্যুর ব্যাপারটা হাওয়ার বেগেই যেন ভোরবেলা ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছিল ছোট শহরটির সর্বত্র।

।।দুই।।

সময়টা পূজার ছুটির অব্যবহিত পরেই। অর্থাৎ অগ্রহায়ণের শুরু সবে।

সুশান্ত, বিনয় ও ফ্যাটি গুপ্ত, দি ফেমাস্ ট্রায়ো জায়গাটা স্বাস্থ্যকর বলে এবং বিশেষ করে নির্জন ও নিরিবিলি বলে বিনয়ের বাবার যে ছোট বাড়িটি সরকার-ভিলার প্রায় কাছাকাছি ছিল সেই বাড়িতে এসে মাসখানেক ধরে বাস করছিল।

সুশান্তর একটু বেলা করে ওঠাই অভ্যাস।

কিন্তু বিনয়ের ডাকাডাকিতে অসময়েই ঘুমজড়িত চক্ষু দু'টি রগড়াতে রগড়াতে উঠে বসল সুশান্ত, কি হল, ডাকাত পড়েছে নাকি? ভোরবেলাতেই ষাঁড়ের মত চেঁচামেচি শুরু করেছিস কেন?

ব্যাপার শুনেছিস, ওদিকে যে হুলুস্থুল কাণ্ড।

কেন, কি আবার হল?

সরকার-ভিলার সেই যে বুড়ো সারদা সরকার, কাল রাতে কে নাকি তাকে শেষ করে দিয়েছে!

মানে?

মানে আর কি—খতম!

সে কি!

হ্যাঁ, একটু আগে দেখলাম বিমল দারোগা সরকার-ভিলার দিকে গেল। যাবি নাকি ব্যাপারটা দেখতে?

নিশ্চয়ই। উৎসাহে উঠে পড়ে সুশান্ত।

বিমল মানে ওদেরই কলেজের সহপাঠী ঐ জায়গার থানা ইনচার্জ বিমল সেন, ওদের ভাষায় বিমল দারোগা।

এখানে আসা অবধি প্রায়ই সন্ধ্যার দিকে বিমল থাকলে ওরা থানায় তার কোয়ার্টারে গিয়ে আড্ডা জমাতো। কাজেই বিমল যখন এখানখার থানা ইন্‌চার্জ, মানে সে-ই এখানকার হর্তাকর্তা সরকার পক্ষের, তখন সরকার-ভিলাতে তাদের প্রবেশের ব্যাপারে কেউ বাধাদান করতে সাহস করবে না এটা ওরা জানত। এবং এমন একটা উত্তেজনার ব্যাপার যখন, তখন সুশান্ত আর বিনয় দেরি করে না। তারা সরকার-ভিলার উদ্দেশ্যে চট্‌পট তৈরী হয়ে নিয়ে বের হয়ে পড়ল।

ফ্যাটি গুপ্তর ওসব সত্যিকারের খুনখারাপীর ব্যাপারে কোনদিনই কোন ইন্টারেস্ট নেই, বরং তার চাইতে তার গ্রন্থে বর্ণিত কল্পনার খুনখারাপীর ওপরেই বেশী আকর্ষণ বরাবর—অর্থাৎ ডিটেকটিভ সাহিত্যে।

অতএব সে ভৃত্য রামহরিকে আর এক দফা চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা রোমাঞ্চ সাহিত্য নিয়ে বসল।

সুশান্ত, বিনয় ও ফ্যাটি অভিন্নহৃদয় বন্ধু বহুদিনের।

যদিও তিনটি বন্ধুর প্রকৃতি ও আকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন একে অন্যের থেকে, তথাপি কি করে যে তিনজনের মধ্যে বিচিত্র একটি ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল সেটাই আশ্চর্য!

সুশান্তর বলিষ্ঠ পেশল উঁচু লম্বা চেহারা।

একমাথা কটা চুল, চোখ দুটি নীল ও বুদ্ধির দীপ্তিতে ঝকঝক করে। এম. এ. পাস করে

বর্তমানে কলকাতার কোন একটি বেসরকারী কলেজের অধ্যাপক। সংসারে এক বিধবা মা ব্যতীত অন্য কোন বন্ধন নেই।

বিনয় রোগাটে লম্বা, গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম, কবিজনোচিত ভাবুক প্রকৃতি এবং যেমন দিলখোলা তেমনি আমুদে। ব্যবসায়ী ধনী পিতার একমাত্র ছেলে। এম. এ. পাস করার পর কি একটা থিসিস্ নিয়ে ব্যস্ত বর্তমানে।

আর ফ্যাটি গুপ্ত—আসলে ওর নাম বিপিন গুপ্ত। বাপ-পিতামহের কেশতৈলের বিরাট একটি প্রতিষ্ঠান আছে। সারাটা বৎসর ধরে সে ব্যবসা থেকে প্রচুর অর্থাগম হয়।

বৎসর দুই হল ডাক্তারী পাস করে কলকাতা শহরেই কোন এক বড় রাস্তার উপর বিরাট এক ডিসপেন্সারী করে শখের প্র্যাকটিস শুরু করেছে।

দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে প্রায় সমান চেহারা, থলথলে চর্বিবহুল। মাথাটা ছোট, কুতকুতে চোখ। আবলুশ কাঠের মত গাত্রবর্ণ। ঐ বিচিত্র আকৃতির জন্যই বিনয় ওর নামকরণ একদা কলেজ লাইফেই করেছিল ঃ ফ্যাটি গুপ্ত।

ক্রমে সেই নামটিই বন্ধুমহলে বিশেষরকম প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল। আসল নামটি যেন পরিচিত বন্ধু-বান্ধবের দল একপ্রকার ভুলেই গিয়েছিল।

ফ্যাটির স্বভাবটি কিন্তু আমুদে ও হাসিখুশি।

তিন বন্ধুই অদ্যাবধি ব্যাচিলর অর্থাৎ অবিবাহিত। তবে মনোমত জীবনসঙ্গিনী পেলে বিবাহে তিনজনেই নাকি প্রস্তুত—ওরা তিনজনেই এই কথা বলে থাকে।

সুশান্ত ও বিনয় যখন সরকার-ভিলার গেটের সামনে এসে পৌঁছল, সেখানে তখন শহরবাসীর বেশ একটি ছোটখাটো ভিড় জমে উঠেছে। তবে প্রহরারত লালপাগড়ির রুলের গুঁতোর ভয়ে গেট থেকে একটা ব্যবধান রেখেই তারা দাঁড়িয়ে ছিল সরকার ভিলার সামনে। যে লালপাগড়ি প্রহরীটি গেটের পাশেই প্রহরারত ছিল, বিনয় ও সুশান্তকে সে চিনতে পেরে ভিতরে প্রবেশে বাধা দিল না।

দুজনে গেট দিয়ে সরকার-ভিলাতে প্রবেশ করল।

গত মাসখানেক ধরে এখানে আসা অবধি নিয়মিত যাতায়াতের পথে দূর থেকে সুন্দর ঝকঝকে সাদা রঙের দোতলা সরকার-ভিলাটি বহুবারই ওদের দৃষ্টিপথে পড়েছে ইতিপূর্বে।

কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার বেশী কিছু নয়। কারণ বিনয়ের মুখেই শুনেছিল সরকার-ভিলার মালিক সারদা সরকার কারও সঙ্গেই নাকি মেশেন না।

একটি বিচিত্র টাইপের ব্যক্তিবিশেষ নাকি।

এগিয়ে চলে দুজনে গেট থেকে যে কাঁকর-ঢালা রাস্তাটি বরাবর গিয়ে সরকার-ভিলার বারান্দার সামনে শেষ হয়েছে সেই রাস্তাটি অতিক্রম করে।

রাস্তার দু'পাশে নানাজাতীয় সযত্নরক্ষিত ও বর্ধিত দেশী-বিলাতী পাতাবাহার ও ফুলের গাছ।

বারান্দাটির সামনে লোহার গ্রীল বসানো।

বারান্দায় পিতল, চীনা-মাটি ও সাধারণ মাটির টবের মধ্যে নানাজাতীয় মরশুমী ফুলের বর্ণ-বৈচিত্র্যের মনোরম সমারোহ।

একপাশে একটি খাঁচায় অনেকগুলো মনুয়া পাখী কিচিরমিচির শব্দ করছে।

বারান্দায় পা দিতেই আর একজন সগুম্ফ লালপাগড়ির সঙ্গে ওদের চোখাচোখি হল, সেও ভাগ্যক্রমে ওদের অপরিচিত নয়।

সুশান্তই প্রশ্ন করে সেই লালপাগড়িকে, দারোগা সাব কাহা পাঁড়েজী?
জি অন্দরমে—
ভিতর যানে সেকতা?
কিউ নেই—যাইয়ে না! অভয় দিল লালপাগড়ি।
দুজনে আবার অগ্রসর হয়।
বারান্দার সামনেই পারলার।
দরজার ভারী পর্দা তুলে দুজনে ভিতরে পা দিল।
ঘরটি আধুনিক রুচিসম্মত আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। ঘরের মধ্যে কেউ তখন ছিল না।
কোন্ দিকে অগ্রসর হবে এরা ভাবছে, কারণ ঘরের দু'দিকে দুটি দরজা ওদের নজরে পড়েছে। ঐসময় একজন ভৃত্য এসে ঘরে প্রবেশ করল।
কাকে চান?
দারোগা সাহেবের লোক আমরা। সুশান্ত বললে।
ও, ভিতরের ডানদিককার ঘরে যান, দাদাবাবুর ঘরে আছেন তিনি।
দুজনে আবার নির্দিষ্ট ঘরের দিকে অগ্রসর হল।
সে ঘরটিও আকারে বেশ প্রশস্তই। এবং রুচিমাফিক দামী আসবাবে সুসজ্জিত। বলা বাহুল্য বিমল ঐ ঘরের মধ্যেই ছিল।
তার অ্যাসিস্টেন্ট শ্রীমন্ত চৌধুরী এ. এস. আই-য়ের সঙ্গে নিম্নকণ্ঠে কি যেন আলোচনা করছিল ঐ সময়ে ঘরের মধ্যে।
বিমল ওদের ঐ সময় ঐখানে দেখে প্রশ্ন করে, এ কি, তোমরা! কি ব্যাপার?
এই এলাম।
বিমলই হেসে বলে, তোদের সাহস তো কম নয়, খুনখারাপীর ব্যাপার দেখতে এসেছিস!
সত্যি-সত্যিই তাহলে সারদাবাবু খুন হয়েছেন?
সঙ্গে সঙ্গে যেন বিমল দারোগা চাপাকণ্ঠে সুশান্তকে সতর্ক করে দিয়ে এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, সেই রকমই তো মনে হচ্ছে—সুইসাইড় নয়, এ কেস অফ হোমিসাইড বা পয়েজনিং হবে।
সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালো সুশান্ত বিমলের দিকে।
পয়েজনিং হবে—বিষ!
তাই তো মনে হচ্ছে। তা দেখবি নাকি?
সেইজন্যই তো এলাম। সুশান্ত বলে।
দেখে আবার ভয় পাবি না তো?
সুশান্ত মৃদু হাসে প্রত্যুত্তরে।

।। তিন ।।

নিছক যে একটা উত্তেজনা বা কৌতূহলের বশবর্তী হয়েই সুশান্ত সরকার-ভিলায় এসেছিল তা নয়।
মাস-দুই পূর্বে একটা সুইসাইডের বিচিত্র রহস্যপূর্ণ মামলার ব্যাপারে ঘটনাচক্রে সুশান্ত

ও বিনয়ের বিখ্যাত সত্যসন্ধানী কিরীটী রায়ের সঙ্গে আলাপের সৌভাগ্য হয়েছিল।

সেই সময় থেকেই উভয়ের মন, বিশেষ করে সুশান্তর এই ধরনের রহস্যপূর্ণ তদন্তের ব্যাপারে ইনটারেস্টেড হয়ে ওঠে।

সেই ইনটারেস্টেই ওরা সরকার-ভিলায় এসেছিল মূলত খবরটা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে।

বাড়িটা সর্বসমেত দোতলা, পূর্বেই বলা হয়েছে। একতলায় খানপাঁচেক ও দ্বিতলে চারিটি ঘর।

দ্বিতলেরই দক্ষিণ প্রান্তের ঘরে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে ওরা এসে প্রবেশ করল। সেই ঘরের মধ্যেই মৃত অবস্থায় সারদাচরণ সরকারকে পাওয়া গিয়েছে ঐদিন প্রত্যুষে।

বেশ প্রশস্ত ঘরখানি।

মেঝেতে দামী কার্পেট বিস্তৃত।

দেওয়ালে চারিদিকে দক্ষ চিত্রকরের আঁকা বিচিত্র মনোরম সব জাপানী ল্যাণ্ডস্কেপ।

একধারে একটি দামী পালঙ্কে তখনও বেডকভার দিয়ে ঢাকা শয্যা।

শয্যাটি একেবারে নিভাঁজ।

ঘরের অন্য ধারে একটি ছোট রাইটিং টেবিল।

একখানা মোটা কি ইংরাজি বই খোলা রয়েছে টেবিলের উপরে এবং তার পাশেই একটা মোটা বাঁধানো খাতা ও মুখবন্ধ একটি পার্কার ঝরনা-কলম রয়েছে। তার পাশে একটি নিঃশেষিত চায়ের কাপ ও প্লেট। এবং 'কোরামিনে'র একটা শিশি।

টেবিলের উপরে টেবিল ল্যাম্পটি তখনও জ্বলছে। তার পাশেই সুদৃশ্য একটি জার্মান টেবিল ক্লক টিকটিক্ শব্দ করে চলেছে অন্তহীন সময়-সমুদ্রের বক্ষে যেন।

ঘরের পূর্ব দিকে ও দক্ষিণ দিকে দুটি গরাদহীন পাল্লা খোলা জানলা।

পূবের জানলার পাশেই একটি গডরেজের ছোট লোহার সিন্দুক। পালঙ্কের শিয়রের দিকে একটি টিপয়। তার উপরে একটি কাচের গ্লাসভর্তি জল ঢাকনি দিয়ে ঢাকা।

সারদাবাবুর মৃতদেহটা সেই রাইটিং টেবিলটারই সামনে পড়ে রয়েছে দেখা গেল এবং অল্প দূরে একটি গদি-আঁটা চেয়ার উল্টে রয়েছে মেঝেতে মৃতদেহের সামনে।

মৃতের পরিধানে পায়জামা ও গেরুয়া বর্ণের মিহি খদ্দরের পাঞ্জাবি।

একটি হাত বুকের তলায় চাপা পড়েছে, মৃতের অন্য হাতটি প্রসারিত মুষ্টিবদ্ধ।

পায়ে রবারের চপ্পল ছিল। চপ্পলজোড়া পাশে পড়ে আছে।

মৃতের মুখটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল।

প্রাণ না থাকলেও সেই মুখের প্রতিটি পেশীতে মর্মান্তিক যাতনার একটা চিহ্ন যেন সুস্পষ্ট হয়ে ছিল তখনও।

শেষ মুহূর্তের মৃত্যু-যন্ত্রণার সুস্পষ্ট চিহ্ন।

সত্যিই সে মুখের দিকে যেন তাকানো যায় না।

বিকৃত বিস্ফারিত ওষ্ঠের কষ বেয়ে লালা ও গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে তখনও।

মৃদুকণ্ঠে সুশান্ত বিমলকে সম্বোধন করে বললে, তোর কি সত্যিই মনে হয় এটা সুইসাইড় নয়?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন? ভদ্রলোক সুইসাইড়ই যে করেননি বুঝলি কি করে? নিম্নকণ্ঠেই আবার প্রশ্ন করল সুশান্ত।

প্রত্যুত্তরে বিমল মৃদু পুলিসী হাসি হাসল।

চল, এখনও জবানবন্দি নেওয়া হয়নি, পাশের ঘরে বৃন্দাবনবাবু অপেক্ষা করছেন আমার জন্য।

বৃন্দাবনবাবু!

হ্যাঁ, সারদাবাবুর একমাত্র ভাইপো আর কলকাতা বোম্বাই ও দিল্লীর সরকার ব্রাদার্স বিরাট প্রতিষ্ঠানটির এবং কলকাতা ও এখানকার বাড়ির একমাত্র ওয়ারিশন ও বর্তমান মালিক।

কেন, আর কেউ ওয়ারিশন নেই বুঝি?

এখন পর্যন্ত তো তাই শুনছি। এখন দেখা যাক, জবানবন্দি থেকে কিছু জানা যায় কিনা।

চল চল! সুশান্ত বলে!

সকলে এসে পাশের ঘরে ঢুকল। নাতিপ্রশস্ত ঘরটি। এবং ঐ ঘরটিই ছিল মৃত সারদাবাবুর প্রিয় লাইব্রেরী বা গ্রন্থাগার।

চারিদিকে সুদৃশ্য সো'কেসে থাকে থাকে সব বই সাজানো। অসংখ্য বই।

এ ঘরেও সুদৃশ্য কার্পেট বিছানো এবং ঘরের মধ্যস্থলে খান-দুই আরামকেদারা ও একটি গোলাকার নিচু টেবিল।

একটি আরামকেদারার উপরেই বসেছিলেন বৃন্দাবন সরকার।

সকলে ঘরে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভদ্রলোক নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন।

বয়স ত্রিশ থেকে বত্রিশের মধ্যে হবে বলেই চেহারা দেখে মনে হয় ভদ্রলোকের।

তবে বেশ হৃষ্টপুষ্ট—যাকে বলে গোলগাল চেহারা।

গৌরবর্ণ। পরিধানে ধপ্‌ধপে দামী কাঁচির ধুতি ও গায়ে দামী একটা শাল জড়ানো। পায়ে দামী চপ্পল।

মাথার চুল রুক্ষ এলোমেলো। মুখে একদিনের দাড়ি। বোঝা যায় তখনো ক্ষৌরকর্ম সমাধান হয়নি।

বসুন, বসুন বৃন্দাবনবাবু। আমাদের কথাবার্তা বসে বসেও চলতে পারে। বিমল বললে।

বৃন্দাবন আর দ্বিরুক্তি না করে পুনরায় সোফার উপরে বসে পড়লেন তখুনি।

এবং বিমলই অতঃপর প্রশ্ন করতে শুরু করে বৃন্দাবনবাবুকে।

আপনি কি এখানেই বরাবর থাকেন?

না। তবে প্রায় প্রতি হপ্তায়ই আসি। পরশু রাত্রে গাড়িতে এসেছিলাম, আজই সকালে আমার কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ছিল।

ও। আচ্ছা আপনার কাকামশাইয়ের মৃত্যুটা আপনার কি বলে মনে হয় মিঃ সরকার?

কি বলব কিছুই বুঝতে পারছি না দারোগাবাবু! ব্যাপার যা দেখছি তাতে তো মনে হচ্ছে সুইসাইডই করেছেন! কিন্তু—

কি?

তাঁর মত লোক সুইসাইড করতে পারেন অ্যাটঅল, আমার চিন্তারও অতীত। তাছাড়া সুইসাইডই বা তিনি করতে যাবেন কেন এ বয়সে, কোন হেতুই তো ছিল না!

আপাতদৃষ্টিতে সেটা আমাদের চোখে না পড়লেও একেবারে যে থাকতে পারেই না তাও তো নয় মিঃ সরকার। গম্ভীর কণ্ঠে প্রত্যুত্তর দিল বিমল।

তা অবিশ্যি ঠিক। তবে—

তাছাড়া উনি সুইসাইডই যে করেছেন, তাই বা আমরা ধরে নিচ্ছি কেন মিঃ সরকার!

কি বলতে চান আপনি? কথাটা বলে উৎকণ্ঠিত ভাবে তাকালেন বৃন্দাবন সরকার বিমলের মুখের দিকে।

হ্যাঁ, এ কেস অফ্ হোমিসাইড্ও তো হতে পারে। তাঁকে কেউ হত্যাও তো করে থাকতে পারে।

।। চার ।।

বিমলের অতর্কিত প্রশ্নটায় যেন সহসা ভূত দেখার মতই চমকে উঠলেন বৃন্দাবন সরকার। এবং কয়েকটা মুহূর্ত তাঁর কণ্ঠ দিয়ে একটি শব্দও বের হল না।

তারপর যেন আত্মগতভাবেই বললেন বৃন্দাবন, এ—এ আপনি কি বলছেন দারোগাবাবু?

বলছিলাম ওঁকে কেউ হত্যাও তো করে থাকতে পারে!

হত্যা? হাউ অ্যাবসার্ড? হাউ ইমপসিবিল! না, না—হত্যা তাঁকে কে করবে আর করতেই যা যাবে কেন?

আরে মশাই, কে করতে পারে সে তো পরের কথা। আপাততঃ সেদিকটাও আমাদের ভেবে দেখতে হবে বৈকি। কিন্তু যাক সে কথা। তার আগে কতকগুলো কথা আমার জানা প্রয়োজন।

কিন্তু—

শুনুন মিঃ সরকার, জানেন তো আমাদের পুলিসের মন বড় সন্দিগ্ধ, তাই অসম্ভবকে আমরা সম্ভব বলেই ধরে নিই। যাক্ যা জিজ্ঞাসা করছিলাম, গতকাল যখন আপনি এখানে ছিলেন আপনার কাকামশাইয়ের সঙ্গে নিশ্চয়ই আপনার কথাবার্তা হয়েছে?

হ্যাঁ, তা হয়েছে বৈকি।

কি বিষয়ে আপনাদের কথাবার্তা হয়েছিল বলতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে—

আপত্তি থাকবে কেন? কথাবার্তা গতকাল যা হয়েছে তা আমাদের ব্যবসা সম্পর্কেই। কারণ ঐ ব্যবসা সম্পর্কে কথাবার্তা বলতেই হপ্তায় অন্ততঃ দু'বার করে এখানে আমাকে আসতে হচ্ছিল ইদানীং।

গতকাল আপনার কাকার কোন কথায় বা ব্যবহারে কোন চাঞ্চল্য বা ভাবান্তর লক্ষ্য করেছিলেন কি কোন সময়?

না কাকার প্রকৃতিই ছিল যেন 'সোবার', শান্ত। কখনও মনে পড়ে না, কোন কারণে কাকাকে জ্ঞানতঃ চঞ্চল বা উত্তেজিত হতে দেখেছি। অতি বড় আনন্দের ব্যাপারেও যেমন তাঁর উল্লাস ছিল না, তেমনি নিদারুণ ক্ষতি বা নিরানন্দের ব্যাপারেও তাঁকে কখনও তেমন ম্রিয়মাণ মুহ্যমান হতে দেখিনি বড় একটা।

হুঁ। আচ্ছা তাঁর কোন শত্রু ছিল বলে জানেন?

শত্রু! না—

এ বাড়িতে যেসব চাকরবাকর ও অন্যান্য যারা সব আছে তারাও কি, আপনি মনে করেন, বিয়ণ্ড অল সাস্পিসন?

নিশ্চয়ই। সবাই তো অনেকদিনের পুরনো লোক, একমাত্র শকুন্তলা ছাড়া।

শকুন্তলা! হু ইজ সি?

কাকার পার্সোন্যাল অ্যাটেনডেন্ট সে। কাকার লেখাপড়ার কাজ করে দেওয়া, তাঁকে বই পড়ে শোনানো ইত্যাদির ব্যাপারে মাস-আষ্টেক হল কাকা তাকে অ্যাপয়েন্ট করেছিলেন।

হুঁ। তাঁর সঙ্গেও কথাবার্তা বলতে চাই।

ডেকে আনব?

না, একটু পরে। একটা কথা মিঃ সরকার, কাল রাত্রে সর্বশেষ কখন আপনার কাকামশাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ বা কথাবার্তা হয়?

কাকা সাধারণতঃ একটু রাত করেই শুতেন, কারণ—

থামলেন কেন, বলুন?

অনেকদিন থেকে হার্টের প্যালপিটেশনে ভুগছিলেন, তারপর ইদানীং মাসকয়েক থেকে শুনছিলাম তিনি এক নতুন উপসর্গ ইনসমনিয়াতেও ভুগছিলেন নাকি।

নিদ্রাহীনতার আর হৃৎপিণ্ডের দৌর্বল্য?

হ্যাঁ।

সেজন্য কোন ঔষধপত্র খেতেন কি?

মধ্যে মধ্যে শুনেছি কোরামিন আর ইদানীং ডাক্তারের পরামর্শে ঘুমের জন্য লুমিনল ট্যাবলেট খেতেন। শকুন্তলা দেবীই একদিন আমাকে বলছিল কথাটা।

কোন্ ডাক্তার তাঁকে দেখতেন?

কলকাতার ডাঃ আর. এন. চৌধুরীই বরাবর তাঁকে দেখতেন। হপ্তায় একবার তিনি এখানে আসতেন।

হুঁ। আচ্ছা তারপর যা বলছিলেন বলুন গতরাত্রের কথা।

চিরদিনই আমার একটু সকাল সকাল শোওয়া অভ্যাস। রাত দশটার মধ্যেই শুয়ে পড়ি আমি। কিন্তু কাকার সঙ্গে তাঁর ঘরেই বসে গতরাত্রে জরুরী ব্যবসা-সংক্রান্ত কতকগুলো আলোচনা করতে করতে কাল শুতে আমার প্রায় পৌনে এগারোটা হয়ে গিয়েছিল।

সারদাবাবুর ঘরে আপনি কাল কত রাত পর্যন্ত ছিলেন মনে আছে?

রাত এগারোটা বাজলে আমি উঠি।

হুঁ। তাহলে রাত এগারোটায় শেষ আপনি গতকাল তাঁকে জীবিত দেখেছিলেন?

হ্যাঁ।

আজ সকালে কখন জানলেন যে উনি মৃত?

দশরথই এসে আমাকে ঘুম থেকে তুলে সংবাদটা দেয়।

ও, দশরথই তাহলে সর্বপ্রথম এ বাড়িতে আজ দেখেছে—জানতে পেরেছে যে আপনার কাকামশাই মৃত।

না।

তবে?

সর্বপ্রথম জানতে পারে ব্যাপারটা শকুন্তলাই।

শকুন্তলা? আই সি! তা তিনি কখন জানতে পারেন?

খুব ভোরে। শকুন্তলা কাকার ঘরে গিয়েই—

কিন্তু অত ভোরে সে ঘরে কেন তিনি গিয়েছিলেন?

কাকার বাগানে নানা জাতের সব রেয়ার গোলাপ আছে, সেই গোলাপের গাছেরই কি সব সার সম্পর্কে শকুন্তলা নাকি গতকাল দুপুরে কি একটা সারের সম্পর্কে বই থেকে পড়ে

কাকাকে বলেছিল, তাই কাকা বলেছিলেন শকুন্তলাকে আজ খুব ভোরে তাঁর সঙ্গে বাগানে যাবার জন্যে যখন তিনি যাবেন। তাই বোধ হয় শকুন্তলা কাকার ঘরে গিয়েছিল তাঁকে ডাকতেই।

আই সি! আচ্ছা এই শকুন্তলা সম্পর্কে আপনার কি ধারণা মিঃ সরকার?

নো নো—সি ইজ অ্যাবসলুটলি বিয়ণ্ড অল সাসপিসন। সি ইজ এ পারফেক্ট লেডি।

ঠিক আছে। আপনি এবারে অনুগ্রহ করে শকুন্তলা দেবীকে এ ঘরে যদি একটু পাঠিয়ে দেন মিঃ সরকার! তাঁকেও আমার কিছু প্রশ্ন করবার আছে।

নিশ্চয়ই, এক্ষুনি পাঠিয়ে দিচ্ছি—বলে বৃন্দাবন সরকার সোফা ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন তখুনি।

বৃন্দাবন সরকার ঘর ছেড়ে চলে যেতেই মৃদুকণ্ঠে এতক্ষণে সুশান্ত কথা বলে, একটা ব্যাপার লক্ষ্য করেছিস বিমল?

কি? বিমল সুশান্তর মুখের দিকে তাকালো।

কাকার অ্যাটেনডেন্ট অথচ ভদ্রলোকের ভাইপোটি এমন অবলীলাক্রমে শকুন্তলা, শকুন্তলা বলে নামটা উচ্চারণ করছিলেন—

মৃদু হেসে বিমল বললে, অল্পবয়সে স্ত্রী-বিয়োগ ঘটেছে, তা একটু-আধটু—

হুঁ, তাই তো মনে হচ্ছে শকুন্তলার দুষ্মন্ত—

সহসা ঐসময় ঘরের বাইরে পদশব্দ শুনে বিমল বললে, চুপ—শকুন্তলা আসছে বোধ হয়!

শকুন্তলা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

ছিপছিপে রোগা, একটু বেঁটে এবং মুখখানি মঙ্গোলিয়ান টাইপের হলেও অদ্ভুত একটা আলগা শ্রী আছে যেন শকুন্তলার চেহারায় ও মুখখানিতে।

দেখার সঙ্গে সঙ্গেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মাথার পর্যাপ্ত চুল দুটি বিনুনীর আকারে বক্ষের দু'পাশে লম্বমান।

সাধারণ একটি কালোপেড়ে তাঁতের শাড়ি যৌবনপুষ্ট দেহে চমৎকার মানিয়েছে।

হাতে একগাছি করে কঙ্কণ এবং দু'কানে দুটি নীলার টাব। আর দেহে কোথাও কোন অলঙ্কার বা আভরণ নেই। পায়ে চপ্পল। কিন্তু ঐ সামান্য অনাড়ম্বর বেশেই যেন শকুন্তলার রূপ একেবারে ফুটে বের হচ্ছিল।

এ যেন সত্যিই সেই কবিমানসী বনবিহারিণী হরিণী শকুন্তলা।

নমস্কার, আপনিই শকুন্তলা দেবী? বিমল বললে।

প্রতি-নমস্কার জানিয়ে নিঃশব্দে মৃদুভাবে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল শকুন্তলা।

বসুন।

শকুন্তলা উপবেশন করল।

।। পাঁচ ।।

কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই আপনাকে শকুন্তলা দেবী।

বলুন। মৃদুকণ্ঠে কথাটি বললে শকুন্তলা।

গলাটিও মিষ্টি।

মিঃ সরকারের মুখে শুনলাম আপনি সারদাবাবুকে বইটই পড়ে শোনাতেন, তাঁর লেখাপড়ার কাজও সব করে দিতেন?

হ্যাঁ।

তাহলে কতকটা তাঁর পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেন্টের মতই আপনি ছিলেন বলুন এখানে তাঁর কাছে? বিমল বলে।

তাই বলতে পারেন।

হুঁ। আচ্ছা কাল রাত্রের দিকে শেষ কখন তাঁর সঙ্গে আপনার কথাবার্তা হয়?

সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত এই লাইব্রেরীতেই তো আমরা ছিলাম। রাত নটার পর এখান থেকে আমি চলে যাই। রাত তখন সোয়া এগারোটা হবে, তিনি আবার আমাকে ডেকে পাঠান তাঁর ঘরে।

অত রাত্রে হঠাৎ ডেকে পাঠালেন যে?

ওঁর ঘুমের ট্যাবলেটের শিশিটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, সেটা খুঁজে দেবার জন্য।

খুঁজে দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ।

কোথায় ছিল সেটা?

ওঁর ঘরে রাইটিং টেবিলের ড্রয়ারেই ছিল, কতকগুলো কাগজের তলায় চাপা পড়েছিল শিশিটা।

তারপর?

আমি যখন বের হয়ে আসছি, আমাকে বললেন দশরথকে বলে দেবার জন্যে, তাঁকে এক কাপ চা পাঠিয়ে দিতে।

অত রাত্রে চা!

হ্যাঁ, চা-পানের ব্যাপারে তাঁর কোন সময়-অসময় ছিল না। যখন-তখনই খেতেন। অতিরিক্ত চা-পানের জন্যই তো ডাক্তার চৌধুরী বলেছিলেন ওঁর ইনসমনিয়া হয়।

দিনে-রাতে কত কাপ চা খেতেন?

তা কুড়ি-পঁচিশ কাপ তো হবেই। আর খেতেনও অত্যন্ত স্ট্রং লিকারের চা।

আচ্ছা শকুন্তলা দেবী, আপনি যখন সারদাবাবুর চিঠিপত্র লেখা ও হিসাবপত্র দেখার ব্যাপারে সাহায্য করতেন, তখন আশা করি নিশ্চয়ই আপনি কনফিডেন্সেই ছিলেন?

হ্যাঁ, উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

স্বাভাবিক। আচ্ছা সারদাবাবু লোকটি কিরকম ছিলেন বলে আপনার ধারণা?

খুব শান্ত, ধীর ও বিবেচক প্রকৃতির লোক ছিলেন সারদাবাবু। ভেবেচিন্তে তবে কোন মতামত প্রকাশ করতেন।

আচ্ছা আপনি তো শুনলাম আট মাসের মত এখানে আছেন, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কখনো আপনার সঙ্গে কোন আলোচনা হয়নি?

না। কখনো কোন কারণেই ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে কারও সঙ্গে কোন আলোচনা করতেই তিনি ভালবাসতেন না। সে ব্যাপারে তাঁকে অত্যন্ত রিজার্ভই বরং মনে হয়েছে বরাবর।

বৃন্দাবনবাবুর প্রতি তাঁর মনোভাবটা কেমন ছিল?

ভালই। বৃন্দাবনবাবুকে অত্যন্ত তিনি ভালবাসতেন বলেই তো আমার মনে হয়।

অতঃপর বিমল কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার প্রশ্ন করল, এবারে আপনি কি করবেন ঠিক করেছেন কিছু?

ইট ইজ টু আর্লি টু থিঙ্ক দ্যাট! তাছাড়া যে কাজের জন্য এখানে আমি এসেছিলাম তার যখন আর প্রয়োজন হবে না, চলেই যাব।

আচ্ছা শকুন্তলা দেবী, ধন্যবাদ, আপনি যেতে পারেন।

শকুন্তলার পরে ঘরে ডাকা হল পুরাতন ভৃত্য দশরথকে।

পূর্ব্ববৎ বিমলই দশরথকে এবারে প্রশ্ন শুরু করে।

লোকটার চোখ দুটি মনে হল বেশ লাল ও ফোলা-ফোলা। লোকটা একটু আগেও কাঁদছিল বুঝতে কষ্ট হয় না।

চেহারাটা রোগাটে পাকানো দড়ির মত। মাথার চুলের এক-তৃতীয়াংশ প্রায় পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

পরিধানে একটি খাটো ধুতি ও ফতুয়া।

কতদিন এ বাড়িতে আছ দশরথ?

তা বাবু এককুড়ি বছরেরও বেশী।

বরাবর তুমি বুড়োবাবুর সঙ্গে সঙ্গেই ছিলে?

হ্যাঁ, বাবুর কাজ ছাড়া আর কোন কাজই কখনও আমাকে করতে হয়নি। বাবু আমাকে ছেলের মতই ভালবাসতেন। শেষের কথাগুলো বলতে বলতে দশরথের গলাটা ধরে এল, চোখের কোল ভিজে উঠল।

কোঁচার খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে আবার দশরথ বললে, কি যে হয়ে গেল মাথামুণ্ডু কিছু এখনও আমি বুঝে উঠতে পারছি না! বাবু যে কেন বিষ খেয়ে মরতে গেলেন!

তোমার বাবু বিষই খেয়েছেন বলে তাহলে তোমার ধারণা দশরথ? বিমল প্রশ্ন করে সহসা।

বিশ্বাস না হলেও তাই তো দেখছি বাবু!

তোমার বাবুকে কাল রাত্রে শেষবারের মত তুমিই তো চা দিয়ে এসেছিলে দশরথ, তাই না?

আজ্ঞে চা-টা আমি নিজে হাতে তৈরী করে দিলেও চা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম কেতুর হাত দিয়ে।

কেতু! সে কে?

বুড়ো হয়েছি, খাটতে পারি না—তাই আমাকে সাহায্য করবার জন্যে বাবুরই আজ্ঞামত দিন পনের হল একজন নতুন বেয়ারা রাখা হয়েছিল। তারই নাম কেতুচরণ। সে-ই চা টা দিয়ে এসেছিল।

ও। তারপর?

কিন্তু কেতু ফিরে এসে বললে, চা নাকি খুব কড়া হয়নি, তাই আর এক কাপ কড়া করে চা বাবু চেয়েছেন। তাড়াতাড়ি আর এক কাপ চা কেতুই তৈরী করে নিয়ে গিয়ে দিয়ে আসে।

তুমি তাহলে কাল রাত্রে যাওনি তোমার বাবুর ঘরে?

না। শরীরটাও কাল তেমন আমার জুত ছিল না, হাঁপানির টানটা বেড়েছিল। তাই সন্ধ্যা থেকে শুয়েই ছিলাম, তবে বাবুর খবর রেখেছি।

তোমার বাবু কি রকম প্রকৃতির লোক ছিলেন দশরথ?

খুব ঠাণ্ডা আর গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন।

বৃন্দাবনবাবুকে তোমার বাবু খুব ভালবাসতেন, তাই না?

হ্যাঁ, ঐ তো ভাইপোদের মধ্যে একমাত্র তাঁর কাছে ছিল, তাছাড়া বাবুর তো কোন ছেলেপিলেও ছিল না।

একমাত্র বৃন্দাবনবাবুই—বৃন্দাবনবাবুর আরও ভাই আছেন নাকি? ও কথা বলছ কেন দশরথ?

আছেন বৈকি, মধু দাদাবাবু—তা তিনি তো বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেননি অনেককাল হয়ে গেল।

কেন? তিনি কোথায়?

কে জানে, কেউ জানে না। দশ বছর আগে সেই যে বাবু তাঁকে বাড়ি থেকে দূর করে কি কারণে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, আর বড় দাদাবাবু বাড়িমুখো হননি।

তাঁর বৌ, ছেলে-মেয়ে কিছু নেই?

না, তিনি তো বিয়েই তখনও করেননি।

ও, আচ্ছা বৃন্দাবনবাবু ও মধুবাবু—তোমার বাবুর বড় ভাইয়ের ছেলে, না?

হ্যাঁ বাবুরা দুই ভাই, রণদাবাবু ও বাবু। বড় ভাইয়ের দুই ছেলে, এক মেয়ে।

মেয়েটির বুঝি বিবাহ হয়ে গিয়েছে?

বিয়ে হয়েছিল, বছর দুই হল তিন মারা গেছেন। তাঁর এক ছেলে আছে বিজনবাবু।

আচ্ছা দশরথ, তুমি যেতে পার। হ্যাঁ ভাল কথা, তোমাদের কেতুচরণকে একটু পাঠিয়ে দাও তো এ ঘরে।

আজ্ঞে কেতু তো নেই বাবু!

কেতু নেই? কেন, কোথায় গিয়েছে?

জানি না, সকাল থেকেই বাড়িতে তাকে দেখছি না।

বাড়িতে নেই?

না।

হঠাৎ চলে যাবার মানে?

তা কেমন করে বলব বাবু, তবে দেখছি না তাকে সকাল থেকে—

অতঃপর বিমল কিছুক্ষণ চুপ করে কি যেন ভাবে।

তারপর আবার প্রশ্ন করে, তা লোকটা দেখতে ছিল কেমন?

বেশ লম্বা-চওড়া কালোমত, তবে বাঁ পাটা দুর্বল ছিল বলে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কুঁজো হয়ে চলত কেতু।

লোকটার স্বভাব-চরিত্র কেমন ছিল বলে তোমার মনে হয়? আর হঠাৎ এভাবে চলে গেলই বা কেন?

কেন চলে গেল বুঝতে পারছি না, লোকটা তো বেশ ভালই ছিল, কাজকর্মও দু'দিনেই শিখে গিয়েছিল। কর্তাবাবুর লোকটাকে পছন্দও হয়েছিল।

কোথায় তার বাড়ির ঠিকানা কিছু জান?

না বাবু, শুনেছিলাম সংসারে নাকি তার কেউ নেই, মেদিনীপুরে কোন্ গাঁয়ে নাকি বাড়ি বলেছিল।

অতঃপর ভৃত্য গোকুল, ঠাকুর হরিদাস, দারোয়ান রামভজন, দাসী পিয়ারী প্রভৃতিকে দু-চারটে প্রশ্নাদি করে, মৃতদেহ শহর হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে এবং সারদাচরণ সরকারের ঘরে টেবিলের উপর রক্ষিত তখনও অর্ধসমাপ্ত চা সমেত চায়ের কাপটা সঙ্গে নিয়ে বিমল সেন 'সরকার-ভিলা' থেকে বের হয়ে এল।

পথেই বিমলের কাছে থেকে বিদায় নিয়ে সুশান্ত ও বিনয় তাদের বাড়ির দিকে চলে গেল।

উক্ত ঘটনার দিনসাতেক বাদে বিকেলের দিকে সুশান্ত ও বিনয় বেড়াতে বেড়াতে থানায় গিয়ে হাজির হতেই বিমল সাদরে ওদের অভ্যর্থনা জানায়, আয়—বস্!

সুশান্তই চেয়ারে বসতে বসতে প্রশ্ন করে, তারপর, তোর সরকার-ভিলার কেসটা কি দাঁড়াল? সুইসাইড় না হোমিসাইড়?

কে জানে, বুঝতে পারছি না। আজই ওপরওয়ালার কাছে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলাম। বিচিত্র ব্যাপার!

কি রকম!

ময়দা তদন্তের রিপোর্ট বলছে, নিকোটিন পয়েজনিং নাকি মৃত্যুর কারণ—

নিকোটিন!

হ্যাঁ, কিন্তু কোথা থেকে যে ঐ মারাত্মক বিষটি এল কিছু ভেবেই পাচ্ছি না। আর সুইসাইডই যদি হয় তো, ঐ রেয়ার পয়েজনটাই বা সারদাবাবু কোথা থেকে যে যোগাড় করলেন, তাও তো মাথামুণ্ডু কিছু বোধগম্য হচ্ছে না।

তাহলে তোর ধারণা কি কেসটা সত্যি হোমিসাইডই?

হোমিসাইডই যে বলব জোর গলায় তারও তো কোন 'ক্লু' পাচ্ছি না।

মৃত্যু যে সারদাবাবুর নিকোটিন পয়জনিংয়েই হয়েছে স্থিরনিশ্চিত হলি কি করে?

সেই অর্ধসমাপ্ত চায়ের কাপের চা'টা অ্যানালিসিসের জন্য পাঠিয়েছিলাম কলকাতায় কেমিক্যাল এগ্‌জামিনারের কাছে। তার মধ্যে কোন পয়জনের ট্রেসই মেলেনি। অথচ সিভিল সার্জেন বলছেন ময়না তদন্ত করে—এ কেস অফ ডেফিনিট নিকোটিন পয়েজনিং!

তাহলে?

যাক গে, বড়কর্তাদের জানিয়ে দিয়েছি। এখন তাঁদের যা করবার করুন। বড়ঘরের ব্যাপারেই সব আলাদা। বেটা বুড়োর তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, তার পার্সোন্যাল অ্যাটেনডেন্টের খুপসুরৎ চেহারা দেখলেই মাথা ঘুরে যাবার যোগাড়!

বিনয় বললে, বৃন্দাবনবাবুকে আজও তো সকালে সরকার-ভিলার সামনে দেখেছিলাম। ভদ্রলোক এখানেই আছেন বুঝি এখনও?

শুধু তিনি কেন, শকুন্তলা দেবীটিও তো শুনলাম এখনও রয়েছেন এখানেই।

দেখ, বৃন্দাবন আর ঐ শকুন্তলা দেবীরই কাজ হয়তো! সুশান্ত এবারে বলে।

বিচিত্র নয়।

কিন্তু ব্যাপারটা যতই বিচিত্র হোক, স্থানীয় লোকেদের যে সে সম্পর্কে কোন দুশ্চিন্তা আছে সেরকম কিছু মনে হল না।

কারণ ব্যাপারটা যেন ক্রমশঃ ধামাচাপা পড়বারই যোগাড় হয়েছিল।

এমন সময় প্রায় আরও দিন সাতেক অর্থাৎ দুর্ঘটনার পক্ষকাল বাদে সন্ধ্যার সময় বিমলের থানার অফিসঘরের মধ্যেই বসে সুশান্ত, বিনয়, ফ্যাটি গুপ্ত ও বিমল সেন রীতিমত আড্ডার আসর যখন জমিয়ে তুলেছে, তখন বাইরের বারান্দায় অপরিচিত একটা জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

বেশ ভারী জুতোর শব্দ।

পরক্ষণেই ভারী, মোটা অপরিচিত গলা শোনা গেল দরজার ওপাশে, দারোগাবাবু আছেন?

কে? ভেতরে আসুন!

একটু পরেই ভারী জুতোর মশমশ শব্দ তুলে দীর্ঘকায় এক আগন্তুক ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন।

ঘরের মধ্যে টেবিলের উপরে রক্ষিত প্রজ্বলিত টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেরই অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিটা গিয়ে প্রায় যেন একই সঙ্গে আগন্তুকের উপর পড়ল।

আগন্তুক দু হাত তুলে নমস্কার জানালেন, নমস্কার। আমি আসছি সরকার-ভিলা থেকে। আমার নাম মধুসূদন সরকার।

চকিতে সকলের নামটা মনে পড়ে যায় যেন।

মধুসূদন সরকার!

পক্ষকাল আগে সারদাবাবুর মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে ভৃত্য দশরথের মুখেই ঐ নামটি ওরা শুনেছিল।

অতএব নামটা তাদের অপরিচিত নয়—যদিও মানুষটা অপরিচিত।

।। ছয় ।।

মধুসূদন সরকার।

পরিধানে দামী সার্জের মভ্ কলারের লংস।

গায়ে গলাবন্ধ কালো ভেনিসিয়ান সার্জের লম্বা কোট।

পায়ে ডার্বী সু।

চেহারাটা বেশ লম্বা-চওড়া ও বলিষ্ঠ।

মাথার চুল পালিশ করা। রগের দু'পাশে সামান্য পাক ধরেছে চুলে, বয়সের ইঙ্গিত।

মুখে ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি। পাকানো গোঁফ।

ছড়ানো চৌকো চোয়াল। চোখে পুরু লেন্সের কালো সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা।

বসুন, বিমল সেন বললে।

বিশেষ একটা ব্যাপারে সাহায্যপ্রার্থী হয়েই আমি এসেছি দারোগাবাবু।

খালি একটা চেয়ারে বসতে বসতে মধুসূদন সরকার বললেন।

বলুন।

আপনারা হয়তো জানেন না, মৃত সারদা সরকার আমার কাকা ছিলেন। অবিশ্যি কথাটা আপনাদের না জানবারই কথা। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় বছর দশেক আগে আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাই। নানা জায়গায় ঘুরে শেষ দুটো বছর আমি রেঙ্গুনেই ছিলাম। মাত্র পরশু জাহাজ থেকে নেমেছি। সেখানেই আমাদের কলকাতার দোকানের

ম্যানেজার মৃগাঙ্কবাবুর মুখে সব শুনলাম। প্রথমটায় ভেবেছিলাম ব্যাপারটা বুঝি একটা পিওর অ্যাণ্ড সিম্পল সুইসাইডই। কিন্তু আজ সকালে এখানে এসে বৃন্দাবন ও শকুন্তলা দেবীর মুখে সব ব্যাপার আদ্যোপান্ত শুনে মনে হচ্ছে—দেয়ার মাস্ট বি সাম ফাউল প্লে সামহোয়ার। তাই আপনার কাছে সোজা চলে এলাম।

কিন্তু—

শুনুন দারোগাবাবু, কথাটা তাহলে খুলেই বলি, আমি চাই ব্যাপারটার একটি মীমাংসা হোক। কাকা যদি সত্যি-সত্যিই আত্মহত্যা করে থাকেন তো কথাই নেই, তা যদি না হয়, যদি সত্যিই তাঁকে কেউ হত্যা করে থাকে, তাহলে যেমন করেই হোক হত্যা-ব্যাপারটার একটা কিনারা করতে চাই আমরা দু ভাই-ই। একসময় কাকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যতই তিক্ত হোক না কেন, কাকা আমাকে স্নেহ করতেন। এই দীর্ঘ দশটা বছর দূরে থাকলেও, নিজের ব্যবহারের জন্য অনুতাপের আমার অন্ত ছিল না। কতবার মনে হয়েছে ফিরে এসে ক্ষমা চেয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে নেব। হাজার হোক গুরুজন। তাছাড়া আমরাই তো তাঁর সব ছিলাম। বলতে বলতে একটু যেন দম নিয়ে পুনরায় শুরু করলেন, ক্ষমা চাইব বলে কত আশা করে ফিরে এসেছিলাম কিন্তু সে সুযোগটুকুও ভগবান দিলেন না। শেষের দিকে অশ্রুতে কণ্ঠস্বর মধুসূদনের রুদ্ধ হয়ে যায়।

বেশ। কিন্তু—

না না, দারোগাবাবু, এ ব্যাপারে আপনার আমি সাহায্য চাই আর আপনাকে সাহায্য করতেই হবে। এমন কি এই অনুসন্ধানের ব্যাপারে খরচপত্র যাই হোক সব আমি দেব।

উপরওয়ালাকে অবিশ্যি সবই আমি জানিয়েছি—

সে আপনাদের আইনের দিক থেকে যা করবার আপনি করুন। কিন্তু শুধু ঐ আইনের উপরেই নির্ভর করে থাকতে আমি চাই না দারোগাবাবু। বেসরকারী ভাবে অনুসন্ধান করবারও যদি প্রয়োজন হয় তাও আমি করতে প্রস্তুত জানবেন।

বেসরকারী ভাবে তদন্ত?

হ্যাঁ, এদেশে ওসব ব্যাপার নেই বটে, তবে বইতে পড়েছি বিলেতে নাকি আছে। সেই রকম কিছু—

দেখুন মধুসূদনবাবু, এখানে আমি অবিশ্যি তৃতীয় ব্যক্তি—সম্পূর্ণ আউটসাইডার, কথা বললে এবারে সহসা সুশান্ত, কিন্তু ব্যাপারটা আমিও গোড়া থেকে অল্পবিস্তর জানি, তাই যদি একটা কথা বলি অন্যায় ধরবেন না, বিশেষ করে একটু আগে আপনি যা বললেন তার উত্তরে—

নিশ্চয়ই না। কিন্তু আপনি—

বিমলই অতঃপর সকলের পরিচয়টা করিয়ে দিল।

কিন্তু কি যেন বলছিলেন সুশান্তবাবু—

আপনার কাকার মৃত্যুর ব্যাপারটা হত্যাই বা ভাবছেন কেন?

দেখুন সুশান্তবাবু, কাকাকে খুব ভাল করে চিনবারই আমার সৌভাগ্য হয়েছিল দীর্ঘদিন ধরে। তাঁর মত আনস্ক্রুপুলাস, স্বার্থান্ধ, অর্থপিশাচ লোক ভীরুর মত আত্মহত্যা করবে, বিশেষ করে ঐ বয়সে—যখন মান সম্ভ্রম প্রতিপত্তি অর্থ সব তাঁর করায়ত্ত, আর যে-ই বিশ্বাস করুক কথাটা অন্ততঃ আমি করতে রাজী নই।

কথাগুলো বলতে বলতে মধুসূদন সরকার যেন বেশ একটু উত্তেজিতই হয়ে ওঠেন এবং

ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলে বেশ একটু বিস্মিত ভাবেই ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

প্রথম পরিচয়ের মুহূর্তেই স্বর্গগত কাকা সম্পর্কে ভাইপোর শ্রদ্ধাটা যেন একটু বিসদৃশ বলেই ওদের মনে হয়।

কিন্তু মধুসূদনের বক্তব্য যে তখনও শেষ হয়নি পরক্ষণেই বোঝা গেল। কারণ তিনি আবার তখনই বলতে শুরু করেছেন।

আমার কথাগুলো শুনে হয়তো আপনারা সকলেই একটু বিস্মিত হচ্ছেন। কিন্তু আমার একটা কি দোষ জানেন, সত্য চিরদিনই অপ্রিয় এবং যত অপ্রিয়ই হোক না কেন, সত্যভাষণে কখনও আমি পেছপাও হই না। আর স্পষ্টবক্তা ও চিরদিন সত্যাশ্রয়ী বলেই কাকার অপ্রিয়ভাজন আমাকে একদিন হতে হয়েছিল।

কি রকম?

বাবার আকস্মিক মৃত্যুর পর দশ বৎসর আগে কাকা অন্যায়ভাবে আমাদের ঠাকুরদামশাইয়ের এক উইল দেখিয়ে তাঁর সম্পত্তির সমান অংশ থেকে বঞ্চিত করেছিলেন বলেই তার প্রতিবাদে আমার প্রতি তিনি একান্ত বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু যাক সে-সব কথা। অতীত। তাছাড়া নেই কাকাও আজ আর বেঁচে নেই যখন, ঐসব পুরাতন কথা ভেবেও তখন আর কোন লাভ নেই। তবু কাকা আমাদের প্রতি যে ব্যবহারই করে থাকুন না কেন একদা, তাঁর মৃত্যুর ব্যাপারে সাহায্য করতে দারোগাবাবু আপনি যোগ্যতম ব্যক্তি জেনে আপনারই সাহায্যপ্রার্থী হয়ে এসেছি।

আমি আপনাকে একটা উপায় বলে দিতে পারি মিঃ সরকার। সহসা আবার সুশান্তই কথা বললে।

নিশ্চয়ই, বলুন?

আপনি কিরীটী রায়ের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন?

না।

শোনেননি?

না। শুনলেনই তো, দীর্ঘদিন বাইরেই আমার কেটেছে।

আপনি মিঃ রায়ের সাহায্য নিন। আমি হলফ করে বলতে পারি, সত্যিই যদি ব্যাপারটা, আমরা সকলেই যা অনুমান করছি—হত্যাই করা হয়ে থাকে সারদাবাবুকে, তাহলে সে হত্যার পিছনে যে রহস্যই থাকুক না কেন, জানবেন কিরীটী রায়ের সাহায্য নিলে নিশ্চয়ই সেটা আপনি জানতে পারবেন।

কিন্তু তাঁর সঙ্গে তো আমার কোন পরিচয় নেই সুশান্তবাবু, আমার কথায় তিনি কি আসবেন! তাঁর পারিশ্রমিক অবশ্যই যা তিনি চান আমরা দিতে রাজি আছি। মধুসূদন সরকার বললেন।

বেশ, আমি লিখব তাঁকে। সুশান্ত বললে।

অতঃপর সেরাত্রের মত মধুসূদন সরকার সকলের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

সেই রাত্রেই সুশান্ত কিরীটীকে চিঠি দিল।

প্রিয়বরেষু,

নিশ্চয়ই সুশান্ত ঘোষালকে ভুলে যাননি। বৎসরখানেক পূর্বে, মনে আছে বোধ হয় আপনার, সেই চেতলার অবিনাশ মল্লিকের কেসে আপনার সঙ্গে আমার আলাপ হবার সৌভাগ্য হয়েছেল। যাহোক আজ তার চাইতেও বিচিত্র একটা মামলার রহস্য উদঘাটনের

ব্যাপারে স্থানীয় একজন ভদ্রলোক আপনার সাহায্য চান। অবিশ্যি কেবল তিনিই নন—আমি এবং আমার বন্ধু, এখানকার থানা অফিসারও ব্যাপারটার একটা মীমাংসার জন্য ইনটারেস্টেড, তাই এই পত্র আপনাকে দিচ্ছি। কলকাতার বিখ্যাত জুয়েলারী ফার্ম সরকার ব্রাদার্স-এর নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন। তারই মালিক সুবিখ্যাত ধনী প্রৌঢ় সারদাচরণ সরকারকে দিন পনের পূর্বে একদিন সকালে তাঁর শয়নঘরে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়। বিস্তারিত বিবরণ হয়তো সংবাদপত্রেই আপনার নজরে পড়ে থাকবে ইতিমধ্যে। ময়না তদন্তে জানা গিয়েছে—ইট ইজ এ কেস অফ নিকোটিন পয়েজনিং। ব্যাপারটা কিন্তু আমাদের কারোরই সুইসাইড কেস বলে মনে হচ্ছে না, তার কারণ ঐ গৃহে মৃত সারদাচরণের পার্সোন্যাল অ্যাটেনডেন্ট ছিলেন এক তন্বী সুন্দরী শকুন্তলা দেবী, যিনি এখনও সরকার ভিলা ছেড়ে যাননি। এখানে এলে বাকি কথা সব জানতে পারবেন। যদি আসেন তা জানালে স্টেশনে উপস্থিত থাকব।

প্রীত্যর্থী
সুশান্ত ঘোষাল

তিন দিন পরেই চিঠির জবাব এল।

সুভাষণেষু,

কাল সন্ধ্যার গাড়িতে রওনা হচ্ছি। সাক্ষাতে বাকী কথা হবে। স্টেশনে থাকবেন আপনাদের বাসাতেই উঠব। নমস্কার।

ভবদীয়—কিরীটী রায়

সুশান্তর ইচ্ছা ছিল সংবাদটা পাওয়া মাত্রই মধুসূদন সরকারকে জানায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি ভেবে আর জানালো না।

পরের দিন প্রত্যুষেই একেবারে কিরীটীকে সঙ্গে করে নিয়ে সরকার ভিলায় যাবে ঠিক করল।

কলকাতার ট্রেনটা আসে রাত প্রায় সাড়ে নটা নাগাদ।

স্টেশনটি ছোট।

দুধারে বাঁধানো প্ল্যাটফরম্।

একপাশে অ্যাসবেসটাসের সেডের নীচে স্টেশন মাস্টারের ঘর, যাত্রীদের ওয়েটিং রুম ও টিকিট ঘর পাশাপাশি।

নির্দিষ্ট সময়েই কলকাতার ট্রেনটা এসে প্ল্যাটফরমে দাঁড়াল। যাত্রী সামান্যই।

স্টেশনের টিমটিমে কেরোসিনের আলোয় সুশান্ত এদিক-ওদিক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে তাকায়।

কিন্তু আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিটি তার নজরে পড়ে না।

তবে কি মিঃ রায় এলেন না!

সহসা ঐ সময় পশ্চাৎ থেকে মৃদুকণ্ঠের সম্বোধন এল, এক্সকিউস মি, আপনিই বোধ হয় সুশান্তবাবু?

কে? মিঃ রায় নিশ্চয়ই—

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, নিঃসংশয়ে।

পরিধানে ধুতি, গায়ে কালো রংয়ের গ্রেট কোট, চোখে সেই কালো মোটা সেলুলয়েডের ফ্রেমের চশমা।

মুখে পাইপ। সেই পরিচিত চেহারা।

কিন্তু কোন্ কম্পার্টমেন্ট থেকে নামলেন দেখতে পাইনি তো! গার্ডের ভ্যানের লাগোয়া থার্ড ক্লাস ও সেকেণ্ড ক্লাস কামরাগুলোর দিকে চেয়ে দেখে দেখে হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।

চলুন, আপনাদের ডেরা কতদূর এখান থেকে?

তা মাইলখানেক হবে। মেঠো কাঁচা রাস্তা তবে ধুলো তেমন নেই।

তা হোক, খোলা হাওয়ায় তবু তো খানিকটা হাঁটতে হাঁটতে পিওর অক্সিজেন পাওয়া যাবে, শহরে তো সে বালাই আর নেই! খুশিভরা কণ্ঠে কিরীটী বলে।

তা যা বলেছেন।

রাত্রে বাসায় ফিরে আহারাদির পর গল্পে গল্পে সুশান্ত সংক্ষেপে কিরীটীকে সারদাচরণের মৃত্যুর ব্যাপারটা বললে।

কিরীটী পাইপটা মুখে লাগিয়ে সোফার উপর হেলান দিয়ে বসে চোখ বুজে সব শুনে গেল নিঃশব্দে, কোন মন্তব্যই প্রকাশ করল না।

আগাগোড়া সমস্ত কাহিনীটা বিবৃত করার পরও কিরীটীর দিক থেকে কোনরূপ সাড়ামাত্রও না পেয়ে অগত্যা সুশান্তই প্রশ্ন করে, আচ্ছা মিঃ রায়, যা শুনলেন তাকে কি আপনার মনে হয় কেসটা—

কি?

হ্যাঁ, মানে বলছিলাম—সুইসাইডই কিনা?

আপনার কি ধারণা?

আমার তো ধারণা, নট এ কেস অফ সুইসাইড়!

ইউ আর রাইট! তবে—সারদাবাবুর মৃত্যু-সম্পর্কে যতটা শুনলাম তাতে সুইসাইড় যে নয় এটা স্পষ্টই বোঝা যায়। তবে কেস অফ হোমিসাইড় বললেই তো চলবে না —প্রমাণ চাই!

বিমলেরও তাই ধারণা। কিন্তু বৃন্দাবনবাবুর ধারণা, কেসটা সিম্পল সুইসাইড়—

মধুসূদনবাবুরও তাই ধারণা নাকি?

না। আর তাইতেই তো তিনি বিমলের কাছে সাহায্যের জন্য এসেছিলেন এবং তখনই আপনার কথা তাঁকে আমি সাজেস্ট করি।

শকুন্তলা কি বলে?

শকুন্তলা!

হ্যাঁ, আপনার চিঠির মধ্যে বর্ণিত সেই সুন্দরী তন্বীটি?

তা তো জানি না।

জানেন না! এত করে চিঠিতে বর্ণনা দিলেন, তার মনের কথাটাই এখনো জানেন না? তারপর মৃদু হেসে বললে, যাক চলুন তো, আগে কাল একবার সরেজমিন তদন্ত করি। তবে আর একটা কথা, শ্রীমান্ কেতুচরণের অনুসন্ধানটা করা আপনার দারোগা বন্ধুর কিন্তু উচিত ছিল সর্বাগ্রে!

কিন্তু তার তো সেইদিন সকাল থেকে কোন পাত্তাই নেই!

তারপর দশরথ। দশরথের কাছেও হয়তো অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

দশরথ!

হ্যাঁ, কোন ক্লু হয়তো সে আমাদের দিতে পারে। হ্যাঁ ভাল কথা, শকুন্তলা দেবী তো এখন সরকার ভিলাতেই অবস্থান করছেন, তাই না?

হ্যাঁ।

।। ছয় ।।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, দশরথকে আর কোন প্রশ্নাদি করার কিরীটীর কোন সুযোগই হল না পরের দিন।

তার আগেই সে মানুষের সমস্ত প্রশ্নের সর্বপ্রকার নাগালের বাইরে চলে গেল একান্ত আকস্মিক ভাবেই যেন।

অর্থাৎ পরের দিন প্রত্যুষে সরকার ভিলায় যাবার পূর্বে সকলে বসে যখন চা-পান করছে, সংবাদ পাওয়া গেল শ্রীমান দশরথ নিহত।

সংবাদটা শুধু অভাবিতই নয়—আকস্মিক।

শ্রীমান দশরথ নিহত!

থানা থেকে সরকার ভিলা যেতে যে রাস্তাটা তারই মধ্যপথে পড়ে সুশান্তদের বাড়ি 'মণি লজ'।

দশরথের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে সরেজমিন তদন্ত করতে যাবার পথে তাই বিমল সেন সংবাদটা দিতে ঢুকেছিল সুশান্তদের বাড়িতে।

কি ব্যাপার বিমল? সুশান্তই প্রশ্ন করে।

সরকার ভিলায় যে আবার আর একজন খতম হয়েছে!

সে কি?

হ্যাঁ, পুওর শ্রীমান দশরথ দি পুরাতন ভৃত্য! মধুসূদনবাবু সংবাদ পাঠিয়েছেন—তাই সেইখানেই যাচ্ছিলাম। ভাবলাম সংবাদটা তোমাকে দিয়ে যাই। শ্রীমন্তবাবু আগেই রওনা হয়ে গিয়েছেন।

অতঃপর কিরীটীর পরিচয় পেয়ে বিমল বললে, আপনি যখন এসে গিয়েছেন, চলুন না মিঃ রায়—যাবেন নাকি অকুস্থানে?

চলুন, আমরাও তো সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলাম। কিরীটী বলে।

সুশান্ত বলে, বিমল, এক কাপ চা হবে নাকি?

না হে, আগে চল ওখান থেকে একবার ঘুরে আসি। তারপর ফেরবার পথে হবে'খন।

সকলে তখন সরকার ভিলার উদ্দেশ্যে গাত্রোত্থান করল।

সুশান্তদের বাড়ি 'মণি লজ' থেকে সরকার ভিলা খুব দূর নয়।

সামান্যই ব্যবধান।

'মণি লজে'র ছাত থেকে সাদা রঙের সরকার ভিলাটা বেশ পরিষ্কার দেখা যায়।

সরকার ভিলার গেট দিয়ে ঢুকে পারলারের মধ্যে শ্রীমন্ত, মধুসূদন সরকার এবং বৃন্দাবন

সরকার পরস্পরের মধ্যে নিম্নস্বরে কি সব আলোচনা করছেন ওরা দেখল। ওদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে শ্রীমন্ত চৌধুরী বললেন, এই যে স্যার, আপনি এসে গিয়েছেন।

কী ব্যাপার? ডেড বডি দেখলেন? গম্ভীর কণ্ঠে বিমল প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ, দেখলাম। হুবহু এ কেসটা আগের মতই মনে হল। বোধ হয় সেম্ পয়েজনিংও।

সে কি!

হ্যাঁ, দেখবেন চলুন না। সিমিলার সাইন্‌স্, সিম্পটম্‌স্!

সুশান্তই মধুসূদন সরকারের সঙ্গে কিরীটীর আলাপটা করিয়ে দিল।

মধুসূদন যেন কিরীটীকে দেখে বেশ খুশীই হলেন বলে মনে হল।

বৃন্দাবন সরকারের দিক থেকে কিন্তু বিশেষ কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কিরীটী বললে চলুন তাহলে ডেড বডিটা একবার দেখে আসা যাক। মিঃ সেন কি বলেন?

হ্যাঁ, চলুন।

সকলে উঠে দাঁড়াল।

নিচের তলাতেই পূবের একখানি ঘর।

দশরথ একা একা থাকত। ঠাকুর ও অন্যান্য ভৃত্যদের সঙ্গে ভৃত্যদের মহলে সে থাকত না।

পুরাতন ভৃত্য হিসাবে তার বোধ হয় ঐ স্বাতন্ত্র্যটুকু ছিল।

ঘরখানি আকারে ছোটই।

ঘরের দরজাটা ভেজানো ছিল।

সর্বাগ্রে বিমল ও তার পশ্চাতে শ্রীমন্ত চৌধুরী, সুশান্ত, কিরীটী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

মধুসূদন ও বৃন্দাবন সরকার ওদের সঙ্গে আসেননি।

ঘরের দক্ষিণ ও পশ্চিমমুখী দুটি জানলা। দুটি জানলাই খোলা ছিল।

প্রচুর আলো ঘরের মধ্যে।

একপাশে একটা কাঠের তক্তপোশ।

তার উপরে মলিন একটা শয্যা এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে এবং তার ঠিক নিচেই মেঝেতে নিস্প্রাণ দশরথের দেহটা উবুড় হয়ে পড়ে আছে।

মৃতদেহের মুখের পেশীতে পেশীতে যেন একটা যন্ত্রণার বিকৃতি এবং বিস্ফারিত ওষ্ঠের ফাঁক দিয়ে গ্যাঁজলা গড়াচ্ছে তখনও।

পরিধানে একটি মলিন ধুতি ও গায়ে একটা শতছিদ্র মলিন গেঞ্জি।

মৃতের পাশেই একটা কাঁসার গ্লাস উল্‌টে পড়ে আছে এবং ঘরের সেইখানকার মেঝেটা জলে ভিজা।

বোঝা গেল গ্লাস থেকে জল সেখানে পড়েছিল, এখনও শুকায়নি।

কয়েকটা স্তব্ধ মুহূর্ত ভূপতিত নিস্প্রাণ দশরথের দেহটার দিকে তাকিয়ে থেকে কিরীটী ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করল নিঃশব্দে একবার।

ঘরের মধ্যে বিশেষ কোন জিনিসপত্র নেই।

এককোণে একটা টিনের তোরঙ্গ, তার গায়ে একটা মিলারের চ্যাপ্টা তালা ঝুলছে, তার পাশেই ছোট একটা জলচৌকি মত, সেটার উপরে একটা ছোট মেজার গ্লাস ও তার পাশে একটা ঔষধের শিশি।

ঘরের এককোণে পেরেকের সাহায্যে দেওয়ালে একটা দড়ি টাঙানো—তার উপর কয়েকটা

ধুতি, গোটা দুই জামা ও একটা আলোয়ান ঝুলছে।

আর দেওয়ালে পেরেকের মাথায় ঝোলানো একটা পুরাতন ছাতা।

কিরীটী নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে চৌকিটার উপর থেকে ঔষধের শিশিটা তুলে নিল।

শিশিটা কালো রঙের, বেঁটে ও গোল।

গায়ে ইউনিয়ন ড্রাগের পেটেন্ট হজমের ঔষধ ডায়াপেপসিনের একটা লেবেল আঁটা।

কিরীটী শিশিটা হাতে তুলে নিল।

শ্রীমন্ত চৌধুরী কিরীটীর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল, সে বললে, গোকুল বলে যে চাকরটি এ বাড়িতে কাজ করে তার মুখেই শুনেছিলাম, দশরথের নাকি হজমের গোলমাল ছিল, তাই অনেক দিন থেকেই ঐ ঔষধটা ও খেতো ডাক্তারের নির্দেশে।

কিরীটী অতঃপর শিশিটা চৌকির উপর নামিয়ে রাখতে রাখতে মৃদুকণ্ঠে কতকটা যেন আত্মগত ভাবেই হললে, হুঁ, একজনের হার্টের ছিল প্যালপিটেশন ও ইনসমনিয়া, অন্যজনের ডিসপেপসিয়া। একজনের কোরামিন ও লুমিনল, অন্যজনের ডায়াপেপসিন। হত্যাকারীর রাস্তাটা বেশ পরিষ্কারই ছিল দেখছি।

কি বললেন মিঃ রায়? প্রশ্ন করে বিমলই।

না, বলছিলাম, দুটো ঘটনা যদি হত্যাই হয়ে থাকে তো হত্যাকারী হার্টের প্যালপিটেশন এবং ইনসমনিয়া ও ডিসপেপসিয়া সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিল।

তাহলে আপনার ধারণা মিঃ রায়, দুটো ব্যাপারই হত্যা?

আগে সন্দেহ থাকলেও, দশরথের মৃত্যুর পর আর নেই মিঃ সেন। হ্যাঁ, দুটোই হত্যা। প্রথমটার মোটিভ যাই থাকুক না কেন, দ্বিতীয়টির মোটিভ বোঝা যাচ্ছে—প্রথমটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু যাক সে কথা, এখানে এ ঘরে আমার যা দেখবার ছিল দেখা হয়ে গিয়েছে। চলুন সারদাবাবুর লাইব্রেরী ঘরে যাওয়া যাক এবার।

।। সাত ।।

সকলে এসে লাইব্রেরী ঘরে প্রবেশ করল।

মধুসূদন ও বৃন্দাবন সরকার দুই ভাই দুটো চেয়ারে পাশাপাশি বসেছিলেন, ওদের পদশব্দে মুখ তুলে তাকালেন দুজনেই একসঙ্গে।

দেখলেন বিমলবাবু? প্রশ্নটা করলেন মধুসূদনই।

হ্যাঁ।

বৃন্দাবনবাবু মধুসূদনবাবু, মিঃ রায়কে তাহলে আপনারা এই ব্যাপারের মীমাংসা করতে—

সুশান্তর কথাটা শেষ হল না, মধুসূদন সরকার বলে উঠলেন, নিশ্চয়ই। উনি যদি এ ব্যাপারের মীমাংসার ভারটা দয়া করে হাতে নেন, তাহলে আমরা সত্যিই ওঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব, কি বল বৃন্দাবন?

নিশ্চয়ই। আমার তো হাত-পা পেটে সেঁধিয়ে যাবার যোগাড় হয়েছে—পনের দিনের মধ্যে দু-দুটো মৃত্যু। আত্মহত্যাই হোক বা হত্যাই হোক, এর একটা বিহিত করা একান্ত প্রয়োজন

বইকি। সমর্থন জানালেন ছোট ভাই বৃন্দাবন সরকার।

এবারে কথা বললে কিরীটী ওঁদের দুই ভাইকেই লক্ষ্য করে, দেখুন আপনাদের ঐ ভৃত্য দশরথের মৃত্যুর ব্যাপারটা যে সুইসাইড নয় সে বিষয়ে আমি হলফ করে বলতে পারি, আর ঐভাবে দশরথের হত্যার ব্যাপারটা থেকে আমার মনে হচ্ছে, আপনাদের কাকামশাইয়ের মৃত্যুর ব্যাপারটাও সুইসাইড নয়—হোমিসাইডই—হত্যা!

মিঃ রায়,—বৃন্দাবন সরকার যেন কি বলবার চেষ্টা করেন কিন্তু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে আবার কিরীটী বলে, হ্যাঁ মিঃ সরকার, আপনার কাকামশাইকেও—হ্যাঁ, সামবডি ডেলিবারেটলি কিল্ড্ হিম, নো ডাউট অফ্ ইট—

বৃন্দাবনবাবু এবারেও কিছু বুঝি বলবার জন্য উদ্যত হয়েছিলেন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় কিরীটীকে সমর্থন জানালেন এবারে মধুসূদন সরকার এবং বললেন, কেমন বৃন্দাবন, আমি সেদিন সব ব্যাপারটা শোনার পরই তোমাকে বলিনি! কোন্ দুঃখে আর কেনই বা আফটার অল কাকা অমনি করে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে যাবে! নিশ্চয়ই কেউ না কেউ তাকে হত্যা করেছে।

কিন্তু দাদা, এ যে কেবল অসম্ভবই নয়—অবিশ্বাস্যও! বৃন্দাবন সরকার বললেন।

সে তুমি যাই বল বৃন্দাবন, ইট ইজ দি ফ্যাক্ট!

বুঝলাম কিন্তু তাই যদি হয় তো কে তাকে হত্যা করবে আর কেনই বা তাকে আফটার অল হত্যা করতে যাবে বলতে পার দাদা? বৃন্দাবন সরকার আবার তাঁর জ্যেষ্ঠকে প্রশ্ন করেন।

তা কি করে বলব? তবে সহজ বিচার-বুদ্ধিতে এক্ষেত্রে যা মনে হচ্ছে তাই বলছি।

বেশ, তাহলে বলতে হয় বাইরে থেকেই কেউ না কেউ এসে সেরাত্রে তার ঘরে ঢুকে তাকে অমন করে হত্যা করে গিয়েছে!

আমার মনে হয় তা নয় বৃন্দাবনবাবু। প্রতিবাদ জানায় এবারে কিরীটী।

তা নয়?

না। সেরাত্রে যারা এ বাড়িতে ছিল তাদেরই মধ্যে নিশ্চয়ই, আমার বিশ্বাস, কেউ না কেউ তাঁকে হত্যা করেছিল। শুধু তাই নয়, হত্যাকারী বুদ্ধিমান বিচক্ষণ ও বেশ কিছু জ্ঞানগম্যিও তার ছিল। কিরীটী আবার বলে।

এ আপনি কি অসম্ভব কথা বলছেন মিঃ রায়। আবার প্রতিবাদ জানান বৃন্দাবন সরকার, সেরাত্রে এ বাড়িতে তো থাকার মধ্যে ছিলাম আমি, শকুন্তলা দেবী আর ছিল দশরথ, গোকুল, ঝি পেয়ারী, ঠাকুর হরিদাস, দারোয়ান রামভজন। এদের কি স্বার্থ থাকতে পারে কাকাকে হত্যা করার বলতে পারেন?

স্বার্থের কথা যদি বলেন বৃন্দাবনবাবু, কিরীটী বলে, তো অত জোরগলায় একেবারে ডেফিনিটলি কিছুই হলফ করে বলা যায় না। কারণ কিসে যে কার স্বার্থ থাকতে পারে আর কিসে যে কার স্বার্থ থাকতে পারে না, তা কি সর্বদা সকলের পক্ষে জানা সম্ভব! তাছাড়া বৃন্দাবনবাবু, একটু আগে যে লিস্ট বললেন, তার মধ্যে একজন কিন্তু বাদ গিয়েছে!

বাদ গিয়েছে? বৃন্দাবন শুধান।

হ্যাঁ, কেতু না রাহু কে একজন আপনার কাকার নতুন বেয়ারা নিযুক্ত হয়েছিল তাঁর মৃত্যুর মাত্র দিন পনের আগে এবং যাকে ঘটনার দিন সকাল থেকেই আর ট্রেস করা আজ পর্যন্ত যায়নি—তাই না বিমলবাবু?

হ্যাঁ। বিমল সমর্থন জানায়।

কেতু-রাহু, কি ব্যাপার বৃন্দাবন? প্রশ্নটা এবারে করলেন মধুসূদনই তাঁর ভাইকে।

হ্যাঁ শুনেছি বটে, কেতু নামে একটা নতুন লোককে কিছুদিন আগে রাখা হয়েছিল, কিন্তু লোকটাকে বিশেষ তেমন আমিও দেখিনি দাদা।

আই সি! তা লোকটা বুঝি উধাও?

হ্যাঁ। তবে তার যথাসম্ভব ডেসক্রিপশন দিয়ে প্রায় সর্বত্রই পুলিস স্টেশনে স্টেশনে ইনফরমেশন পাঠিয়ে দিয়েছি ঐদিনই। বাছাধন যাবেন কোথায়! বললে বিমল কতকটা যেন আত্মপ্রত্যয়ের কণ্ঠে ঐসময়।

তা এতগুলো লোক তো বাড়িতে রয়েছে, আবার একজন নতুন লোকই বা আমদানি করবার কি প্রয়োজন হয়েছিল, বিশেষ করে অজ্ঞাতকুলশীল? কথাটা বললেন মধুসূদন সরকার।

দশরথ বুড়ো হয়ে গিয়েছে, কাকার দেখাশুনা তেমন আর করে উঠতে পারছিল না, তাই নাকি লোকটাকে কাজে বহাল করা হয়েছিল। শকুন্তলা দেবী কথাটা আমাকে বলেছিলেন। মধুসূদন সরকারের প্রশ্নের জবাব দিলেন বৃন্দাবনবাবু।

কাকা এত বড় কাঁচা কাজটা কি করে যে করলেন বুঝলাম না! অজ্ঞাতকুলশীল একটা লোককে হুট করে কি করে যে তিনি এ বাড়ির কাজে বহাল করলেন, বিশেষ করে তাঁর মত একজন সতর্ক ও বিচক্ষণ প্রকৃতির লোক, এখনও বুঝে উঠতে পারছি না। মধুসূদন আবার মৃদুকণ্ঠে কথাটা বললেন।

কিন্তু সে যাই হোক মধুসূদনবাবু, লোকটা দুর্ঘটনার সময় এ বাড়িতে উপস্থিত ছিল যখন, তখন সন্দেহের তালিকায় সেই কেতুকেও আমাদের ধরতে হবে। বললে কিরীটী।

ধরাধরি আর কি মিঃ রায়, এ তো অত্যন্ত সহজ ব্যাপার! আপনার কথা যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়, তাহলে সবচাইতে বেশী সন্দেহ তো ঐ লোকটার উপরেই পড়ে! বললেন মধুসূদন।

তারপরই একটু থেমে আবার মৃদুকণ্ঠে বললেন, কিন্তু বর্তমানে তো সে হাতের কাছে আমাদের নেই—

মধুসূদনের কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে কিরীটী বললে, না থাকলেও আমাদের তদন্তের ব্যাপারে অগ্রসর হতে বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না মিঃ সরকার। কারণ আপাতত যাঁরা আমাদের চোখের সামনেই আছেন বা আছে, তাঁদের সম্পর্কেই তো আমরা এখনো সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল হতে পারিনি! কিন্তু তারও পূর্বে আমি একটা বিষয়, মধুসূদনবাবু ও বৃন্দাবনবাবু, আপনাদের কাছে জানতে চাই—

বলুন! দুজনেই তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

সারদাবাবু,—আপনাদের কাকা কোনরকম উইল কিছু করে গিয়েছেন কিনা জানেন?

উইল!

হ্যাঁ, মধুসূদনবাবু। কারণ শুনেছি আপনাদের সরকার জুয়েলারী বিরাট একটা লাভজনক প্রতিষ্ঠান। এত বড় সম্পত্তির একটা কিছু বিলি-ব্যবস্থা ভবিষ্যতের জন্যে ভেবে নিশ্চয় তিনি করে রেখেছিলেন, স্বাভাবিক বলেই মনে হয় না কি! কিরীটী বললে ওঁদের দিকে তাকিয়ে।

তা তো নিশ্চয়ই। তবে আমি তো এখানে দীর্ঘদিন ছিলাম না, কাকার সঙ্গে কোন চিঠিপত্রের যোগাযোগও ছিল না—বৃন্দাবনই কাকার কাছে ছিল। সেরকম কিছু থাকলে ও-ই হয়ত ভাল বলতে পারবে। বললেন মধুসূদন সরকার ভাইয়ের দিকে চেয়ে।

আমিও সঠিক কিছু বলতে পারব না বর্তমানে মিঃ রায়, এসব ব্যাপার জানেন সব কিছুই হয়তো আমাদের সলিসিটার বোস ও চৌধুরী ফার্মের মিঃ শচীবিলাস বোস। তিনিই আমাদের লিগ্যাল অ্যাডভাইসার ছিলেন। কিন্তু কাকার মৃত্যুর পর থেকে আর তো ইতিমধ্যে আমি কলকাতাতেই যাইনি—তাঁর সঙ্গে এর মধ্যে দেখাসাক্ষাৎও হয়নি।

আপনার কাকার মুখেও কখনও কি ঐ সম্পর্কে কিছু শোনেননি বৃন্দাবনবাবু?

না, প্রয়োজন হয়নি। তাছাড়া বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে কাকা কখনও কিছু আলোচনা পছন্দ করতেন না।

কিন্তু মানুষের একটা কৌতূহলও তো হয় বৃন্দাবনবাবু!

তা হয়তো হয়, কিন্তু আমার বেলায় তো তার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ কাকার তো কোন সন্তানাদি ছিল না—যা কিছু সব তো আমরাই পাব জানতাম।

কিন্তু মানুষের মনের কথা তো কিছু বলা যায় না বৃন্দাবনবাবু! কিরীটী আবার বলে।

তা হয়তো যায় না, তবে কাকার দিক থেকে সেরকম কিছু ঘটবার সম্ভাবনা হলে অন্তত আমি জানতে পারতাম বৈকি!

ইতিমধ্যে একসময় বিমল সেন ঘর থেকে বের হয়ে গিয়েছিল দশরথের মৃতদেহটা ময়না তদন্তের জন্য পাঠাবার ব্যবস্থা করতে।

সত্যি কথা বলতে কি, থানা অফিসার বিমল সেন দশরথের মৃত্যুর ব্যাপারে বেশ একটু বিচলিতই হয়ে পড়েছিল।

ঘটনার পরিস্থিতিতে এখন মনে হচ্ছে তারও যে সারদা সরকার ও দশরথের মৃত্যুর ব্যাপার দুটো সাধারণ আত্মহত্যা নয়—দুটোই হত্যা!

দুজনকেই হত্যা করা হয়েছে!

আর ব্যাপারটা রীতিমত জটিলই বলে তার এখন মনে হচ্ছে।

বিমল সেন যখন পুনরায় ঘরের মধ্যে ফিরে এল, কিরীটী তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সমস্ত বাড়িটা একবার ঘুরে দেখলে কেমন হত বিমলবাবু?

বেশ তো, দেখুন না!

।। আট ।।

যে লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে সকলে তখন উপস্থিত ছিল, সেই ঘরেরই পশ্চিম কোণে একটা বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে বৃন্দাবনবাবুর দিকে সহসা চোখের ইঙ্গিত করে কিরীটী প্রশ্ন করল একসময়, ঘরের ঐ দরজাটা কিসের বৃন্দাবনবাবু? ঐ দরজা-পথে কোথায় যাওয়া যায়?

এই ঘরের সঙ্গেই ছোট একটা অ্যান্টিরুম মত আছে। সেই অ্যান্টিরুমে যাবারই দরজা ওটা। মধুসূদন সরকারই কথাটার জবাব দিলেন।

আই সি! ওটা কি ব্যবহৃত হত?

কাকাই ওটা ব্যবহার করতেন। এবার জবাব দিলেন বৃন্দাবনবাবু।

সারদাবাবু!

হ্যাঁ। কাকার বাগান ও ফুলগাছের—বিশেষ করে নানাজাতীয় গোলাপের খুব শখ ছিল। ঐ ঘরটার মধ্যে সেই সব গোলাপ গাছে কি সব সার-টার কাকার থাকত।

কৌতূহলী কিরীটী আর দ্বিতীয় প্রশ্ন না করে নিঃশব্দে সেই অ্যান্টিরুমের দরজার দিকে এবার এগিয়ে গেল সোফা থেকে উঠে।

ঘরের দরজা বরাবর গিয়েছে কিরীটী, সহসা পশ্চাৎ দিক থেকে বিমল সেন বলল, মিঃ রায়, আপনার যদি আপত্তি না থাকে তো আমি থানায় এবারে ফিরে যেতে চাই। সেখানে আমার অনেক কাজ জমা হয়ে আছে।

নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।

সন্ধ্যাবেলা ওদিকে আসবেন নাকি?

যাব।

তাহলে একটু না হয় বেলাবেলিই আসবেন, ওখানেই চা খাবেন। বিমল সেন বলে।

বেশ তো।

সুশান্ত, তাহলে কিরীটীবাবুকে আমার ওখানে নিয়ে এস।

যাব। সুশান্ত বললে।

বিমল সেন অতঃপর ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী এবারে বন্ধ দরজাটা ঠেলে অ্যান্টিরুমের মধ্যে প্রবেশ করল।

সুশান্তও তাকে অনুসরণ করল।

বাকি সব লাইব্রেরী ঘরের মধ্যেই দাঁড়িয়ে রইল।

অ্যান্টিরুমটা আকারে একেবারে খুব ছোটি নয়।

লম্বায় প্রায় আট ফুট ও পাশে চার ফুট। এবং ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করে পূর্বদিকের জানলাটা খুলে দিতেই পর্যাপ্ত আলোয় ঘরটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

সেই সঙ্গে কিরীটীর অনুসন্ধানী ও সজাগ দৃষ্টির সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে সমগ্র ঘরের পরিবেশটা।

একটি দেওয়াল-সংলগ্ন কাচের দেওয়াল-আলমারি। ঘরের মধ্যে তার সামনে একটি লম্বা ধরনের উঁচু টেবিল।

টেবিলের সামনে একটা বসবার টুল। টেবিলটার উপরে ওয়েয়িং অ্যাপারেটাস, ফানেল, র‍্যাকে টেস্ট-টিউব, স্পিরিট ল্যাম্প ইত্যাদি নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক টুকিটাকি যন্ত্রপাতি রয়েছে দেখা গেল।

কাচের আলমারির মধ্যে নানা আকারের বেঁটে, গোল, মোটা, লম্বা অনেকগুলো শিশি সাজানো।

তার মধ্যে কোনটায় তরল পদার্থ, কোনটায় চূর্ণ প্রভৃতি নানাজাতীয় দ্রব্য দেখা যাচ্ছে।

ঘরের চারিদিকে আর একবার দৃষ্টিপাত করে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে এবার দেওয়াল-আলমারির পিতলের কড়া লাগানো পাল্লাটা টানতেই পাল্লা দুটো খুলে গেল।

সামনেই একটা বড় বোতল নজরে পড়ে কিরীটীর।

কালো রঙের বোতলটা। বোতলের গায়ে লেবেল আঁটা। এবং লেবেলের গায়ে বড় বড় অক্ষরে ইংরাজীতে লেখা—"রোজ স্প্রেয়িং সলুশন"।

কি খেয়াল হল কিরীটীর, বোতলটা একবার হাতে তুলে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখলো।

তার পাশেই আর একটা বোতলে সাদা চূর্ণ ভর্তি। তার গায়ে লেখা আছে "বোন্ মিল"। অর্থাৎ হাড়ের গুঁড়ো। সে বোতলটাও একবার নেড়েচেড়ে দেখে রেখে দিল কিরীটী যথাস্থানে।

তার পাশের শিশিটার গায়ে "অ্যামোনিয়াম সালফেট" লেবেল আঁটা।

সহসা ঐসময় পশ্চাতে বৃন্দাবন সরকারের কণ্ঠস্বর শুনে ফিরে তাকালো কিরীটী তাঁর দিকে।

এই ঘরটা কাকার নিজস্ব ল্যাবরেটোরী ছিল। বৃন্দাবন সরকার বললেন।

ল্যাবরেটোরী!

হ্যাঁ, ঐরকমই খানিকটা। এ বাড়ির পিছনে মস্ত বড় একটা নিজের হাতে তৈরী ফুলের বাগান আছে মিঃ রায়, আপনি দেখেননি। আর ঐ বাগানে বেশীর ভাগই হচ্ছে নানাজাতীয় গোলাপের গাছ। অনেক টাকা খরচ করে দেশ-দেশান্তর থেকে নানা জাতের গোলাপ গাছ বহুদিন ধরে সংগ্রহ করে ঐ বাগানে লাগিয়েছিলেন।

হুঁ। তাহলে দেখছি আপনার কাকা সারদাবাবুর গোলাপ গাছের একটা রীতিমত নেশা ছিল বলুন? কিরীটী মৃদু হেসে বললে।

হ্যাঁ, ঐ একটি ও বই পড়া—এ দুটি নেশাই তাঁর ছিল। তার মধ্যে আবার গোলাপ গাছের নেশাটা ছিল একটু বেশী। নানা বই পড়ে পড়ে নানা ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য দিয়ে, নিজেই তাঁর এই ল্যাবরেটোরী ঘরে বসে, গোলাপ গাছের সার তৈরী করে সেই সব সার তাঁর সব গাছের গোড়ায় দিতেন।

কিরীটি মৃদুকণ্ঠে বলে, তাই দেখছি, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সার তৈরী করে তিনি কাজে লাগাতেন। হ্যাঁ ভাল কথা বৃন্দাবনবাবু, আপনার কাকা লেখাপড়া কতদূর করেছিলেন?

ইণ্টারমিডিয়েট সায়েন্স।

অতঃপর কিরীটী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, চলুন এ ঘরটা আমার দেখা হয়ে গিয়েছে।

পুনরায় হলঘরেই অর্থাৎ পূর্বেকার লাইব্রেরী ঘরেই সকলে ফিরে এল।

মধুসূদন সরকার ঐসময় লাইব্রেরী ঘরে ছিলেন না।

বৃন্দাবনবাবুর দিকে তাকিয়েই কিরীটী বললে, শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই যে বৃন্দাবনবাবু, তিনি তো শুনেছি এখানেই আছেন!

হ্যাঁ, তবে কাকার মৃত্যুর পর থেকে তিনি ঘর থেকে বড় একটা বেরও হন না, কারও সঙ্গে কথাবার্তাও বলেন না। ডেকে পাঠাব কি এ ঘরে?

কোন্ ঘরে আছেন তিনি?

এ ঘরেরই পাশের ঘরে তিনি থাকেন।

বেশ, একটিবার খবর পাঠান যে আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই, তাঁর অসুবিধা না হলে।

বৃন্দাবন সরকার ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

মিনিট দশেকের মধ্যেই বৃন্দাবন সরকার ফিরে এলেন, চলুন মিঃ রায়!

কিরীটী ঐসময় দাঁড়িয়ে খোলা জানলার সামনে বাইরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে পাইপ টানছিল, বৃন্দাবন সরকারের ডাকে ফিরে তাকালো।

তাঁর ঘরেই তিনি আছেন, সেখানেই চলুন।

চলুন। বলে এগিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ থেমে বৃন্দাবন সরকারের দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, একটি কথা বৃন্দাবনবাবু—

বলুন?

ওঁর সঙ্গে যখন আমি কথা বলব, তখন একমাত্র সুশান্তবাবু ছাড়া সেখানে অন্য কেউ

থাকেন আমার ইচ্ছা নয়।

মুহূর্তকাল বৃন্দাবন সরকার চুপ করে রইলেন। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললেন, বেশ তাই হবে, তবে একটা রিকোয়েস্ট জানাব আপনাকে।

নিশ্চয়ই, বলুন!

কাকার মৃত্যুতে উনি বড় শক পেয়েছেন, সেই কারণেই আজ পর্যন্ত ওঁকে আমরা কেউই এখান থেকে যাবার কথা পর্যন্ত বলিনি...

ও!

হ্যাঁ, উনি নিজে থেকে যেদিন যাবেন যাবেন—তাই বলছিলাম এমন কোন কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করবেন না যাতে করে উনি মনে ব্যথা পান বা ওঁর কোনরূপ বিরক্তির কারণ ঘটে।

মুহূর্তকাল বৃন্দাবন সরকারের মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে মৃদকণ্ঠে কিরীটী বললে, তাই হবে। চলুন।

।। নয় ।।

লাইব্রেরী ঘর থেকে বের হয়ে তারই লাগোয়া ঘরটির পর্দা-ফেলা-দরজার সামনে এসে সকলে দাঁড়াল।

চলুন। বৃন্দাবনবাবুই সর্বাগ্রে দরজার পর্দাটা হাত দিয়ে সরিয়ে ওঁদের আহ্বান জানালেন ভিতরে প্রবেশের।

প্রথমে বৃন্দাবনবাবু ও তাঁর পশ্চাতে কিরীটী ও সর্বশেষে সুশান্ত ঘরের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করে।

মাঝারি আকারের ঘরটি।

ঝকঝকে মোজেইক টাইলের ঠাণ্ডা মেঝে।

ঘরের একটিমাত্র জানলা খোলা ছিল, তবে জানলার পর্দা টেনে রাখার জন্য ঘরের মধ্যে দিনের বেলাতেও পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ করতে পারেনি।

ঘরের একধারে একটি সিংগল খাটের উপরে বেড়কভারে ঢাকা শয্যা।

অন্যদিকে একটি প্রমাণসাইজের আরশি-বসানো আলমারি। তার পাশে বড় একটি কালো ট্রাঙ্ক ও তার ওপরে একটি চামড়ার সুটকেস।

ঘরের অন্য কোণে ত্রিপয়ের উপরে সুদৃশ্য একটি টাইমপিস ও তার পাশে কারুকার্যখচিত একটি জয়পুরী ফ্লাওয়ার ভাসে একগুচ্ছ টাটকা বড় বড় ব্ল্যাকপ্রিন্স গোলাপফুল।

ফ্লাওয়ার ভাসটার সামনেই ধূপদানিতে প্রজ্বলিত একটি মোটা ধূপকাঠি।

গোলাপের ও চন্দন ধূপের সুমিষ্ট মিশ্র গন্ধ ঘরে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই কিরীটীকে আকৃষ্ট করেছিল।

আলমারিটার পাশেই আলনায় কয়েকখানি শাড়ি পাট করে রাখা।

ঘরের পশ্চিম কোণে একটি গোল টেবিলের চারপাশে খানতিনেক সোফা। তারই একটায় দরজার দিকে পিছন ফিরে বোধ হয় শকুন্তলা দেবী বসেছিলেন।

কারণ ঘরে ঢুকে তাঁকে না দেখা গেলেও তাঁর মাথার কালো কেশ কিরীটীর চোখে পড়েছিল।

শকুন্তলা, মিঃ রায় এসেছেন!

বৃন্দাবনবাবুর গলার সাড়া পেয়ে শকুন্তলা উঠে দাঁড়াল সোফা থেকে।

ঈষৎ হরিদ্রাভ গাত্রবর্ণ।

লম্বায় পাঁচ ফুটের একটু বোধ হয় কমই হবে শকুন্তলা।

মুখখানা মঙ্গোলিয়ান টাইপের হলেও এবং ছোট চোখ ও নাকটা একটু চাপা হলেও মুখখানির মধ্যে চমৎকার আলগা একটি শ্রী আছে।

পরিধানে জরিপাড় ঈষৎ নীলাভ একটি তাঁতের দামী শাড়ি।

মাথায় পর্যাপ্ত কেশ। এলোমেলো হয়ে রয়েছে।

হাতে দু'গাছি করে সোনার চুড়ি।

কানে নীলার টাব।

পায়ে চপ্পল।

না, না—আপনাকে উঠতে হবে না শকুন্তলা দেবী, আপনি বসুন বসুন—কিরীটী তাড়াতাড়ি বলে।

শকুন্তলা দ্বিরুক্তি না করে কিরীটীর অনুরোধে যে সোফাটার উপর বসেছিল, সেই সোফাতেই পুনরায় বসে পড়ল।

তাহলে আপনি কথা বলুন ওঁর সঙ্গে মিঃ রায়। আমি লাইব্রেরী ঘরে আছি। বৃন্দাবন সরকার ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

কিরীটী আর সুশান্ত দুজনে অন্য দুটি খালি সোফায় পাশাপাশি বসল।

আপনাকে বিরক্ত করার জন্য আমি দুঃখিত শকুন্তলা দেবী, তবে বেশীক্ষণ আপনাকে বিরক্ত আমি করব না। দু'চারটে কথা আপনাকে আমার জিজ্ঞাস্য আছে মাত্র।

শকুন্তলা কিরীটীর কথায় বারেকের জন্য মুখ তুলে তাকিয়ে দেখল নিঃশব্দে, পুনরায় নিঃশব্দেই মুখটা নামিয়ে নিল।

আমার পরিচয়টা সর্বাগ্রে আপনাকে বোধ হয় দেওয়া কর্তব্য মিস ত্রিবেদী। কিরীটী বললে।

বৃন্দাবনবাবুর মুখেই শুনলাম, আপনি মিঃ সরকারের হত্যারহস্যের তদন্তের জন্যই এসেছেন!

ও, তাহলে বোধ হয় আমার বক্তব্য আমি শুরু করতে পারি?

বলুন, কি জানতে চান?

সহজ সতেজ কণ্ঠস্বর শকুন্তলার।

সারদাবাবুকে নিয়মিত বই পড়ে শোনানো ও তাঁর লেখাপড়ার টুকটাক কাজগুলো করে দেবার জন্যই তো আপনি নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাই না? কিরীটী এবার প্রশ্ন শুরু করে।

হ্যাঁ।

আচ্ছা, সারদাবাবুর মেজাজ কি রকম ছিল শকুন্তলা দেবী?

খুব ঠাণ্ডা ও ধীর মেজাজ ছিল তাঁর, ক্বচিৎ কখনো হয়তো রেগে উঠতেন—

নিজের মতের সঙ্গে না মিললেই, এই তো?

হ্যাঁ।

আপনি তো এখানে প্রায় মাস আষ্টেক আছেন, তাই না?

হ্যাঁ।

এই সময়ের মধ্যে বৃন্দাবনবাবু এখানে কি রকম আসা-যাওয়া করতেন?

হপ্তায় দুবার বা মাঝে মাঝে তিনবারও এসেছেন।

এই ক'মাসে আপনার তাঁর সঙ্গে নিশ্চয়ই বেশ আলাপ হয়েছে! কথাটা বলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটী শকুন্তলার মুখের দিকে তাকায়।

কেন বলুন তো মিঃ রায়? আপনার জিজ্ঞাস্যটা ঠিক কি জানতে পারি কি? পাল্টা প্রশ্ন করে শকুন্তলা ভ্রূ উত্তোলিত করে তাকালো কিরীটীর মুখের দিকে সুস্পষ্ট দৃষ্টিতে প্রায় যেন সঙ্গে সঙ্গেই।

না, না—আপনি অন্য রকম কিছু ভাববেন না শকুন্তলা দেবী, বৃন্দাবনবাবু সম্পর্কে আপনার ধারণাটাই জিজ্ঞাস্য শুধু।

ওঃ! তা ভদ্রলোক পারফেক্ট জেন্‌টেলম্যান বলেই তো আমার মনে হয়।

আর মধুসূদনবাবু?

কিরীটীর শেষের কথায় চমকে যেন শকুন্তলা দেবী তাকালো তার মুখের দিকে মুহূর্তের জন্য। এবং ক্ষণেকের সেই চমকটা কিরীটীর দৃষ্টিকে তো এড়ায়নিই, সুশান্তর দৃষ্টিকেও ফাঁকি দিতে পারে না।

কিন্তু সে মুহূর্তের জন্যই। পরক্ষণেই শান্ত স্থির দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলে, I am sorry ! ভদ্রলোকের সঙ্গে বিশেষ কোন আলাপের এখনও কোন সুযোগই আমার হয়নি। কাজেই তার সম্পর্কে কোন কথা আমি বলতে পারবও না।

প্রত্যুত্তরে কিরীটী কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

তারপর আবার তার প্রশ্ন শুরু করে, আপনি শুনলাম অনেক দিন নাকি বর্মায় ছিলেন, তাই কি শকুন্তলা দেবী?

হাঁ।

বর্মায় কোথায় ছিলেন?

দ্বিতীয়বার তখনি শকুন্তলা আবার কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করল, বর্মায় আপনি গিয়েছেন নাকি কখনও মিঃ রায়?

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, হ্যাঁ, সেইজন্য বর্মা দেশের প্রায় সব কিছুই মোটামুটি আমার জানা।

রেঙ্গুনে। মাথাটা নিচু করে শকুন্তলা অতঃপর বললে।

প্রপার রেঙ্গুন শহরেই বরাবর ছিলেন?

হ্যাঁ।

ভাল কথা শকুন্তলা দেবী, সারদাবাবুর যে হার্টের ট্রাবলস ছিল, আপনি তো তা জানতেন?

জানতাম।

মধ্যে মধ্যে তিনি ইনসম্‌নিয়ার জন্য আবার ঘুমের ঔষধ খেতেন, তাও আপনি জানতেন?

জানতাম।

আচ্ছা যে রাত্রে সারদাবাবু মারা যান, সেরাত্রে কখন আপনার সঙ্গে সারদাবাবুর শেষ দেখা হয় ও তাঁর সঙ্গে আপনার শেষ কথাবার্তা হয়?

ঠিক মনে নেই, তবে রাত প্রায় সাড়ে নটা পর্যন্ত আমরা লাইব্রেরী ঘরেই ছিলাম। ওঁকে আমি বই পড়ে শোনাচ্ছিলাম। ঐসময় বৃন্দাবনবাবু ওঁর সঙ্গে কি জরুরী কথাবার্তা বলতে আসায় আমাকে ছুটি দিয়ে ওঁরা মিঃ সরকারের ঘরের দিকেই যান।

তাঁদের মধ্যে তাহলে সেরাত্রে কি ধরনের কথাবার্তা হয়, আপনি কিছুই জানেন না? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

না।

কিন্তু আমি যতদূর শুনেছি, আপনি নাকি ঐ রাত্রেই রাত এগারোটা নাগাদ আবার সারদাবাবুর ঘরে গিয়েছিলেন, কথাটা কি সত্যি?

হ্যাঁ, ঠিকই শুনেছেন। ঐ সময় তিনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন আবার তাঁর ঘরে।

অত রাত্রে?

হ্যাঁ, লুমিনলের ফাইলটা খুঁজে পাচ্ছিলেন না, তাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন।

আপনি বুঝি মধ্যে মধ্যে তাঁকে ঔষধপত্রও দিতেন?

দিতাম।

হুঁ, তারপর আপনি কি করলেন?

ঔষধের ফাইলটা খুঁজে দিয়ে যখন চলে আসছি আমাকে বললেন, দশরথকে এক কাপ চা তাঁকে দিয়ে যেতে বলবার জন্য।

বলেছিলেন আপনি সেকথা দশরথকে?

হুঁ —আমি বলিনি, তবে গোকুলকে দিয়ে বলে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম।

আচ্ছা সে সময় সারদাবাবুর মুড আপনার কি রকম লেগেছিল?

কেন, হি ওয়াজ পারফেক্টলি অল রাইট, নাথিং অ্যাবনরমাল আই ফাউণ্ড দেয়ার!

আই সি! আচ্ছা শকুন্তলা দেবী, এ বাড়িতে সারদাবাবুর মৃত্যুর কয়েক দিন আগে 'কেতু' নামে কে একজন লোককে কাজে বহাল করা হয়েছিল এবং যার আজ পর্যন্ত সেইদিন সকাল থেকে কোন সন্ধানই আর পাওয়া যায়নি, কথাটা জানেন বোধ হয়?

জানি। একটু যেন ভেবে সময় নিয়ে ধীরে কথাটা উচ্চারণ করল শকুন্তলা।

লোকটার চেহারা নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে?

হ্যাঁ! একটু যেন চমকেই ওঠে শকুন্তলা, তারপর সেই ভাবটা সামলে নিয়ে বলে, হ্যাঁ, তা মনে আছে বৈকি।

লোকটাকে আবার দেখলে বা তার কোন ফটো দেখলে চিনতে পারবেন আশা করি!

বোধ হয় পারব। কারণ তার চেহারা বেশ ঢ্যাঙা ছিল এবং বাঁ পা-টা ডিফেকটিভ থাকার দরুণ সামান্য একটু পা-টা টেনে কুঁজো হয়ে লোকটা চলত লক্ষ্য করেছিলাম।

আর একটি কথা শকুন্তলা দেবী, আপনি বোধ হয় এখন কিছুদিন এখানেই থাকবেন, তাই না?

তা ঠিক এখনো কিছু বলতে পারছি না। তারপর একটু থেমে বললে, ওরা যদি আমাকে রাখেন তো থাকতেও পারি।

সেরকম কোন কথা আজ পর্যন্ত—মানে বৃন্দাবনবাবুর সঙ্গে আপনার হয়নি?

না।

আচ্ছা, আর আপনাকে বিরক্ত করব না, উঠি—নমস্কার। কথাটা বলে ঘুরে তাকালো কিরীটী সুশান্তর দিকে এবং বললে, চলুন সুশান্তবাবু।

চলুন।

সুশান্তও উঠে দাঁড়ায়।

।। দশ ।।

শকুন্তলার ঘর থেকে বের হয়ে উভয়ে আবার লাইব্রেরী ঘরেই ফিরে এসে প্রবেশ করল।।

লাইব্রেরী ঘরের মধ্যে দুটো সোফায় মুখোমুখি বসে তখন বৃন্দাবন সরকার ও মধুসূদন সরকার দুই ভাই নিম্নকণ্ঠে কি সব কথাবার্তা বলছিলেন। ওদের পদশব্দে দুজনাই মুখ তুলে তাকালেন।

বৃন্দাবনবাবু, আপনার কাকা সারদাবাবু যে ঘরে মারা গিয়েছিলেন সেই ঘরটা যে একটিবার দেখতে চাই! কিরীটী ঘরে ঢুকেই বৃন্দাবনবাবুকে লক্ষ্য করে কথাটা বললে।

বেশ তো চলুন—উঠে দাঁড়ালেন সঙ্গে সঙ্গে বৃন্দাবন সরকার।

সারদাবাবুর মৃত্যুর পর থেকে এযাবৎকাল তাঁর নিজস্ব ঘরটা তালা দেওয়াই ছিল! বৃন্দাবন সরকার তাঁর নিজের ঘর থেকে চাবিটা নিয়ে এসে ঘরের তালা খুলে ওদের নিয়ে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

ঘরের জানলাগুলো বন্ধ ছিল।

কিরীটীর নির্দেশে বৃন্দাবন সরকার ঘরের জানলাগুলো খুলে দিলেন।

সুশান্তর মনে পড়ল, মাত্র এক পক্ষকাল পূর্বে এই ঘরে প্রথম যেদিন সে এসে পদার্পণ করেছিল, সামনেই ঐ মেঝেতে সারদাচরণ সরকারের নিষ্প্রাণ দেহটা পড়েছিল সেদিন।

সেই একই বাড়িতে গতরাত্রে আবার একজন নিহত হয়েছে। এবং সম্ভবত তারও মৃত্যুর কারণ একই।

বিষপ্রয়োগ!

একজন এই বাড়ির মালিক, অন্যজন তাঁর বিশ্বস্ত পুরাতন ভৃত্য।

প্রভু সারদাচরণ সরকার ও তাঁর ভৃত্য দশরথ।

ঘরের আসবাবপত্র সেদিন যেমনটি সে দেখেছিল আজও ঠিক তেমনটিই রয়েছে, মনে হল সুশান্তর।

সেই পালঙ্ক, সেই টেবিল, চেয়ার—

সহসা কিরীটীর ডাকে সুশান্ত তার দিকে ফিরে তাকালো!

সুশান্তবাবু?

বলুন।

সেদিন তো, মানে সারদাবাবুর মৃতদেহ যেদিন আবিষ্কৃত হয়, আপনি এ ঘরে এসেছিলেন?

কিরীটীর প্রশ্নে মৃদুকণ্ঠে সুশান্ত জবাব দেয়, হ্যাঁ।

সেদিন ঘরের মধ্যে সব কিছু যেমন ছিল, আজও কি ঠিক তেমনিই অ্যাজ ইট ওয়াজ আছে বলে মনে হচ্ছে?

সুশান্ত বারেকের জন্য আবার ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে বললে, তাই তো মনে হচ্ছে।

কিরীটী অতঃপর লিখবার টেবিলের সামনেই সর্বপ্রথম এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল ও টেবিলের সাইডে যে ড্রয়ার ছিল তার সবার উপরের ড্রয়ারটা টানতেই সেটা বের হয়ে এল।

ড্রয়ারটা ভর্তি নানা টুকিটাকি জিনিসপত্রে। একটা মোটা ডাইরী কালো রংয়ের মলাটের, গোটা দুই ঝর্ণা কলম, একটা শেফিল্ডের ছুরি, একটা জেমস পকেট ডিক্সনারী, কোরামিনের একটা ফাইল ও একটা লুমিনল ট্যাবলেটের টিউব।

এটা-ওটা নাড়াচাড়া করতে করতে কিরীটী লুমিনল ট্যাবেলেটের টিউবটা তুলে নিল

ড্রয়ার থেকে।

একেবারে আনকোরা টিউব। মুখ খোলাই হয়নি তখনও। কুড়িটা ট্যাবলেটই রয়েছে।

কি ভেবে কিরীটী টিউবটা নিজের পরিধেয় কোটের পকেটে রেখে দিল।

তারপর কালো মলাটের ডাইরীটা তুলে নিল ড্রয়ার থেকে।

অন্যমনস্ক ভাবে ডাইরীর পাতা উল্টে উল্টে দেখতে লাগল। কিছু নাম ও ঠিকানা লেখা। মধ্যে মধ্যে টাকার হিসাব লেখা এবং শেষের দিকে এক জায়গায় দেখল লেখা আছে—গাছের নানা প্রকারের সারের কথা।

তারই এক জায়গায় বিশেষভাবে তার দৃষ্টি যেন আকৃষ্ট হল। সেখানে লেখা : এককালে আমেরিকায় একপ্রকার স্থানীয় উদ্ভিদের নাম ছিল 'নিকোটিয়ানা', এখন অবিশ্যি ভারতবর্ষে নাকি ঐজাতীয় উদ্ভিদ প্রচুর আছে। নিকোটিয়ানা থেকে দুই প্রকারের 'অ্যালকলয়েড' পাওয়া যায়। নিকোটিন ও নিকোটিনাইন। ঐ নিকোটিনে খুব ভাল গাছের সার হয় যদিও ওটা তীব্র বিষ। মাত্র দু'তিন ফোঁটা নিকোটিন বিষই মারাত্মক—মাত্র দু'তিন মিনিটের মধ্যে মৃত্যুই ঘটতে পারে। পিওর বা খাঁটি 'নিকোটিন' অ্যালকলয়েডের কোন রং নেই, জলের মতই সাদা।

ঐ পর্যন্তই। আর কিছু লেখা নেই ঐ পৃষ্ঠায়।

আবার কিরীটী পাতা উল্টে যায় ডাইরীর।

সহসা আবার এক পাতায় দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ হয় একটি লাইনের উপর।

নতুন সারটার নাম দিলাম : রোজ স্প্রেয়িং সলুশন।

সুশান্তবাবু?

সুশান্তর দিকে ফিরে সহসা কিরীটী ডাকল!

কিছু বলছিলেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ, শুনুন—বলে সুশান্তর কানের কাছে মুখ নিয়ে কিরীটী নিম্নকণ্ঠে যেন কি বললে তাকে।

পরমুহূর্তেই সুশান্ত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী ডাইরীটাও পকেটস্থ করল।

এবারে কিরীটী দ্বিতীয় ড্রয়ারটা টেনে খুলল। কিন্তু দ্বিতীয় ড্রয়ারটি টেনে খুলেই যেন কিরীটীর মনে বিস্ময়ের একটা চমক লাগে।

টুকিটাকি সব প্রসাধন দ্রব্য ড্রয়ারের মধ্যে রয়েছে। পাউডার, সেন্ট,—দামী ইভনিং প্যারি সেন্ট, ছোট একটি সুদৃশ্য আয়না। একটি চিরুনি, একটি চুল তোলার সন্না, ছোট একটি কাঁচি, একটি দামী কলপের শিশি। ঐসব ছাড়াও এক টিন ৯৯৯ সিগারেট ও একটি দেশলাই। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে ঐ জিনিসগুলোর দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে একসময় আবার কিরীটী নিঃশব্দে ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিল। এবং অদূরে নিঃশব্দে দণ্ডায়মান বৃন্দাবনবাবুর দিকে ফিরে তাকাল।

বৃন্দাবনবাবু!

বলুন?

আপনার কাকাবাবু একটু বেশ শৌখীন প্রকৃতির ছিলেন, তাই না?

না তো! তবে ইদানীং—বলতে গিয়েও থেমে যান বৃন্দাবন সরকার, যেন কেমন একটু ইতস্তত: করেন।

কি? থামলেন যে?

না, তেমন বিশেষ কিছু নয়। তবে ইদানীং মাসখানেক ধরে যেন একটু মনে হয়েছে

নিজের সাজসজ্জার প্রতি তাঁর একটু নজর পড়েছিল। নচেৎ বরাবরই তো জ্ঞান হওয়া অবধি দেখে এসেছি অত্যন্ত সিম্পল, বিলাসিতাকে ঘৃণাই করতেন। বেশভূষা কিছুতেই কোন নজর কোনদিনই ছিল না।

হুঁ। আচ্ছা আপনার কি মনে হয় বৃন্দাবনবাবু, ইদানীং তাঁর ঐ পরিবর্তনের কোন কারণ ঘটেছিল?

প্রশ্নটা করে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আবার তাকাল কিরীটী বৃন্দাবন সরকারের মুখের দিকে। এবং কিরীটীর ঐ স্পষ্টাস্পষ্টি প্রশ্নে বৃন্দাবন সরকার যে সহসা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছেন সেটা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে কিরীটীর কষ্ট হয় না। মনে মনে তার অতি দুঃখে হাসি এলেও, বাইরে কিন্তু সেটা প্রকাশ করে না।

না, মানে, আমি ঠিক বলতে পারব না মিঃ রায়! একটু যেন থেমে থেমে কথাগুলো কোনমতে উচ্চারণ করেন বৃন্দাবন সরকার।

ঠিক ঐ মুহূর্তে সুশান্ত এসে পুনরায় ঘরে প্রবেশ করলে। এবং কিরীটীর দিকে তাকাতেই পরস্পরের চোখে চোখে কি যেন কথা হল নিঃশব্দে।

কিরীটী এবারে সর্বশেষ ড্রয়ারটি টেনে খুললে। কিন্তু তার মধ্যে বিশেষ কোন দ্রষ্টব্য বস্তু তার চোখে পড়ল না।

বেলাও ইতিমধ্যে প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে গিয়েছিল।

বৃন্দাবন সরকারের দিকে চেয়ে কিরীটী বললে, চলুন মিঃ সরকার, এ-ঘরে আর আমার দেখবার কিছু নেই।

অন্য ঘরগুলো দেখবেন না? বৃন্দাবন সরকার প্রশ্ন করেন।

এখন আর নয়। বিকেলের দিকে এসে আপনাদের বাগানটা একবার দেখব, কিরীটী বলে।

বেশ তো আসবেন। তবে আজই আমি কলকাতায় চলে যাচ্ছি দুপুরের ট্রেনে মিঃ রায়।

আজই যাবেন?

হ্যাঁ, দাদা বোধ হয় এখানেই থাকছেন। আপনার যা প্রয়োজন ওঁকেই বলবেন। কাকার মৃত্যুর পর কলকাতায় তো আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি। দোকানের হিসাবপত্রও সব একবার দেখা দরকার।

তা তো নিশ্চয়ই। তা কবে ফিরছেন?

তা ঠিক বলতে পারছি না। তবে হপ্তাখানেকের আগে ফিরতে পারব মনে হয় না।

।। এগারো ।।

'সরকার-ভিলা' থেকে বের হয়ে কিরীটী আর সুশান্ত দুজনে 'মণি লজে'র দিকে হাঁটতে শুরু করে।

বাইরে রৌদ্রের তাপ বেশ প্রখর হয়ে উঠেছে তখন।

পথে দুজনার মধ্যে আর বিশেষ কোন কথাবার্তা হয় না।

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর পাশাপাশি বিনয় ও সুশান্ত একটা সোফায় বসে এবং কিরীটী তাদের অল্প ব্যবধানে অন্য একটি সোফায় বসে সরকার-ভিলার হত্যা-ব্যাপার সম্পর্কেই পরস্পরের মধ্যে আলোচনা করছিল।

সহসা একসময় সুশান্ত প্রশ্ন করে, আপনার কথায় মনে হচ্ছে মিঃ রায়, বৃন্দাবন সরকারকেই আপনি যেন একটু বেশী সন্দেহ করছেন!

সন্দেহ কাউকেই ও-বাড়ির আমি কম বেশী করছি না সুশান্তবাবু, কিরীটী হস্তধৃত পাইপটায় মৃদু একটা টান দিয়ে খানিকটা পীতাভ ধোঁয়া উদ্‌গিরণ করে বলতে থাকে, আপনাকে তো একটু আগেই বললাম, সারদাচরণ সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারটা রীতিমত জটিল। জানবেন, কবি আমাদের মিথ্যে বলেননি, পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছো এ কি সন্ন্যাসী, বিশ্বময় দিয়েছো তারে ছড়ায়ে। পঞ্চশরের এমনই প্রতাপ যে কোন গতিই সে মানতে রাজী নয়। এই দেখুন না—আপনার কথাটাই ধরুন!

বিস্ময়ে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে সুশান্ত প্রশ্ন করে, আমার কথা?

হ্যাঁ, শকুন্তলার প্রতি আপনার দুটি চক্ষুর নীরব মুগ্ধ দৃষ্টি আপনার মনশ্চক্ষে ধরা পড়ার কথা নয় অবিশ্যি, কিন্তু আমার ও শকুন্তলা দেবীর দৃষ্টিকে এড়ায়নি। মৃদু রহস্য-তরল কণ্ঠে কিরীটী কথাগুলো বলে।

কিরীটীর অতর্কিত আক্রমণে সুশান্তর মুখখানা সহসা রক্তিম হয়ে ওঠে এবং মৃদু লজ্জাজড়িত কণ্ঠে বলে, কি যে আপনি বলেন মিঃ রায়!

মৃদু হেসে সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী জবাব দেয়, না, না—এতে তো লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই সুশান্তবাবু। শকুন্তলার ইতিহাস যাই হোক না কেন, মুখখানি তার সত্যিই সুন্দর। আর সুন্দর বস্তুর প্রতি বিশেষ করে সে যদি আবার সজীব হয় তো তার প্রতি মানুষ মাত্রের আকর্ষণ তো একান্তই স্বাভাবিক।

বিনয় হো হো করে হেসে ওঠে, কিরীটীর কথায়।

সুশান্ত ঐসময় তাড়াতাড়ি কথার মোড়টা ঘুরিয়ে দেবার জন্য বলে ওঠে, কিন্তু সরকার-ভিলার ল্যাবরেটারী থেকে ঐসময় আমাকে রোজ স্প্রেয়িং সলুশন-এর শিশিটা সরিয়ে আনতে বললেন কেন মিঃ রায় এখনও বুঝতে পারছি না।

ব্যস্ত কি, সময়ে সব জানতে পারবেন। কিন্তু শিশিটা কোথায় রেখেছেন?

রেখে দিয়েছি আমার ঘরে।

সাবধানে রেখেছেন তো?

হ্যাঁ।

দেখবেন সাংঘাতিক বিষ!

বিষ!

হ্যাঁ, কিন্তু যাক এখন নিশ্চিন্ত। ভাল কথা, শিশিটা যখন সরিয়ে নিয়ে আসেন কেউ আপনাকে দেখেনি তো?

না।

মধুসূদনবাবু তখন কোথায় ছিলেন?

দেখিনি।

শকুন্তলা দেবী?

জানি না, লক্ষ্য করিনি।

তাঁর ঘরের দরজার দিকে যাবার সময় বারান্দা দিয়ে তাকানও নি?

না।

।। বারো ।।

একটা কথা জিজ্ঞাসা করব মিঃ রায়? সুশান্ত সহসা প্রশ্ন করে।

নিশ্চয়ই।

আপনার সন্দেহের তালিকার মধ্যে—

সুশান্তর কথাটা তাকে শেষ না করতে দিয়ে কিরীটী বলে ওঠে, শকুন্তলাও আছেন কিনা, এই তো আপনার প্রশ্ন সুশান্তবাবু? দুঃখের বিষয়, আছেন। কি জানেন সুশান্তবাবু, ক্রিমিন্যাল মাইনডেড়দের মুখের একটা-না-একটা বিশেষত্ব নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন যদি সেই মুখগুলোর দিকে একটু ভাল করে চেয়ে দেখেন!

আপনার কথাটা কিন্তু ঠিক আমি বুঝতে পারলাম না মিঃ রায়!

পারলেন না? আচ্ছা আবার যখন ওদের মানে বৃন্দাবনবাবু, মধুসূদনবাবু ও শকুন্তলা দেবীকে দেখবেন—ওদের মুখের দিকে ভাল করে চেয়ে দেখবেন তো, তাঁদের কারও মুখের কোন বিশেষ পিকিউলিয়রিটি আপনার চোখে পড়ে কিনা?

দেখব। কিন্তু—

এটা তো বিশ্বাস করেন, মুখই হচ্ছে মানুষের মনের আয়না?

সর্বত্র না হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যে অ্যাপলিকেবল কথাটা কিছু অতিশয়োক্তি নয়। কিন্তু যাক যে কথা। একটা কাজ আপনাকে করতে হবে যে!

বলুন?

শকুন্তলা দেবীর সঙ্গে আপনাকে আলাপ জমাতে হবে।

তার মানে?

আপনার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হচ্ছে, কাজটা যেন আপনার কাছে অত্যন্ত দুরূহ বলে ঠেকছে! কাজটা অবিশ্যি আমিই চেষ্টা করতাম কিন্তু সেটা কি যুক্তিসঙ্গত হবে, কারণ তিনিও যখন আপনার প্রতি মুগ্ধ—

না মিঃ রায়, আমি মানে—

উঁহু, আপনি ভুল করছেন সুশান্তবাবু। স্রেফ আড্ডা দেওয়া বা শকুন্তলার সঙ্গে আপনাকে আমি সাধারণ আলাপ জমাতে বলছি না। উদ্দেশ্য আমার অন্য—

উদ্দেশ্য—

হ্যাঁ, তবে সেটা এখন বলব না, ক্রমশ জানতে পারবেন।

কিন্তু—

ভাবছেন সুযোগের কথা? বিমুগ্ধমনেরা পরস্পর সুযোগ আপনা থেকেই করে নেয়। সেজন্য আপনি চিন্তা করবেন না।

কিরীটী বৃন্দাবন সরকারকে বলে এসেছিল, বিকেলের দিকে আবার সে সরকার ভিলায় আসবে। কিন্তু ঐদিন বেরুতে বেশ দেরিই হয়ে গেল।

ফ্যাটি গুপ্তর জরুরী একটা চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে, তাকে ঐদিনই বিকেলের ট্রেনে কলকাতা ফিরতে হবে, বিনয় ও সুশান্ত তাকে স্টেশনে পৌঁছে দিতে গেল, কাজেই ওদের স্টেশন থেকে না ফিরে আসা পর্যন্ত অনুরোধ জানিয়ে গেল কিরীটীকে সে যেন না বের হয়, অপেক্ষা করে।

প্রায় সন্ধ্যার মুখোমুখি সুশান্ত ও বিনয় স্টেশন থেকে ফিরে এল।

কিরীটী বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েই একটা সোফার উপর বসে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা উল্টেপাল্টে দেখছিল। সুশান্ত ঘরে ঢুকতে ঢুকতে বললে, মিঃ রায়, বেরুনো যাক!

চলুন। কিরীটী উঠে দাঁড়ায়।

সরকার-ভিলার বাইরের ঘরে প্রবেশ করতেই ভৃত্য গোকুলের সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল।

এ বাড়িতেই তো তুমি কাজ কর? কিরীটী গোকুলকে শুধায়।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তোমার নাম কি?

কিরীটীর প্রশ্নে গোকুল জবাব দেয়, গোকুল।

বাবুদের কাউকে একবার খবর দিতে পার গোকুল, বলগে কিরীটীবাবু আর সুশান্তবাবু এসেছেন।

ছোটবাবু তো নেই, বড়বাবু আছেন। গোকুল বলে।

তাঁকেই তাহলে খবর দাও।

যান না, বড়বাবু তো বাগানেই আছেন। ঐ বারান্দার পশ্চিম দিক দিয়ে নেমে যান। গোকুল বাগানে যাবার পথটা দেখিয়ে দিল।

কিরীটী আর সুশান্ত নির্দিষ্ট পথে এগিয়ে যায়।

বারান্দার শেষপ্রান্তে পশ্চিম দিকে ছোটমত একটা গেট। গেট খুললেই তিন ধাপ সিঁড়ি নেমে গিয়েছে। এবং সিঁড়ি অতিক্রম করে পঞ্চাশ গজ গেলেই পুরোপুরি সমস্ত বাগানটা দৃষ্টির সামনে ভেসে ওঠে।

উদ্যানে যে কত প্রকারের ফল, ফুল ও পাতাবাহারের গাছ তার যেন কোন সংখ্যা নেই। ছোট বড় মাঝারি নানা আকারের সব গাছ। কোথাও গাছের নিবিড়তা ঝোপের সৃষ্টি করেছে, কোথাও দীর্ঘ ইউক্যালিপটাস্ গাছ, কোথাও আনারসের ঝাড়, কোথাও ক্রোটন ও পাতাবাহারের ঝোপ, কোথাও চীনা বাঁশের ঝাড়, কোথাও শুধু সারি সারি গোলাপ আর গোলাপ গাছ। লাল সাদা হলদে গোলাপী নানা রঙের নানা আকারের অজস্র গোলাপ ফুটে রয়েছে।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাতে তাকাতে এগিয়ে গেল কিরীটী। আর তাকে ধীরপদে অনুসরণ করে চলে সুশান্ত।

মুগ্ধ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে দেখতে মৃদুকণ্ঠে একসময় কিরীটী বলে, অনেক সময় শ্রম ও অধ্যবসায়ই দিয়েছিলেন দেখছি মৃত সারদাবাবু তাঁর এই উদ্যানের পিছনে, কি বলেন সুশান্তবাবু?

তাই। সত্যিই চমৎকার। ওদিকটা একটু ঘুরে দেখে আসি, বলে ডানদিকে গোলাপ বাগিচার দিকে এগিয়ে গেল সুশান্ত।

সামনেই একটা চীনা বাঁশের ঝাড়।

নাতিদীর্ঘ সরু সরু বাঁশগুলো সামান্য একদিকে যেন গুচ্ছে গুচ্ছে হেলে পড়েছে। এবং সরু চিকন পাতাগুলো হাওয়ায় সিপ সিপ শব্দ করে চলেছে একটানা। দিনান্তের শেষ বিষণ্ণ আলোয় হঠাৎ বাঁশগুচ্ছের ফাঁকে ফাঁকে ঝাড়ের উল্টোদিকে বিশেষ একটি দৃশ্য কিরীটীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে।

সবুজ চিকন চিকন পাতাগুলোর ফাঁকে পাকে পর্যপ্ত কেশের একটি অগোছাল খোঁপা

ও বাসন্তীরঙের শাড়ি জড়ানো একটি পৃষ্ঠের ঊর্ধ্বাংশ চোখে পড়ে।

সামনে ওদের পায়ে চলার পথটা বাঁশের ঝাড়টাকে বাঁয়ে রেখে আরও সামান্য একটু এগিয়ে বাঁয়ে বাঁক নিয়েছে।

কিরীটী মুহূর্তকাল দাঁড়িয়ে যেন কি ভাবে, তারপরই পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেল, দূরে হাত দশেক তফাতে সুশান্ত গোলাপ বাগিচার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, কিরীটী নিঃশব্দে বাঁয়ের পথ ধরে এগিয়ে চলল।

কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়।

চীনা বাঁশঝাড়ের একেবারে কোল ঘেঁষে সবুজ ঘাসের উপর পা ছড়িয়ে সামনের দিকে একাকিনী বসে শকুন্তলা।

শকুন্তলা ত্রিবেদী।

পরিধানে বাসন্তীরঙের কালো চওড়াপাড় একটি শাড়ি।

গায়ে লাল ভেলভেটের কনুই পর্যন্ত হাতা একটি ব্লাউজ।

ঠিক যেন অরণ্য দেবী বনছায়াতলে আঁচল বিছিয়ে বসে বিশ্রাম করছেন অলস শিথিল ভঙ্গীতে।

একটা কড়া উগ্র তামাকের গন্ধ কিরীটীর অভ্যস্ত ও পরিচিত নাসারন্ধ্রে এসে প্রবেশ করে। সহসা যেন আত্মচিন্তায় নিমগ্ন উপবিষ্ট শকুন্তলার কাছে গিয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে এবং ঐদিকে আরও একটু অগ্রসর হতেই গন্ধটা আরও স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়।

বর্মা চুরুটের পরিচিত গন্ধ। কিরীটীর ভুল হবার নয়।

এদিক ওদিক তাকাতেই অল্প দূরে ঘাসের ওপর একটি নিঃশেষিত-প্রায় বর্মা চুরুট এবারে ওর নজর পড়ে।

মৃদু হেসে মুহূর্তকাল কিরীটী আপন মনে যেন কি ভাবে। তারপর মৃদু-কণ্ঠে ডাকে, শকুন্তলা দেবী!

কে?

চমকে ফিরে তাকাতেই শকুন্তলা সামনেই দণ্ডায়মান কিরীটীকে দেখতে পেয়ে একটু যেন বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করে, এ কি, আপনি!

হ্যাঁ। সারদাবাবুর বাগানটা ঘুরে দেখতে দেখতে এদিকে আসতেই লক্ষ্য করলাম, আপনি চুপচাপ বসে আছেন!

হ্যাঁ, এই নির্জন জায়গাটি বাগানের মধ্যে আমার খুব ভাল লাগে, তাই বিকেলের দিকে এখানে এসে প্রায়ই বসি।

যা বলেছেন, সত্যই চমৎকার জায়গাটি! কিন্তু মধুসূদনবাবুকে দেখছি না যে? তিনি কোথায়?

কিরীটীর শেষের কথায় যেন একটু চমকেই শকুন্তলা কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল এবং অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে উচ্চারণ করল, মধুসূদনবাবু!

হ্যাঁ, ঐ যে গোকুল বলল, তিনি নাকি বাগানেই আছেন?

তা—তা হবে। আমি তো দেখিনি।

তাহলে বোধ হয় অন্যদিকে কোথাও আছেন। হ্যাঁ ভাল কথা, বৃন্দাবনবাবুর আজ কলকাতায় ফিরে যাবার কথা ছিল, গেছেন নাকি চলে তিনি কলকাতায়?

হ্যাঁ, বিকেলের ট্রেনেই চলে গেলেন।

আপনার নির্জন বিশ্রামে ব্যাঘাত করছি না তো শকুন্তলা দেবী?

না, না—ব্যাঘাত কিসের আবার! আপনি বুঝি একলাই এসেছেন?

কেন বলুন তো?

না—এমনিই জিজ্ঞাসা করছিলাম।

।। তেরো ।।

শকুন্তলার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদুকণ্ঠে কিরীটী এবারে বলে, না, একা আসিনি, আমার সকালের সেই বন্ধুটিও এসেছেন। ওদিককার গোলাপ বাগিচার দিকে গেলেন গোলাপ দেখতে এইমাত্র।

নিজের অনুমানটা যে মিথ্যা নয় বুঝতে পেরে কিরীটী মনে মনে একটু যেন উল্লসিতই হয়। কিন্তু চোখেমুখে তার সে ভাবটা প্রকাশ পায় না।

কিন্তু পরক্ষণেই শকুন্তলার কণ্ঠস্বরে কিরীটীর চিন্তায় ছেদ পড়ে।

দাঁড়িয়ে কেন মিঃ রায়, জায়গাটা বেশ পরিষ্কার—বসুন না।

কিরীটী আর দ্বিধামাত্রও না করে শকুন্তলার অল্প ব্যবধানে ঘাসের উপরেই বসে পড়ল।

ক্রমশ অস্পষ্ট আলোয় চারিদিক আরও বিষণ্ণ আরও ধূসর হয়ে আসছে যেন তখন।

কিরীটীই অতঃপর একসময় কথা শুরু করে, সারদাবাবুর মৃত্যুতে আপনি শোক পেয়েছেন শকুন্তলা দেবী, তাই না?

উনি আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মাত্র আট মাস তাঁর কাছে কাজ করেছি, কিন্তু তাঁর ব্যবহার কখনও ভুলতে পারব না বোধ হয় মিঃ রায় এ জীবনে।

স্বাভাবিক। এক-একজন আছেন যাঁরা খুব সামান্য সময়ের মধ্যেই দূরের জনকে কাছে টেনে নেন। আর তাইতেই নিশ্চয়ই আপনি এ জায়গার মায়া এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছেন না।

সত্যিই তাই। কে যেন সর্বক্ষণ এখানে চারপাশ থেকে আঁকড়ে ধরছে আমাকে।

আচ্ছা শকুন্তলা দেবী, সকালে তখন একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা করব-করব করে করা হয়ে ওঠেনি।

কি?

সারদাবাবু বেশ সৌখীন প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাই না?

কেন বলুন তো? হঠাৎ এ কথা আপনার মনে উদয় হল কেন?

উদয় হল কেন সে কথা নাই বা শুনলেন, কথাটা সত্য কি মিথ্যা সেটাই শুধু জিজ্ঞাসা করছি!

মুহূর্তকাল শকুন্তলা চুপ করে যেন কি ভাবতে থাকে।

অস্পষ্ট আলো-ছায়ায় কিরীটী শকুন্তলার মুখের কোন ভাবান্তর বুঝতে পারে না।

তৎসত্ত্বেও সে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে শকুন্তলার মুখের দিকে।

মৃদুকণ্ঠে শকুন্তলা বলে, আপনার অনুমান সত্যি কি মিথ্যা তা জানি না মিঃ রায়, কারণ এখানে আসা অবধি দু মাস পর্যন্ত যাঁকে অত্যন্ত সংযমী ও কোন বিলাস-ব্যসন যাঁর নেই বলেই মনে হয়েছিল এবং ব্যবহারেও দেখেছি, সেই লোক—

ধীরে ধীরে যেন বদলে গিয়েছিলেন, তাই না? কিরীটীই শকুন্তলার মুখ থেকে কথাটা কেড়ে নিয়ে শেষ করে।

হ্যাঁ।

কিন্তু তার কোন কারণই আপনি বুঝতে পারেননি?

না।

তাঁর কথায়বার্তায় হাবভাবে কখনও কিছু প্রকাশ হতেও দেখেননি যাতে করে তাঁর ঐ পরিবর্তনটা—কারণ আপনি তো সব সময়ই প্রায় তাঁর কাছে-কাছেই থাকতেন—

না, তবে একটা ব্যাপার ইদানীং মাস দুই থেকে লক্ষ্য করছিলাম—

কি?

আগে আগে ইতিহাস ও ধর্মগ্রন্থই বেশীর ভাগ তাঁকে পড়ে শোনাতে হত আমাকে, কিন্তু ইদানীং প্রায় বৈষ্ণব কাব্য থেকেই কেবল আমাকে পড়ে শোনাতে বলতেন।

তাতেও বোঝেননি ব্যাপারটা? মৃদু হেসে কিরীটী কথা বললে।

কিরীটীর কথায় যেন একটু বিস্মিত হয়েই তাকায় শকুন্তলা কিরীটীর মুখের দিকে, তারপরই হঠাৎ বলে, কি বলছেন আপনি মিঃ রায়! ইজ ইট পসিব্‌ল্?

ঠিক তাই শকুন্তলা দেবী। আপনার মত বুদ্ধিমতী মেয়ের আগেই কিন্তু ব্যাপারটা বোঝা উচিত ছিল তার ড্রয়ারের ভিতরকার বিশেষ দ্রব্যগুলো দেখে।

বিশেষ দ্রব্যগুলো?

হ্যাঁ, পাউডার, সেন্ট, কলপ ইত্যাদি—সৌখীন দ্রব্যগুলি নিশ্চয়ই আপনার চোখের দৃষ্টি এড়ায়নি—কারণ আপনি যখন তাঁর ড্রয়ার খুলতেন মধ্যে মধ্যে। আমার তো মনে হয় তাঁর ইদানীং ইনসমনিয়াটা যে বেড়ে গিয়েছিল তারও কারণ ঐ—

শকুন্তলা এবারে আর কোন জবাব দেয় না।

চুপ করেই থাকে।

মানুষের মন এমনিই বিচিত্র বটে শকুন্তলা দেবী! কিরীটী আবার বলতে থাকে, নইলে সারদাবাবুর যে বয়স ছিল সে বয়সে তো অমনটা ঘটা উচিত ছিল না। আর আমার অনুমান যদি ভুল না হয়ে থাকে তো খুব সম্ভব—

কিরীটী তার কথা শেষ করতে পারে না।

তার আগেই যেন চমকে শকুন্তলা প্রদোষের অন্ধকারে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, কি, কি মিঃ রায়?

হ্যাঁ শকুন্তলা দেবী, পঞ্চশরের ঐ অকাল শরক্ষেপই সম্ভবত তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

তার মানে?

মানেটা মনে মনে চিন্তা করে দেখলে আপনিও হয়তো বুঝতে পারবেন, আমার ব্যাখ্যার প্রয়োজন হবে না। তাছাড়া—

কিরীটীর কথাটা শেষ হল না, অদূরে পদশব্দ পাওয়া গেল এবং সুশান্তর গলা শোনা গেল, মিঃ রায়?

কে! সুশান্তবাবু, আসুন—আমরা এখানে। শকুন্তলা দেবী, সুশান্তবাবু এসেছেন।

শকুন্তলা ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। বলে, চলুন ঘরে যাওয়া যাক। বেশ অন্ধকার হয়ে গিয়েছে।

কোথায় ছিলেন এতক্ষণ সুশান্তবাবু? কিরীটী প্রশ্ন করে।

আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন। জবাব এল সুশান্তর ঠিক পশ্চাতেই মধুসূদনের কণ্ঠ থেকে অন্ধকারে।

কে, মধুসূদনবাবু! কিরীটী ঘুরে দাঁড়ালো যেন সঙ্গে সঙ্গেই।

কাকার বাগানটা দেখলেন? মদুসূদন আবার প্রশ্ন করলেন একটু এগিয়ে এসে।

হ্যাঁ, দেখলাম। সত্যিই চমৎকার!

কত টাকা যে এর পিছনে ঢেলেছেন কাকা! কিন্তু এখানে আর নয়। চলুন ঘরে যাওয়া যাক।

কিন্তু এখন আর ঘরে যাব না মিঃ সরকার। একবার বিমলবাবুর ওখানে যেতে হবে, কিরীটী বলে।

বেশ তো যাবেন'খন। এক কাপ চা খেয়ে যাবেন।

তা মন্দ নয়, চলুন—

সকলেই অন্ধকারেই অগ্রসর হয়।

।। চৌদ্দ ।।

আমাকে অনুসরণ করে আসুন মিঃ রায়। মদুসূদন সরকার বললেন, আপনারা পথ ঠিক হয়তো চিনতে পারবেন না। আর একটু সাবধানে আসবেন, যা চারিদিকে ঝোপ-ঝাড় বলা যায় না কিছু!

কেন, এখানে সাপ আছে নাকি? কিরীটী প্রশ্ন করে চলতে চলতেই অন্ধকারে।

খুব কি বিচিত্র নাকি কথাটা! মৃদু হেসে মধুসূদন সরকার কথাটা বললেন, চারিদিকে যা বনজঙ্গল করে গিয়েছেন এখানে কাকা, তা আচমকা একটা বাঘ বেরুলেও আশ্চর্য হবে না বোধ হয় কেউ।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, কথাটা কিন্তু একটু অতিশয়োক্তিই হল মধুসূদনবাবু আপনার।

কেন বলুন তো?

তা বৈকি। এরকম জায়গায় সাপই অতর্কিতে ছোবল বসাতে পারে, কিন্তু এখানে বাঘের আসাতে তার রক্তের আভিজাত্যে বাধবে। কিরীটী চলতে চলতেই হেসে্ জবাব দেয়।

শকুন্তলা আর সুশান্ত কিন্তু নিঃশব্দেই পথ অতিক্রম করছিল।

এবং কিরীটী লক্ষ্য করে তারা যেন পরস্পরের সঙ্গে একটু ঘেঁষাঘেঁষি করেই পথ চলছিল।

বারান্দার গেটের কাছাকাছি এসে সহসা আবার কিরীটী বলে, মিথ্যে বলেননি আপনি মিঃ সরকার। সত্যি আপনি সঙ্গে না থাকলে এমন অবলীলাক্রমে কিন্তু এখানে এসে পৌঁছতে পারতাম না এখন বুঝতে পারছি। তা আপনারও বুঝি শকুন্তলা দেবীর মত কাকার বাগানটা ভাল লেগে গিয়েছে?

ক্ষেপেছেন মশাই! বনজঙ্গল আমার একদম ধাতে সয় না। তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানিয়ে বলে ওঠেন মধুসূদন সরকার।

কিন্তু আবার অমন নিরিবিনি জায়গাও সময় বিশেষে চট্ করে পাওয়া যায় না, এও নিশ্চয়ই্ মানবেন মিঃ সরকার?

অগ্রবর্তী মদুসূদন সরকার ততক্ষণে সিঁড়ির শেষ ধাপটি অতিক্রম করে বাইরের আলোকিত বারান্দায় উঠে দাঁড়িয়েছেন।

বারান্দার আলোয় মধুসূদন সরকার পরমুহূর্তেই কিরীটীর শেষের কথায় চকিতে তার দিকে ফিরে তাকাতেই মুখে প্রতিটি রেখা তাঁর স্পষ্ট দেখতে পায় কিরীটী।

কিন্তু সেও মুহূর্তের জন্য।

কিরীটীর মুখের দিকে পলকের জন্য তাকিয়েই ততক্ষণে মধুসূদন সরকার আবার মুখটা তাঁর দিকে ফিরিয়ে নিয়েছেন।

দুজনে এসে নিচের সুসজ্জিত বৈঠকখানায় মধুসূদন সরকারের নিদের্শেই সোফা অধিকার করে বসল।

মধুসূদন চা দেবার জন্য ভৃত্যকে ডেকে আদেশ দিতে যাচ্ছিলেন কিন্তু শকুন্তলা দেবী তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, আপনি বসুন। আমি দেখছি।

কথাটা বলে উত্তরের আর অপেক্ষা না করে শকুন্তলা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিন্তু কি জানি কেন, পরস্পরের আলাপের মধ্যে সহসা একটা ছেদ পড়ে গিয়েছিল।

বাগান থেকে ফিরবার পথে অন্ধকারে যে সহজ কথাবার্তা পরস্পরের মধ্যে চলছিল, সেটা হঠাৎই যেন ফুরিয়ে গিয়েছে।

সোফায় যে যার মুখোমুখি চুপচাপ বসে।

কারও মুখেই কোন কথা নেই।

বাইরের বারান্দায় ঐ সময় ভারী একটা জুতোর মচমচ শব্দ শোনা গেল।

কে যেন আসছে! কিরীটীই প্রথমে কথা বলে।

মধুসূদন সরকার কিরীটীর প্রশ্নের কোন জবাব দেবার পূর্বেই চব্বিশ-পঁচিশ বৎসরের একটি হৃষ্টপুষ্ট সুশ্রী যুবক ঘরে প্রবেশ করল।

এ কি! বিজন, তুমি এ সময়?

আগন্তুক যুবকটিকে সম্বোধন করে মধুসূদনই প্রথমে কথা বললেন।

হ্যাঁ—কেন, ছোটমামাই তো আমাকে তাড়াতাড়ি আসবার জন্য চিঠি দিয়েছিলেন।

কে? বৃন্দাবন?

হ্যাঁ, যোধপুরে একটা বড় অর্ডার সাপ্লাইয়ের ব্যাপারে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে দিল্লীতে ফিরেই মামা জরুরী চিঠি পেয়ে চলে আসছি।

বলতে বলতে আগন্তুক একটা খালি সোফায় বসে পড়ল। এবং বললে, কিন্তু এ সব কি ব্যাপার?

কিরীটী যুবকটির দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল ব্যাক-ব্রাশ করা।

দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

মুখখানি একটু লম্বাটে ধরনের!

নাকটা উঁচু, চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ।

ধারালো চিবুক।

পরিধানে দামী গরম সুট।

তা ছোটমামা কোথায়? বিজন আবার প্রশ্ন করল।

আজই তো বিকালের ট্রেনে কলকাতায় চলে গেল। তা বৃন্দাবন সব কথা তোমাকে জানিয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, বিনু মামার চিঠিতেই সব জানালাম। ব্যাপারটা তাহলে সত্যি সত্যি—মানে ছোট দাদুকে সামবডি হত্যাই করেছে?

তাই তো মনে হচ্ছে।

এমন সময় ভৃত্যের হাতে চায়ের ট্রে নিয়ে শকুন্তলা ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল।

কিন্তু এঁদের তো চিনলাম না! বিজন কিরীটী ও সুশান্তকে লক্ষ্য করে মধুসূদনকেই পুনরায় প্রশ্নটা করে ঐ সময়।

হ্যাঁ, পরিচয় নেই তোমার—ইনি কিরীটী রায়—ওঁর বন্ধু সুশান্তবাবু। আর মিঃ রায়, এই আমার ভাগ্নে মানে দিদির একমাত্র ছেলে বিজন বোস।

পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার ও প্রতিনমস্কার জানায়।

অতঃপর সংক্ষেপে কিরীটীর আগমনের হেতুটাও মধুসূদন সরকার বিজনকে জানিয়ে দেন।

শকুন্তলা সকলকে চা পরিবেশন করে।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটীই একসময় বিজনকে প্রশ্ন করে, আপনি বুঝি দিল্লীতেই থাকেন বিজনবাবু?

য়্যাঁ! না—আমি তো কলকাতাতেই থাকি।

ও! আচ্ছা, ঐ যে কি সব অর্ডার সাপ্লাইয়ের কথা একটু আগে বলছিলেন?

ও, কলকাতায় সিং অ্যাণ্ড সিং যে অর্ডার সাপ্লাইয়ের ফার্ম আছে সেখানেই আমি চাকরি করি। তাদেরই কাজে মাঝে মাঝে আমাকে সারা ভারতবর্ষে টহল দিয়ে বেড়াতে হয়।

তা আপনি যে যোধপুর গিয়েছিলেন এবং দিল্লীতে ফিরে যাবেন, বৃন্দাবনবাবু সে কথাটা জানতেন বুঝি?

না। ছোটমামা আমার ফার্মের ঠিকানায় চিঠি দিয়েছিলেন, তারাই চিঠিটা আমাকে রিডাইরেক্ট করে দেয় দিল্লীর ঠিকানায়, তারা জানত যে যোধপুর থেকে আমি দিল্লীতেই আবার ফিরব।

সহসা ঐ সময় মধুসূদন সরকার সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ান এবং বলেন, এক্সকিউজ মি মিঃ রায় ফর এ ফিউ মিনিটস্!

মধুসূদন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

মধুসূদন উঠে চলে যেতে কিরীটী বিজনবাবুর দিকে তাকিয়ে সহসা আবার প্রশ্ন করে, আপনি তাহলে আপনার মামা বৃন্দাবনবাবুর চিঠিতেই আপনার দাদুর মৃত্যুর সংবাদটা প্রথম জানতে পারেন বিজনবাবু?

হ্যাঁ, আমি তো চিঠি পেয়ে একেবারে ন যযৌ ন তস্থৌ!

তা তো হবারই কথা। তা চিঠিতে তিনি কি লিখেছিলেন?

লিখেছেন তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর কথা, তারপর আরও লিখেছেন, পুলিসের এবং তাঁরও ধারণা নাকি দাদুর মৃত্যুটা স্বাভাবিক বা আত্মহত্যা নয়, তীব্র নিকোটিন বিষ-প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। কথাটা বলেই বিজনবাবু সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে এবারে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললে, আপনারও কি ধারণা তাই মিঃ রায়?

হ্যাঁ। শুধু তাঁকেই নয়, দশরথকেও সেই বিষ-প্রয়োগেই হত্যা করা হয়েছে বলেই আমার

ধারণা বিজনবাবু। শান্তকণ্ঠে কিরীটী কথাগুলো বললে।

দশরথ! দশরথও মারা গেছে নাকি? বিজন চমকে প্রশ্ন করে পরক্ষণেই।

হ্যাঁ।

কবে?

গতকাল সকালে।

কয়েকটা মুহূর্ত অতঃপর স্তব্ধ হয়ে রইল বিজন, তারপর কেমন যেন অসহায় দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বলল, ব্যাপারটা এখনও যেন কেমন আমার শুনে অবধি অবিশ্বাস্য বলেই মনে হচ্ছে মিঃ রায়, মামারবাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক আমার না থাকলেও ঐ ছোটদাদুর স্নেহ থেকে কোনদিনই আমি বঞ্চিত হইনি। খুব ছোটবেলায় মাকে ও বাবাকে হারিয়ে ঐ দাদুর কাছেই মানুষ হয়েছিলাম একপ্রকার বলতে গেলে আমি। নিজের দাদুকে দেখিনি কখনও, কিন্তু নিজের দাদুও যে আমাকে আমার ঐ ছোটদাদুর চাইতে বেশী স্নেহ করতে পারতেন বলে আমার মনে হয় না।

কিছু যদি মনে না করেন বিজনবাবু তো একটা কথা জিজ্ঞাসা করতাম। সহসা কিরীটী বাধা দিল বিজনবাবুকে।

বলুন।

মামারবাড়ি ছেড়েছেন আপনি কতদিন?

তা খুব বেশী দিন নয়, কলকাতা থেকে দাদু এখানে চলে আসার বছরখানেক আগেই।

হঠাৎ মামারবাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন যে?

উত্তরে নিঃশব্দে বিজন মাথাটা নিচু করল।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, থাক বলতে হবে না—

না, জানতে চেয়েছেন যখন বলছি। মামীমা—মানে ছোটমামার স্ত্রীর ব্যবহারটা—

বুঝতে পেরেছি। থাক আর কিছু বলতে হবে না। কিন্তু সে মামীমাও তো শুনেছি মারা গিয়েছেন। তা ছাড়া ছোট মামা নিশ্চয়ই আপনাকে ভালবাসতেন!

মিথ্যে বলব না, তা বাসতেন। কিন্তু—

আচ্ছা আপনার ছোট মামীমা কতদিন হবে গত হয়েছেন?

আমি মামারবাড়ি ছেড়ে চলে আসার মাসখানেক পরেই।

হুঁ। আচ্ছা তারপর আপনি ফিরে যাননি কেন? মামীমার জন্যই যখন—

না, তা আর হয়ে ওঠেনি।

।। পনেরো ।।

কিরীটী বিজনের সঙ্গে এত তন্ময় হয়ে কথাবার্তা বলছিল যে অদূরে সোফার উপর উপবিষ্ট সুশান্ত ও শকুন্তলার দিকে তেমন নজরই দিতে পারেনি।

তারর হঠাৎ একসময় বিজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ওদের দিকে নজর পড়তেই কিরীটীর ওষ্ঠপ্রান্তে চাপা একটা হাসির বিদ্যুৎ যেন খেলে গেল।

সুশান্ত ও শকুন্তলা পরস্পরের মধ্যে গল্পে তখন একেবারে তন্ময় হয়ে গিয়েছে।

চাপাকণ্ঠে তারা পরস্পরের সঙ্গে কি যেন সব গল্প করে চলেছে। পরস্পরের প্রতি

পরস্পরের মুগ্ধ দৃষ্টি নিবদ্ধ হচ্ছে কখনও চকিতের জন্য, আবার সংকোচে সে দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিচ্ছে পরস্পর পরস্পর থেকে।

নিঃশব্দে কিরীটী সুশান্ত ও শকুন্তলার দিক থেকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে নিয়ে বিজনের মুখের দিকে চেয়েই আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা বিজনবাবু, আপনার ছোটমামা বৃন্দাবনবাবু আপনাকে চিঠিতে আর কিছু লেখেননি?

হ্যাঁ, আগামী পরশু অর্থাৎ শুক্রবার ছোটদাদুর উইল নাকি সলিসিটার বোস-চৌধুরীর শচীবিলাসবাবু এখানে এসে পড়বেন, সেইদিন বিশেষ করে উপস্থিত থাকবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

ও, সামনের শুক্রবারেই তাহলে উইল পড়া হচ্ছে?

হ্যাঁ, বোস-চৌধুরীর ফার্ম নাকি সেইমত তাঁকে জানিয়েছে এবং তাদেরই নির্দেশে তিনি আমাকে এখানে উপস্থিত থাকবার জন্য লিখেছেন।

নিশ্চয়ই তাহলে আপনার দাদু আপনাকেও কিছু সম্পত্তি দিয়ে গিয়েছেন তাঁর উইলে? নচেৎ বোস-চৌধুরী আপনাকে উইল পড়বার সময় উপস্থিত থাকতেই বা বলবেন কেন?

হতে পারে, তবে দাদুর সম্পত্তির কানাকড়ি না পেলেও কোন ক্ষোভ ছিল না।

আপনি তাহলে এ কদিন এখানেই আছেন?

হ্যাঁ, শুক্রবার পর্যন্ত তো আছিই।

আচ্ছা আজ তাহলে উঠি। কিন্তু মধুসূদনবাবু এখনও ফিরলেন না তো!

ডেকে দেব বড়মামাকে?

না, প্রয়োজন নেই। বলবেন, পরে আবার দেখা হবে। কি সুশান্তবাবু, উঠবেন তো?

কিরীটীর ডাকে সুশান্ত যেন চমকে ওঠে। হ্যাঁ! হ্যাঁ—চলুন।

সুশান্ত ও কিরীটী সরকার ভিলা থেকে বের হয়ে এল।

রাস্তায় নেমে কিরীটী বললে, চলুন বিমলবাবুর ওখান থেকে একবার ঘুরে যাওয়া যাক।

হ্যাঁ চলুন, চা খাবার জন্য বিকেলে আজ অনুরোধ জানিয়ে গিয়েছিল সে অনেকবার। হয়তো খাপ্পা হয়ে আছে—

তা তো হওয়াই উচিত। আপনি তাকে যাবো বলে কথা দিয়ে গল্পে মেতে বেমালুম সব ভুলে বসে থাকবেন—

না, না—এমন কিছু নয়। এমনিই সাহিত্যের ব্যাপার নিয়ে গল্প হচ্ছিল ওঁর সঙ্গে সামান্য। ভদ্রমহিলার দেখলাম খুব পড়াশুনা আছে।

তাই বুঝি! তা সাহিত্যের কোন্ বিষয় নিয়ে গল্প হচ্ছিল আপনাদের? কাব্য, গল্প, উপন্যাস, না নাটক? কিরীটী প্রশ্ন করে।

রবীন্দ্রনাথের গান নিয়ে।

ও। আমি ভাবলাম বুঝি নাটক।

মানে?

না, কিছু নয়। তারপর হঠাৎ একসময় আবার চলতে চলতে কিরীটী বলে, তাস খেলতে নিশ্চয়ই আপনি জানেন সুশান্তবাবু?

তাস! মানে কার্ডস?

হ্যাঁ। সাহেব, বিবি, গোলাম, ছক্কা, পাঞ্জা, দুরি, তিরি, টেক্কা—চেনেন নিশ্চয় এগুলো?

চিনি, কিন্তু—কতকটা বিস্ময়ই প্রকাশ পায় সুশান্তর কণ্ঠস্বরে।

আচ্ছা বলুন তো, সাহেব বিবি গোলামের মধ্যে কোন্‌টা আপনার বেশী পছন্দ—মানে চেহারার ও নামের দিক দিয়ে বেশ, দেখতেও সুন্দর বা মনে ধরে?

কেন, সাহেব বিবি!

ঠিক বলেছেন। সাহেব বিবি—তবে একটা কথা মনে রাখবেন, সাহেবদের মেজাজ বুঝতে পারা গেলেও বিবিদের মেজাজ কিন্তু সত্যিই অনেক সময় দুর্বোধ্য!

কথাটা একটু স্পষ্ট করে বললে বাধিত হতাম।

সবই কি স্পষ্ট করে সব সময় বলা যায়! এই বোধ হয় সামনে থানা, তাই না?

হ্যাঁ।

কিন্তু থানায় গিয়ে বিমল সেনের পাত্তা পাওয়া গেল না।

কি একটা জরুরী তদন্তের ব্যাপারে ঐদিন বিকেলের দিকে সে নাকি মাইল দশেক দূরে একটা গ্রামে গিয়েছে।

কখন ফিরবে কিছু স্থির নেই।

অগত্যা দুজনকে ফিরতেই হল।

।। ষোলো ।।

সুশান্তদের বাড়ি থেকে স্থানীয় থানার দূরত্বটা একেবারে কম নয়। বেশ কিছুটা পথ। ছোট শহর।

মিউনিসিপ্যালিটির আলোর ব্যবস্থাও রাস্তায় তেমন যথেষ্ট নয়। তার উপরে রাতটাও ছিল কৃষ্ণপক্ষ।

দূরে দূরে রাস্তার দুপাশে যে কেরেসিনের আলোর ব্যবস্থা, তাতে করে আলোর চাইতে অন্ধকারটাই যেন বেশী জমাট বেঁধে ছিল।

সেই অন্ধকার পথ ধরে দুজনে বাড়ির দিকে মন্থর পদবিক্ষেপে হেঁটে চলেছিল পাশাপাশি।

সহসা কিরীটীই একসময় প্রশ্ন করে, থানা-ইনচার্জ বিমলবাবু তো আপনাদের বন্ধু, তাই না সুশান্তবাবু?

হ্যাঁ, একই কলেজে আমরা থার্ড ইয়ারে ও ফোর্থ ইয়ারে পড়েছি।

আচ্ছা সরকার ভিলার দুর্ঘটনা সম্পর্কে আপনাদের বন্ধুর সঙ্গে আপনাদের খোলাখুলি আলাপ কখনও হয়েছে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

তা হয়েছে বৈকি।

সারদাচরণের হত্যার ব্যাপারটা সম্পর্কে ওঁর মানে আপনাদের বন্ধুর ঠিক কি ধারণা জানেন কিছু বা বুঝতে পেরেছেন?

কথাটা ঠিক বুঝলাম না। মানে ঠিক আপনি কি জানতে চাইছেন মিঃ রায়?

বলছিলাম হত্যাকারী কে হতে পারে বলে তাঁর ধারণা? জানেন তো, এসব ডিটেকশনের ব্যাপারে প্রবাবিলিটি বলে একটা কথা আছে সেটার কথাই বলছিলাম।

সে সম্পর্কে একদিন আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম—

করেছিলেন? তা উনি কি জবাব দিলেন?

ওর ধারণা ঐ বৃন্দাবনবাবুই নাকি তাঁর কাকাকে হত্যা করেছেন।
কিরীটী কথাটা শুনে কিছুক্ষণ কোন জবাবই দিল না, যেমন চলছিল হেঁটে তেমনিই হাঁটতে লাগল। এবং কিছুক্ষণ স্তব্ধতার পর বললে, হুঁ। তা কেন উনি বৃন্দাবনবাবুকে সন্দেহ করছেন কিছু বলেছেন? তাঁর যুক্তি কি?
না, সেরকম কিছু বলেনি।
অবিশ্যি প্রবাবিলিটির দিক দিয়ে বৃন্দাবনবাবুকে যে তাঁর কাকার হত্যাকারী একেবারে ভাবা যায় না তা নয়, কিন্তু কথা হচ্ছে এসব ক্ষেত্রে শুধু সন্দেহটাই তো সব নয়, প্রমাণ এবং উদ্দেশ্য দুই থাকা চাই।
আচ্ছা মিঃ রায়?
বলুন!
এমনও তো হতে পারে, বৃন্দাবনবাবু কৃতদার ছিলেন এবং বয়সও তাঁর এখনও এমন কিছু বেশী নয়—
হ্যাঁ হ্যাঁ—বলুন, বলুন? প্রত্যেকেরই চিন্তার একটা মূল্য আছে জানবেন। আপনি কোন্ পথে চিন্তা করছেন ব্যাপারটা শোনাই যাক না, বলুন?
বলছিলাম শকুন্তলা দেবীর কথা।
খুব স্বাভাবিক সুশান্তবাবু। এই হত্যার ব্যাপারে শকুন্তলা দেবীর উপস্থিতি সরকার ভিলায় বিশেষ একটি সূত্র বা বলতে পারেন পয়েন্ট। কিরীটী বললে।
কিন্তু, কিরীটী একটু থেমে আবার বলে, কি আপনি সঠিক বলতে চাইছেন স্পষ্ট করে বলুন তো সুশান্তবাবু?
বলছিলাম শকুন্তলা দেবী ও বৃন্দাবনবাবুর ঐ ব্যাপারে একটা যোগসাজস তো পরস্পরের মধ্যে থাকতে পারে! সুশান্ত বললে।
আশ্চর্য নয়! তাহলে আপনার ধারণা—
ধারণা আমার কিছুই নয় মিঃ রায়, সব কিছু দেখেশুনে যা মনে হয়েছে তাই বললাম। সুশান্ত কিরীটীকে একপ্রকার বাধা দিয়েই বলে।
তাহলে তো আপনারও সাবধান হওয়া উচিত ছিল সুশান্তবাবু?
আমার সাবধান হওয়া উচিত!
নিশ্চয়। শেষ পর্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে বৃন্দাবনবাবু যদি আপনার সঙ্গেই ধরুন ডুয়েল লড়বার জন্য আবার আস্তিন গুটিয়ে এগিয়ে আসেন—
যাঃ, কি যে বলেন! লজ্জিত কণ্ঠে সুশান্ত প্রতিবাদ জানিয়ে ওঠে।
সাধে কি আর বলি—অপর পক্ষও যে আপনার প্রতি মুগ্ধ বলে মনে হল সামান্য সাক্ষাতেই।
কিরীটী হাসতে হাসতে শেষের কথাটা বলে।
না, না—আপনার ওটা ভুল মিঃ রায়!
ভুল! তা হবে। কিন্তু একটা কথা কি জানেন, এক ধরণের নারী আছে যাদের নিজেদের আকর্ষণ দিয়ে পুরুষকে টেনে এনে তাদের নিয়ে খেলাটাই একটা নেশা।
না, আমি কিন্তু ওঁর সম্পর্কে আপনার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না মিঃ রায়।
পারবেন না জানি, কারণ আপনি যে সেই অপর পক্ষ!
সত্যি বলুন তো মিঃ রায়, শকুন্তলা দেবীকে আপনি এখুনি যা বললেন—তাঁকে কি ঠিক

তাই মনে হয়?

পাল্টা প্রশ্ন করল সুশান্ত পরক্ষণেই কিরীটিকে।

সে কথা যাক, কিরীটী বললে, আপনি আমার একটা প্রশ্নের আগে জবাব দিন।

কি?

আপনার পরামর্শেই হোক বা যাই হোক, মধুসূদনবাবু ও তস্য ভ্রাতা বৃন্দাবনবাবু যে তাঁদের কাকার হত্যার ব্যাপারে আমাকে নিযুক্ত করেছেন, এতে কি ওঁদের উভয়েরই পূর্ণ সমর্থন আছে বলে মনে হয় আপনার?

নিশ্চয়ই।

কিসে বুঝলেন?

এটা তো আপনি স্বীকার করেন, নিজের আত্মীয়ের এভাবে রহস্যজনক মৃত্যু সম্পর্কে সত্যটা জানতে মানুষ মাত্রেরই ইচ্ছা হয়!

তা হয়তো হয়—কিন্তু সেটা কি সর্বক্ষেত্রেই হয়।

তবে কি আপনার ধারণা—

ধারণা আপাততঃ কিছুই নয় আমার সুশান্তবাবু। তবে আমার মনে হয়—

কি?

যাক্ সে কথা। এখন বলুন শুনি, ঐ কেতু সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?

কেতু?

হ্যাঁ—লোকটি মধুসূদনবাবুর মতে অজ্ঞাতকুলশীল এবং যে সারদাচরণের মৃত্যুর মাত্র কয়েক দিন পূর্বে সরকার ভিলায় রহস্যজনক ভাবে আবির্ভূত হয়ে আবার মৃত্যুর পরদিন সকাল থেকে রহস্যজনক ভাবে নিরুদ্দিষ্ট!

কি বলতে চান আপনি মিঃ রায়?

বলছি সে কি সারদাচরণকে মৃত জেনেই গা-ঢাকা দিয়েছে, না ব্যাপারটা না জেনেই নিরুদ্দিষ্ট হয়েছে?

তা কি করে হবে? মৃত্যুর ব্যাপারটা তো পরদিন সকালে শকুন্তলাই প্রথমে জানতে পেরেছে?

এমনও তো হতে পারে, তারও আগে জেনেছিল কেতু?

তা কি করে বলি বলুন!

তা বটে। তবে এটা ঠিকই জানবেন, সরকার ভিলার হত্যা-রহস্যের ব্যাপারে শ্রীমান কেতু দ্বিতীয় এবং প্রয়োজনীয় সূত্র। অর্থাৎ প্রথম সূত্র শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, দ্বিতীয় সূত্র শ্রীমান কেতু। আর—

আর?

আর ঐ শকুন্তলা ও কেতু—

কি?

ঐ দুজনের সরকার ভিলায় আবির্ভাবের মূলেই রয়েছে সারদাচরণের মৃত্যুবীজটি নিহিত।

না, না—তা কেমন করে হবে? শকুন্তলার মত একটি মেয়ে—highly cultured—কেতুর মত একটা চাকরের সঙ্গে—

কেন, ড্রাইভার বা ভৃত্যের সঙ্গে মনিব-কন্যা গৃহত্যাগিনী হয়েছে এমন নজিরের তো অভাব নেই! পঞ্চশরের ব্যাপার—কে কখন কানা হয় কিছু কি বলা যায় সুশান্তবাবু!

না না, কিরীটীবাবু—you are going too far!

সুশান্তবাবু, পৃথিবীটা বড় বিচিত্র। আপনার অভিজ্ঞতা কতটুকু? কিন্তু আমি এই অল্প বয়সেই দেখেছি অনেক।

তাই বলে একটা খোঁড়া কুৎসিত চাকর—

চাকরই বটে। যাক সে কথা। তবে একটা ব্যাপার, আপনার চোখ স্বচ্ছ থাকলে আপনিও দেখতে পেতেন কিছু।

কি?

আজ সকালে শকুন্তলা দেবীর ঘরে—

শকুন্তলা দেবীর ঘরে—কি?

সদ্য-প্রস্ফুটিত গোলাপের গুচ্ছ ও ধূপের প্রজ্বলন্ত কাঠি।

মানে?

মানে সব—সবটাই অভিনয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, কার সঙ্গে অভিনয় এবং কেনই বা ঐ অভিনয়টা করলেন শ্রীমতী?

মিঃ রায়!

তাই বলছিলাম সুশান্তবাবু, আপনার বয়েসটা বড় risky! ও কেয়ার ঝোপ—গন্ধে মাতাল হয়ে হুট করে হাত বাড়াবেন না—জানেন তো কেয়ার ঝোপের আশেপাশেই আত্মগোপন করে থাকে কালনাগ!

বিস্মিত দৃষ্টি তুলে সুশান্ত আবার অন্ধকারেই পথ চলতে চলতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

কিন্তু অন্ধকারে কিরীটীর মুখটা ভাল করে তাঁর নজরে পড়ে না।

সুশান্তর মনে হয়, কিরীটী যেন রীতিমত হেঁয়ালি করে কথা বলছে। তাই একসময় সে প্রশ্ন করে, আপনি যেন বড্ড হেঁয়ালি করে কথা বলছেন মিঃ রায়।

হেঁয়ালি নয়, সুশান্তবাবু। সহজ সত্যি কথাগুলোই বলছি। এবং আজকের এই হত্যারহস্যের আসল সত্যটা যেদিন আপনার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে, দেখবেন মিলিয়ে—আজ যা বলছি মিথ্যা বা অতিশয়োক্তি নয় এর কিছুই। কিন্তু বাড়ির কাছে এসে পড়েছি—চলুন চায়ের পিপাসায় গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে উঠেছে। এক কাপ চায়ের প্রয়োজন বর্তমানে সবচাইতে বেশী।

রাত্রে খাবার টেবিলে বসেও আবার সরকার ভিলার-মৃত্যু-রহস্যের আলোচনাতেই ফিরে যায় ওরা।

কিরীটী একসময় কথায় কথায় বলে, সারদাবাবুর উইলটার একটা বিশেষ গুরুত্ব আছে জানবেন। তাঁর এই রহস্যজনক হত্যার ব্যাপারে আমার যতদূর ধারণা—

উইল তো বোধ হয় কাল-পরশুর মধ্যেই পড়া হবে!

হ্যাঁ—আর উইলের মর্মকথাটা একান্তভাবেই জানা দরকার।

উইল খোলা হলেই তা জানতে পারবেন!

তা জানতে পারব, তবে সে সময় আমি উপস্থিত থাকতে চাই—

সে আর এমন কঠিন ব্যাপার কি? মধুসূদনবাবুকে আপনি বললেই হয়তো রাজী হবেন তিনি।

কাল সকালেই সরকার ভিলায় একবার গিয়ে অনুরোধটা তাঁকে জানাব ভাবছি।

বেশ তো।

পরের দিন সকালেই কিরীটী সরকার ভিলায় গেল।

বাইরের ঘরে মধুসূদনের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল কিরীটীর।

মধুসূদন ও শকুন্তলা বসে প্রভাতী চা-পান করছিলেন।

এই যে মিঃ রায়, আসুন আসুন—একেবারে সকালেই যে! কোন মীমাংসায় পৌঁছতে পারলেন নাকি? মধুসূদন আহ্বান জানালেন।

না, ব্যাপারটা বড় জটিল বলে মনে হচ্ছে—বলতে বলতে তির্যক দৃষ্টিতে একবার তাকালো কিরীটী মধুসূদনের মুখোমুখি উপবিষ্ট শকুন্তলার দিকে।

তাহলে এখনও কিছু বুঝতে পারেননি?

না। কিন্তু একটা request ছিল—

বলুন?

আপনার কাকার উইল কবে পড়া হচ্ছে?

বোধ হয় তো কালই, কিন্তু কেন বলুন তো?

আমি যদি সে-সময় উপস্থিত থাকি, আপত্তি হবে আপনার?

বিলক্ষণ, আপত্তি কিসের! নিশ্চয়ই থাকবেন।

তাহলে সেই কথাই রইল। আপনি আমাকে একটা খবর পাঠাবেন।

নিশ্চয়ই। কিন্তু এক কাপ চা খাবেন না?

না, এখন একবার থানায় বিমলবাবুর ওখানে যাব ভাবছি। কাল তাঁর ওখানে গিয়ে দেখি উনি থানায় নেই!

বেশ।

কিরীটী সরকার ভিলা থেকে অতঃপর বের হয়ে এল।

।। সতেরো ।।

বৃন্দাবন সরকার ইচ্ছা করে ভাগ্নে বিজনকে সরকার ভিলায় আমন্ত্রণ করে আনেননি জরুরী চিঠি দিয়ে।

মৃত সারদাচরণের নির্দেশমতই বিজনকে আসার জন্য তাঁকে চিঠি দিতে হয়েছিল। এবং শুধু বিজনকেই নয়, আরও দুজন ভদ্রলোকও পরের দিন বৃন্দাবন সরকারের সঙ্গে কলকাতা হতে এলেন ঐ উইলের নির্দেশমতই।

একজন সারদাচরণের বিশেষ পরিচিত বাল্যবন্ধু ডাঃ বাসুদেব অধিকারী, অন্যজন সারদাচরণের আত্মীয় অর্থাৎ সারদাচরণের ভগ্নীপতি রতিকান্ত মল্লিক।

ডাঃ অধিকারী ও রতিকান্ত মল্লিক দুজনেরই বয়স হয়েছে, প্রৌঢ়।

সলিসিটার শচীবিলাস বসুও এলেন ওঁদের সঙ্গে।

চল্লিশের ঊর্ধ্বে বয়স হয়েছে শচীবিলাসের।

পরের দিন শুক্রবার সকলে এসে বিকেল পাঁচটা নাগাদ সরকার ভিলার লাইব্রেরী ঘরে

জমায়েত হলেন।

মধুসূদন সরকার, বৃন্দাবন সরকার, বিজন, ডাঃ বাসুদেব অধিকারী, রতিকান্ত মল্লিক ও কিরীটী রায়।

মাঝখানে বসলেন সলিসিটার শচীবিলাস এবং তাঁকে ঘিরে বসলেন অন্যান্য সকলে।

সকলের উপস্থিতিতেই শচীবিলাস তাঁর ফোলিও থেকে একটি সিল-করা পুরু লেপাফা বের করলেন ও সিল ভেঙে সারদাচরণের শেষ উইলটি বের করলেন।

উইলের সারমর্ম শুনে কিরীটী রীতিমত অবাক হয়ে যায়।

বিরাট সম্পত্তির মালিক ছিলেন সারদাচরণ সরকার।

স্থাবর, অস্থাবর, ব্যবসা ও নানা ধরনের সম্পত্তি মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি।

এবং সেই সম্পত্তির ভাগ-বাটোয়ারার যে নির্দেশ তিনি দিয়ে গিয়েছেন তা হচ্ছে এইরূপঃ

কলকাতা, বোম্বাই ও দিল্লীর জুয়েলারী ব্যবসার দুইয়ের তিন অংশ দিয়ে গিয়েছেন তিনি বৃন্দাবন সরকারকে এবং বাকি একের তিন অংশ নিরুদ্দিষ্ট মধুসূদন সরকারকে।

কলকাতার বাড়িটা দিয়েছেন বিজনকে। সরকার ভিলা দিয়েছেন শকুন্তলা দেবীকে জীবনস্বত্বে। ব্যাঙ্কের নগদ এক লক্ষ টাকা সমান ভাগে অর্ধেক দিয়েছেন ডাঃ বাসুদেব অধিকারী ও রতিকান্ত মল্লিকের হাতে একটি দাতব্য হাসপাতাল তৈরীর জন্য—তাঁর মৃত জ্যেষ্ঠ রণদাচরণের স্মৃতিরক্ষার্থে এবং বাকী অর্ধেক সমান ভাগে বৃন্দাবনের কন্যাকে এবং বিজনকে। মধুসূদন যদি জীবিত না থাকে, তার অংশ সব পাবে বৃন্দাবন।

উইল পড়া শেষ করে শচীবিলাস উইলটা ভাঁজ করছেন, ভৃত্য ট্রে-তে করে গরম চা নিয়ে এল ঘরে।

ট্রে-টি ছোট এবং তাতে মাত্র চারটি কাপই সাজানো।

মধুসূদন ভৃত্যের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ কি, চার কাপ আনলি কেন?

ট্রে-টা ছোট, তাই আনতে পারিনি, এখুনি আনছি। বললে ভৃত্য।

কেন, দুটো ট্রেতে সাজিয়ে দুজনে নিয়ে আসতে পারনি? যত বেটা উজবুক এসে এ-বাড়িতে জুটেছে! বলে মধুসূদন নিজেই সোফা থেকে উঠে ঘর থেকে বের হয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বৃন্দাবন বাধা দিলেন, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা, ও এখুনি নিয়ে আসবে, তুমি বোস।

ভৃত্য তখনও বকুনি খেয়ে ট্রে-টা হাতে করেই দাঁড়িয়ে আছে।

আবার হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখ! কোণের ঐ টেবিলে ট্রে-টা নামিয়ে কাপগুলো হাতে হাতে দে না!

মধুসূদন আবার ঝাঁজিয়ে উঠলেন ভৃত্যকে।

ভৃত্য এধারে ঘরের কোণে যে বড় টেবিলটা ছিল, সেটার উপর নিয়ে গিয়ে ট্রে-টা নামিয়ে রাখল।

মধুসূদন তখন সেই টেবিলের কাছে এগিয়ে যান।

যা, বাকি কাপগুলো নিয়ে আয়। মধুসূদন আবার বললেন ভৃত্যকে।

ভৃত্য বাইরে চলে গেল।

এবং একটু পরে বাকি তিন কাপ চা নিয়ে এসে টেবিলের উপর নামিয়ে রাখল।

সকলের হাতেই অতঃপর মধুসূদনের নির্দেশে এক কাপ করে চা এগিয়ে দিল ভৃত্য।

তোমরা শুরু কর, আমি আসছি এখুনি। বলে মধুসূদন ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন পুনরায়।

সকলেই হাতে চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দিতে উদ্যত। এবং সর্বাগ্রে বোধ হয় বিজনই চায়ের কাপে চুমুক দিল।

কিন্তু দ্বিতীয় চুমুক দেওয়ার আগেই বিজনের কম্পিত হাত থেকে কাপটা নিচের মেঝের কার্পেটের উপর সশব্দে পড়ে গেল।

এবং সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটা কাতরোক্তি করে বিজন যে সোফার উপরে বসেছিল সেই সোফার উপরেই এলিয়ে পড়ল।

কি—কি হল? ব্যাপার কি, বিজনবাবু? বলতে বলতে সকলেই ততক্ষণে যে যার আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় এবং বিজনের দিকে এগিয়ে আসে।

কিরীটীর এগিয়ে আসে ক্ষিপ্রপদে।

নিদারুণ যন্ত্রণায় বিজনের সমস্ত মুখের পেশীগুলো তখন কুঞ্চিত ও প্রসারিত হচ্ছে।

দুটি চক্ষু বিস্ফারিত। কি যেন বলবার চেষ্টা করে কিন্তু পারে না বিজন, কথা জড়িয়ে যায়।

সকলের উৎকণ্ঠিত চোখের দৃষ্টির সামনেই সহসা বিজনের মাথাটা একপাশে কাত হয়ে পড়ল পরক্ষণেই।

অভাবিত আকস্মিক পরিস্থিতি।

সকলেই শুধু নিস্পন্দ বাক্যহারা নয়, বিমূঢ়।

কিরীটী সর্বাগ্রে বিজনের স্থির-নিস্পন্দ দেহটা বারেকের জন্য স্পর্শ করে ডাঃ অধিকারীর দিকে তাকিয়ে বললে, দেখুন তো ডাঃ অধিকারী—

বিমূঢ় ডাঃ অধিকারী কেমন যেন শ্লথ পায়ে এগিয়ে এলেন কিরীটীর নির্দেশে এবং নিস্পন্দ বিজনের পাল্‌সটা একবার দেখেই তার হাতটা ছেড়ে দিয়ে, বিষণ্ণ কাতর দৃষ্টিতে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন কেবল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই মধুসূদন ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে, বিজনকে ঘিরে সকলকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলেন, কি—ব্যাপার কি?

বিজন ইজ ডেড মধুসূদন। ডাঃ অধিকারী বললেন।

সে কি!

হ্যাঁ, হি ইজ নো মোর! ইন্সট্যানটেনিয়াস ডেথ হয়েছে বিজনের!

কিরীটীও যেন ডাঃ বাসুদেব অধিকারীর কথায় স্তব্ধবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিল ক্ষণেকের জন্য, কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার নিজেকে সামলে নিয়ে নিচু হয়ে মেঝের কার্পেট থেকে কাপটা তুলে নিতে গিয়ে দেখল, কিছুক্ষণ পূর্বে তাদের সকলের দৃষ্টির সামনে মেঝেতে বিজনের হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল যে কাপটা—ইতিমধ্যে বিজনের সোফার তলায় চলে গিয়েছে কোন্ এক সময়।

কারও পায়ের ধাক্কায় বোধ হয় কাপটা সোফার নিচে চলে গিয়েছিল।

কিরীটী সোফার নিচে হাত ঢুকিয়ে কাপটা তুলে নিল।

কাচের কাপের গায়ে তখন চা লেগে রয়েছে।

ডাঃ অধিকারীর উচ্চারিত কথাটা যেন ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলকেই একেবারে বোবা করে দিয়েছিল।

মৃদুকণ্ঠে কিরীটী যেন কতকটা আত্মগত ভাবেই বললে, এমন আকস্মিক মৃত্যু—

শচীবিলাস বললেন, হঠাৎ এভাবে হার্টফেল করলেন, কোন অসুখ-বিসুখ ছিল নাকি

ভদ্রলোকের মিঃ সরকার?

বৃন্দাবন অসহায় ভাবে মাথা নেড়ে বললেন, কই, সেরকম কিছু রোগ ওর ছিল বলে তো শুনিনি!

আকস্মিক হার্টফেল বলেই কি আপনার মনে হয়, ডাঃ অধিকারী? সহসা কিরীটী ডাঃ অধিকারীর দিকে চেয়ে প্রশ্নটা করল।

হ্যাঁ!

বলছিলাম পয়েজনিং নয় তো? কিরীটী আবার বলে।

পয়েজনিং! বিস্মিত ডাঃ অধিকারী এবারে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ, নিকোটিন পয়েজনিং নয় তো?

নিকোটিন পয়েজনিং!

একটা অভিশপ্ত চাপা কান্নার মতই যেন মৃদুচ্চারিত বৃন্দাবনবাবুর কথাটা ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলকে একটা বৈদ্যুতিক শক দেয় অকস্মাৎ।

হ্যাঁ, একান্ত দুঃখের সঙ্গেই বলতে বাধ্য হচ্ছি আমি, এটাও বোধ হয় হত্যা। কিরীটী আবার বললে।

হত্যা! কি বলছেন মিঃ রায়? প্রশ্নটা করলেন মধুসূদন সরকার এবারে।

মনে তো হচ্ছে তাই। তবে ময়না তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত অবিশ্যি কিছু ডেফিনিট বলা যাচ্ছে না। তবু মধুসূদনবাবু, আপনি এখুনি একবার থানার বিমলবাবুকে খবর দিন।

আরও ঘন্টাখানেক পরে। সংবাদ পেয়েই বিমলবাবু ছুটে এসেছে।

বিমল সব শুনে বলে, তাহলে আপনার ধারণা মিঃ রায়, ইটস এ সিমিলার কেস!

আমার তো তাই বলেই মনে হচ্ছে। এই কাপটা একবার অ্যানালিসিস করতে পাঠাতে পারেন?

তবে আমার মনে হয়—

কি?

এবারও হয়ত পূর্বের মতই অ্যানালিসিস করেও কিছুই পাবেন না ওতে।

হুঁ। আচ্ছা মধুসূদনবাবু, চা তৈরী করেছিল কে? বিমল সহসা প্রশ্ন করে।

তা তো জানি না। তবে চাকরদের মধ্যেই কেউ হবে।

কিরীটী ঐ সময়ে বলে, যে ভৃত্যটি এ ঘরে চা ট্রে-তে করে নিয়ে এসেছিল তার নাম গোকুল না, বৃন্দাবনবাবু?

হ্যাঁ।

তাকে একবার ডাকুন তো! কিরীটী বলে।

তখুনি গোকুলকে ডাকানো হল ঐ ঘরে।

ভৃত্যদের মহলেও দুঃসংবাদটা ততক্ষণে পৌঁছে গিয়েছে।

বেচারী কাঁপতে কাঁপতে ঘরে এসে ঢুকল।

গোকুল, চা কে তৈরি করেছিল আজ? কিরীটীই প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে দিদিমনি করেছেন, আর আমি সব যোগাড় করে দিয়েছি।

দিদিমণি অর্থাৎ শকুন্তলা দেবী।

আর সেখানে কেউ ছিল? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

আজ্ঞে না।

চা করতে করতে তুমি বা দিদিমণি একবারও গিয়েছিলে বাইরে ঘর থেকে?

আজ্ঞে আমি একবার গিয়েছিলাম, দিদিমণিও বার-দুই গিয়েছিলেন বোধ হয়।

সেসময় কেউ সে-ঘরে ঢুকেছিল কি?

তা তো জানি না।

হুঁ। আচ্ছা তুমি যেতে পার।

গোকুল কাঁপতে কাঁপতেই আবার চলে গেল।

তাহলে মিঃ রায়—

মধুসূদন সরকারের প্রশ্নে তাঁর দিকে তাকিয়ে কিরীটী বললে, এমনও তো হতে পারে মধুবাবু, এ ঘরে ট্রে-তে করে চা আসবার পর কেউ কিছু কাপে মিশিয়ে দিয়েছে সবার অলক্ষ্যে, বিশেষ করে আমরা তো সবাই তখন কথাবার্তায় অন্যমনস্ক ছিলাম।

কথা বললেন এবারে বৃন্দাবন সরকার, কিন্তু তাই যদি হয়ে থাকে তো এতগুলো কাপের মধ্যে মাত্র একটা চায়েই বিষ মেশানো হল। এবং সেক্ষেত্রেও কেবল ইচ্ছা করেই যদি কেউ কাউকে হত্যা করবার জন্য আপনার ধারণামতই কাপে বিষ মিশিয়ে থাকে, তাহলে যাকে হত্যা করবার জন্য ঠিক বিষ মেশানো হয়েছিল, সেই বিশেষজন সে কাপটা না নিয়ে যদি এ-ঘরের মধ্যে অন্য কেউ সে কাপটা নিত, তবে কি—

নিঃসন্দেহে সে-ই ঐ কাপটার চা পান করত তারই মৃত্যু হত বৃন্দাবনবাবু। সেদিক দিয়ে হয়ত হত্যাকারী একটা চান্সই নিয়েছিল।

চান্স?

হ্যাঁ, কিন্তু কেবল বিজনবাবুর কথাই ভাবছেন কেন? হত্যাকারী হয়ত আপনি, মধুবাবু ও বিজনবাবু—তিনজনের উপরেই অ্যাটেম্পট্ নিয়েছিল আজ।

সে কি?

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো তাই বৃন্দাবনবাবু। কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বলে।

কিন্তু শকুন্তলা দেবীকে একবার ডাকলে হত না মিঃ রায়? বিমল বললে।

ডাকিয়েও কোন কিনারা করতে পারবেন বলে তো আমার মনে হয় না বিমলবাবু আজকের এই রহস্যের! কিরীটী শান্তকণ্ঠে বললে।

তাহলে?

আপাততঃ ঐ মৃতদেহটা এখান থেকে সরিয়ে ময়নাতদন্তে পাঠাবার ব্যবস্থা করুন। আর যতক্ষণ না এই হত্যা-রহস্যের তদন্ত শেষ হয়, কেউ যেন এ বাড়ি থেকে না যান সেই নির্দেশই সকলকে আপনি দিন।

কিরীটীর কথায় সকলেই চমকে তার মুখের দিকে তাকাল।

কিন্তু যাকে কথাটা বলা হল সেই বিমলবাবু কারও দিকে না তাকিয়েই গম্ভীর কণ্ঠে বললে, তাহলে কেউ আমার পারমিশন ব্যতীত এ বাড়ি ছেড়ে যাবেন না—এই কথাই রইল।

কেউ কোন সাড়া দিল না।

সবাই নির্বাক নিস্পন্দ যেন।

কিরীটী যে তখনকার মত 'সরকার ভিলা' থেকে সকলের যাওয়াই বন্ধ করল তাই নয়, নিজেও সে রাত্রের মত 'সরকার ভিলা' থেকে যাবে না বলেই সুশান্তকে একটা সংবাদ তখুনি বিমলের এক সেপাইয়ের সাহায্যে পাঠিয়ে দিতে বলল।

এবং শুধু সে রাত্রেই নয়।

পর পর আরও চারিটি দিন ও রাত সরকার ভিলার চৌহদ্দির মধ্যে ঐ লোকগুলোকে খাঁচায় আবদ্ধ জানোয়ারের মতই যেন বন্দী হয়ে থাকতে হয়েছিল।

একমাত্র ছুটি পেয়েছিলেন পরের দিন ঐ দল থেকে সারদাচরণের সলিসিটার শচীবিলাসবাবু।

আর কেউ বাইরে পা বাড়াবার হুকুম পাননি দারোগা বিমল সেনের কাছ থেকে কিরীটীরই নির্দেশে।

সত্যি, সে এক বিচিত্র পরিস্থিতি।

বিশেষ করে কথার ছলে সেই রাত্রেই যখন সকলের সামনে দাঁড়িয়ে কিরীটী বলেছিল, সারদাচরণ, দশরথ ও বিজনবাবুর হত্যাকারী একজনই—এবং সে হত্যাকারী তখনও তাদের মধ্যে ঐ সরকার ভিলাতেই উপস্থিত আছে, তখন কিরীটীর কথায় সেরাত্রে উপস্থিত সকলেই মুহূর্তের জন্য পরস্পরের প্রতি অপাঙ্গে দৃষ্টিপাত করে অজানিত এক দুর্বোধ্য আশঙ্কায় মনে মনে শিউরে উঠেছিল বুঝি।

একটা সত্য কথা উচ্চারণের মধ্যে যে এমন একটা ভয় আতঙ্ক থাকতে পারে, সেটা যেন সকলেই সেদিন মর্মে মর্মে অনুভব করেছিল।

অথচ কেউ সেদিন এতটুকু প্রতিবাদও জানাতে পারেনি।

একটা দুর্বোধ্য আতঙ্কে কেমন যেন সব বোবা হয়ে ছিল।

থানা-অফিসার বিমল সেন তো তাঁর চরম নির্দেশটা শুনিয়ে দিয়ে সরকার ভিলার চারিদিকে সর্বদা সতর্ক প্রহরার ব্যবস্থা করে সে রাত্রের মত বিদায় হল, কিন্তু যারা সেই খাঁচার মধ্যে বন্দী রইল তাদের তো একটা থাকবার ও খাবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

সরকার ভিলাতে অবিশ্যি থাকবার জায়গার অভাব ছিল না।

কিরীটীর নির্দেশে তখুনি মধুসূদন সরকার সকলের ব্যবস্থা করবার জন্য চলে গেলেন।

এবং ঘণ্টাখানেক বাদেই মৃতদেহ ঐ লাইব্রেরী ঘর থেকে সরিয়ে বাড়ির বাইরে উদ্যানের মধ্যে যে মালীদের ঘরটা ছিল সেই ঘরে রেখে আসা হল রাত্রের মত।

সকলে এসে নিচের পারলারে জমায়েত হলেন আবার।

প্রৌঢ় ডাক্তার অধিকারী একসময় কিরীটীকে বললেন, এ কি বিশ্রী ঝঞ্ঝাটে পড়া গেল বলুন তো মিঃ রায়!

আমি বুঝতে পারছি ডাঃ অধিকারী আপনার মনের অবস্থাটা, কিন্তু বিশ্বাস করুন আপনি, এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন পথ সত্যিই ছিল না।

কিন্তু সত্যিই কি আপনি মনে করেন মিঃ রায়, আজ যারা এখানে এ বাড়িতে উপস্থিত তাদের মধ্যে সামবডি—

তাই আমার ধারণা ডাঃ অধিকারী। এর আগে এই বাড়িতেই দুটি নৃশংস হত্যার ব্যাপার আপনি তো শুনেছেন—

হ্যাঁ, শুনেছি।

একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন, পর পর এই তিনটি মৃত্যুই আকস্মিক ও রহস্যজনক হলেও একই সূত্রে গাঁথা।

কিন্তু—

বুঝতে পারছি ডাঃ অধিকারী, আপনি কি বলতে চান। প্রথম দুটো হত্যার সময় অকুস্থানে তৃতীয় কোন ব্যক্তি ছিল কিনা আপাততঃ সেটা যদিও আমরা জানি না বা জানতে পারিনি বটে, কিন্তু ভেবে দেখুন তৃতীয় মৃত্যুর সময় আমরা এতগুলো লোক সজ্ঞানে অকুস্থানে উপস্থিত ছিলাম!

তাই তো ব্যাপারটা এখন আমার কিছুই বোধগম্য হচ্ছে না।

তা না হলেও এটা তো আপনি স্বীকার করবেন, প্রথম ও দ্বিতীয় দুটো হত্যাই হয়েছে তীব্র নিকোটিন বিষপ্রয়োগে?

তাহলে দশরথের মৃত্যুর কারণও আপনার ধারণা মিঃ রায় ঐ একই?

ধারণা নয়, তাই। কারণ আজ একটু আগে বিমলবাবু আমাকে সেকথা বলে গেলেন। তাহলেই ভেবে দেখুন, বিষপ্রয়োগের কোন প্রমাণ—অর্থাৎ কে কার দ্বারা, কি উপায়ে তাদের বিষপ্রয়োগ করা হয়েছিল সেটার কোন প্রমাণ এখনও পর্যন্ত না পাওয়া গেলেও ময়নাতদন্তে তাদের দেহে বিষ পাওয়া গিয়েছে,—যার দ্বারা তাদের যে বিষের ক্রিয়াতেই মৃত্যু ঘটেছে সে সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। তারপর দেখুন, তিন-তিনটে মৃত্যু একই বাড়ির বিভিন্ন ঘরে হয়েছে এবং একই বাড়ির লোক তারা!

কিন্তু এটাই তো আমি বুঝতে পারছি না মিঃ রায়, আপনার কথা যদি সত্যি বলে ধরে নেওয়া যায়ই, তাহলে এই ধরনের ডায়বলিক্যাল মার্ডারের কি উদ্দেশ্য কার থাকতে পারে?

সেটা তো পরের কথা। কিন্তু একটা কথা কি জানেন ডাঃ অধিকারী, এসব ব্যাপারে বরাবরই আমার দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার দ্বারা দেখেছি, সরলভাবে বিচার করে দেখতে গেলে প্রত্যেকটি এই ধরনের হত্যার ব্যাপারেই 'মোটিভ' বা উদ্দেশ্য, 'অপরচুনিটি' বা সুযোগ এবং 'প্রবাবিলিটি' বা সম্ভাবনা তিনটি জিনিসই থাকবে। অবিশ্যি এর মধ্যে মোটিভই হচ্ছে সর্বপ্রধান—মুখ্য। অন্য দুটি গৌণ। সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে প্রথম ও তৃতীয় হত্যার 'মোটিভ' আমাদের চোখের সামনে থাকলেও, দ্বিতীয় হত্যার মোটিভটি অবিশ্যি তত স্পষ্ট নয়।

কি মোটিভ? ডাঃ অধিকারী আবার প্রশ্ন করলেন।

কেন? সেই চিরাচরিত মোটিভ—অর্থ!

অর্থ?

হ্যাঁ, অর্থম্ অনর্থম্! সারদাচরণ সরকারের সুবিপুল সম্পত্তি, যার হদিস আজই আমরা শচীবিলাসবাবুর কাছ থেকে কিছুক্ষণ মাত্র আগে পেয়েছি—

তাই যদি হয় তো দশরথ কেন নিহত হল?

দশরথ বেচারী প্রথম হত্যার ব্যাপারে এমনভাবে জড়িত হয়ে পড়েছিল,—যে কারণে হত্যাকারীর চোখে তার মৃত্যুটা একান্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল!

মধুসূদনবাবু অবিশ্যি সেরাত্রে সকলের আহারের ভাল ব্যবস্থাই করেছিলেন। কিন্তু আহারের এতটুকু রুচিও কারো ছিল না বুঝি, তাই সকলেই গিয়ে নিয়মরক্ষার জন্য খাবার টেবিলে বসলেন মাত্র।

এবং একসময় সকলে আবার টেবিল ছেড়ে উঠে যে যাঁর নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে যেন শ্লথপায়ে প্রবেশ করে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

সেরাত্রে নিদ্রা যে কারও চোখে আসবে না বা আসতে পারে না, সকলেই অবিশ্যি সেটা জানতেন—তবু কেউ যেন আর বসে থাকতে পারছিলেন না।

যে যাঁর নির্দিষ্ট শয়নঘরে প্রবেশ করে যেন সন্ধ্যা থেকেই সেই একটানা দুর্বিষহ মানসিক যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে সে রাতের মত নিশ্চিন্ত হলেন কতকটা।

মধুসূদন সরকারের পাশের ঘরেই কিরীটীর শয়নের ব্যবস্থা হয়েছিল সে রাত্রে।

রাত্রি গভীর।

সরকার ভিলার ঘরে ঘরে একে একে আলো নিভে গিয়েছে।

কিরীটী তার ঘরের খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বাইরের অন্ধকারের দিকে দৃষ্টি মেলে ধূমপান করছিল।

ঘর অন্ধকার।

সরকার ভিলার মৃত্যু-রহস্যের সমাধান করে ওখান থেকে চলে আসবার পূর্বে সুশান্ত প্রশ্ন করেছিল কিরীটীকে, ওভাবে সেদিন সকলকে সরকার ভিলায় আটকে রেখেছিলেন কেন মিঃ রায়?

জবাবে কিরীটী বলেছিল, তা না করলে হয়ত হত্যাকারীকে অত সহজে আমি ধরতে পারতাম না সুশান্তবাবু।

তাহলে বলুন, হত্যাকারীকে আপনি মনে মনে চিনতে পেরেছিলেন ঐদিনই?

তা পেরেছিলাম বইকি! মৃদু হেসে কিরীটী জবাব দিয়েছিল।

।। আঠারো ।।

কিন্তু যাক সে কথা।

সেই রাত্রির কথায়ই ফিরে আসা যাক।

অন্ধকার ঘর।

ক্যাঁচ করে মৃদু শব্দ হতেই চকিতে কিরীটী ঘুরে দাঁড়ালো।

কিরীটীর ঘরের দরজা ভেজানোই ছিল।

নিঃশব্দে সেই দরজার ভেজানো কপাট দুটো যেন ধীরে ধীরে একটু একটু খুলে যাচ্ছে।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে কিরীটী সেই দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

দরজাটা খুলছে।

একটু একটু করে খুলছে।

তারপরই দীর্ঘ একটা ছায়ামূর্তি ঘরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল অন্ধকারে।

কে?

মিঃ রায় জেগে আছেন? আমি—

আসুন। কিন্তু কি ব্যাপার বৃন্দাবনবাবু, এত রাত্রে? ঘুমোননি?

না মিঃ রায়, ঘুম আসছে না।

দাঁড়িয়ে কেন বৃন্দাবনবাবু, বসুন ঐ চেয়ারটায়।

বৃন্দাবন সরকার কিন্তু বসলেন না। দাঁড়িয়েই রইলেন।

মিঃ রায়! একসময় মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন।

বলুন?

আপনি আজ সন্ধ্যার সময় যা বললেন, সত্যিই কি আপনি তাই বিশ্বাস করেন?

কি?

এই বাড়িরই একজন—

আমার ধারণা তাই বৃন্দাবনবাবু। শান্তকণ্ঠে কিরীটী বলে কথাটা।

কিন্তু বিশ্বাস করুন, আপনি মিঃ রায়, আমি—

একটা কথার জবাব দেবেন বৃন্দাবনবাবু?

কি?

শকুন্তলা দেবী সম্পর্কে আপনার সত্যি কি ধারণা?

না না—সি—সি ইজ বিয়ণ্ড অল ডাউটস্!

কিন্তু একটা কথা কি আপনি জানেন বৃন্দাবনবাবু, বৃদ্ধ বয়সে আপনার কাকা সারদাবাবুর ঐ শকুন্তলার প্রতি তীব্র একটা আকর্ষণ জন্মেছিল?

আমি—আমি তা জানতে পেরেছিলাম মিঃ রায়—

জানতে পেরেছিলেন?

হ্যাঁ।

তাহলে কি আপনারও শকুন্তলার প্রতি মনে মনে—

না না, আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়—

সেই বিশ্বাসের জোরেই তো বলছি—

এবার আর কোন প্রতিবাদই জানাতে পারেন না বৃন্দাবন সরকার। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন।

রাত অনেক হল, যান এবার ঘুমোবার চেষ্টা করুনগে বৃন্দাবনবাবু।

চোরের মতই যেন মাথা নীচু করে ঘর থেকে অতঃপর বৃন্দাবন সরকার বের হয়ে গেলেন।

অন্ধকারে নিঃশব্দে একবার হাসল কিরীটী।

তারপর আধ ঘন্টাও অতিবাহিত হয়নি, কিরীটীর ঘরের ভেজানো দরজার কবাট দুটো পুনরায় নিঃশব্দে খুলে গেল।

কে?

আমি—

আসুন মধুসূদনবাবু। ঘুম হল না বুঝি? কিন্তু দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।

মধুসূদন চেয়ারটার উপর উপবেশন করলেন।

মিঃ রায়।

বলুন?

এ কি হল মিঃ রায়। সত্যি আমার মত হতভাগ্য বুঝি এ জগতে আর কেউ নেই। দীর্ঘ দশ বছর পরে কত আশা নিয়েই না ঘরে ফিরেছিলাম, কিন্তু কোথা থেকে কি সব হয়ে গেল! ঐ বিজন—দিদি যখন মারা যায় ওর বয়স মাত্র আট কি দশ—ওকে আমিই বুকে-পিঠে করে মানুষ করেছি। বাড়িতে ফিরে ও বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছে শুনে ভেবেছিলাম আবার ওকে ফিরিয়ে নিয়ে আসব। নিজে বিয়ে-থা করিনি, ও আমার সন্তানের মতই ছিল—কথাগুলো বলতে বলতে মধুসূদন সরকারের গলাটা ভারী হয়ে আসে, চোখের কোল দুটো অশ্রুতে সজল হয়ে ওঠে।

কি করবেন বলুন মধুসূদনবাবু, যা হবার হয়ে গিয়েছে।

না, না মিঃ রায়, এখনও আমি ভাবতেই পারছি না, বিজন নেই—হি ইজ ডেড, এ যেন এখনও স্বপ্নের মতই বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। এখানে আর একটি মুহূর্ত আমি টিকতে পারছি না মিঃ রায়, অনুগ্রহ করে আমাকে এখান থেকে কাল সকালেই যাবার অনুমতি দিন। আর নয়—আমি আবার সেই মগের মুল্লুকেই ফিরে যাব। এখানে থাকলে সত্যিই বলছি পাগল হয়ে যাব!

কিন্তু যাকে আপনি প্রাণের চাইতেও ভালবাসতেন, তাকে যে এমনি করে নিষ্ঠুর ভাবে হত্যা করলে, তাকে এত সহজে নিষ্কৃতি দেবেন?

দেবো না নিশ্চয়ই—এবং জানতে পারলে তাকে আমি গলা টিপে শেষ করতাম! উত্তেজনায় মধুসূদনের কণ্ঠস্বরটা কাঁপতে থাকে।

আর আপনার অনুরোধেই এই হত্যা-রহস্যের তদন্তের ভার আমি হাতে নিয়েছি। এক্ষেত্রে আপনিই যদি চলে যান তো আমার এখানে থাকার অর্থই হয় না মধুসূদনবাবু।

কিন্তু মিঃ রায়—

শুনুন মিঃ সরকার, আমি মনে মনে একটা প্ল্যান করেছি, আর প্ল্যানটা যদি আমার সাকসেসফুল হয় তো দু-একদিনের মধ্যেই এ রহস্যের একটা হয়তো কিনারা করতে পারব বলে আশা করি।

কি প্ল্যান মিঃ রায়?

বসুন আপনি, আমি বলছি।

কিন্তু আপনি কি সত্যিই কাউকে এ ব্যাপারে সন্দেহ করেছেন মিঃ রায়?

অনুমান মাত্র। অনুমান অবিশ্যি ভুল হতে পারে, তাই আপনার সাহায্য নিয়ে আমার অনুমান সত্যি কি মিথ্যা যাচাই করে দেখতে চাই মিঃ সরকার একটিবার!

বেশ, বলুন। আমি আপনাকে সাধ্যমত আমার সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।

তারপর দুজনে বসে এক ঘণ্টা ধরে নানা আলোচনা করল।

আলোচনা-শেষে কিরীটী বললে, বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়ই আমার প্ল্যানটা?

হুঁ, বুঝেছি। কিন্তু—

আর কিন্তু নয় মিঃ সরকার—রাত প্রায় শেষ হয়ে এল, এবার শুতে যান।

মধুসূদন সরকার নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

পরের দিন প্রত্যুষে।

বেলা তখন প্রায় সাতটা হবে। সকলেই এসে গতরাত্রের মত উপরের লাইব্রেরী ঘরে জমায়েত হয়েছেন।

সকলের চোখ-মুখ দেখলেই বোঝা যায়, গতরাত্রে কারও চোখেই ঘুম ছিল না।

সকলের চোখ-মুখেই নিদ্রাহীন রাত্রি ও গত সন্ধ্যার দুর্ঘটনার উদ্বেগটা যেন স্পষ্ট হয়ে রয়েছে তখনও।

নিদারুণ উদ্বেগ, অশান্তি ও দুশ্চিন্তার মধ্যে যে সকলের রাত কেটেছে, কিরীটীর বুঝতে সেটা আদৌ কষ্ট হয় না সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে।

কারও মুখেই কোন কথা নেই। সকলেই যেন বোবা।

আজ অবিশ্যি সকলের মধ্যে শকুন্তলা দেবীও ছিল। কারণ কিরীটীর ইচ্ছাতেই তাকেও

লাইব্রেরী ঘরে আসতে হয়েছিল।

সমস্ত ঘরের মধ্যে যেন একটা থমথমে বিষণ্ণ ভাব।

একসময় ভৃত্য গোকুলই গত সন্ধ্যার মত চায়ের ট্রেতে করে চা নিয়ে এসে ঘরে ঢুকল। এবং গত সন্ধ্যার মতই দ্বিতীয়বার গিয়ে আবার গোকুল বাকি চায়ের কাপগুলো নিয়ে এল। তারপর প্রত্যেকের হাতে চায়ের কাপ তুলে দেওয়া হল।

চায়ের কাপ সকলেই হাতে নিল বটে, কিন্তু কিরীটী লক্ষ্য করলে, কারুরই যেন চায়ের কাপে চুমুক দিতে তেমন কোন আগ্রহই নেই আজ।

পুতুলের মতই যেন যে যাঁর চায়ের কাপ হাতে বসে আছেন।

কিরীটী আরাম করে নিজের হস্তধৃত চায়ের কাপে একটা চুমুক দিয়ে মৃদুকণ্ঠে বললে, কি হল, সব চুপচাপ বসে কেন? চা খান! ভয় নেই—নির্ভয়ে খান। কেউ যদি গতকাল চায়ের কাপে বিষ দিয়ে থাকে, আজ নিশ্চয়ই আবার সাহস পাবে না। তাছাড়া যিনিই গত সন্ধ্যায় বিজনবাবুর চায়ের কাপে বিষ দিয়ে থাকুন না কেন, আমার কাছে তিনি ধরা পড়ে গিয়েছেন!

সকলে যাঁরা ঘরের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যেন চমকেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন ঐ কথার সঙ্গে সঙ্গে।

হ্যাঁ, আজ তাঁকে আমি চোখে-চোখেই রেখেছি। অতএব নির্ভয়ে সকলে চা পান করুন।

বৃন্দাবনবাবুই অতঃপর সর্বপ্রথম চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

তারপর ডাঃ অধিকারী।

একে একে তারপর সকলেই যে যাঁর চায়ের কাপে চুমুক দিলেন।

সর্বশেষে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন মধুসূদন সরকার।

এবং দুই চুমুক চা পান করবার পরই ঠিক গত সন্ধ্যার মতই অব্যক্ত একটা যন্ত্রণায় মুখ-চোখ বিকৃত করে মধুসূদন সরকার চেয়ারের উপর ঢলে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে।

তাঁর হাত থেকে চায়ের কাপটা মেঝেতে পড়ে গেল।

সর্বাগ্রে বৃন্দাবন সরকারই চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে শঙ্কাজড়িত ব্যাকুলকণ্ঠে বলে উঠলেন, কি—কি হল?

ডাঃ অধিকারী বললেন, সর্বনাশ! আবার পয়েজন নাকি?

ঘরের আর সকলেই নির্বাক। আর প্রত্যেকের হাতেই তখন ধরা রয়েছে যাঁক যাঁর চায়ের কাপটি।

কিরীটী তার চায়ের কাপটা একপাশে নামিয়ে মধুসূদনবাবুর কাতরোক্তি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, এবারে সে এগিয়ে এসে হতবাক বিমূঢ় সকলের দিকে বারেকের জন্য দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে নিঃশব্দে মধুসূদন সরকারকে স্পর্শ করে মৃদুকণ্ঠে বললে, হি ইজ ডেড!

।। উনিশ ।।

ডেড! আর্তকণ্ঠে যেন কথাটা প্রশ্নের মতই পুনরুচ্চারণ করলেন বৃন্দাবন সরকার।

হ্যাঁ, স্টোন ডেড!

সকলে স্তম্ভিত নির্বাক।

ডাঃ অধিকারী একটু পরে মৃতদেহের সামনে একসময় ধীরে ধীরে এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত নির্বাক হলেও—মধুবাবুর চায়ের কাপটা কোথায় গেল?—বলতে বলতে কিরীটী নিচু হয়ে হাত ঢুকিয়ে উপবিষ্ট মধুসূদনের সোফার তলা থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিল। তারপরই কাপটা হাতে নিয়ে মধুসূদন সরকারকে লক্ষ্য করে বললে, স্পেন্‌ন্‌ডিড! সত্যিই চমৎকার অভিনয় করেছেন মধুবাবু, উঠুন—এতটা সাকসেস্ সত্যিই আমি আশা করিনি!

বিস্মিত হতবাক সকলের চোখের সামনে এবারে মধুসূদন সরকার চোখ মেলে সোজা হয়ে বসলেন।

কিরীটী ডাঃ অধিকারীর দিকে চেয়ে এবারে বললে, বাধ্য হয়েই আজকের এই অভিনয়টুক্ মিঃ সরকারকে দিয়ে আমাকে করাতে হল ডাক্তার অধিকারী। কিন্তু কেন করেছিলাম এবারে আমি সেই কথাটাই বলব।

কিরীটীর কথায় ও মধুসূদনকে চোখ মেলে উঠে বসতে দেখে এতক্ষণে যেন সকলে সম্বিৎ ফিরে পান। সকলেই একটা যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

সকলেই কিরীটীর মুখের দিকে তাকায়।

কিরীটী তখন আবার বলছে, হ্যাঁ, কোন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই আজকের এই অভিনয়ের অনুষ্ঠানটি আমি মধুবাবুর সঙ্গে গতরাত্রে পরামর্শ করে করেছি এবং আজকের ব্যাপারটা নিছক একটা অভিনয় হলেও, গতকাল সন্ধ্যায় ঠিক অনুরূপ ব্যাপারটি নির্মম ও নিষ্ঠুর সত্য বলেই আমরা জানি। কারণ গত সন্ধ্যায় ঠিক আজকের মতই কাপে এক চুমুক দিয়েই বিজনবাবু মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছেন আমাদের সকলেরই চোখের সামনে—এবং যদিও ময়না তদন্তের ফলাফল এখনো আমরা জানতে পারিনি, তথাপি আমি আপনাদের সুনিশ্চিতভাবে বলতে পারি, হতভাগ্য বিজনবাবুর মৃত্যুর পশ্চাতেও আছে আগের দুবারের মতই মারাত্মক 'নিকোটিন' বিষপ্রয়োগই।

ঘরের মধ্যে সকলেই স্তব্ধ, বিমূঢ় ও নির্বাক।

কিরীটী আবার বলে, নিকোটিন বিষপ্রয়োগেই যদি বিজনবাবুর মৃত্যু হয়ে থাকে তো কাল নিশ্চয়ই তাঁর চায়ের কাপের মধ্যেই আমাদের অলক্ষ্যে হয় নিজ হাতে বা অন্য কারও সহযোগিতায় হত্যাকারী ঐ মারাত্মক 'নিকোটিন' বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। রান্নাঘরের পাশের ঘরে গত সন্ধ্যায় শকুন্তলা দেবী গোকুলের সাহায্যে আমাদের জন্য চা তৈরী করেছিলেন বলেই আমরা জানি। এবং ঐ সময় তাঁরা দুজনেই বাইরে গিয়েছিলেন—শকুন্তলা দেবী দুবার ও গোকুল একবার। কাজেই ঐ গোকুল বা শকুন্তলা দেবী যদি চায়ে না বিষ মিশিয়ে থাকেন—

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের সকলের দৃষ্টি অদূরে উপবিষ্ট শকুন্তলার উপর গিয়ে পতিত হল।

না, না, আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, সহসা যেন চাপা আর্তকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল শকুন্তলা, বিষ আমি দিইনি—

কিন্তু কিরীটী শকুন্তলার সেই আর্ত চিৎকারে যেন কর্ণপাতও করল না। সে যেমন বলছিল বলতে লাগল, হ্যাঁ, কেবল শকুন্তলা দেবী বা গোকুলই নয়—কাল এ-বাড়িতে যাঁরা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন তাঁদের যে কারও পক্ষেই বিজনবাবুর চায়ের কাপে বিষ মেশানো সম্ভবপর ছিল। অর্থাৎ যে কেউ বিষ মেশাতে পারেন।

আবার ঐ সময় চিৎকার করে উঠলেন বৃন্দাবন সরকার, হাউ অ্যাবসার্ড! এ আপনি

কি বলছেন মিঃ রায়?

ঠিকই বলছি বৃন্দাবনবাবু, একমাত্র আমি ও শচীবিলাসবাবু ব্যতীত কাল সকলেই আপনারা এ ঘর থেকে ঐ সময়ের মধ্যে বেরিয়েছেন আমার স্পষ্ট মনে আছে।

সকলেই এবারে চুপ।

তাই যদি হয়, তাহলে আপনাদের যে কারো পক্ষেই গতকাল চায়ের কাপে বিষ মেশানো সম্ভবপর ছিল এ কথাটা নিশ্চয়ই কেউ ডিনাই করতে পারবেন না! যাক যা বলছিলাম, তারপর ট্রেতে করে চায়ের যে কাপগুলো গোকুল নিয়ে এল তার মধ্যেই কোন একটি কাপে নিকোটিন বিষমিশ্রিত চায়ে চুমুক দিয়েই নিজের অজ্ঞাতে বিজনবাবু আমাদের মধ্যে মৃত্যুবরণ করলেন। কথা অবিশ্যি এর মধ্যে একটা আছে। গোকুলই সকলের হাতে চায়ের কাপ তুলে দিয়েছিল। নিজে যদি দোষী হয় তো সে জেনেই পূর্বাহ্নে বিজনবাবুর হাতে বিষমিশ্রিত চায়ের কাপটি তুলে দিয়েছিল ; আর সে যদি নির্দোষী হয়ে থাকে তো অজ্ঞাতেই সে বিজনবাবুর হাতে ঐ বিষের কাপটি তুলে দিয়েছিল। সেক্ষেত্রে আর একটা সন্দেহ জাগতে পারে আমাদের মনে। বিজনবাবুর হাতে অজ্ঞাতে বা না জেনে যদি গোকুল বিষের কাপটি তুলে দিয়েই থাকে, তাহলে কি বিজনবাবুর মৃত্যুটা অ্যাকসিডেন্টাল! আর তাই যদি হয়, হত্যাকারীর এইম্ কার উপরে ছিল? কিন্তু আমার মনে হচ্ছে বিজনবাবুর মৃত্যুটা একেবারে অ্যাকসিডেন্টাল নয়। বিজনবাবু হত্যাকারীর লিস্টে তো ছিলেনই—আরো কেউ ছিল!

সে কি! অর্ধস্ফুট কণ্ঠে প্রশ্ন করেন এবারে ডাঃ অধিকারী।

হ্যাঁ, ডাঃ অধিকারী। আরও কেউ ছিল এবং এখনও তিনি পূর্ববৎ হত্যাকারীর লিস্টে আছেন।

কিরীটীর শেষের কথায় সকলে আবার ভীতদৃষ্টিতে পরস্পরের মুখের দিকে তাকায়।

মৃত্যু—আবার কার জন্য মৃত্যু এখানে ওৎ পেতে আছে কে জানে?

এ কি সর্বনেশে কথা!

কিরীটী একটু থেমে আবার তখন বলতে শুরু করেছে, তবে আমার বিশ্বাস, বেচারী গোকুল হয়ত দোষী নয়। তা সে যাই হোক, বর্তমানে আমাদের সব চাইতে বেশী ভাববার কথা হচ্ছে, পর পর যেভাবে তিনটি মৃত্যু এ বাড়িতে ঘটেছে সেরকম নাটকীয় ব্যাপারের আর যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই দিকেই আমাদের দৃষ্টি দেওয়া কর্তব্য নয় কি?

কিন্তু একটা কথা আমি বুঝতে পারছি না মিঃ রায়—সহসা কিরীটীকে বাধা দিয়ে ডাঃ অধিকারী বললেন, দশরথের কথা ছেড়ে দিলেও সারদা আর বিজনের মৃত্যু যদি ঐ নিকোটিন বিষপানেই তাদের অজ্ঞাতে হয়ে থাকে তো গ্লাসে ও কাপে—

কিরীটী শেষ করতে দিল না ডাঃ অধিকারীকে কথাটা, বললে, কেমিক্যাল অ্যানালিসিসে নিকোটিন বিষ গ্লাসে পাওয়া উচিত ছিল ও কাপেও পাওয়া উচিত ছিল, তাই না?

হ্যাঁ, মানে—

না ডাঃ অধিকারী, গ্লাসেও যেমন নিকোটিনের নামগন্ধ পাওয়া যায়নি, ঐ কাপেও পাওয়া যেত না। তাই মিথ্যে আমি কাপটা আর কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের জন্য বিমলবাবুকে পাঠাতে বলিনি।

তবে?

কিন্তু কেন? গ্লাসে ও কাপে যদি সত্যই নিকোটিন দেওয়া হয়ে থাকে তো কেন নিকোটিন অ্যানালিসিসে কাপে বা গ্লাসে পাওয়া যাবে না? সহসা কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা ঋজু ও ধারাল

হয়ে ওঠে। সে বলতে থাকে, পাওয়া যায়নি ও যাবে না—তার কারণ সারদাবাবুর ঘরে যে গ্লাসটা পাওয়া গিয়েছিল এবং গতকাল সোফার তলায় যে কাপটা পাওয়া গিয়েছে, আদপেই সে গ্লাস এবং সেই কাপ সারদাবাবু বা বিজনবাবু ব্যবহার করেননি তাঁদের মৃত্যুর পূর্বে।

হোয়াট ডু ইউ মিন, মিঃ রায়? তার মানে?

তীক্ষ্ণ একটা চীৎকারের মতই যেন ডাঃ অধিকারীর প্রশ্নটা কিরীটীর প্রতি নিক্ষিপ্ত হল।

এবারে শান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে কিরীটী বললে, একস্যাক্টলি তাই ডাঃ অধিকারী। বলতে বলতে সহসা জামার পকেট থেকে একটা কাপ বের করে সম্মুখস্থিত টেবিলের উপরে রক্ষিত ক্ষণপূর্বের যে কাপটি মধুসূদনের সোফার তলা থেকে নিচু হয়ে কিরীটী বের করেছিল সেই কাপটি অন্য হাতে তুলে নিয়ে সকলের দিকে তাকিয়ে আবার বললে, দেখুন সকলে, এই দুটি কাপ হুবহু এক। অথচ আপনাদের চোখের সামনে—এই কিছুক্ষণ পূর্বে যে কাপটি আমি সোফার নিচে থেকে বের করেছিলাম সে কাপে আদৌ মধুবাবু আজ চা পান করেননি তাঁর মৃত্যুর অভিনয়ের সময়। তিনি চা পান করেছিলেন আসলে এইমাত্র আমার জামার পকেট থেকে যে কাপটি বের করলাম সেই কাপে!

সর্বনাশ! তবে কি—

ঠিক তাই ডাঃ অধিকারী। সেই কারণেই সারদাবাবুর ঘর থেকে যে গ্লাসটা পাওয়া গিয়েছিল সেই গ্লাস কেমিক্যাল অ্যানালিসিস করে যেমন কোন নিকোটিনের ট্রেস মাত্রও পাওয়া যায়নি, তেমনি গত সন্ধ্যায় বিজনবাবুর মৃত্যুর পর যে কাপটি আমি সোফার নিচে পেয়েছিলাম সে কাপটিতেও নিকোটিনের ট্রেস বা নামগন্ধও পাওয়া যেত না। সো ইউ অল অ্যানডারস্ট্যাণ্ড নাউ? আসল ব্যাপার, গতকাল অত্যন্ত ট্যাক্টফুলি তার কাজ হাসিল করেছিল হত্যাকারী। যদিও প্রথম দুবারে ট্যাক্টফুলনেসের তার প্রয়োজন হয়নি, কারণ বিষপ্রয়োগের সময় নো বডি ওয়াজ প্রেজেন্ট দেয়ার!

কিন্তু হাউ, কেমন করে? প্রশ্ন করলেন আবার ডাঃ অধিকারী।

কেমন করে, তাই না ডাক্তার? আসল বিষমিশ্রিত কাপটি হত্যাকারী গতকাল কি ভাবে আমাদের চোখের সামনে ম্যানেজ করে অন্য একটা কাপ রিপ্লেস করল! ওয়েল—ভাবতে গেলে যদিও ব্যাপারটা দুর্বোধ্য ও অবিশ্বাস্য, তথাপি হত্যাকারী বা খুনীর পক্ষে গতকাল কাপটা রিপ্লেসের ব্যাপারে যা প্রয়োজন ছিল সেটা হচ্ছে তার খানিকটা তৎপরতা, ক্ষিপ্রতা এবং খানিকটা নার্ভ—যে দুটোই অবিসংবাদিত ভাবে হত্যাকারীর ছিল। কালকের ব্যাপারটা একবার সকলে আবার 'কুল' ব্রেনে ভেবে দেখুন। অতর্কিতে যখন বিজনবাবু হঠাৎঅসুস্থ হলেন বিষপান করে, আর অজ্ঞাতে আমরা সকলেই যেন কিছুটা ননপ্লাসড্ হয়ে পড়েছিলাম ঘটনার আকস্মিকতায় ও আমাদের সকলের মনই তখন বিজনবাবুর দিকে—আমাদের সকলের সেই অসতর্ক মোমেন্ট-টুকুরই ত্বরিত সদ্ব্যবহার করেছিল হত্যাকারী অর্থাৎ ঐ মুহূর্তেই সে ঠিক আজকের আমার মতই আসল কাপটি অন্য একটি নির্দোষ কাপ দিয়ে সবার অলক্ষ্যে রিপ্লেস করেছিল। আশা করি এবারে আপনারা সকলেই আমার আজকের অনুষ্ঠানের সত্যকার উদ্দেশ্যটা উপলব্ধি করতে পারছেন!

কিরীটীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অর্ধস্ফুট চিৎকার করে বললেন মধুসূদন সরকার, কে—কে তবে কাপটা সরিয়েছিল?

নিঃসন্দেহে এ সে-ই মিঃ সরকার, যে সারদাবাবু দশরথ ও বিজনবাবুকে হত্যা করেছে। গম্ভীরকণ্ঠে কিরীটী প্রত্যুত্তর দিল।

কিন্তু কে—কে সে?

কে—সেটাই তো আমাদের খুঁজে এখন বের করতে হবে মিঃ সরকার—এবং সেটা যতক্ষণ না সম্ভব হচ্ছে, হত্যাকারীকেও আমরা স্পট-আউট করতে পারব না। সে আমাদের নাগালের বাইরেই অন্ধকারে থেকে যাবে।

আপনি—আপনি জানেন মিঃ রায়?

হয়ত জানি বা হয়ত জানি না, মিঃ সরকার। কিন্তু তার চাইতেও বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা সেটা হচ্ছে—আপনারা সকলেই কাল যাঁরা ঐ দুর্ঘটনার সময়ে এ ঘরে উপস্থিত ছিলেন, আজও আছেন এবং আবার কিছুক্ষণ পূর্বে যা আমি আপনাদের বলেছি সেটাই রিপিট করছি। যে মৃত্যুর অভিনয় আজ মধুসূদনবাবুকে দিয়ে করিয়েছি ক্ষণপূর্বে এই ঘরে সেটা অভিনয় এবং নিছক মিথ্যা হলেও, আবার আচমকা যে কোন মুহূর্তেই হয়ত ঠিক ঐভাবেই কারো না কারো আপনাদের মধ্যে মৃত্যু তার সত্য নিয়ে দেখা দিতে পারে। ঠিক হয়ত ঐভাবেই হত্যাকারী আবার কারও উপরে অ্যাটেম্পট নিতে পারে, যদি তার হত্যার প্রয়োজন না এখনও ফুরিয়ে গিয়ে থাকে। তাই সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, যাতে গত তিনবারের হত্যার মত আবার ঐ নৃশংস ব্যাপার ভবিষ্যতে না ঘটে। যদি আপনাদের মধ্যে কেউ এমন কিছু জানেন যা এখনও পর্যন্ত পুলিস জানতে পারেনি, অথচ যার সাহায্যে পুলিসের এই হত্যা-রহস্যের তদন্ত সহজ হয়—সে কথাটা অন্তত আমাকে খুলে বলুন। জানবেন এই সময় কোন কিছু ঐ হত্যা-রহস্য সম্পর্কে গোপন রাখা মারাত্মক হবে। বলুন, আমি আবার অনুরোধ জানাচ্ছি সকলের কাছে, বলুন!

কিন্তু সকলেই চুপ। নির্বাক। যেন পাথর।

ছুঁচ পতনের শব্দটুকু পর্যন্তও বুঝি শোনা যাবে।

ধীরপদে ঐ সময় থানা-অফিসার বিমল সেন ও সুশান্ত এসে ঘরে প্রবেশ করল।

সত্যি কথা বলতে কি, সকলে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

।। কুড়ি ।।

আরো দুটো রাত দুটো দিন তারপর কেটেছে।

এবং একমাত্র শচীবিলাসবাবু ব্যতীত সকলেই তখনও সরকার ভিলাতেই উপস্থিত।

শচীবিলাসকে যেতে অনুমতি দিয়েছে বিমল সেন।

কিন্তু যাঁরা আছেন তখনও সরকার ভিলায় তাঁরা বুঝি সত্যই পাগল হয়ে যাবে। সর্বক্ষণ এক দুর্বিষহ অকথিত মানসিক যন্ত্রণার পীড়ন সকলকেই যেন কেমন বিমূঢ় করে রেখেছে।

বিজনবাবুর মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিরীটীর অনুমানটাও মিথ্যা হয়নি। নির্ভুল সত্য বলেই প্রমাণিত হয়েছে। অর্থাৎ বিজনবাবুর ময়নাতদন্তের রিপোর্টেও মৃত্যুর কারণ মারাত্মক বিষ নিকোটিন বলেই প্রমাণিত হয়েছে ইতিমধ্যে।

সবাই যে যাঁর ঘরে চুপচাপ সর্বক্ষণই প্রায় বসে বা শুয়ে কাটান। যাবতীয় পান ও আহারের ব্যাপারে সদা-সতর্ক পুলিসপ্রহরী নিযুক্ত করেছে কিরীটী বিমল সেনের সাহায্যে। তথাপি যেন আহারে ও পানে ভীতি রয়েছে সকলের।

কেউ যেন কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছে না।

মৃত্যুভয়ে, মৃত্যু-আশঙ্কায় এমনিই বুঝি মানুষ তার আপন অজ্ঞাতে ভীত, সশঙ্কিত।

তবু আশ্চর্য, মৃত্যু আসবেই এবং প্রতিনয়ত আসছেই!

জন্মের মতই মৃত্যু স্বাভাবিক এবং অনিবার্য, তবু মানুষ চিরদিনই জন্মের পর জ্ঞান হওয়া অবধি মৃত্যুভয়েই যে সিঁটিয়ে রয়েছে।

কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে।

মানুষের সহ্যশক্তির একটা সীমারেখা রয়েছে—সেই কথাটি ভেবেই সেদিন রাত্রে খাবারের টেবিলে বসে কিরীটী সকলকে লক্ষ্য করে বললে, কাল সকাল থেকেই আপনারা সবাই মুক্ত।

সকলেই একসঙ্গে কথাটা শোনামাত্র কিরীটীর মুখের দিকে তাকালেন।

তাহলে সত্যিই অসহ্য এই প্রতি মুহূর্তের বোবা-যন্ত্রণা থেকে তাঁরা মুক্তি পেল সকলে!

অভিশপ্ত মৃত্যু-আতঙ্কে-ভরা এই সরকার ভিলা ছেড়ে তাঁরা যেখানে যার খুশি চলে যেতে পারবেন!

একে একে সকলে খাবার টেবিল ছেড়ে ডাইনিং হল থেকে বের হয়ে গেলেন। শুধু টেবিলের সামনে বসে রইল কিরীটী আর শকুন্তলা।

টেবিলের উপর টেবিল-ল্যাম্পটা জ্বলছে।

সহসা কিরীটী শকুন্তলাকে সম্বোধন করে বললে, আপনিও নিশ্চয় চলে যাচ্ছেন কালই শকুন্তলা দেবী?

হ্যাঁ! সহসা যেন নিদ্রোত্থিতের মতই তাকালো শকুন্তলা কিরীটীর মুখের দিকে, এবং মৃদুকণ্ঠে বললে, হ্যাঁ, যাব!

কথাটা বলে আর দাঁড়াল না শকুন্তলা।

চেয়ার থেকে আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, নিঃশব্দে ঘর থেকে এবারে বের হয়ে গেল।

কিরীটীও ঘর থেকে বের হয়ে তার নির্দিষ্ট ঘরে এসে প্রবেশ করল।

ঐদিনই দ্বিপ্রহরে সারদাচরণের লাইব্রেরী ঘরের বইগুলো দেখতে দেখতে একটা বাঁধানো ফটোর অ্যালবাম পেয়েছিল কিরীটী। অ্যালবামটা এনে নিজের শয্যার তলায় রেখে দিয়েছিল। সেটা বের করে টেবিলের সামনে আলোয় এসে বসল।

সারদাচরণের ফ্যামিলি অ্যালবাম।

একটার পর একটা পাতা উলটে যায় কিরীটী অ্যালবামের।

নানাবয়েসী মেয়ে-পুরুষের ফটো সেই অ্যালবামে রয়েছে আঁটা।

ফটোগুলো দেখতে দেখতে সহসা একটা ফ্যামিলি গ্রুপ ফটোর প্রতি নজর পড়ে কিরীটীর।

মধ্যস্থলে সারদাচরণ, তাঁকে বেশ চেনা যায়—বাইরের ঘরে ও লাইব্রেরী ঘরে সারদাচরণের যে ফটো আছে তার সঙ্গে হুবহু মিল রয়েছে। তাঁর এক পাশে বৃন্দাবন সরকার ও অন্যপাশে তাঁর দাঁড়িয়ে মধুসূদনই সরকার নিশ্চয়ই।

ফটোটা অন্ততঃ দশ-বারো বৎসর পূর্বের। কারণ দশ বৎসর তো মধুসূদন গৃহছাড়াই।

পরিবর্তনও হয়েছে মধুসূদনের চেহারায় ইতিমধ্যে যথেষ্ট।

এবং দশ বৎসরে চেহারার পরিবর্তন তো হবারই কথা।

তখন মধুসূদন দাড়ি-গোঁফ রাখতেন না, এখন চাপদাড়ি ও ভারী গোঁফ মুখে শোভা পাচ্ছে।

চাপদাড়ি ও গোঁফ।

কিরীটী বোধ হয় নিজের চিন্তায় তন্ময় হয়ে গিয়েছিল, সহসা একটা দীর্ণ আর্ত চিৎকার ও দুড়ুম দুড়ুম পর পর দুটো গুলির শব্দে সচকিত হয়ে ওঠে কিরীটী।

চকিতে কিরীটী অ্যালবামটা টেবিলের উপরেই ফেলে রেখে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে আসে।

গুলির শব্দ ও চিৎকার সকলেই শুনেছিলেন নিশ্চয়ই, কারণ কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলকেই বাইরের বারান্দায় দেখতে পায়।

কিরীটীর নির্দেশমতই গত কদিন ধরে বারান্দা ও সিঁড়ির সামনে যে আলোটা ছিল সেটা সারারাত ধরেই জ্বালানো থাকত।

আলোটা অবিশ্যি খুব পর্যাপ্ত নয়। তবে পর্যাপ্ত না হলেও সমস্ত বারান্দা ও সিঁড়ির অর্ধেকটা ভালই দেখা যাচ্ছিল।

সিঁড়ির কাছাকাছিই বারান্দাটা ডাইনে বেঁকে গিয়েছে পশ্চিম দিকে।

ডাঃ অধিকারী, মিঃ মল্লিক, শকুন্তলা ও বৃন্দাবন সরকারকে দেখতে পেল কিরীটী।

কেবল মধুসূদন সরকারকেই দেখতে পেল না তাঁদের মধ্যে।

কথা বললেন প্রথমে বৃন্দাবন সরকারই, পর পর দুটো গুলির আওয়াজ আর কার যেন চিৎকারের শব্দ শুনলাম।

হ্যাঁ, কিন্তু মধুসূদনবাবু কোথায়? তাঁকে দেখছি না? বললে কিরীটী।

দাদা তো পশ্চিমের ঘরে—বললেন বৃন্দাবন সরকার।

চলুন তো—বলে সর্বাগ্রে এগিয়ে গেল কিরীটী এবং তাকে অনুসরণ করে অন্যান্য সকলেই যেন কেমন ভীতভাবে অগ্রসর হল।

মধুসূদন সরকারের ঘরের দরজা খোলাই ছিল। এবং ঘরে আলো জ্বলছিল।

সর্বাগ্রে সেই ঘরে কিরীটীই পা দিয়ে থমকে দাঁড়াল।

ঘরের মেঝেতে কে একটা লোক উবুড় হয়ে পড়ে আছে আর তার চারপাশে রক্তের যেন একেবারে ঢেউ খেলে যাচ্ছে এবং দক্ষিণ বাহুমূলে গুলিবিদ্ধ হয়ে মেঝের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় বসে যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন মধুসূদন সরকার ক্ষতস্থানটা বাঁ হাতে চেপে।

এ কি! কি সর্বনাশ! তাড়াতাড়ি কথাটা বলে সর্বাগ্রে ডাঃ অধিকারীই আহত মধুসূদনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

কি হয়েছে? ব্যাপার কি দাদা? বৃন্দাবনও এগিয়ে যান।

কিরীটী ততক্ষণে এগিয়ে গিয়ে ভূপতিত মৃত রক্তাক্ত দেহটা উল্‌টে দিতেই যেন সকলে চমকে উঠল মৃতের দিকে তাকিয়ে এবারে।

গুলিবিদ্ধ মৃত ব্যক্তি আর কেউ নয়—ভৃত্য গোকুল।

এ কি ! এ যে দেখছি গোকুল! বললেন মিঃ মল্লিক।

হ্যাঁ—ওই বেটাই। যন্ত্রণা-ক্লান্ত কণ্ঠে বললেন মধুসূদন সরকার, ঘরের দরজা আমার ভেজানোই ছিল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে পড়তে বোধ হয় একটু তন্দ্রামত এসেছিল, হঠাৎ খুট করে একটা শব্দ হতেই চেয়ে দেখি আমার জলের গ্লাসে শিশি থেকে কি একটা ঢালছে ঐ গোকুল। তাই দেখেই সঙ্গে সঙ্গে আমি বালিশের তলা থেকে রিভলবারটা নিয়ে ওকে গুলি করতে যাব হঠাৎও আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধস্তাধস্তি করতে করতে একটা ফায়ার আমার হাতে লাগে, আর একটায় বোধ হয় ওই বেটা ফিনিশ হয়েছে—

ঘরের মেঝেতেই একটা বেঁটে মত কালো শিশিও পাওয়া গেল মৃত গোকুলের পাশেই।

কি সর্বনাশ! ডাঃ অধিকারী বললেন, শেষ পর্যন্ত ঐ বেটাই—

পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে শিশিটা আলগোছে মেঝে থেকে তুলে নিয়ে

বৃন্দাবন সরকারের দিকে চেয়ে কিরীটী বললে, থানায় বিমলবাবুকে এখনি একটা খবর দিন বৃন্দাবনবাবু!

থানায়?

হ্যাঁ, যান—গোকুলের ব্যাপারটা বিমলবাবুকে এখুনি জানানো কর্তব্য।

বেশ।

বৃন্দাবন সরকার তখুনি ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন।

এবার কিরীটী ডাঃ অধিকারীর দিকে তাকিয়ে বললে, ওঁর হাতের উণ্ডটা পরীক্ষা করে দেখলেন ডাঃ অধিকারী?

নাঃ, এই দেখছি—বলে ডাঃ অধিকারী মধুসূদন সরকারের হাতের উণ্ডটা পরীক্ষা করে বললেন, না সামান্যই, সুপারফিসিয়াল একটা স্কিন ডিপ উণ্ডের উপর দিয়ে গিয়েছে বলেই মনে হচ্ছে।

তা হোক, ড্রেস করে দিন। কিরীটী বললে শান্তকণ্ঠে।

ঘন্টা দেড়েকের মধ্যেই থানা থেকে বিমল সেন এসে গেল। সে আবার মধুসূদন সরকারের জবানবন্দি নিল। জবানবন্দি নিতে নিতেই একসময় বললে বিমল, যাক্‌, শেষ পর্যন্ত যে বেটা ঘায়েল হয়েছে এই রক্ষে! নইলে আরও যে এমন কতগুলো খুন করত কে জানে! উঃ সাংঘাতিক!

সকলে লাইব্রেরী ঘরের মধ্যেই জমায়েত হয়েছিলেন আজও।

ডাঃ অধিকারী বললেন, যা বলেছেন মিঃ সেন। মধু আজ খুব বেঁচে গিয়েছে।

তাকিই বলতে হবে! মিঃ মল্লিক বললেন।

যাহোক সে-রাত্রিও অতিবাহিত হল একসময়।

এবং পরের দিন সকাল দশটার ট্রেনেই মিঃ মল্লিক ও ডাঃ অধিকারী চলে গেলেন কলকাতায়।

কিরীটীও তাঁদের সঙ্গে একই ট্রেনে কলকাতায় গেল।

পরের দিন শকুন্তলাও কলকাতা চলে গেল।

দিন সাতেক বাদে।

বৈকালের দিকে 'সরকার ভিলা'য় যখন কিরীটী, সুশান্ত ও বিমল সেন এসে প্রবেশ করল, মধুসূদন সরকার তখন বাইরের ঘরে বসে একজন বৃদ্ধ বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন।

ওদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে মধুসূদন সাদরে আহ্বান জানালেন, আসুন, আসুন —বসুন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওদের ঘরে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, তাহলে আজ আমি উঠি মিঃ সরকার। তাহলে ঐ কথাই রইল। সামনের সপ্তাহেই রেজেস্ট্রি হবে।

বেশ।

ভদ্রলোক বিদায় নিলেন।

আপনারা বসুন মিঃ রায়, আমি কাউকে চা দিতে বলে আসি।

না, না—আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না মিঃ সরকার, বসুন। চা একটু আগেই থানা থেকে

খেয়ে আসছি। কিরীটী বললেন।

আমার এখানেও না হয় এক কাপ করে হোক। বলেই মধুসূদন মৃদু হেসে কথাটা শেষ করলেন, এখানে চা খেতে আপনাদের তো আর ভয় নেই। চা রহস্যের তো মীমাংসা হয়েই গিয়েছে, কি বলেন মিঃ রায়!

তা হয়েছে বটে। তবে চা পরে হবে'খন। আপনি বসুন।

কিরীটীর কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের বারান্দায় কয়েকজোড়া মিলিত জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

কারা যেন আসছে বলে মনে হচ্ছে! মিঃ সরকার বললেন।

হ্যাঁ, বোধ হয় ডাঃ অধিকারী, বৃন্দাবনবাবু ওঁরা সব এলেন। বললে কিরীটী।

সত্যিই পরমুহূর্তেই ডাঃ অধিকারী, তাঁর পশ্চাতে মিঃ মল্লিক, বৃন্দাবন সরকার ও শকুন্তলা এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কি ব্যাপার ডাঃ অধিকারী, আপনারা—

মধুসূদনকে কথাটা শেষ করতে দিল না কিরীটী। সে বললে, হ্যাঁ—সকলকেই আজ এখানে আমি ডেকে আনিয়েছি।

কিন্তু ব্যাপারটা কি?

আপনি শুনে হয়ত খুশী হবেন মিঃ সরকার, কিরীটী বললে, সারদাবাবু দশরথ, বিজনবাবু ও গোকুলের হত্যারহস্যের মীমাংসা—

মীমাংসা! কথাটা বললেন বৃন্দাবন সরকার।

হ্যাঁ বৃন্দাবনবাবু, সেই রহস্যের মীমাংসার জন্যই আজ সকলে আমরা এখানে জমায়েত হয়েছি।

কিরীটীর কথায় ঘরের মধ্যে উপস্থিত সকলেই কেমন যেন একটু বিব্রত ও অস্বোয়াস্তি বোধ করছেন বোঝা গেল।

কিরীটী কিন্তু একান্ত নির্বিকার।

একটা অখণ্ড স্তব্ধতা যেন ঘরের মধ্যে থমথম করছে।

।। একুশ ।।

ধীরে ধীরে কিরীটী তার বক্তব্য শুরু করে :

শুনে নিশ্চয়ই সুখী হবেন আপনারা, গত এক মাস ধরে পর পর যে চারটি নিষ্ঠুর হত্যা এই 'সরকার ভিলা'য় অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেই হত্যা-রহস্যের পশ্চাতে যে আছে সে যত চালাক ও চতুর হোক না কেন, আমার চোখে শেষ পর্যন্ত সে ধুলো দিতে পারেনি—

এসব আপনি কি বলছেন মিঃ রায়? তবে কি গোকুল হত্যাকারী নয়? প্রশ্ন করলেন বৃন্দাবন সরকার।

শান্তকণ্ঠে কিরীটী বলে ওঠে, না, না বৃন্দাবনবাবু, ইট ওয়াজ নট গোকুল!

তবে কে—কে?

একসঙ্গে সকলেরই কণ্ঠ হতে যেন ঐ কথাগুলি উচ্চারিত হল উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠায় একই সময়ে।

সে কে—সেই কথাই তো আজ আপনাদের আমি বলব। সারদাবাবু ও দশরথের মৃত্যুর

ব্যাপারটা হত্যাকারী খুব ট্যাক্টফুলি ম্যানেজ করলেও, বিজনবাবুর হত্যার পরই খুনী আমার চোখের সামনে—ব্যাপারটা আগাগোড়া স্থিরচিত্তে ঐদিনই রাত্রে চিন্তা করবার পর থেকেই ক্রমশঃ—হ্যাঁ, আমার চোখের সামনে আকার নিতে থাকে একটু একটু করে। আর আমার সেই সন্দেহের ব্যাপারটা খুনী যে মুহূর্তে অনুমান করতে পারলে সেই মুহূর্ত থেকেই সে বিচলিত হয়ে ওঠে।

কিন্তু সে কে? অধীর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন ডাঃ অধিকারী।

বলছি ডাঃ অধিকারী। ডোন্‌ট বি ইমপেসেণ্ট! হ্যাঁ, খুনী বিচলিত হবার সঙ্গে সঙ্গে অনন্যোপায় হয়েই সে শেষ চালটি চালে।

শেষ চাল? প্রশ্ন করল বিমল সেন।

হ্যাঁ, রাদার ইউ ক্যান সে—দি লাস্ট অ্যাটেম্প্‌ট! কিন্তু দুটি মারাত্মক ভুল সে করে বসে ঐ শেষবারের মত আত্মরক্ষার চেষ্টা করতে গিয়ে, যার ফলে যেটুকু তখনও আমার কাছে অস্পষ্ট ছিল তাও স্পষ্ট হয়ে ওঠে দিনের আলোর মতই সঙ্গে সঙ্গে।

তাহলে গোকুলের মৃত্যুই রাতেই—

ডাঃ অধিকারীর কথাটা শেষ হল না, কিরীটী তাঁকে বাধা দিয়ে বললে, হ্যাঁ ডাক্তার, আমি সেই রাত্রেই জানতে পেরেছিলাম কে সে—কে হত্যা করেছে এমন নৃশংসভাবে পর পর এতগুলো লোককে! সেদিন আপনাকে আমি বলেছিলাম যে অর্থম্‌ অনর্থম। তা এ ব্যাপার অর্থম্‌ অনর্থম্‌ তো বটেই—সেই সঙ্গে পঞ্চশরের খেলাও ছিল, যেজন্য হত্যাকারী সর্বপ্রথম সারদাচরণকে হত্যা করে। সত্যি অত্যন্ত ট্যাক্টফুলি সে সারদাচরণকে হত্যা করেছিল ছদ্মবেশে এই সরকার ভিলাতে এসে—

ছদ্মবেশে? উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করেন বৃন্দাবন সরকার।

হ্যাঁ বৃন্দাবনবাবু, হি ওয়াজ ইন ডিসগাইজ অ্যাট দ্যাট টাইম! কিন্তু তা সত্ত্বেও সে সকলের চোখে, এমন কি আপনার চোখে ধুলো দিতে পারলেও, কিন্তু এ বাড়ির একজনের চোখে ধুলো দিতে পারেনি—সে হচ্ছে পুওর দশরথ।

দশরথ? ডাঃ অধিকারী বললেন।

হ্যাঁ, দশরথ। এবং দশরথ তাকে চিনতে পেরেছে সন্দেহ করেই খুনী আর কালবিলম্ব না করে তাকেও শেষ করে বা করতে বাধ্য হয়।

কিন্তু কে সে? বললেন বৃন্দাবন সরকার আবার।

আপনাদের সরকার ভিলার নবনিযুক্ত ভৃত্য শ্রীমান কেতু।

কেতু!

হ্যাঁ। কিন্তু কে সে কেতু? কি তার আসল পরিচয়? আর কেনই বা হত্যাকারীকে কেতু পরিচয়ে ছদ্মবেশে এই সরকার ভিলাতে আসতে হয়েছিল?

একটু থেমে কিরীটী আবার বলতে শুরু করে, সে অন্য পরিচয়ে এসেছিল এই জন্য যে, তার সত্যকারের পরিচয়ে সারদাচরণ বেঁচে থাকা পর্যন্ত এই 'সরকার ভিলা'য় প্রবেশ দুঃসাধ্য ছিল। অথচ সারদাচরণকে হত্যা করতে হলে এখানে তাকে প্রবেশ করতেই হবে। তাই অনেক কৌশল খাটিয়ে সে কেতু হয়ে এই সরকার ভিলায় এসে প্রবেশ করল। কিন্তু দুর্ভাগ্য তার, সে ধরা পড়ে গেল পুরাতন ভৃত্য দশরথের চোখে। যা হোক, সেই কারণেই কেতু পরে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং তার কোন সন্ধানই আর আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। কারণ কেতু বলে কেউ সত্যই ছিল না সেদিন আর আজও নেই।

কিন্তু কে—কে'সেই কেতু? অধীরভাবে আবার মধুসূদন সরকারই প্রশ্ন করলেন।

বলছি—সবই বলব একে একে। এবারে আমি আসছি হতভাগ্য বিজনবাবুর হত্যার ব্যাপারে। বিজনবাবুকে হত্যাকারী সরিয়েছে তাঁর সম্পত্তিটা হাত করবার জন্য। আর বিজনবাবুর হত্যার ব্যাপারটাই হচ্ছে হত্যাকারীর চরম নৃশংসতা। একটু আগেই আপনাদের আমি বলেছি, ঐ বিজনবাবুর হত্যার পর থেকেই হত্যাকারী ক্রমশঃ আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। কিন্তু কেন? কি ভাবে? এ ধরনের হত্যারহস্যের মীমাংসায় পৌঁছতে হলে প্রধানতঃ তিনটি কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক প্রত্যেকেরই। মোটিভ, প্রবাবিলিটি ও চান্স্। প্রথমেই ধরা যাক প্রবাবিলিটি—বিজনবাবু নিহত হবার পরই সর্বপ্রথম যে কথা আমার মনে উদয় হয়েছিল সেটা হচ্ছে বিজনবাবু সিম্প্লি বাই অফ মিসটেক নিহত হয়েছেন কিনা। যে কথাটা সেদিনও কিছুটা আপনাদের সামনে আমি আলোচনা করেছিলাম। অর্থাৎ কোন একজন বিশেষ ব্যক্তিকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলবশতঃ বিজনবাবুকে প্রাণ দিতে হয়েছিল কিনা। কিন্তু অনেক ভেবেও কোন কূল-কিনারা না পেয়ে শেষে স্থির করলাম, না, ভুল নয়—ইচ্ছা করেই এবং খুনীর প্রয়োজনেই তাঁকেও হত্যা করা হয়েছে। বিজনবাবু এক চুমুক চা পান করার সঙ্গে সঙ্গেই মারা গেলেন। আগেই অবশ্য প্রমাণ করে দিয়েছি আমি, কি ভাবে নিকোটিন বিষপ্রয়োগে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। বিষ একমাত্র সেক্ষেত্রে মেশাতে পারে কে এবং কার পক্ষে সর্বাপেক্ষা সেটা সম্ভব ছিল তা পরে বিবেচ্য, কিন্তু বর্তমানে প্রশ্ন হচ্ছে, তিনি যেভাবে মারা গেলেন সেভাবে আমাদের মধ্যে অন্য কেউই সে সন্ধ্যায় মারা যেতে পারত কিনা। হ্যাঁ, পারত। কিন্তু খুনী এখানে প্রবাবিলিটির উপরে একটা স্রেফ্ চান্স্ নিয়েছিল মাত্র সে সন্ধ্যায়। সৌভাগ্যবশতঃ খুনীর সে চান্স্ ফলে গেল। হি ওয়াজ সাকসেসফুল! কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বিজনবাবুর মৃত্যুর পর—পরের দিন মধুবাবুকে নিয়ে যখন আমি তার আগের সন্ধ্যার অভিনয়টা করি সে সময়ও যদি একবারও ডাঃ অধিকারী—আপনি—হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনি আমার অনুরোধ সত্ত্বেও মুখ না বন্ধ করে থাকতেন তো পুওর গোকুলকে ঐভাবে সে রাত্রে প্রাণ দিতে হত না হয়ত!

না, না—এ আপনি কি বলছেন মিঃ রায়? আমি—আমি সত্যিই কিছু জানি না। ব্যাকুল কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন ডাঃ অধিকারী।

এখনো আপনি সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন ডাঃ অধিকারী—সঙ্গে সঙ্গে কিরীটী বলে ওঠে কঠিন কণ্ঠে। সেদিন মধুবাবুর অভিনয়কালে ব্যাপারটা সত্য ভেবে যে উদ্বেগ আপনার চোখে মুখে ফুটে উঠেছিল, সেটা আর কারও চোখে না পড়লেও আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। শুনুন ডাক্তার—অর্থের লোভই সেদিন আপনার মুখ বন্ধ করে রেখেছিল। বলুন—বুকে হাত দিয়ে আপনি বলুন তো একটা কথা—আপনার অভিন্নহৃদয় বন্ধু মৃত সারদাবাবুর সঙ্গে তাঁর মৃত্যুর তিনদিন আগে যখন দেখা করতে এই 'সরকার ভিলা'তে এক বেলার জন্য আপনি এসেছিলেন সে সময় ছদ্মবেশী কেতুকে কি আপনি চিনতে পারেন নি? আপনি কি সত্যিই বুঝতে পারেননি আসলে সে কে?

আমি—আমি—

হ্যাঁ, কেতুই যে ছদ্মবেশে আমাদের মধুসূদনবাবু তা কি বুঝতে পারেননি আপনি সেদিন, বলুন?

ঘরের মধ্যে যেন বজ্রপাত হল।

বৃন্দাবন চিৎকার করে উঠলেন, কেতুই দাদা?

হ্যাঁ—কেতুই ছদ্মবেশী আপনার দাদা মধুসূদনবাবু। আপনি—আপনিও বোধ হয় সন্দেহ করেছিলেন বৃন্দাবনবাবু? কিন্তু কেন আমাকে সে কথা বলেননি—তাহলে তো হতভাগ্য বিজনবাবু ও গোকুলকে ঐভাবে ঐ শয়তানের হাতে নিষ্ঠুরভাবে মরতে হত না।

ঘরের সব কটি প্রাণীই যেন বিমূঢ়।

।। বাইশ ।।

মধুসূদনবাবু তখন ধীরে ধীরে বোধ হয় সোফাটা ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু তাঁর আর উঠে দাঁড়ানো হল না। শান্ত অথচ তীক্ষ্ণকণ্ঠে কিরীটী মধুসূদন সরকারকে লক্ষ্য বললে, উঁহু মিঃ সরকার, উঠবার চেষ্টা করবেন না কারণ আজ আমরা প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

সকলকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে আরও শান্ত ও একান্ত নির্লিপ্ত কণ্ঠে মধুসূদন এবারে কথা বললেন, ওঠবার চেষ্টা আমি করিনি মিঃ রায়—আর তার প্রয়োজনও নেই। তবে এটা ঠিকই, আপনার উর্বর কল্পনা-শক্তির প্রশংসা না করেও আমি পারছি না। মিঃ সুশান্ত ঘোষালের কথায় সেদিন এখন দেখছি আপনাকে একটু ওভার-এস্টিমেট করে ভুলই করেছিলাম।

ভুল করেছিলেন বৈকি! ভেবেছিলেন আপনার চাতুরী বুঝি কেউ ধরতে পারবে না। মধুবাবু, আমাদের দেশে একটা চলতি প্রবাদ আছে—অধিক লোভে তাঁতি নষ্ট। সারদাবাবু যে উইল করে গিয়েছিলেন সেটা যদি মাস-চারেক আগে আপনার অভিন্নহৃদয় বন্ধু আমাদের সলিসিটার মিঃ শচীবিলাসবাবুর কাছ থেকে না জানতে পারতেন—

শচীবিলাস বললেন, আশ্চর্য! আপনি-আপনি সেকথা জানলেন কি করে মিঃ রায়?

অনুমান—নিছক সেটা অনুমান মাত্র শচীবিলাসবাবু!

অনুমান?

হ্যাঁ। মধুসূদনবাবু বর্মা থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে এসেছেন দু-সপ্তাহকাল আগে নয়—চার মাস পূর্বে। এবং তিনি যে এসেই আপনার সঙ্গে দেখা করেছিলেন সেকথা প্রথম আমি মাত্র পরশু জানতে পারি আপনার ফার্মের পার্টনার রথীন বোসের কাছ থেকেই। তারপর বাকিটা অনুমান করে নিতে আমার কষ্ট হয়নি।

চুপ কর শচী, ওর দৌড়টা একবার শেষ পর্যন্ত আমাকে দেখতে দাও। লেট হিম স্পিক! বললেন আবার মধুসূদন সরকার।

কিন্তু সব কথা আমার বলবার আগে—বিমলবাবু, আমার অনুরোধ, সরকার সাহেবের রক্তাক্ত হাত দুটি আপনি লৌহবলয়াঙ্কৃত করুন! বললে কিরীটী।

নিশ্চয়ই। উঠে দাঁড়াল বিমল সেন এবং মধুসূদনের দিকে এগিয়ে গেল।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালেন মিঃ সরকার, আই—আই মাস্ট নট্ আলাউ দিস ইনসাল্ট!

কিন্তু তাঁর কোন প্রতিবাদই কাজে লাগল না।

মধুসূদন সরকারের হাতে বিমল সেন হ্যাণ্ডকাপ্ পরিয়ে দিলেন।

হ্যাঁ, এবার সব কিছুই এক্সপ্লেন করে আপনাদের বলব।

কিরীটী নিশ্চিন্ত কণ্ঠে আবার শুরু করল, অবশ্যই এই খেলাটি ইস্কাবনের সাহেবেরই খেলা নয়—সাহেবের বিবিও আছেন—হরতনের বিবি।

চকিতে সুশান্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

আশ্চর্য হচ্ছেন সুশান্তবাবু আমার কথা শুনে, তাই না? সেই জন্যেই সে রাত্রে আপনাকে ফিরবার পথে সাবধান করে দিয়েছিলাম, অল দ্যাট গ্লিটারস ইজ নট গোল্ড এবং কেয়ার ঝোপের পাশেই থাকে বিষধর কালনাগ বলে। যাক গে সে কথা, যা বলছিলাম বলি। ইস্কাবনের সাহেব অর্থাৎ আমাদের ঐ সরকার সাহেবের দিকে চেয়ে দেখুন, ঠিক তাসের ইস্কাবনের মতই মুখখানি নয় কি ওঁর?

ঘরের মধ্যে উপস্থিত যাঁরা ছিলেন সকলেরই দৃষ্টি মধুসূদন সরকারের মুখের উপরে গিয়ে নিবদ্ধ হল এবং সকলেরই যেন মনে হল কিরীটী মিথ্যা বলেনি। মধুসূদনের মুখখানি যেন হুবহু তাসের ইস্কাবনের সাহেবের মতই দেখতে।

সত্যিই আশ্চর্য!

কিরীটীর কণ্ঠস্বরে পরমুহূর্তেই আবার সকলে তার মুখের দিকে তাকাল।

কিরীটী বলছিল, এবারে চেয়ে দেখুন সকলে আমাদের শকুন্তলা দেবীর মুখের দিকে? হুবহু হরতনের বিবি নয় কি এবং ওঁদের দুজনের ঐ বিচিত্র মুখাকৃতিই—সত্য বলতে কি, প্রথম দিন ওঁদের দেখেই ওঁদের প্রতি মন আমার আকৃষ্ট হয়েছিল।

সকলের দৃষ্টি আবার ঘুরে গেল শকুন্তলা দেবীর মুখের দিকে।

এতটুকু অতিশয়োক্তি নয়—আশ্চর্য, হুবহু যেন হরতনের বিবিটিই!

কিরীটী আবার বলতে শুরু করে, এবারে শুনুন ঐ সাহেব-বিবির খেলা। মধুসূদনবাবুর সঙ্গে যে কারণে বিবাদ হয়েছিল তাঁর কাকা সারদাবাবুর এবং যে কারণে একদিন বিতাড়িত হতে হয় তাঁর পিতৃগৃহ থেকে সে হচ্ছে ওঁর অতিরিক্ত জুয়াখেলায় আসক্তি—কেমন কিনা বৃন্দাবনবাবু?

বৃন্দাবনবাবু নিঃশব্দে মাথা নাড়লেন, হ্যাঁ।

আমাদের বিতাড়িত ইস্কাবনের সাহেব অনন্যোপায় হয়ে চলে গেলেন তখন একেবারে ভাগ্যান্বেষণে সুদূর বর্মা দেশে মগের মুল্লুকে। সেখানে এ ধনীকাষ্ঠব্যবসায়ীর নজরে পড়ে কিঞ্চিৎ ভাগ্যও একটু একটু করে ফিরিয়ে আনছিলেন, কিন্তু যার রক্তে একবার জুয়ার নেশা ধরেছে—সে যে বাঘের মতই নররক্তের আস্বাদ পেয়েছে—সে নেশা সে ভুলবে কি করে? তাই ছুটলেন আবার জুয়ার আড্ডায় যেই হাতে কিছু জমেছে। এবং সেইখানেই অর্থাৎ প্রেমের এক জুয়ার আড্ডাতেই পরিচয় ঘটল সাহেব-বিবির পরস্পরের। দেবা চিনলেন দেবীকে, দেবী চিনলেন দেবাটিকে। সেও আজ থেকে বৎসর দেড়েক আগেকার কথা। এসব সংবাদ অবিশ্যি আমাকে রেঙ্গুন পুলিসের দপ্তর থেকেই সংগ্রহ করতে হয়েছে কষ্ট করে। তথাপি ভুলভ্রান্তি অবশ্য থাকতে পারে। এবং ভুলভ্রান্তি যদি থাকেও, সরকার সাহেব আশা করি সংশোধন করে দিতে পারবেন।

কথাগুলো বলে কিরীটী তাকাল মধুসূদনের মুখের দিকে।

রোমকষায়িত দৃষ্টিতে তাকালেন মধুসূদন সরকার কিরীটীর দিকে নিরুপায় পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত।

আর শকুন্তলা চোখ নামিয়ে নিল একান্ত অসহায়ের মতই যেন।

আবার কিরীটী তার অর্ধসমাপ্ত কাহিনীর বিবৃতির মধ্যে ফিরে যায়, জুয়োতে সর্বস্বান্ত হয়ে অনন্যোপায় সাহেব আবার ফিরে এলেন বাংলাদেশে দীর্ঘ দশ বৎসর পরে এবং সঙ্গে এবারে এলেন তাঁর বিবিসাহেবা, কারণ জুয়োর আড্ডায় পরিচয়টা উভয়ের তখন নিবিড় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশে ফিরে সরকার সাহেব কাকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে গলাধাক্কা

খেলেন। এবারে কি উপায় করা যায় যখন ভাবছেন, ঐ সময় কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সারদাচরণের কাছে পাঠিয়ে দিলেন শকুন্তলাকে। এবারে কিন্তু হার হল না, কারণ শকুন্তলার রূপ দেখে প্রৌঢ় সারদাচরণের মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল। অতএব বহাল হল শকুন্তলা তাঁর কাজে। কিন্তু দুর্ভাগ্য সরকার সাহেবের। যে প্ল্যান করে শকুন্তলাকে তিনি কাকার কাছে চাকরি করার জন্য পাঠালেন সেটা গোড়াতেই বানচাল হয়ে গেল। কারণ পঞ্চশরের বানে কাহিল হলেন সারদাচরণ আর ঐশ্বর্যের লোভে শকুন্তলা তাঁর পূর্ব চুক্তি বোধ হয় ভুলে গেলেন যা হয়েছিল সাহেবের সঙ্গে। ফলে নাটকের দৃশ্যান্তর হল। মধুসূদন দেখলেন বেগতিক। কিন্তু এত সহজে হাল ছাড়বার পাত্র তিনি নন। তাতেই কেতুর আবির্ভাব ঘটল সরকার ভিলায়, কাজও হাসিল হল বটে সারদাচরণেরই নিজ হাতে তৈরী রোজ স্প্রেইং সলুশনের মধ্যস্থিত বিষ নিকোটিনের সাহায্যে, কিন্তু দশরথ আসল পরিচয়টা জেনে ফেলল, ফলে হতভাগ্য দশরথকেও মরতে হল ঐ মারাত্মক নিকোটিন বিষে।

এই পর্যন্ত বলে কিরীটী একটু থামল।

তারপর? প্রশ্ন করল সুশান্ত।

তারপর? তারপর আসতে হল আমাকে। এদিকে উইলের আসল মর্মকথা মধুসূদন তাঁর বন্ধুর কৃপায় পূর্বাহ্নেই জেনেছিলেন। এবং দশরথ ও সারদাচরণকে সরিয়ে সাহসও তাঁর বেড়ে গিয়েছিল—অতএব অর্থের লোভে হতভাগ্য বিজনবাবুকেও এবারে মরতে হল। পূর্বেই বলেছি সারদাবাবু ও দশরথের মৃত্যু ও তাঁদের ময়না তদন্তের রিপোর্ট থেকে আমার মনে দুটি সন্দেহ হয়। এক—যেভাবে তাঁদের মৃত্যু ঘটেছে তাতে করে হত্যাকারী বাইরের কেউ নয়—ভিতরেরই। দুই—প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে দ্বিতীয় মৃত্যুর যোগাযোগও আছে এবং ঐভাবে হত্যা করা কোন সাধারণ ব্যক্তির পক্ষে সম্ভবপর নয়। তখনো হত্যার মোটিভ বা উদ্দেশ্যটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়নি। পরিষ্কার হল উইলের মর্মকথা শোনবার পর। এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সারদাচরণের গৃহে তাঁর ড্রয়ারের মধ্যে প্রসাধনদ্রব্যগুলো দেখে ও বাগানে সেদিন শকুন্তলা দেবীর খোঁজে সেই চায়না বাঁশের ঝাড়ের কাছে গিয়ে চুরুটের শেষাংশ দেখে, শকুন্তলা ও মধুসূদনবাবুকে ঘিরে যে সন্দেহটা আমার মনে দানা বাঁধবার চেষ্টা করছিল সেটা যেন ক্রমশঃ শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। এবং সেই মুহূর্তেই এল আকস্মিকভাবে বিজনবাবুর মৃত্যু।

কিরীটী এই পর্যন্ত বলে আবার থামল।

।। তেইশ ।।

পাইপটায় টোবাকো ভরে তাতে অগ্নিসংযোগ করে কিরীটী পাইপে গোটা-দুই টান দিয়ে আবার তার কাহিনী শুরু করল :

বিজনবাবুর মৃত্যুটা যদিও মর্মান্তিক, তথাপি তাঁর মৃত্যু ঐভাবে সেদিন না ঘটলে হয়ত এত তাড়াতাড়ি এই জটিল রহস্য আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠত কিনা সন্দেহ। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরই ক্রমশঃ হত্যাকারী আমার দৃষ্টির সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। আর সেই কারণেই আপনাদের এখানে আমি কৌশলে বন্দী করেছিলাম সে-সময়।

কিন্তু কেন যে কৌশলে ওদের আমার সাহায্যে এই সরকার ভিলায় আপনি বন্দী করেছিলেন সেটাই এখনও বুঝতে পারিনি মিঃ রায়। বললে বিমল সেন।

মানুষের নার্ভেরও একটা সীমা আছে মিঃ সেন! তারই পরীক্ষা করতে চেয়েছিলাম আমি

এই আশাতে যে শেষ পর্যন্ত মানসিক পীড়নে কারো মুখ দিয়ে কোন কথা যদি বের হয়ে পড়ে! হলও তাই। হত্যাকারী তখন আন্দাজ করতে পেরেছে সে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর সেই আতঙ্কেই সে যখন অনন্যোপায় হয়ে তার দক্ষিণ হস্ত গোকুলকে শেষ করে দেবে বলে মনস্থ করল। এবং তাকে হত্যা করতে গিয়েই সে দুটি মারাত্মক ভুল করল—যার ফলে সে আমার দৃষ্টির সামনে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

মারাত্মক ভুল! প্রশ্ন করল বিমল সেন।

হ্যাঁ মিঃ সেন, দুটি মারাত্মক ভুল। এক হচ্ছে, হত্যা করতে গিয়ে রিভলবারের সাহায্য নিয়ে এবং দুই—সেই নিকোটিনের শিশিটি আমার হাতে অসম্ভব আত্মপ্রত্যয়ে তুলে দিয়ে। রিভলবার দিয়ে হত্যা করতে গিয়েই নিজের দেহেও তাকে ক্ষতের সৃষ্টি করতে হল এবং নিকোটিনের শিশির গায়ে তার হাতের আঙুলের ছাপও পাওয়া গেল—হত্যার মারাত্মক দু'টি প্রমাণ। কিন্তু এবারে আমাকে উঠতে হবে—আজকের শেষ গাড়িটা আমাকে ধরতেই হবে—

বিমল সেন বললেন, কেন, আজ রাতটা থেকে যান না!

উপায় নেই—

কেন?

কাল আমার বিয়ে।

বিয়ে! সে কি? পাত্রী কে? কার মেয়ে? কি নাম? সুশান্তই জিজ্ঞাসা করল।

কার মেয়ে তা দিয়ে কি হবে? নাম তার কৃষ্ণা, সুশান্তবাবু।

কৃষ্ণা?

হ্যাঁ, একটি পার্শী মেয়ে—

পার্শী মেয়েকে আপনি বিয়ে করবেন! সুশান্ত বললে, বাংলাদেশে কি মেয়ে ছিল না?

বন্ধু, তুমি জান প্রেম অন্ধ—

হুঁ, তা অঘটনটা ঘটল কোথায়?

সিংহলে।

তাহলে সত্যিই এতদিনে কিরীটী রায় কুমারত্ব ঘুচাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

হ্যাঁ, চলি ভাই—সামনের শনিবার আমাদের ম্যারেজ-পার্টিতে আসা চাই—আপনারা তিন বন্ধুই—সকলকে আমার হয়ে নিমন্ত্রণ জানাবেন।

কিরীটী বের হয়ে গেল।

পরের দিন সকালে কলকাতায় একটা হোটেলে কৃষ্ণা এসে বোম্বাই থেকে উঠেছিল। কিরীটী এসে ঢুকতেই কৃষ্ণা বলে, আমি তো ভেবেছিলাম বুঝি এলেই না। গতকাল আসার কথা—

কিরীটী মৃদু মৃদু হাসে।

হাসছ যে?

কিছু না, চল—

কোথায়?

বাঃ, রেজেস্ট্রি অফিসে যেতে হবে না?

কৃষ্ণার মুখটা লাল হয়ে ওঠে।

ড্রাগন

।। এক ।।

বর্ষা-মেদুর সন্ধ্যা

চারিদিকে আবছা কালো অন্ধকারের যেন যবনিকা থির-থির করে কাঁপছে। কিরীটীর টালিগঞ্জের বাড়িতে তার বসবার ঘরে কৃষ্ণা চুপটি করে বসে কিরীটীর গল্প শুনছে। কিরীটীর পরিধানে গেরুয়া রঙের খদ্দরের ঢোলা পায়জামা ও গেরুয়া রঙের ঢোলা খদ্দরের পাঞ্জাবি।

মুখে পাইপ।

কিরীটী বলছিল ঃ এই মিস্ট্রি, যাকে তোমরা রহস্য বল—এ কোন ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে পাওয়া যায় না। কত প্রকারের মিস্ট্রিই যে আমি দেখেছি ও শুনেছি—রাতের পর রাত তোমাদের বসে বসে আমি গল্প শোনাতে পারি। ক্রাইমের রহস্য আছে ঃ কোন খুনের মামলার যখন আদালতে বিচার হয়, আদালতে প্রত্যেকটি দর্শক তখন উদগ্রীব ও উৎসুক হয়ে থাকে। ধর একটা খুন হল, কে খুন করলে ? কেন খুন করলে? কেমন করে কোন্ অবস্থায় কখন খুন হল? একটার পর একটা চিন্তা আমাদের মনের মাঝে রহস্যের জাল বুনতে শুরু করে। এই এক ধরনের মিস্ট্রি। আবার হয়ত এমন হল, কোন লোক সহসা আশ্চর্য ভাবে অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় গেল সে অদৃশ্য হয়ে? কেমন করে সে অদৃশ্য হল? তাকে কি কেউ চুরি বা গায়েব করে নিয়ে গেল? অথবা কেউ কি তাকে খুন করে পৃথিবী থেকে তার মৃতদেহ চিরতরে লোকচক্ষুর অন্তরালে লুকিয়ে ফেললে? কিংবা হয়ত কোন নিরালা মাঠের প্রান্তে পাওয়া গেল তার হিমশীতল প্রাণহীন দেহখানি কিংবা কোন এক প্রাসাদোপম অট্টালিকার কোন এক নির্জন সুসজ্জিত কক্ষে দেখা গেল পড়ে আছে তার মৃতদেহ। অথবা কোন নদী-কিনারে এসে ঠেকে রয়েছে তার মৃত্যুশীতল প্রাণহীন দেহ।

আর তার কাছ থেকে জানা যাবে না কোনদিন কখন কে বা কারা কি ভাবে তাকে এমনি করে খুন করে ফেলে রেখে গেল!

ভাষা তার চিরদিনের জন্য মূক হয়ে গেছে।

আর সে কথা বলবে না, আর সে সাড়া দেবে না।

নিস্তব্ধ স্বল্পালোকিত কক্ষের মধ্যে কিরীটীর স্বপ্নাতুর কণ্ঠস্বর রিম্ ঝিম্ করতে লাগল।

বাইরে তখন অশ্রান্ত বৃষ্টি শুরু হয়েছে।

সোঁ সোঁ করে প্রচণ্ড হাওয়া বন্ধ জানালার কাচের শার্সির গায়ে এসে আছাড়িপিছাড়ি করছে।

মাঝে মাঝে হিল-হিল করে উঠছে বিদ্যুতের অগ্নি-ইশারা। কড়কড় করে কোথায় যেন বাজ পড়ল।

পথের ধারের বড় কৃষ্ণচূড়ার গাছটা ঝড়জলে সোঁ-সোঁ সপসপ শব্দ তুলেছে।

পাইপের আগুনটা নিভে গিয়েছিল, কিরীটী আবার তাতে অগ্নিসংযোগ করে নিল।

আবার সে বলতে শুরু করল ঃ এ ধরনের মিস্ট্রিও আছে— একটু অদ্ভুত শব্দ শোনা যায়, অদ্ভুত সব দৃশ্য চোখে পড়ে—যখন কেউ কোথাও জেগে নেই ; সব নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে। অদ্ভুত অশরীরী সব মৃদু চাপা পায়ের শব্দ কোন অন্ধকার শূন্য ঘর থেকে হয়ত শোনা যাচ্ছে। ছুটে হয়ত দেখতে গেলে সেখানে কিসের শব্দ, কিছু চোখে পড়ল না।

যেন মায়ায় গেছে সব মিলিয়ে।

সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে স্বপ্নের ফাঁকে ভেসে আসা ঘুমন্ত রাজকন্যার স্মৃতির মত।

কেউ হয়ত দেখে, আবছা চাঁদের আলোয় কোন পোড়ো বাড়ির বারান্দায় নিঃশব্দে একাকী কে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়।

কে সে?

কেন সে একাকী গভীর রাতে এমনি করে পোড়ো বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়?

কাকে সে খোঁজে?

সে কি কোন বিদেশী রাজপুত্র, হারিয়ে যাওয়া রাজকুমারীকে আজও এই পৃথিবীর ঘরে ঘরে নিশীথ রাতে খুঁজে খুঁজে ফেরে? মানুষ না ছায়া? না মিথ্যা দুঃস্বপ্ন?

শরীর সহসা রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

মিস্ট্রি! মিস্ট্রি! রহস্য!

কার চাপা ফিসফিস কণ্ঠস্বর? কার করুণ কান্নার সুর? মৃদু গানের আওয়াজ বা সঙ্গীতের মৃদু রেশ...রাতের নিঃশব্দে অন্ধকারে এমনি করে ভেসে আসে।

কে শব্দ করে? কে কথা বলে? কে গান গায়? কে বাজায় একা একা আপন মনে?

এ প্রশ্নের মীমাংসা কোথায়? কোথায় এ রহস্যের সমাধান? শুধু কী এই? মানুষের চরিত্রও কি অনেক সময় একটা প্রকাণ্ড রহস্য হয়ে আমাদের চোখের কোণে মায়া জাগায় না? এই পৃথিবীর ঘরে ঘরে কত বিভিন্ন চরিত্রের লোকই না আছে! কেউ কাঁদে পরের দুঃখে, কেউ দুঃখ দিয়ে আনন্দ পায়। কেউ ভালবেসে হয় সুখী, কেউ ঘৃণা করে আনন্দ পায়। কেউ আপনাকে বিলিয়ে দিয়েই ধন্য, কেউ অন্যকে বঞ্চিত করে নিজেকে মনে করে ধন্য!

* * *

বিচিত্র—সব বিচিত্র রহস্যময়! বিচিত্র এই পৃথিবী! বিচিত্র এই পৃথিবীর মানুষ।

মানুষই মানুষকে করে খুন।

যে খুন করেছে সেও মানুষ—যাকে খুন করছে সেও তারই মত একজন মানুষ!

কেউ উদ্দেশ্য নিয়ে খুন করে, আবার কেউ বিনা উদ্দেশ্যেই নিছক নেশায় খুন করে। ডাক্তারী ভাষায় বলা হয় তাদের—'হোমিওসাইড্যাল ম্যানিয়াক' মানুষের।

সারাটি রাতের বর্ষণক্লান্ত প্রকৃতি প্রথম ভোরের আলোয় ঝিলমিল করছে। কিরীটী লম্বা টান-টান হয়ে একটা বড় সোফার উপরে গভীর আলস্যে শুয়ে চোখ বুজে নিঃশব্দে চুরুট টানছে।

চুরুটের পীতাভ ধোঁয়া মাথার উপরে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অদূরে আর একটা সোফায় বসে কৃষ্ণা সেদিনকার দৈনিক সংবাদপত্রটা ওলটাচ্ছে।

সহসা একসময় কৃষ্ণা বলে উঠল, আজকের সংবাদপত্রটা দেখেছ?

কিরীটী চোখ বুজেই জবাব দিল : না, কেন?

বিখ্যাত ডেনটিস্ট ডাঃ চৌধুরীকে কে বা কারা যেন নৃশংস ভাবে হত্যা করেছে তাঁর সার্জারী রুমে। ক্লিনিকে—

কি রকম?

এই দেখ না, কৃষ্ণা সংবাদপত্রটা কিরীটীর দিকে এগিয়ে দিল।

কিরীটী হাত বাড়িয়ে কৃষ্ণার হাত থেকে সেদিনকার দৈনিকখানা নিল। বললে, বল কি,

চৌধুরী যে আমার বিশেষ বন্ধু!

বিখ্যাত দন্ত-চিকিৎসক
ডাঃ এন. এন. চৌধুরীর রহস্যময় মৃত্যু

গতকল্য বেলা সাতটার সময় বিখ্যাত দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ এন. এন. চৌধুরীকে ধর্মতলাস্থ তাঁর শয়নকক্ষে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।

অতীব নিষ্ঠুর ও পৈশাচিক ভাবে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। গলার সামনের দিকে একটা তিন ইঞ্চি পরিমাণ ভয়ঙ্কর ক্ষত ও বাম দিককার বুকেতে একটি চার ইঞ্চি পরিমাণ ক্ষত। মনে হয় যেন কোন তীক্ষ্ণ নখরে গলার ও বুকের মাংস খুবলে নেওয়া হয়েছে। ডাঃ চৌধুরী মাত্র বছর-চোদ্দ আগে জার্মানী থেকে দন্ত-চিকিৎসায় পারদর্শী হয়ে আসেন। শহরে দন্ত-চিকিৎসক হিসাবে তাঁর যথেষ্ট সুনাম ও প্রতিপত্তি ছিল। ধনী পিতার তিনি একমাত্র পুত্র ছিলেন। নিজেও প্রভূত অর্থ উপায় করেছেন। তিনি অবিবাহিত ও সংযমী, অত্যন্ত বিনয়ী স্বাস্থ্যবান সুপুরুষ ছিলেন। এই প্রসঙ্গে দিন পনের আগে চেতলার অবসরপ্রাপ্ত আলিপুর জেলের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট গণনাথ মিত্রের হত্যার কথা মনে পড়ল। তাঁকেও একদিন প্রাতে তাঁর শয়নকক্ষে ঐরূপ নৃশংস অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁরও গলায় ও বাম দিককার বক্ষে ঐরূপ নৃশংস ক্ষত ছিল। পুলিসের কর্তৃপক্ষ এ সম্পর্কে কী বলেন?

কিরীটী সংবাদপত্রটা কৃষ্ণার হাতে ফেরত দিতে দিতে বললে—

হবুচন্দ্র রাজা তাঁর গবুচন্দ্র মন্ত্রী
পথেঘাটে সদা ঘোরে সশস্ত্র সান্ত্রী!
হঠাৎএকদা রাজা ডাকিলেন 'গবু'!
রাজ্যে এত খুনোখুনি শুনিনি তো কভু!
কহিলেন গবু : তবে শোন মহারাজ,
নিশ্চয় ঘুমায় সান্ত্রী করেনাকো কাজ।
শুনি হবু বলে তবে চক্ষু করি লাল,
মাহিনা দিতেছি তবু একি হীন চাল!
আমি হবু, তবু রাজ্যে একি অনাচার
এখুনি মস্তকচ্যুত করহ সবার।
শুনি গবু বলে তবে, একি মহারাজ ;
গরীবের শির লবে একি তব কাজ!

এমন সময় সুব্রত হাসতে হাসতে এসে ঘরে প্রবেশ করল। কার শির নিচ্ছ হে!

কার আবার—তোমার?

অপরাধী জানিল না কি দোষ তাহার? বিচার হইয়া গেল তবু?

এসব কি শুনছি হে সুব্রতচন্দ্র? তোমার রাজ্যে কি আজকাল মানুষেই মানুষ খেতে শুরু করেছে?

হ্যাঁ, কন্ট্রোলের চালে মানুষের পেট ভরছে না, তাই মানুষের বুকের মাংস খুবলে খেতে হচ্ছে।

তা তো বুঝলাম, কিন্তু আসল ব্যাপারটা কী বল তো?

মাথামুণ্ডু এখনও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না, তবে চেষ্টার ত্রুটি করছি না!

কয়েকদিন পরে গভীর রাত্রে। শীতের মধ্যরাত্রি। স্বল্প কুয়াশার মৃদু অস্বচ্ছ অবগুণ্ঠনতলে কলিকাতা শহর যেন তন্দ্রানত।

ব্ল্যাক আউটের নিস্তেজ বাতির ম্রিয়মাণ রশ্মিগুলি কুয়াশার মায়াজালে আটকা পড়ে যেন মুক্তির আশায় পীড়িত হয়ে উঠেছে।

কিরীটী শ্যামবাজারে এক বন্ধুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ি ফিরছে।

ট্রাম ও বাস বন্ধ হয়ে গেছে, রাস্তায় লোকচলাচল একপ্রকার বন্ধ হয়ে গেছে বললেও চলে। শুধু হেথা-হোথা ফুটপাতের উপরে ও ঝোলানো বারান্দার আশ্রয়ে দু-একজন ভিক্ষুক নিঃসঙ্গ রাত্রির বুকে জীবনের স্পন্দনটুকু জাগিয়ে রেখেছে।

কিরীটী ইচ্ছা করেই গাড়ি ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিল। হীরা সিংকে বলে দিয়েছিল সে হেঁটেই বাড়ি ফিরবে।

প্রভুর এ ধরনের অদ্ভুত খেয়ালের সঙ্গে হীরা বিশেষ করেই পরিচিত ছিল, তাই বিনা বাক্যব্যয়ে গাড়ি নিয়ে চলে গেছে।

কিরীটী গায়ে লংকোটটা চাপিয়ে পাইপটায় অগ্নিসংযোগ করে মৃদু মৃদু টান দিতে দিতে পথ চলছিল।

স্তব্ধ নির্জন রাত্রির একটা নিজস্ব রূপ আছে। প্রকৃতি সেখানে নিঃশেষে আপনাকে মুক্ত করে দেয়। দু'হাতে নিঃস্ব করে আপনাকে বিলিয়ে দেয়।

মানুষের মন যেন সেখানে অনায়াসেই আপনাকে খুঁজে পায়, সেখানে কোন দম্ভ থাকে না, কোন প্রশ্ন থাকে না, এইভাবে একাকী আপন মনে রাত্রির নিঃসঙ্গতায় পথ চলতে কিরীটীর বড় ভাল লাগে।

বৌবাজারের কাছাকাছি আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে তখনও একটা পানের দোকানে দু-একজন খরিদ্দারের ভিড়। কিরীটী এগিয়ে চলে।

এত বড় জনকোলাহল-মুখরিত নগরী যেন কোন যাদুমন্ত্রের স্পর্শে ঘুমিয়ে পড়েছে।

রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা হবে—কিরীটী রসা রোড ও লেক রোডের কাছাকাছি এসে আবার তার পাইপটায় নতুন করে তামাক ভরে অগ্নিসংযোগ করে নিল।

সবে কয়েক গজ এগিয়েছে এমন সময় একটা দীর্ণ আর্ত চিৎকার নৈশ রাত্রির স্তব্ধ নির্জনতাকে ছিন্নভিন্ন করে জেগে উঠল।

কিরীটী থমকে দাঁড়াল।

দীর্ণ চিৎকারটা যেন সহসা রাত্রির স্তব্ধ সমুদ্রে একটা আকস্মিক শব্দের ঢেউ তুলে সহসাই মিলিয়ে গেল।

কিরীটী ভাবলে, শুনতে ভুল হয়নি তো? অন্যমনস্ক ভাবে সে ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করতে লাগল।

আবার সেই চিৎকার।

না, ভুল নয়। এ যে কোন মানুষের বুক-ভাঙা দীর্ণ চিৎকার!

কিরীটী উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল। আবার সেই চিৎকার!

মনে হচ্ছে যেন ডান দিককার কোন একটা বাড়ি থেকে আসছে সেই চিৎকারের শব্দ।

ডানদিকে কতকগুলো একতলা, দোতলা, তিনতলা নানা আকারের বাড়ি। ব্ল্যাক আউটের স্তিমিত আলোকে কেমন ভৌতিক ছায়ার মতই প্রতীয়মান হয়।

কিরীটী দ্রুতপদে অনুমানে শব্দটা যেদিক থেকে আসছিল সেইদিক লক্ষ্য করে এগিয়ে চলল।

একটা বাড়ির কাছাকাছি আসতেই পাশের একটা সরু গলিপথ দিয়ে কে যেন ছায়ার মত দ্রুতপদে এগিয়ে এল।

লোকটার সর্বাঙ্গে কালো রঙের পোশাক।

মাথায় একটা কালো রঙের ফেল্ট টুপি। একপাশে ঈষৎ নামানো।

লোকটা এসে দ্রুতপদে পথের ধারে একটা গ্যাসপোস্টের নীচে দাঁড়াল।

কিরীটী দু-তিন হাত দূরে একটা গাড়িবারান্দার সামনে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লোকটাকে দেখতে লাগল, অথচ লোকটা কিন্তু কিরীটীকে দেখতে পেল না। লোকটার সর্বাঙ্গ যেন একটা গভীর উত্তেজনায় কাঁপছে। গ্যাসপোস্টের খানিকটা আলো তির্যক গতিতে লোকটার মুখের ডানপাশে এসে পড়েছে।

সেই স্তিমিত আলোয় লোকটার চোখ দুটো যেন কী এক ভয়ঙ্কর ক্ষুধিত জিঘাংসায় আগুনের ভাটার মত জ্বল-জ্বল করে জ্বলছে। মাথার চুলগুলো ডান দিককার কপালে এসে পড়েছে।

একজোড়া পাকানো গোঁফ।

লোকটা পকেট থেকে একটা রুমাল বের করে ঘন ঘন মুখ মুছতে শুরু করল।

এমন সময় পাশের একটা বাড়ি থেকে প্রচণ্ড একটা গোলমালের শব্দ শোনা গেল।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটা চমকে রাস্তায় নেমে দ্রুতপদে চলতে লাগল এবং ঘন ঘন পিছনপানে তাকাতে লাগল। কিরীটীও নিঃশব্দ পদসঞ্চারে লোকটাকে অনুসরণ করল। লোকটা আরও দ্রুতবেগে রাস্তাটা পার হতে লাগল। কিরীটীও তার চলার বেগ বাড়িয়ে দিল।

কিন্তু কিরীটী লোকটার কাছাকাছি পৌঁছবার আগেই রাস্তার ধারে রক্ষিত একটা সাইকেলে চেপে লোকটা সোঁ সোঁ করে নিমেষে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল।

কিরীটী যখন সেখানে এসে পৌঁছল, দেখলে সাইকেলটা যেখানে ছিল সেইখানে রাস্তার উপরে কী একটা কাপড়ের মত পড়ে আছে।

নীচু হয়ে কিরীটী জিনিসটা তুলে নিল হাতে।

নিশ্চয়ই লোকটা রুমালটা তাড়াতাড়িতে ফেলে গেছে।

কিরীটী রুমালটা হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে রাস্তার ওপাশে যেখান থেকে তখনও গোলমাল আসছিল সেইদিকে এগিয়ে গেল।

গোলমালটা আসছিল একটা গেটওয়ালা দোতলা বাড়ি থেকে।

বাড়িটার কক্ষে কক্ষে তখন আলো জ্বলে উঠেছে। অনেক লোক চলাফেরা করছে।

কিরীটী গেট খুলে এগিয়ে গেল।

দরজার সামনে অল্পবয়স্ক একটি যুবককে দেখে কিরীটী তাকেই প্রশ্ন করলে, কী ব্যাপার মশাই?

কে আপনি? যুবক প্রশ্ন করলে।

একজন পথিক ভদ্রলোক, এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, গোলমাল শুনে দেখতে এলাম, ব্যাপার কী?

কী আর বলব মশাই!...যুবকের কণ্ঠস্বর কাঁপতে লাগল।

কিরীটী স্পষ্টই বুঝতে পারলে কোন কারণে যুবক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।

কী, ব্যাপার কী?

ব্যাপার যে কী তা কি আমিই বুঝতে পারছি! ভৌতিক কাণ্ড মশাই!

ভৌতিক কাণ্ড! বলেন কী?

তাছাড়া আর কী? মানুষ যে মানুষকে ওভাবে খুন করতে পারে, এ যে স্বপ্নেরও অতীত।

খুন?

হ্যাঁ, খুন।

পুলিসে সংবাদ দিয়েছেন?

না, দিইনি তো!

ফোন আছে বাড়িতে?

আছে।

চলুন শীগগির পুলিসে একটা ফোন করা যাক।

কিরীটী যুবকের সঙ্গে বৈঠকখানায় এসে ফোনের রিসিভার তুলে নিল, হ্যালো বড়বাজার...

ওপাশ থেকে জবাব এল, হ্যালো, কে?

কে, সুব্রত? কিরীটী প্রশ্ন করলে এপাশ থেকে।

হ্যাঁ, ব্যাপার কী? কিরীটী না?

হ্যাঁ, হ্যাঁ। শীঘ্র এস। ...নং রসা রোডে একজন খুন হয়েছেন।

খুন? এত রাত্রে?

আরে ছাই, এসোই না!

তুমি থাকছ তো?

হ্যাঁ আছি, এস তাড়াতাড়ি। কিরীটী রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

তারপর যুবকের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললে, চলুন, দেখি কোথায় খুন হয়েছে।

আসুন। নিস্তেজভাবে যুবক কিরীটীকে আহ্বান করল।

উপরের একটা ঘরে যুবকের পিছু পিছু কিরীটী এসে প্রবেশ করল।

বেশ প্রশস্ত সাজানো-গোছানো একখানা ঘর। মেঝেতে দামী পুরু কার্পেট বিছানো। ঘরের একপাশে একখানা দামী খাটে নিভাঁজ একটি শয্যা বিছানো।

একপাশে একটি টেবিল ও একটি বুক-সেলফ্, টেবিলের উপরে কাগজপত্র স্তূপাকার করা আছে।

একপাশে একটি লোহার সিন্দুক। টেবিলের সামনে একটি গদি-মোড়া চেয়ার। টেবিলের উপরে সবুজ ঘেরাটোপে ঢাকা একটি টেবিল-ল্যাম্প জ্বলছে। তারই আলোয় ঘরটি আলোকিত।

মেঝেয় কার্পেটের উপরে দামী স্লিপিং স্যুট পরা কে একজন উপুড় হয়ে পড়ে আছে।

পিঠের দিকে স্লিপিং স্যুটটা ছিন্নভিন্ন, রক্তে ভিজে লাল হয়ে উঠেছে।

কিরীটী এগিয়ে দেখল, পিঠের উপরে প্রকাণ্ড দু-তিনটি গভীর ক্ষত।

মনে হয় কোন এক হিংস্র রক্তপিপাসু জন্তু যেন তীক্ষ্ণ দন্তাঘাতে লোকটার পিঠের মাংস খুবলে নিয়েছে।

উঃ, কী ভয়ানক পৈশাচিক দৃশ্য!

কিরীটী পকেট থেকে টর্চ বের করে ভূপতিত ব্যক্তিকে আলোতে আরও ভাল করে দেখতে লাগল।

একবার নাকের কাছে হাত নিয়ে দেখতে পেল, নাকমুখ দিয়ে রক্তাক্ত ফেনা গড়াচ্ছে।

চোখ দুটো খোলা, যেন ঠিক্‌রে বের হয়ে আসতে চায় মুখে-চোখে একটা অস্বাভাবিক আতঙ্ক যেন প্রকট হয়ে উঠেছে।

কিরীটী লোকটার বুকে হাত দিয়ে দেখলে, না, লোকটার নিঃসন্দেহে মৃত্যু হয়েছে।

গলার উপরে ও কিসের নীল দাগ! ও যে আঙুলের দাগ বলেই মনে হয়। হ্যাঁ, লোকটাকে কণ্ঠনালী চেপে নিষ্ঠুরভাবে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে।

কিন্তু কী ভয়ঙ্কর পৈশাচিকতা, কী দানবীয় নিষ্ঠুরতা!

কিরীটী একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়াল এবং অদূরে স্থাণুর মত দণ্ডায়মান যুবকের মড়ার মত রক্তহীন ফ্যাকাশে মুখের দিকে তাকাল।

চলুন এ ঘর থেকে অন্য ঘরে যাওয়া যাক।

কিরীটী মৃদুস্বরে যুবককে বললে।

দুজনে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে পাশের ঘরে দুখানা চেয়ার অধিকার করে বসল।

বাইরে তখন চার-পাঁচজন ভৃত্য উঁকিঝুঁকি মারছে।

উনি আপনার কে হন? কিরীটীই প্রথমে নিস্তব্ধতা ভেঙে প্রশ্ন করলে।

আমার জ্যেঠামশাই। বিখ্যাত ডাঃ অমিয় মজুমদার।

উনিই ডাঃ অমিয় মজুমদার?

হ্যাঁ।

আপনার নাম?

সুশীল মজুমদার।

এ বাড়িতে আর কে আছেন?

জ্যেঠামশাই ব্রহ্মচারী, চিরকুমার। আমি ছোটবেলায় মা-বাপকে হারিয়েছি, জ্যেঠামশাইয়ের কাছেই মানুষ। যুবকের চোখদুটি ছলছল করে এল। কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

এরা সব?

চাকরবাকর, ঠাকুর, সোফার।

ব্যাপারটা কখন জানতে পারলেন?

আমি জ্যেঠামশাইয়ের পাশের ঘরেই ঘুমোই। জ্যেঠামশাই রাত্রে সাধারণতঃ অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করেন। আজও বোধ হয় তাই করছিলেন। হঠাৎ একটা চিৎকার শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমটা বুঝতে পারিনি।

আবার চিৎকার শোনা গেল। তখন মনে হল যেন পাশের ঘর থেকেই আসছে, ছুটে ঘরের বাইরে চলে আসি। জ্যেঠামশাইয়ের ঘরের দরজা ঠেলতে গিয়ে দেখি দরজা ভিতর থেকে বন্ধ।

অনেক কষ্টে ঠেলাঠেলি করে ও চিৎকার করেও যখন দরজা খুলতে পারছি না, এমন সময় সহসা দরজাটা দড়াম করে খুলে গেল এবং কে যেন অন্ধকারে ঝড়ের মত আমাকে একপ্রকার ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েই ছুটে সিঁড়ির দিকে চলে গেল। ততক্ষণে চাকরবাকরেরাও গোলমাল শুনে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে আসছে। কিন্তু লোকটা সকলকে

যেন ঝড়ের মতই ধাক্কা দিয়ে ঠেলে ফেলে আচমকা অদৃশ্য হয়ে গেল।

দেখেছিলেন লোকটা দেখতে কেমন?

ভাল করে দেখতে পাইনি, তবে মনে হল যেন কালো পোশাক পরা।

কিরীটী একবার চমকে উঠল। তবে কি...

এমন সময় বাইরের রাস্তায় মোটর থামবার শব্দ শোনা গেল।

একটু পরেই সিঁড়িতে কার জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

সুপার সুব্রত রায় আসছেন। কিরীটী বললে।

সুব্রত এসে ঘরে প্রবেশ করল। হ্যালো কিরীটী! ব্যাপার কি?

কিরীটী হাত তুলে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললে, বস সুব্রত।

ইনি শ্রীযুক্ত সুশীল মজুমদার।...কিরীটী একে একে সুব্রতকে সমস্ত ব্যাপার খুলে বললে।

সুব্রত খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থেকে বললে, হুঁ। তারপর সুব্রত পাশের ঘরে গিয়ে মৃতদেহ পরীক্ষা করে দেখল। সমস্ত বাড়িটা ঘুরে ঘুরে দেখল সিন্দুকটা পরীক্ষা করে দেখা গেল, বন্ধই আছে, কিছু চুরি যায়নি।

ততক্ষণে কয়েকজন লালপাগড়ীও এসে গেছে।

বাড়িটা বেশ প্রশস্ত।

উপরে নীচে সর্বসমেত আটখানি ঘর।

দেখা গেল বৈঠকখানায় একটা কাচের জানলা ভাঙা।

জানালার দু'পাশে দুটো বাড়ির মাঝখানে একটা সরু গলিপথ।

আশেপাশের বাড়ির অনেকে তখন ঘুম ভেঙে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে।

বোঝা গেল ওই জানালা-পথেই খুনী বাড়িতে প্রবেশ করেছিল।

বাড়ির ঠাকুর, চাকর, সোফারের জবানবন্দি নিয়ে মৃতদেহ ময়নাঘরে পাঠাবার বন্দোবস্ত করে, দুজন লালপাগড়ী বাড়িতে মোতায়েন রেখে কিরীটী ও সুব্রত যখন ডাঃ মজুমদারের বাড়ি ছেড়ে পথে বের হয়ে এল রাত্রি তখন পৌনে চারটে!

সুব্রত কিরীটীর দিকে তাকিয়ে বললে, চল্ তোকে পৌঁছে দিয়ে যাই।

দুজনে গাড়িতে উঠে বসল। গাড়ি ছুটে চলল।

গাড়িতে আর কোন কথাবার্তা হল না।

গাড়ি এসে টালিগঞ্জে কিরীটীর বাড়ির সামনে দাঁড়াল। বাইরের ঘরে এসে দুজনে বসে জংলীকে দু কাপ চায়ের আদেশ দিল।

বাইরের ঘরে উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোয় কিরীটী পকেট থেকে রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া রুমালটা বের করতেই চমকে উঠল।

সমস্ত রুমালটাই চাপ চাপ রক্তের লাল দাগে ভর্তি।

সুব্রত বিস্মিত ভাবে কিরীটীর হস্তধৃত রুমালটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, কী ওটা?

কিরীটী চিন্তিতভাবে জবাব দিল, একটা রক্তমাখা রুমাল।

হুঁ, তা তো দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু কোথায় পেলি ওটা?

রাস্তায় কুড়িয়ে, একজন তাড়াতাড়িতে রাস্তায় ফেলে গেছে।

মানে?

কিরীটী তখন একে একে সমস্ত কথা খুলে বলল সুব্রতকে।

ধরতে পারলি না লোকটাকে?

না। কিন্তু আমি ভাবছি, এ কি সত্যই সম্ভব? মানুষে মানুষের মাংস খায়? মনে পড়ে দন্ত-চিকিৎসক ডাঃ চৌধুরীর রহস্যময় মৃত্যুর কথা?

কিরীটী বলতে লাগল, দুটো কেসই একেবারে হুবহু মিলে যাচ্ছে না কি?

কি বলতে চাস তুই? সুব্রত অধীরভাবে প্রশ্ন করলে।

ঠিক যা তুই ভাবছিস তাই বলতে চাই, তার চাইতে বেশী কি আর! এই বর্তমান সভ্যতার যুগেও 'ক্যানিবালিজিম' চলে?

অ্যাঁ!

হ্যাঁ, তাছাড়া আর কী? আদিম যুগে মানুষ যখন ছিল বর্বর, তখন নাকি মানুষে মানুষ খেত। কিন্তু গুহা ছেড়ে তো অনেকদিন তারা লোকালয়ে এসে ঘর বেঁধেছে। হয়েছে সভ্য পরিপাটি। তবে এর অর্থ কি? আর তাছাড়া যদি বলি একটা 'হোমিসাইডাল ম্যানিয়াক্', এমনি করে খুনের নেশায় মানুষ খুন করে বেড়াচ্ছে!

তা কি সম্ভব?

অসম্ভব বলে এ দুনিয়াতে কিছুই নেই ভাই। স্পষ্ট আমি দেখেছি লোকটাকে এই রুমালটা দিয়ে মুখ মুছতে।

কিরীটী ভাল করে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে রুমালটা পরীক্ষা করে দেখতে লাগল। সাধারণ ক্যালিকো মিলের একটা রুমাল সাদা রঙের।

রুমালের কোথাও কোন ধোপার বাড়ির চিহ্ন নেই। বোধ হয় একেবারে নতুন। একবারও নিশ্চয়ই ধোপা-বাড়ি দেওয়া হয়নি।

তবে রুমালের এক কোণে লাল সুতোয় ছোট্ট করে ইংরাজী 'K' অক্ষরটি তোলা।

লোকটা দেখতে কেমন কিরীটী? সুব্রত প্রশ্ন করলে।

এমন সময় জংলী দু'হাতে দুটো ধূমায়িত চায়ের কাপ নিয়ে ঘরে এসে প্রবেশ করল।

সামনে একটা টিপয়ের উপরে কাপ দুটো নামিয়ে রেখে জংলী ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

একটা চায়ের কাপ তুলে নিয়ে কিরীটী চুমুক দিয়ে মৃদু একটা শব্দ করলে, আঃ!

কে বলে রে অমৃত সুদূর স্বর্গেতে,
চেয়ে দেখ ভরা এই চায়ের পাত্রেতে!

ভোরের আলো সবে ফুটি-ফুটি করছে। রাতের বিলীয়মান অন্ধকারের অস্বচ্ছ যবনিকাখানি একটু একটু করে নিঃশেষে মিলিয়ে যাচ্ছে।

একটা মৃদু শীতল হাওয়া ভোরের বারতা নিয়ে খোলা জানলা-পথে ঝিরঝির করে এসে প্রবেশ করল।

সুব্রত আবার প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিরীটী বাধা দিয়ে বলে উঠল, লোকটা লম্বায় প্রায় ছ'ফুট মত হবে। বলিষ্ঠ পেশল গঠন। দ্রুত চলন। পরিধানে কালো রঙের গরম সার্জের স্যুট ছিল। মাথায় কালো রঙের ফেল্ট টুপি। মুখে একজোড়া বড় পাকানো গোঁফ। সামনের দাঁত দুটো উঁচু, নীচের ঠোঁটের উপরে চেপে বসেছে।

তীক্ষ্ণ শিকারী বিড়ালের মত খর-অনুসন্ধানী হিংস্র গোল গোল দুটি চোখ।

মৃদু গ্যাসের আলোয় যেন ভয়ঙ্কর এক শয়তানের প্রতিমূর্তির মতো দেখাচ্ছিল। এখনও যেন তার ক্ষুধিত চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি আমার চোখের উপর ভাসছে।

মানুষ—আমাদের মতই মানুষ? তবে?

হ্যাঁ মানুষ, তবে আমাদের মত কিনা জানি না। কিরীটী মৃদুস্বরে জবাব দিল।

*   *   *

বালিগঞ্জ রেল স্টেশনের ধারে কাঁকুলিয়া রোডে প্রকাণ্ড ইমারততুল্য তিনতলা সাদারঙের একখানা বাড়ি।

বাড়ির লৌহ-ফটকের একপাশে কালো পাথরের বুকে সোনালী জলে খোদাই করে লেখা 'মহানির্বাণ', অন্যপাশে নামফলকে লেখা মহীতোষ রায়চৌধুরী।

মাত্র বছর ছয়েক হল মহীতোষবাবু কলকাতার এই অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করেছেন।

মহীতোষবাবুর পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে স্থানীয় অধিবাসীদের কৌতূহলের অন্ত ছিল না। কিন্তু অগাধ ধনশালী, চিরকুমার, উচ্চশিক্ষিত, অত্যন্ত অমায়িক বৃদ্ধ মহীতোষ রায়চৌধুরীকে শ্রদ্ধা করত না শহরে এমন একটি লোক ছিল না।

অনাথ আতুর কাঙালের জন্য তাঁর প্রাসাদোপম অট্টালিকার লৌহদ্বার সর্বদাই খোলা থাকত।

প্রার্থীকে কখনও কেউ কোনদিন মহীতোষের দ্বার হতে রিক্তহস্তে ফিরতে দেখেনি।

স্কুলের চাঁদার খাতায়, স্থানীয় লাইব্রেরী, সর্বজনীন উৎসবাদি নানা প্রতিষ্ঠানে তাঁর চাঁদার অংশটা সকলকে ডিঙিয়ে যেত।

মুক্তহস্ত উদার প্রকৃতির সদাহাস্যময় মহীতোষ সকলের বন্ধু। এই সব নানাবিধ গুণাবলীতেই শহরবাসীরা মুগ্ধ হয়ে তাঁর নামকরণ করেছিল 'রাজা মহীতোষ'।

মহীতোষের আধিপত্যও ছিল যথেষ্ট।

স্থানীয় স্কুল সমিতির প্রেসিডেন্ট, লাইব্রেরীর প্রেসিডেন্ট, সভা-সমিতির প্রেসিডেন্ট।

কোন উৎসবই মহীতোষকে বাদ দিয়ে চলে না।

কর্পোরেশনের একজন প্রতিপত্তিশালী কাউনসিলার মহীতোষ। গুজব সামনের মেয়র নির্বাচনে তিনিও একজন প্রার্থী।

মহীতোষের বয়স যে ঠিক কত সেটা অনুমান করা একটু বেশ কঠিন।

দৈর্ঘ্যে প্রায় ছয় ফুট। পেশল বক্ষ, বলিষ্ঠ গঠন। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। গোলগাল সদাচঞ্চল দুটি চোখ, দৃষ্টিতে বুদ্ধির প্রাখর্য যেন ঠিকরে বের হয়। কপালের দুপাশে একটুখানি টাক দেখা দিয়েছে। ঘন কৃষ্ণকালো চুলের মধ্যে দু-চারটে পাকা চুলও দেখা যায়। দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো।

মুখের গঠন তীক্ষ্ণ।

নীচের ঠোঁটটা একটু বেশী পুরু ও ভারী। মুখে সর্বদাই যেন খুশীর একটুকরো হাসি জেগে আছে।

সংসারে তাঁর আপনার বলতে কেউ নেই। তবে অনাত্মীয় পোষ্যের দল তাঁকে আপনার জনের মত সর্বদাই আঁকড়ে ধরে আছে।

মহীতোষ মিতাহারী, সংযমী ও মিতভাষী।

উপরের তলায় দুখানি ঘর তাঁর নিজস্ব ব্যবহারের জন্য, বাড়ির বাকি ঘরগুলিতে অনাত্মীয়ের দল ভিড় করে আছে।

ঠাকুর ও চাকর অনেকগুলি।

উপরে তাঁর নিজস্ব দখলে যে ঘর দুখানি, তার একখানি তাঁর শয়নঘর, অন্যখানি লাইব্রেরী। শয়নঘরখানি আকারে মাঝারি।

ঘরের এক কোণে একটা স্প্রিংয়ের খাটে নিভাঁজ শয্যা বিছানো। খাটের সামনেই একটি টিপয়ে একটা সুদৃশ্য নামী টাইমপিস ও টেলিফোন।

ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একখানা এনলার্জড ফটো। তাঁর পিতার।

ঘরে আর কোন আসবাবপত্র নেই। মেঝেতে দামী কাশ্মীরী কার্পেট বিছানো।

শয়নঘরের সংলগ্ন ছোট একটি ঘর আছে, তাতে মহীতোষের আবশ্যকীয় জামাকাপড় ও অন্যান্য আবশ্যকীয় জিনিসপত্রে বোঝাই।

ঘরটি সর্বদাই প্রায় তালা-বন্ধ থাকে।

শয়নঘরের সংলগ্ন বাথরুম আছে।

লাইব্রেরী ঘরখানি আকারে প্রশস্ত। মেঝেটায়ও দামী পুরু কার্পেট বিছানো। আধুনিক কেতাদুরস্ত ভাবে সুদৃশ্য সোফায় সজ্জিত। অদৃশ্য বৈদ্যুতিক বাতিদান থেকে ঘরখানি রাত্রে আলোকিত করার ব্যবস্থা। দু-তিনটি সিলিং ফ্যান। ঘরের চারপাশে সুদৃশ্য কাচের আলমারিতে নানা শাস্ত্রের সব বই।

ঘরের একপাশে একখানা সুদৃশ্য সেক্রেটারিয়েট টেবিল। তার উপরে কাগজপত্র, ফাইল প্রভৃতি সাজানো।

সামনে একখানা রিভলভিং গদী-আঁটা চেয়ার।

মহীতোষের বাড়িতে তাঁর দর্শনার্থীর ও দয়াপ্রার্থীর সদাই ভিড়।

কেউ এলে মহীতোষ তার সঙ্গে এই লাইব্রেরী ঘরে বসেই কথাবার্তা বলেন।

অতিথি-অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়নের কোন ত্রুটিই মহীতোষের বাড়িতে হয় না।

সাধারণতঃ সারাদিন ও সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত মহীতোষ সকলের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন।

সাড়ে সাতটার পরে কেউ এলে হাজার প্রয়োজনীয় কাজ হলেও তিনি কারও সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না।

বাড়ির লোকেরা বলে, মহীতোষ নাকি অনেক রাত্রি পর্যন্ত জেগে পড়াশুনা করেন।

মহীতোষের নিজস্ব কাজকর্ম যা কিছু তার প্রিয় পাহাড়িয়া ভৃত্য ঝুমনই করে।

কলকাতার পুলিসের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও মহীতোষের যথেষ্ট হৃদ্যতা দেখা যায়।

বিখ্যাত গোয়েন্দা সুপার সুব্রত রায় মহীতোষের একজন পরম বন্ধু।

প্রায়ই সুব্রত মহীতোষের ওখানে আসে ও নানা গল্পগুজবে সময় কাটায়।

সেদিন সন্ধ্যার দিকে মহীতোষের লাইব্রেরী ঘরে বসে দুজনে—সুব্রত ও মহীতোষ গল্প করছিলেন। মহীতোষ বলছিলেন, মানুষের মন সত্যই বড় বিচিত্র সুব্রতবাবু। মানুষ যে ঠিক কী চায় ও কী চায় না তা হয়ত নিজেই সে অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে না। আসলে মানুষের মনের মধ্যে দুটো সত্তা আছে, তার মধ্যে একটা থাকে জেগে, অন্যটা থাকে ঘুমিয়ে।

অথচ সবচাইতে আশ্চর্য এই যে, ঘুমন্ত সত্তাকে অবহেলা করবার মত তার মনের জাগরিত আর কোন ক্ষমতাই নেই। অলক্ষ্যে সেই ঘুমন্ত সত্তা প্রভাব বিস্তার করে মানুষের মনের উপরে। এই ঘুমন্ত সত্তাকে ভুলে থাকবার কি চেষ্টাই না আমরা করি!

সুব্রত জবাব দিল, অবিশ্যি যা আপনি বলছেন সবই স্বীকার করি কিন্তু তবু মানুষের সংযম শিক্ষা ও জন্মগত সংস্কার চিরদিনই কি সেই ঘুমন্ত সত্তার উপরে প্রভাব বিস্তার করে না মিঃ চৌধুরী?

স্বীকার করি করে, কিন্তু ঐ যে বললেন জন্মগত সংস্কার—ওটাকে আমি তত

importance দিই না। সেটা প্রকৃতি ও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে পারিপার্শ্বিক নিয়ে গড়ে ওঠে।

আসলে 'জন্মগত সংস্কার' ওটা একটা মন ভুলানো কথা। মনের সত্যিকারের জোর থাকলে ওটাকে আমরা অনায়াসেই ইচ্ছামত গড়ে তুলতে পারি। তাছাড়া মানুষের জন্মের জন্য তো মানুষ দায়ী নয় সুব্রতবাবু। স্ট্যালিন মুচির ঘরে জন্মেও স্ট্যালিনই হয়েছে, হিট্‌লার হিট্‌লার হয়েছে, জন্ম তো তাদের চরিত্রকে ধরে রাখতে পারেনি!

সুব্রত হাসতে হাসতে বললে, পারেনি সত্যি বটে, তবু রক্তের ঋণকে কেউ কোনদিন অস্বীকার করতে পারেনি ও পারবে না। যে সংস্কার তার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে তার দেহের প্রতি রক্ত-বিন্দুতে সংক্রামিত হয়েছে তার কাছে ধরা সে দিতে বাধ্য—ইচ্ছায়ই হোক বা অনিচ্ছায়ই হোক।

সুব্রতর কথায় মহীতোষবাবু হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। রক্তের ঋণ! বেশ কথাটা কিন্তু মিঃ রায়। হ্যাঁ ভাল কথা, আপনি একদিন বলেছিলেন আপনার বন্ধু কিরীটী রায়ের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবেন, নিয়ে আসুন না তাঁকে একদিন এখানে। ক্রিমিনোলজি (অপরাধ-তত্ত্ব) সম্পর্কে চিরকালই আমার একটা উৎসাহ ও আগ্রহ আছে। অপরাধ-জগতের বিচিত্র ভাবধারা—তার সঙ্গে পরিচয় হবার মধ্যে বুঝি একটা ভয়ঙ্কর মাদকতা আছে।

* * *

রাত্রি দশটা পাঁচ মিনিটে একটা রাণাঘাট লোকাল ট্রেন আছে। যেসব অফিসফেরত বাবুর দল প্রথম দিককার লোকাল ট্রেনগুলোতে না গিয়ে এই শেষ ট্রেনে বাড়ি ফেরেন, তাঁদের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

প্রত্যহই এই ট্রেনটায় বিশেষ ভিড় হয়। অনেক খুচরো ও পাইকারী ব্যাপারী, যারা কলকাতার হাটে-বাজারে শাকসব্জী, দুধ, ছানা প্রভৃতির বেচা-কেনা করে তাদের সংখ্যাও কম নয়।

একে শীতের ধোঁয়ায় মলিন রাত্রি, তার উপরে সেই সন্ধ্যা থেকে সারাটা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে আছে ও গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে। শিয়ালদহের তিন নম্বর প্ল্যাট্‌ফরমে রাণাঘাট লোকাল দাঁড়িয়ে আছে।

ট্রেন ছাড়তে তখনও প্রায় বিশ মিনিট বাকি।

প্ল্যাট্‌ফরমের স্তিমিত আলোয়, নানাবিধ যাত্রী ও ফেরিওয়ালাদের গুঞ্জনে প্ল্যাটফরমটিতে অদ্ভুত এক অবস্থার সৃষ্টি করেছে।

'চাই পান', 'পান সিগ্রেট', 'গরম চা', 'সল্‌টেড বাদাম'...

ক্লান্ত অফিস-ফেরতা বাবুর দলের শ্লথ গতি, কারও হাতে ঝুলানো একটি ইলিশ মাছ, কারও হাতে আগরপাড়ার ক্যাম্বিসের ব্যাগে শিয়ালদহের বাজার থেকে কেনা তরিতরকারি, কারও বগলে ভাঁজ করা সেদিনকার দৈনিক পত্রিকাখানা, কারও হাতে রুমালে বাঁধা বাড়ির ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু খাবার।

ব্যাপারীদের কাঁধে শূন্য ঝাঁকা ও কলসী, মাতায় মলিন গামছা জড়ানো।

সকলেই ট্রেন ধরবার জন্য ব্যস্ত।

আলোহীন অন্ধকার বগীগুলোর মধ্যে ঠেসাঠেসি করে যাত্রীরা সব বসে, কেউ গল্প করছে, কেউ বিড়ি বা সিগারেট ফুঁকছে। কেউ বা পাশের যাত্রীর সঙ্গে যুদ্ধের খবর আলোচনা করছে।

যুদ্ধ লেগেছে সন্দেহ নেই।

যুদ্ধ! যুদ্ধ! যুদ্ধ!

একটা প্রবল বন্যা যেন ছুটে এসেছে ধনী, নির্ধন, সাধারণ গৃহস্থ প্রত্যেকের জীবনে।

ধ্বংসের আগুন জ্বলছে দিকে দিকে।

প্রত্যেকের ঘর ও বাহির সেই আগুনের শিখায় ঝলসে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

মানুষের নীরব আর্ত চিৎকার জগতের বাতাস ভারী করে তুলেছে।

ঘরে আহার নেই, পরিধানে বসন নেই, পাবলিশার্সদের কাগজ নেই। প্রেসম্যান বই ছাপতে পারে না, দপ্তরী বই বাঁধতে পায় না। যুদ্ধের গোগ্রাসী ক্ষুধার অনলে সব আহুতি দিচ্ছে কিন্তু তবু মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারা চলছে বয়ে। আশা, আকাঙ্ক্ষা, দুঃখ, শোক, হাসি সবই আছে। যুদ্ধ যদি আরও দশ বছর চলে এমনিই সব চলবে।

*   *   *   *

ট্রেন ছাড়বার আর মাত্র মিনিট দশেক বাকি আছে।

একখানি সেকেণ্ড ক্লাস কামরা। সেখানেও ভিড়ের অন্ত নেই।

সমগ্র দেহ কালো একটা ভারী ওভারকোটে ঢাকা, মাথায় কালো ফেল্ট হ্যাট একজন যাত্রী এসে কামরার সামনে দাঁড়াল।

দরজার উপরেই একটি কেতাদুরস্ত যুবক দাঁড়িয়েছিল, তিলমাত্র বসবার স্থান নেই, সাত-আটজন মাঝখানের জায়গাটুকুতে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে।

যুবকটি বললে, এ গাড়িতে জায়গা নেই, স্যার।

আগন্তুক তার বলিষ্ঠ মুষ্টিতে গাড়ির হ্যাণ্ডেলটা চেপে ধরে কর্কশ গলায় বললে, কেন?

যুবক জবাব দিল, কেন আবার কী, দেখছেন না সব ঠেসাঠেসি করে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে, অন্য কামরা দেখুন।

দেখেছি, সব গাড়িই সমান। যেতে হবে আমাকেও। আগন্তুক জবাব দিল।

কামরার ভিতর থেকে কে একজন জবাব দিলেন, যাবেন তো, কিন্তু ঢুকবেন কোথায়? দেখছেন না তিলমাত্র জায়গা নেই?

আগন্তুক বললে, জায়গা করে নিতে হবে।

এবার একজন রুখে এল, আচ্ছা লোক তো মশাই আপনি, বলছি জায়গা নেই তবু ঝগড়া করবেন, দেখুন না অন্য কোন গাড়িতে!

এমন সময় গাড়ির শেষ ঘণ্টা বাজল, গার্ড সবুজ আলো দেখিয়ে হুইসেল বাজাল।

আগন্তুক বলিষ্ঠ হাতে সামনের দণ্ডায়মান ভদ্রলোককে একটু ঠেলে কোনমতে গাড়িতে উঠে দাঁড়াল।

গাড়ি তেমনি চলতে শুরু করেছে।

গাড়ি প্রত্যেক স্টেশনে দাঁড়াবে।

ক্রমে স্টেশনে স্টেশনে যাত্রীরা নেমে যেতে লাগল।

ব্যারাকপুরে এসে গাড়ি খালি হয়ে গেল প্রায়।

গাড়িতে তখন আগন্তুক ও যুবকটি।

অন্ধকার শীতের রাত্রি।

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে।

যুবক আর আগন্তুক গাড়ির দুপাশে দুখানা সিট অধিকার করে বসে।

হঠাৎ একসময় আগন্তুক তার সিট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, মুখে তার জ্বলন্ত সিগারেট।

যুবক আনমনে খোলা জানলা-পথে অন্ধকার প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে নীরবে বসে।

আগন্তুক নিঃশব্দে এসে যুবকের সামনে দাঁড়াল ও ডান হাতখানি যুবকের কাঁধের উপরে রাখল।

কে? চমকে যুবক মুখ ফেরাল।

চাপা গম্ভীর গলায় আগন্তুক বললে, চুপ! আস্তে—কী নাম তোমার?

আগন্তুকের মুখে জ্বলন্ত সিগারেটের স্তিমিত আলোয় তার উদ্ভাসিত মুখের দিকে সভয়ে তাকালো যুবক।

লোহার মত শক্ত একখানা মুষ্টি যেন যুবকের কাঁধের মাংসপেশীকে সাঁড়াশীর মত আঁকড়ে ধরেছে।

উঃ, কী ভয়াবহ আগন্তুকের মুখখানা!

গোল-গোল দুটি চোখের দৃষ্টি সিগারেটের আগুনের আলোয় যেন কী এক অস্বাভাবিক মৃত্যুক্ষুধায় লকলক করছে। সামনের দিকে উপরের পাটির বড় বড় দুটো দাঁত নীচের পুরু ঠোঁটটার উপরে যেন চেপে বসেছে।

একজোড়া পাকানো গোঁফ।

মাথার টুপিটা একদিকে হেলানো।

মুখের খানিকটা অন্ধকারে অস্পষ্ট, খানিকটা স্তিমিত আলোয় ভয়ঙ্কর একটা নিষ্ঠুরতায় শক্ত কঠিন হয়ে উঠেছে।

যুবকের শরীরে স্নায়ু বেয়ে যেন তীব্র ভয়ের স্রোত সিরসির করে বয়ে গেল ; সহসা সে একটা দীর্ণ ভয়ার্ত চিৎকার করে উঠল।

আগন্তুক হাঃ হাঃ হাঃ করে তীব্র বাজের মত হেসে উঠল। সেই ভয়ঙ্কর হাসির শব্দ যেন অদ্ভুত একটা বিভীষিকায় চলন্ত গাড়ির শব্দকে ছাপিয়ে অন্ধকার কামরার মধ্যে প্রেতায়িত হয়ে উঠল।

আগন্তুক তখন দু'হাত দিয়ে যুবকের কণ্ঠনালী চেপে ধরেছে। একটা গোঁ গোঁ শব্দ।....

যুবকের সমস্ত মুখখানা নীল হয়ে উঠেছে। চোখ দুটো যেন ঠিকরে আঁখিকোটর থেকে বের হয়ে আসতে চায়।

আগন্তুকের সমস্ত মুখাবয়বের উপরে একটা পাশবিক নিষ্ঠুরতার পৈশাচিক আনন্দের ছায়া ঘনিয়ে উঠেছে।

দেখতে দেখতে আগন্তুকের বলিষ্ঠ মুষ্টির নিষ্ঠুর লৌহপেষণে হতভাগ্য যুবক গাড়ির গদিতে এলিয়ে পড়ল।

আগন্তুক আবার খলখল করে পৈশাচিক হাসি হেসে উঠল, হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

মরেছে। নিঃশেষে মরেছে!

সহসা হঠাৎ পাগলের মত যুবকের বুকের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ নখরাঘাতে যুবকের বুকের জামা ছিঁড়তে লাগল। গাড়ির গতি মন্থর হয়ে আসছে না!

পাগলের মতই আগন্তুক যুবকের পেশল উন্মুক্ত বক্ষের দিকে তাকাল।

চোখের দৃষ্টিতে একটা দানবীয় লালসা যেন হিলহিল করে উঠল।

যেমন সে নীচু হয়ে যুবকের বুকের মাংসে তার ধারাল দাঁত বসিয়েছে, খানিকটা তাজা রক্ত তার জিহ্বায় এসে লাগল।

যেন একটা ক্ষুধার্ত নেকড়ে শিকারের বুকে চেপে বসেছে! সহসা এমন সময় গাড়িটা থেমে গেল।

কিন্তু দানবের সেদিকে লক্ষ্য নেই।

আচমকা একটা টর্চের আলোর রক্তিম আভা দানবটার উপরে এসে পড়ল—সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার—ভূত ! ভূত!

চকিতে দানবটা পাশের দরজা খুলে অন্ধকারে লাফিয়ে পড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে সেই চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে আশেপাশের কামরা থেকে লোক এসে জড়ো হয়েছে। ব্যাপার কী! ব্যাপার কী মশাই!

ঐ কামরার মধ্যে ভূতে মানুষ খাচ্ছে! কে একজন ভিড়ের মধ্যে থেকে বললে।

আর একজন বললে, স্বপ্ন দেখচেন না তো মশাই!

একজন মন্তব্য করলে, গাঁজায় দম চড়িয়েছেন নাকি? কিন্তু সত্যি সত্যি যখন সকলে বাক-বিতণ্ডার পর গার্ডের সঙ্গে আলো নিয়ে কামরাটার মধ্যে এসে প্রবেশ করল তখন সেখানকার সেই ভৌতিক দানবীয় দৃশ্য দেখে সকলেই চমকে উঠল।

হতভাগ্য যুবকের মৃতদেহ তখনো কামরার গদীর উপরে লুটিয়ে পড়ে আছে। বুকের জামা ছিন্নভিন্ন, রক্তাক্ত। ডান দিককার বুকের মাংস কে যেন নিষ্ঠুরভাবে দাঁত দিয়ে খাবলে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।

G.I.P.-র পুলিস এল, স্টেশন-মাস্টার এলেন, লাশ স্টেশনে নামানো হল, গাড়ি আবার চলল।

পরের দিন সমস্ত দৈনিকে বড় বড় হরফে প্রকাশিত হয়েছে দেখা গেল—

ভয়ঙ্কর নরখাদক দানবের আবির্ভাব! এই শহরের বুকে এই সভ্য যুগে। হতভাগ্য যুবকের পৈশাচিক মৃত্যু। সেই অদৃশ্য ভয়ঙ্কর নরখাদকের হাতে এই তৃতীয় ব্যক্তির শোচনীয় মৃত্যু!

শহরবাসী অবগত আছেন কয়েক মাসের মধ্যে আলিপুরের অবসরপ্রাপ্ত সুপার ও ডাঃ এন. এন. চৌধুরীর এইভাবে মৃত্যু হয়। তারপর আর একজন বিখ্যাত ডাক্তার অমিয় মজুমদারের মৃত্যু হয়। এই যে শহরের বুকে অবাধে নরহত্যালীলা চলেছে এর শেষ কোথায়? ঘটনাগুলি হতে স্পষ্টই মনে হয়, বুঝিবা কোন নরখাদক এই শহরের বুকে হত্যালীলা করে বেড়াচ্ছে। আবার কি সেই বন্য বর্বর যুগ ফিরে এল? পুলিসের কর্তৃপক্ষ কি নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছেন? সমগ্র শহরবাসী আতঙ্কিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে যদি নরখাদক আরও কিছুদিন এই শহরের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়, তবে যে শহরবাসীর মধ্যে কী ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তা কি পুলিসের কর্তৃপক্ষ বুঝতে পারছেন না? ইত্যাদি ইত্যাদি।

* * *

কিরীটী, সুব্রত, মহীতোষবাবু ও তাঁর এক বিশিষ্ট বন্ধু সমর বসু সকলে বিকেলের দিকে মহীতোষের লাইব্রেরী ঘরে বসে চা পান করতে করতে আলাপ-আলোচনা করছিল।

সমরবাবু বলছিলেন, উঃ, এ কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার শহরের বুকে চলেছে বলুন তো সুব্রতবাবু? প্রত্যেক শহরবাসীর মনে যে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক উপস্থিত হয়েছে তা কি বুঝতে পারছেন না?

বুঝেই বা কি করছি বলুন, মিঃ বসু! চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না।

কিন্তু এও কি সম্ভব? মহীতোষ বলতে লাগলেন, মানুষ তো মানুষের মাংস খেতে পারে না! তবে কি সেই জনকথার কোন রাক্ষসেরই আবির্ভাব হল এই শহরে? ভয়ে রাত্রিতে আমার ভাল করে ঘুমই হয় না আজ দুদিন থেকে।

কিরীটী হাসতে হাসতে বললে, দরজায় খিল দিয়ে শোন তো?

মহীতোষ বললেন, তা আবার বলতে! কথায় বলে সাবধানের মার নেই!

কিন্তু সত্যি আপনার কী মত বলুন তো কিরীটীবাবু? সমরবাবু প্রশ্ন করলেন।

সেও একটা মানুষ, তবে abnormal বলতে পারেন। আমি স্বচক্ষে তাকে দেখেছি। কিরীটী বললে।

সকলে একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলেন, সে কি!

হ্যাঁ! কিন্তু আজকের মত এসব আলোচনা থাক। চল সুব্রত। উঠলাম মিঃ চৌধুরী। নমস্কার।

কিরীটী সুব্রতকে নিয়ে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। ঘরের মধ্যে মহীতোষ ও সমরবাবু বসে।

হঠাৎ মহীতোষবাবু বললেন, এই কিরীটী রায় লোকটা অসাধারণ বুদ্ধিমান বলে শুনেছি, তবে অহমিকা বড় বেশী।

সমরবাবু কোন জবাব দিলেন না, চুপ করে বসে রইলেন।

* * *

সেই রাত্রে।

কৃষ্ণা সুব্রতদের ওখানে নিমন্ত্রণ খেতে গেছে। আজ আর ফিরবে না রাত্রে।

কিরীটী একাকী নিজের শয়নঘরে একটা সোফায় হেলান দিয়ে টেবিল-ল্যাম্পের আলোয় গভীর মনোযোগের সঙ্গে ক্রিমিনোলজির একখানি বই পড়ছে। ঘরের দেওয়ালে টাঙানো বড় ঘড়িতে ঢং করে রাত্রি একটা ঘোষণা করলে।

কিরীটী সোফা হতে উঠে পাশের টেবিলে বইটা রেখে আড়মোড়া ভাঙল। উঃ, অনেক রাত্রি হয়ে গেছে! আলোটা নিভিয়ে দিয়ে খোলা জানলার সামনে এসে দাঁড়াল।

বাইরে চন্দ্রালোকিত নিঃশব্দ রজনী যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। রাস্তার মোড়ে কৃষ্ণচূড়ার গাছের পাতায় পাতায় আলোছায়ার লুকোচুরি।

রাত্রির নিঃশব্দ হাওয়া ঝিরঝির করে বইছে।

সহসা পশ্চাতে কার ভারী গলার স্বরে কিরীটী বিদ্যুতের মত চমকে ফিরে দাঁড়াল।

কিরীটী রায়!

কে?

চাঁদের আলোর খানিকটা ঘরের মধ্যে এসে ঈষৎ আলোকিত করে তুলেছে।

অস্পষ্ট আলোছায়ায় ঘরের ওপাশের দেওয়াল ঘেঁষে কালো ওভারকোট গায়ে মাথার একপাশে হেলানো কালো ফেল্টের টুপি।

কে? কে ও দাঁড়িয়ে? কিরীটী রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সামনের দিকে চেয়ে রইল।

চকিতে মনের কোণে ভেসে ওঠে রসা রোডের কিছুদিন আগেকার একটা মধ্যরাত্রির কথা।

বসতে পারি কিরীটীবাবু? আগন্তুক প্রশ্ন করল।

কিরীটী নির্বাক।

কথা বলবার সমগ্র শক্তিই যেন তার কণ্ঠ হতে লুপ্ত হয়েছে। আগন্তুক একটা সোফা টেনে নিয়ে বসল।—সত্যি মিঃ রায়, এই নিশুতি রাত ও বাইরের ঐ চাঁদের আলো—এর মধ্যে যেন একটা রহস্য লুকিয়ে আছে। বসুন, আপনি যে দাঁড়িয়েই রইলেন! কতদূর থেকে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম!

আমার বাড়িতে আপনি ঢুকলেন কি করে? কিরীটী রুদ্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করল।

আগন্তুক এবারে হাঃ হাঃ করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠল, কিরীটীবাবু, আপনি অপরাধ-তত্ত্বের একজন মস্তবড় পণ্ডিত শুনেছি। এককালে আপনার নেশা ছিল অপরাধীদের অপরাধ-তত্ত্ব বিশ্লেষণ করা। ঘরের দরজাটা একটা লোহার তালা এঁটে বন্ধ করলেই কি গৃহপ্রবেশ অসম্ভব হয়ে গেল? একটা তুচ্ছ লোহার তালাই হল বড় আর মানুষের বুদ্ধিটা একেবার মিথ্যা হয়ে যাবে! যাকগে সেকথা। তালা আঁটা থাকলেও দরজায় গৃহপ্রবেশের উপায় আমার জানা আছে।

কিরীটী নিঃশব্দে একখানি চেয়ারের উপরের উপবেশন করে গা এলিয়ে দিল।

হ্যাঁ, নিজেকে এমনি করে শিথিল না করতে পারলে কি গল্প জমে কখনও,—বিশেষ এমনি নিশুতি রাতে!...নিশুতি রাত। শুধু আবছা রহস্যময় চাঁদের আলো! কেউ কোথাও জেগে নেই, সবাই ঘুমিয়ে, কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই কেন? কেন—কেন আমি ঘুমোতে পারি না? চোখ বুজলেই একটা ভয়ঙ্কর বিভীষিকা যেন আমায় অষ্টবাহু মেলে অক্টোপাশের মত আঁকড়ে ধরে! শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। আমি উঠে বসি শয্যার উপরে। শুধু রক্ত—তাজা লাল টকটকে রক্ত যেন অজস্র ঝরনার মত আমার সর্বাঙ্গে আগুন ছড়াতে থাকে। বুকের মধ্যে একটা শয়তান মোচড় দিয়ে ওঠে। একটা লালসা, একটা বন্য বর্বর ক্ষুধা দেহের রক্তবিন্দুতে যেন দানবীয় উল্লাসে নাচতে থাকে। আমি এই হাত দিয়ে গলা টিপে মানুষ খুন করি। এই যে দেখছেন তীক্ষ্ণ ধারালো উপরের দুটো দাঁত, এর সাহায্যে তাজা মানুষের মাংস আমি ছিঁড়ে খাই। আপনাদের বর্তমান রহস্যের মেঘনাদ, নরখাদক রাক্ষস আমিই। আমাকে ধরুন, আমায় খুন করুন!...আগন্তুক গভীর উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল।

কিরীটী নির্বাক হয়ে শুধু বসে রইল।

হঠাৎ আগন্তুক সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল, পারলেন না, হেরে গেলেন। জানি কেউ আমায় ধরতে পারবে না। আমার এই রাক্ষসের মুখোশটা টেনে খুলে কেউ আমায় চিনতে পারবে না। কিন্তু আমি অপেক্ষা করব ; তোমার জন্যই আমি অপেক্ষা করব কিরীটী! খুলে রাখব আমার ঘরের দুয়ার বন্ধু। তুমি এসে প্রবেশ করবে বলে। তারপর দুটি হাত তোমার সামনে প্রসারিত করে দিয়ে বলব, বন্ধু! এই আমাকে ধর! হার মেনেছি!

ঝড়ের মতই আগন্তুক দরজা ঠেলে ঘরের বাইরে চলে গেল।

অন্ধকার ঘরের মধ্যে একা শুধু বসে রইল তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী কিরীটী রায়।

ঘরের দেওয়াল-ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি দুটো ঘোষণা করল।

কিরীটী চোখ দুটো একবার রগড়ে নিল। এতক্ষণ একটা স্বপ্ন দেখছিল না তো!

*   *   *

হঠাৎ সেদিন বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীটে এক বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতার দোকানে প্রায় দীর্ঘ নয় বৎসর বাদে সহপাঠী ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে কিরীটীর দেখা হয়ে গেল।

ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী কলিকাতা ইউনিভারসিটির একজন নামকরা ছাত্র। বি. এস্-সি পাস করে সে কারমাইকেল মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. পাস করে। পরে মনোবিজ্ঞানে এম. এ. পাস করে। বিলাতে তিন বৎসরকাল অধ্যয়ন করে 'সাইকাড্রিকস্ট্' হয়ে আসে। যুদ্ধ বাধবার মাত্র মাস ছয়েক আগে সে ফিরে আসে।

অত্যন্ত খেয়ালী প্রকৃতির। এতদিন বসেই ছিল, হঠাৎ আবার কী খেয়াল হওয়ায় কলকাতায় মাস দুই হল এসে একটা ক্লিনিকস্ খুলে প্র্যাকটিস শুরু করেছে। দু'মাসেই বেশ নাম হয়েছে তার শহরে।

বহুকাল বাদে দুই বন্ধুর দেখা। দুজনে গিয়ে এক রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করল, চা খেতে খেতে নানা সুখ-দুঃখের গল্প চলতে লাগল।

কলেজ-লাইফে কিরীটী ছিল অত্যন্ত দুর্ধর্ষ। আর অমিয় ছিল শান্তশিষ্ট ভাবুক প্রকৃতির।

কিরীটীকে অমিয় 'কিরাত' বলে ডাকত, আর কিরীটী অমিয়কে 'কূনো' বলে সম্বোধন করত।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে অমিয় বললে, তুই তো আজকাল মস্ত বড় একজন গোয়েন্দা হয়ে উঠেছিস কিরাত। কাগজে কাগজে তোর নাম।

কিরীটী জ্বলন্ত সিগারেটে একটা মৃদু টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে গম্ভীর স্বরে বললে, হ্যাঁ, গোয়েন্দা নয়, রহস্যভেদী। কিন্তু তোর খবর কি বল্ তো? সত্যিই ডাক্তারী করবি নাকি? চিরদিন তো রবি ঠাকুরের কবিতা আর যত রাজ্যের মনোবিজ্ঞানের বই পড়ে কাটালি!

ডাক্তারী করব মানে? রীতিমত শুরু করেছি। বিনি ফিসে একটা মাথা খারাপের গোষ্ঠী পাওয়া গেছে!

মানে?

মানে আর কি! বালিগঞ্জে আমাদের পাশের বাড়িতে তারা থাকে। সমস্ত ফ্যামিলিটাই পাগল, কর্তা থেকে শুরু করে ছেলেগুলো পর্যন্ত।

বলিস কী? কর্তা ক্ষ্যাপা, গিন্নী ক্ষ্যাপা, পাগল দুটো চেলা, সেথা সাত পাগলের মেলা!

আর বলছি কী! সামনের রবিবারে আয় না, আলাপ করিয়ে দেব ভদ্রলোক আবার শীঘ্রই পুরীতে হাওয়া বদলাতে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকের নাম রায়বাহাদুর গগনেন্দ্রনাথ মল্লিক। জেল ডিপার্টমেন্টে মোটা মাহিনায় চাকরি করতেন। কিছুকাল আলিপুর জেলের ও পোর্টব্লেয়ারে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ছিলেন। গত মহাযুদ্ধে লোহালক্কড়ের ব্যবসা করে প্রচুর অর্থও জমিয়েছিলেন। অবিবাহিত। বয়স এখন বোধ করি ষাটের কাছাকাছি হবে। সংসারে পোষ্যের মধ্যে চারটে ভাইপো। এই ভাইপোদের শিশুবয়সে মা-বাপ মারা যায় এবং এরা এদের এই বুড়ো কাকার কাছেই মানুষ।

বড় রণধীর বি. এস-সি পাস করে বাড়িতেই বসে আছে। বছর দুই হল বিবাহও করেছে, ছেলেমেয়ে নেই। বয়স প্রায় ত্রিশের মত। মেজ সমীর আই. এ. পর্যন্ত পড়ে আর লেখাপড়া করেনি। বাড়িতে বসে আছে। বয়স প্রায় সাতাশ। সেজ অধীর, বয়স চব্বিশ-পঁচিশ হবে, বি. এ. পাস করে বসে আছে। সবার ছোট কিশোর, বছর চৌদ্দ বয়স, বাড়িতেই পড়াশুনা করে।

বুড়ো গগনেন্দ্রনাথ অসুস্থ, হার্টের ব্যারামে ভুগছেন। সর্বদাই বাড়িতে বসে থাকেন। অত্যন্ত খিটখিটে বদমেজাজী, অসাধারণ প্রতিপত্তি এই বুড়োর ভাইপোদের উপর।

ভাইপোরা বাড়ি থেকে এখনও এক পাও কোথাও বের হয় না। সর্বদাই বাড়ির মধ্যে বুড়োর দৃষ্টির ভিতরে আছে।

কারও বাড়িতে জোরে কথা বলবার উপায় নেই, হাসবার উপায় নেই। সবাই গম্ভীর চিন্তাযুক্ত। একটা কঠিন শাসন-শৃঙ্খলা যেন বাড়ির সব কটি প্রাণীকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধন দিয়ে পঙ্গু নিশ্চল করে রেখেছে।

ভাইপোরা খাবেদাবে, ঘুরবে, বেড়াবে, দাঁড়াবে, চলবে, ঘুমুবে সব বুড়োর সৃষ্টিছাড়া বাঁধাধরা আইনে। এতটুকু কোন ব্যতিক্রম হবে না এমনি কঠোর শাসন বুড়োর।

সবার ছোটটাই রীতিমত hallucination-এ ভুগছে।

বাড়ির মধ্যে কেবল একমাত্র বড় ছেলের বৌ নমিতা দেবী যেন ওদের গণ্ডির বাইরে।

এক বিচিত্র আবহাওয়া! বিচিত্র পরিস্থিতি!

বুড়ো হঠাৎ একদিন রাত্রে অসুস্থ হয়ে পড়ায় পাশেই থাকি বলে বাড়িতে আমার ডাক পড়েছিল। কী জানি কেন বুড়ো আমাকে যেন একটু স্নেহের চোখেই দেখে।

একমাত্র আমাকেই সকলের সঙ্গে মিশতে দেয়।

কিন্তু ছেলেগুলো দীর্ঘকাল ধরে ঐ অদ্ভুত শাসনগণ্ডির মধ্যে থেকে থেকে মানসিক এমন একটা সদা-সশঙ্কিত ভাব হয়েছে যে, কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে বা দু'দণ্ড আলাপ করতে পর্যন্ত ভয়ে শিউরে ওঠে।

কী করে যে অতগুলো প্রাণী একটা কুৎসিত গণ্ডির মধ্যে অমন ভাবে দিনের পর দিন আটকে রয়েছে ভাবলেও আশ্চর্য হয়ে যাই।

আশ্চর্য তো! কিরীটী বললে, এ যুগে এও সম্ভব?

Mentally সবক'টা লোকই ও-বাড়ির unbalanced, সকলেই একটা মানসিক উত্তেজনার মধ্যে আছে অথচ বিদ্রোহ করবার মত কারও সাহস নেই।

কিরীটী বললে, আমিও বর্তমানে একটা হোমিসাইডাল ম্যানিয়াকের পিছনে ঘুরছি ভাই। দেখি আসছে রবিবার চেষ্টা করব যেতে।

* * *

কিন্তু কিরীটীর আর রবিবার যেতে হল না।

সহসা শনিবার সকালে বন্ধুর এক চিঠি পেল।

পুরী—স্বর্গধাম

প্রিয় কিরাত, ১৩ ডিঃ, ৪৩

হঠাৎ গগনবাবুর অনুরোধে পুরী চলে এলাম। সকলে স্বর্গধাম হোটেলে এসে উঠেছি। বেশ লাগছে। কলকাতার ধুলো বালি রোগের বাইরে প্রকৃতির এই গম্ভীর পরিস্থিতিতে মনের সব কটি দুয়ারই যেন খুলে গেছে। সকালে বিকালে শুধু সমুদ্রে বিরাট রূপ নয়নভরে দেখি। কখনও ভয়ঙ্কর, কখনও স্নিগ্ধ, কখনও শান্ত....সে এক অপূর্ব। আয় কটা দিন থেকে যাবি, আমি একটা আলাদা ঘর নিয়েছি, সেখানেই থাকতে পারবি। আসবি তো রে! ভালবাসা রইল।

তোর কুনো

।। দুই।।

ঘনীভূত

নীল! নীল! নীল!

পুরীর সাগর।

কী একটা বিরাট অপূর্ব সীমাহীন অনন্ত বিস্ময়।

বিশ্বপ্রকৃতি যেন বিরাট এক নীলাম্বরী গায়ে জড়িয়ে অসীমের মাঝে ডুব দিয়েছে।

অকূল পারাপারহীন নীলাঞ্জনে দৃষ্টি স্নিগ্ধ হয়ে আসে।

অসীম নীলাকাশ যেন স্নেহে আকুল অসীম বারিধির শান্ত শীতল বক্ষে নিঃস্ব করে

আপনাকে আপনি উজাড় করে ফেলে দিয়েছেন। শুধু হেরি এক বিপুল মহান নীলিমা। যেদিকে চক্ষু ফিরাই! এ কি অপূর্ব! মহাবিস্ময়ে সমগ্র ইন্দ্রিয়কে মুগ্ধ করেছে!

কিরীটী মুগ্ধ হয়ে গেল।

একদিন মাত্র এখানে এসেছে সে, কিন্তু একটি দিনেই যেন তার সমগ্র মনখানি মুক্ত অবাধ প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গেছে। কাজকর্ম চিন্তা সব কোথায় চলে গেছে।

গতকাল রাত্রি প্রায় বারোটা পর্যন্ত এই সমুদ্রের ধারে বালুবেলার উপরে সে বসে বসে কাটিয়েছে।

অনেক রাত্রে যখন শুতে যায়, দু-চোখের নিদ্রালু ভারী পাতার সঙ্গে যেন অদ্ভুত এক স্বপ্ন জড়িয়ে থাকে।

স্বর্গদ্বার হোটেল থেকে সাগরের বেলাভূমি মাত্র একরশি পথ দূরে। একতলার খোলা বারান্দায় দাঁড়ালে সাগরের বিপুল রূপ দু-চোখের দৃষ্টি জুড়ে ভাসতে থাকে।

সারাটা রাত এক অদ্ভুত চাপা গুম্ গুম্ গর্জন। যেন সাত-সাগরের অতলতলে কোন এক লৌহকারার অন্তরালে অনাদিকালের বন্দী দৈত্য মুক্তির লাগি লৌহকপাটের গায়ে মাতা খুঁড়ে খুঁড়ে গর্জন করছে।

বিরামহীন ছেদহীন সে গর্জনধ্বনি।

বিশেষ করে রাত্রির অন্ধকারে বিশ্বচরাচর যখন স্তব্ধ হয়ে যায়, সমুদ্রের কান্না যেন কী এক করুণ বেদনায় সাগরবেলায় কেঁদে কেঁদে ফেরে।

ছোট মাঝারি বড় কালো কালো ঢেউগুলো শুভ্র ফেনার মুকুতা-কিরীট মাথায় পরে সাগরবেলার করুণ বেদনায় কেবলই আছড়ে আছড়ে পড়ে।

মাটির কাছে বারিধির সেই চিরন্তন মিনতি, ওগো বন্ধু, ওগো আমার শান্ত মাটি, আমায় গ্রহণ কর! আমায় ধন্য কর! আমায় পূর্ণ কর!

একজন পাগল সদাচঞ্চল খেয়াল খুশিতে উদ্দাম বাঁধনহারা, অন্যজন শান্ত-ধীর।

* * *

স্বর্গদ্বার হোটেল।

হোটেলটি একজন উড়িষ্যাবাসী বাঙালী ভদ্রলোকের।

সাগরের প্রায় কোল থেকেই উঠেছে স্বর্গদ্বার হোটেলটি।

আরাম ও পরিচ্ছন্নতার দিক দিয়ে সত্যই প্রশংসনীয়। ঘরগুলি খোলামেলা, পরিপাটী সাজানো-গোছানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সুপ্রশস্ত।

হোটেলটি সর্বসমেত দোতলা।

উপরে ও নীচে অনেকগুলি ঘর।

সর্বদাই হোটেলটি নানাজাতীয় লোকের ভিড়ে ভর্তি থাকে। একতলা ও দোতলায় খোলা বারান্দা। সেখানে সোফা, আরাম-কেদারা প্রভৃতিতে বসবার বন্দোবস্ত আছে।

উপরে ও নীচে দুটি খাবার ঘর।

গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ভাইপোদের নিয়ে নীচেরই কয়েকখানি ঘরে বসবাস করছেন।

কিরীটী ডাঃ অমিয়র সঙ্গে একই ঘরে থাকবার বন্দোবস্ত করে নিয়েছে।

গগনেন্দ্রনাথ সর্বসমেত পাঁচখানি ঘর নীচের তলায় ভাড়া নিয়েছিলেন। একখানিতে তিনি থাকেন। তাঁর ডান দিককার ঘরে রণধীর সস্ত্রীক, বাঁয়ের ঘরে কিশোর, তার পাশের ঘরে সমীর এবং তার পাশের ঘরে অধীর।

কোন ঘরের সঙ্গে কোন ঘরের যোগাযোগ নেই, প্রত্যেক ঘরের সঙ্গে আলাদা আলাদা সংলগ্ন ছোট্ট একটি বাথরুম আছে। তাছাড়াও একটি সকলের ব্যবহারের জন্য বড় স্নানঘর আছে। এক ঘর থেকে অন্য ঘরে যাতায়াত করতে হলে বারান্দা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়।

রেলিং দেওয়া প্রশস্ত বারান্দার সামনেই প্রশস্ত একটি বাঁধানো চত্বর, চত্বরের সীমানায় লোহার রেলিং, তারপরেই সদর রাস্তা, রাস্তার নীচে সাগরের বেলাভূমি।

গগনেন্দ্রনাথের ফ্যামিলি ছাড়াও নীচের তলায় আরো তিনজন বাস করেন।

কিরীটীদের পাশের ঘরেই থাকেন বারীন রায় নামে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি হবে বলেই মনে হয়। দীর্ঘ ছয় ফুট, বলিষ্ঠ গঠন। এত বয়স হয়েছে তবু শরীরের গাঁথুনি দেখলে বিস্মিত হতে হয়। মাথায় সাদা চুল ব্যাক্-ব্রাশ করা। দীর্ঘলম্বিত ধবধবে সাদা দাড়ি।

চোখে সোনার ফ্রেমে কালো কাচের চশমা। চোখের গোলমাল আছে বলে তিনি রঙীন কাচের চশমা ব্যবহার করেন। অতি সৌম্য প্রশান্ত চেহারা, হাসিখুসী আমুদে লোক। অত্যন্ত রসিক।

ভদ্রলোক অবিবাহিত, বাংলার বাইরে পাণ্ডববর্জিত মুল্লুকে কোথায় কোন্ বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনা করে এতকাল কাটিয়েছেন। কার্য থেকে বিশ্রাম নিয়ে এখন দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

বেশ সচ্ছল অবস্থা।

তাছাড়া বারীনবাবুর পাশের ঘরে যতীন ঘোষ বলে এক ভদ্রলোক থাকেন।

ভদ্রলোক চিররুগ্ন। অবস্থাপন্ন বাড়ির ছেলে, স্বাস্থ্যকর জায়গায় কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়ান।

তাঁর পাশের ঘরে থাকেন তরুণী কুমারী ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী।

মেডিকেল কলেজ থেকে এম. বি. পাস করে বিলেত থেকেও ধাত্রীবিদ্যার ডিগ্রী নিয়ে এসেছেন।

লাহোর মেডিকেল কলেজে ধাত্রীবিদ্যার অধ্যাপনা করেন।

বড়দিনের ছুটিতে পুরীতে বেড়াতে এসেছেন।

বয়স প্রায় সাতাশ-আটাশ বৎসর হবে। রোগা ছিপছিপে গড়ন। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল পরিষ্কার।

টানা টানা দুটি স্বপ্নময় চোখ।

সুশ্রী মুখখানি জুড়ে একটা কমনীয়তা যেন ঢল ঢল করে।

ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে যথেষ্ট আলাপ।

আমাদের নীচের তলার বাসিন্দাদের নিয়েই ঘটনা, তাই উপরের বাসিন্দাদের এখানে বৃথা বর্ণনা করে কারো বিরক্তিভাজন হতে চাই না। গগনেন্দ্রনাথের ভাইপোদেরও এখানে একটু বর্ণনা দেওয়া দরকার।

রণধীর মল্লিকের বয়স ত্রিশের মধ্যে আগেই বলেছি। বেশ মোটাসোটা নাদুসনুদুস চেহারা। গায়ের বর্ণ গৌর, নাক চোখ মুখে কোন বুদ্ধির প্রাখর্য নেই বটে, তবে শিশুর মত একটা সহজ সরলতা বিরাজ করে।

অত্যন্ত শান্ত, গোবেচারী নিরীহ, আরামপ্রিয়। মিতভাষী চোখের দৃষ্টিতে একটা সদা-সশঙ্কিত ভাব। একান্ত নির্জনতাপ্রিয়। বেশীর ভাগ সময়ই বই পড়ে কাটায়।

মেজো সমীরের বয়স প্রায় সাতাশের কাছাকাছি হবে।

ভাইদের মধ্যে সমীরেরই গাত্রবর্ণ সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ভাইদের মধ্যে সব চাইতে বেশী লম্বা, রোগাটে গড়ন, ধীর শান্ত নমনীয়।

চোখ দুটি টানা-টানা, গভীর আঁখিপল্লবের নীচে সমুদ্রে নীল জলের মত গভীর নীলাভ শান্ত উদাস দৃষ্টি। চোখের কোল দুটি সর্বদাই ছলছল করে। মাথার কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। বিস্রস্ত, এলোমেলো। উন্নত খড়্গের মত বাঁকা নাসিকা যেন উদ্ধত বিস্ময়ে মুখের উপরে ভেসে আছে।

পাতলা লাল দুটি ঠোঁট, মুক্তা-পংক্তির মত শুভ্র একসারি দাঁত।

মুখখানি সদাই বিষণ্ন, চিন্তাযুক্ত। যেন একখানি জলভরা মেঘ। বেশীর ভাগ সময়ই চুপচাপ একা একা বসে কী যেন ভাবে।

সেজো বা তৃতীয় অধীর বেশ বলিষ্ঠ গঠন। গায়ের বর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম। চোখমুখে একটা উদ্ধত দৃষ্টি। কথা একটু যেন বেশীই বলে, কিন্তু ব্যবহারে একটা যুদ্ধ-ক্লান্ত সশঙ্কিত ভাব। বয়স চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যে।

সর্বকনিষ্ঠ কিশোর। রুগ্ন পাংশু চেহারা।

মনে হয় চিরদিন শুধু রোগেই কেবল ভুগছে।

চোখেমুখে একটা ভীত সশঙ্কিত ভাব। দেখলে করুণা হয়।

এ বাড়ির বৌ বিনতা।

এক কথায় যেন একখানি লক্ষ্মীর সচল প্রতিমা।

চোখেমুখে একটা উদ্ধত বুদ্ধির প্রাখর্য।

বুড়ো গগনেন্দ্রনাথের সর্ববিধ সেবার কাজ হাসিমুখে সে-ই করে। দিবারাত্র ছায়ার মতই বুড়োর আশেপাশে ঘোরে।

সমীর সব সময়ই বৌদিকে সাহায্য করে।

প্রকাণ্ড এক বৃদ্ধকারার মধ্যে বিনতা যেন আলোর একটুখানি আভাস। গভীর বেদনার মাঝে একফোঁটা আঁখিজল।

এ বাড়ির সকলের মধ্যে যে শঙ্কার একটা কালো ভয়াবহ ছায়া থমথম করছে তার মাঝে যেন একটা আশার বিদ্যুৎ-শিখা এই বিনতা।

বিনতা বড় গরীবের মেয়ে। মামার দয়ায় মামার বাড়িতেই চিরকাল অবহেলা অনাদরে মানুষ।

জন্মাবধি তার ব্যথার সঙ্গেই পরিচয়। অশ্রু তার চিরসাথী, হাসি তার কেউ নয়।

কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সে তীক্ষ্ণ মেধাবী।

নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় স্কলারশিপ নিয়ে বি. এ. পাস করে লাহোরে এক স্কুলে চাকরি নিয়ে যায়। মাঝখানে কিছুদিন নার্সিংও পড়েছিল। গগনেন্দ্রনাথ তখন লাহোর সেনট্রাল জেলে সুপারিনটেনডেন্ট। বিনতা থাকত গগনেন্দ্রনাথেরই পাশের একতলা ছোট্ট বাড়িটায়। কেমন করে যে রণধীরের সঙ্গে বিনতার আলাপ হল, কাকার দুর্জয় শাসনের গণ্ডি ডিঙিয়ে কেমন করে যে সেই আলাপ গভীর হতে গভীরতর হল এবং শেষটায় বিনতা স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে রণধীরের পিছু পিছু বধূবেশে গগনেন্দ্রনাথের পাষাণ-প্রাচীরের মধ্যে এসে প্রবেশ করল সে আজও এক বিস্ময়।

বাইরে থেকে এ বাড়ির যে ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক আবহাওয়া, যেটা কোনদিনই বিনতার

চোখে ধরা পড়েনি, আজ সেইটাই বিনতার সর্বাঙ্গে যেন সুকঠিন লৌহ-শৃঙ্খলের মতই তাকে জড়িয়ে ধরল এ বাড়ির মধ্যে পা দেওয়ার কিছুকালের মধ্যেই।

শীঘ্রই চিরস্বাধীন বাধাহীন মন তাঁর হাঁপিয়ে উঠল।

ভয়ঙ্কর অস্বাভাবিক এ বাড়ির আবহাওয়া। যেন একটা দুর্জ্ঞেয় গোলকধাঁধা। এখানে সব কিছু একজনের বাঁধাধরা সুকঠিন নিয়মের মধ্যে চলে।

যেন একটা প্রকাণ্ড অজগর সাপের বিষাক্ত দৃষ্টির তলায় সকলে সম্মোহিত পঙ্গু হয়ে আছে।

এখানে জীবনের স্পন্দন নেই, আছে মৃত্যুর গভীর নীরবতা। এখানকার বাতাসে নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হয়। হাঁফ ধরে।

পুরীতে এসে অবধি গগনেন্দ্রনাথ বেশীর ভাগ সময়ই তাঁর ঘরের সামনে বারান্দায় একটা আরাম-কেদারার উপরে দামী সাদা শাল গায়ে দিয়ে চুপ করে বসে থাকেন, তাঁর আশেপাশে বাড়ির আর সকলে বসে থাকে।

মাঝে মাঝে গগনেন্দ্রনাথ সমুদ্রের তীরে বেড়াতে যান ; সঙ্গে সবাই যায়। আবার সন্ধ্যার পরে একত্রে সবাই হোটেলে ফিরে আসে।

দিনমণি একটু আগে সাগরজলে আবির গুলে অস্ত গেছেন। সাগর-কিনারে বালুর ওপরে সাগরজলের দিকে নিমেষহারা দৃষ্টি মেলে একাকী নীরবে বসে আছে প্রতিমা।

কোলের উপরে পড়ে আছে রবিঠাকুরের সঞ্চয়িতাখানা।

মাথায় আজ সে সাবান দিয়েছিল, রুক্ষ বিস্রস্ত চুলগুলি হাওয়ায় উড়ছে। পরিধানে তার আজ গেরুয়া রঙের একখানা খদ্দরের শাড়ি, গায়ে ডিপ আকাশ-নীল রঙের হাতকাটা ব্লাউজ।

প্রতিমা দেখছিল, সন্ধ্যার ধূসর ম্লান ছায়া একটু একটু করে সারা পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ছে।

সমুদ্রের নীল জল কালো হয়ে উঠছে।

আজ যেন সমুদ্র বড় বেশী উতলা।

আবছা আলোয় কালো কালো ঢেউগুলি শুভ্র ফেনার মালা গলায় দুলিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে ছুটে আসছে।

প্রতিমা গান গাইছিলঃ

"ওগো কোন্ সুদূরের পার হতে আসে,
কোন্ হাসি কান্নার ধন।
ভেবে মরে মোর মন,
ভেসে যেতে চায়
এই কিনারার সব চাওয়া সব পাওয়া।"

বাঃ, চমৎকার গান তো আপনি! কী মিষ্টি আপনার গানটি!

চমকে প্রতিমা ফিরে তাকাল।

সন্ধ্যার ঘনায়মান আঁধারে তার ঠিক পশ্চাতে বালুবেলার উপরে যেন দীর্ঘ এক অস্পষ্ট ছায়ার মতই দাঁড়িয়ে আছে সমীর। যেন খাপ-খোলা একখানা বাঁকা তলোয়ার।

কে, সমীরবাবু?

সমীর প্রতিমার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেল, বললে, হ্যাঁ। কিন্তু আমার নাম আপনি জানলেন কি করে? আপনার নাম তো আমি জানি না।

প্রতিমা মৃদু হাসলে, তারপর স্মিতভাবে, বললে, আপনি আমার নাম জানেন না সমীরবাবু, কিন্তু আমি আপনার নাম জানি। আমার নাম প্রতিমা গাঙ্গুলী, পেশা ডাক্তারী। বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন যে?

বসব? কণ্ঠে যেন একরাশ মিনতির বেদনা ঝরে পড়ল।

কী অসহায়, করুণ!

হ্যাঁ, বসুন না। আপনাকে এই হোটেলে প্রথম দিন থেকে দেখা অবধিই আপনার সঙ্গে আমার আলাপ করবার খুব ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আপনারা কারো সঙ্গে কথাও বলেন না, মেশেনও না। খাবার ঘরে যান, চুপচাপ খেয়ে চলে আসেন।

সমীর ততক্ষণে প্রতিমার অল্প একটু দূরে সাগরবেলার উপরে বসে পড়েছে। প্রতিমা বলছিল, কেন আপনারা কারো সঙ্গে মেশেন না, কথা বলেন না সমীরবাবু?

সমীর চুপ করে বসে রইল।

সমীরবাবু, এই চমৎকার জায়গায় এসেও আপনারা ঘরের মধ্যেই বসে থাকেন! কেমন করে থাকেন? ভাল লাগে? বাইরে আসতে কি ইচ্ছে হয় না? আমি তো এখানে আসা অবধি এক মুহূর্তও ঘরে থাকতে পারি না! সমস্ত মন যেন কেবলই বাইরে ছুটে আসে।

হ্যাঁ, আমার ইচ্ছে করে প্রতিমা দেবী, কিন্তু কই পারি না তো! কেন পারি না? কেন বাইরে আসতে পারি না আমি বুঝতে পারি না, একটা প্রবল নিষেধ যেন ঘরের মধ্যে আমায় পিছু টেনে রাখে, আমার সমস্ত গতিকে নষ্ট করে দেয়।

চলে আসবেন বাইরে, যখন মন চাইবে।

মন তো বাইরে ছুটে আসতে সব সময়ই চায় প্রতিমা দেবী। বলতে পারেন, কেমন করে ঘর ছেড়ে বাইরে আসতে হয়? সমীর বলল।

কী সরল প্রশ্ন!

প্রতিমা ডাঃ চক্রবর্তীর মুখে এদের সব কথাই শুনেছিল।

শুনে সে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এও কি সম্ভব নাকি?

সে বলেছিল ডাঃ চক্রবর্তীকে, কেন এরা সব ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয় না? কেন এরা বিদ্রোহী হয়ে বাইরে ছুটে আসে না?

ডাঃ চক্রবর্তী জবাব দিয়েছিলেন, একদিন হয়তবা এরা বিদ্রোহী হতে পারত, কিন্তু আজ আর তারা পারবে না। মনের সে শক্তি আজ ওরা নিঃশেষে হারিয়েছে। আজ শুধু নিরুপায় বেদনায় ছট্‌ফটই করবে, কিন্তু প্রতিকার তার করতে পারবে না। একদিন নয়, দুদিন নয়, দীর্ঘদিনের এই সম্মোহন--আজ আর এর থেকে তো ওদের নিস্তার নেই ডাঃ গাঙ্গুলী!

কেন নেই ডাঃ চক্রবর্তী? প্রতিমা প্রশ্ন করেছিল।

আমার ওদের সঙ্গে বেশ কিছুদিনের পরিচয়, অমিয় বলতে লাগল, কৌতূহলবশেই একটু একটু করে গগনেন্দ্রনাথের পূর্ব ইতিহাস আমি সংগ্রহ করেছি। প্রথম জীবনে গগনেন্দ্রনাথ লোকটা জেলের কয়েদীদের রক্ষী ছিলেন। দিনের পর দিন একদল অস্বাভাবিক অপরাধীদের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ওঁর মনের সহজ প্রবৃত্তিগুলো একটু একটু করে বিকৃত হয়ে গেছে। হয়ত গগনেন্দ্রনাথ মনে মনে নিষ্ঠুরতা ভালবাসতেন না। কিন্তু যেহেতু তাঁকে জেলের কয়েদীদের রক্ষী হতে হয়েছিল, কর্তব্যের খাতিরেই হোক বা আইনের খাতিরেই হোক নিত্যনিয়মিত একদল অস্বাভাবিক লোকের সঙ্গে মিশে মিশে, ভেড়ার মত সর্বদা তাদের আইনের নাগপাশে

বেঁধে রেখে চালনা করতে করতে হয়ত বা মনে মনে নিজের অজ্ঞাতেই একদিন অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছিলেন। এক কথায় অন্যের উপরে ক্ষমতা প্রয়োগ করবার হয়ত একটা দুর্মদ উন্মাদ কামনা চিরদিনই ওঁর অবচেতন মনের মধ্যে সুপ্ত কস্তুর মত ঘুমিয়ে ছিল। একদিন হয়ত সেই অবচেতন মনের অলঙ্ঘ্য ইঙ্গিতেই জেলের কয়েদীদের রক্ষার কাজ বেছে নিয়েছিলেন প্রয়োজন হিসাবে, মনের অবচেতন লালসার তৃপ্তিসাধন করতে।

মনোবিজ্ঞানে বলে, আমাদের অবচেতন মনে অনেক সময় অনেক অদ্ভুত বাসনাই গোপন থাকে। ক্ষমতা প্রয়োগের একটা দুর্বার বাসনা, একটা পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা, ধ্বংস করবার একটা বন্য বর্বর আদিম ইচ্ছা—ঐসব প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম মানব-প্রবৃত্তি—আজও ওগুলো আমাদের সভ্যতার চাকচিক্যের অন্তরালে আমাদের অবচেতন মনের মধ্যে ঘুমিয়ে আছে। আদিম বর্বর যুগের সেই বন্য নিষ্ঠুরতা, উন্মাদ প্রলোভন, পাশবিকতা—আজ আমরা সভ্যতার আবরণে সেটা ঢেকে রাখতে অনেক কায়দা-কানুন শিখেছি বটে, স্বীকার করি, কিন্তু তবু সেই আদিম বর্বর অবচেতন প্রবৃত্তিগুলি যখন আমাদের মনে প্রবল হয়ে ওঠে, তখন আমাদের একান্ত অজান্তেই আমরা নিরুপায় হয়ে ধরা দিতে বাধ্য হই সেই সব প্রকৃতির হাতে। কোথায় ভেসে যায় আমাদের সভ্যতা, এত কষ্টে অর্জিত শিক্ষার গিল্টির আবরণ। মনের সেই চিরন্তন আদিম বর্বরতা ক্ষুধার্ত লালসায় হুঙ্কার দিয়ে ওঠে।

দুঃখের বিষয় আজ আমরা আমাদের জীবনের সব কিছুতেই যেন সেই আদিম বন্য বর্বর প্রবৃত্তির প্রকাশ দেখতে পাচ্ছি। জাতীয় জীবনে, রাজনীতিতে, সমাজে, রাষ্ট্রে, সভ্যতায়। দয়া হতে, ভ্রাতৃত্ব হতে আজকের এই মনুষ্যত্বের এটা একটা 'রিঅ্যাক্‌শন'। আজকের এইসব চলিত নীতিগুলো দেখে অনেক সময় মনে হয় বুঝি খুব সঠিক চিন্তাপূর্ণ ও মঙ্গলজনক একটা গভর্মেন্ট গড়ে উঠেছে। কিন্তু আমরা ভুলে যাই যে সে গভর্মেন্ট একদিন জোর করে চালু করা হয়েছিল, ভয় ও নিষ্ঠুরতার উপরে তার ভিত্তি উঠেছিল গড়ে। সেদিনকার সেই ভয় ও নিষ্ঠুরতার ভিত্তিতে গড়া গভর্মেন্টই আজ আমাদের মনের চিরন্তন আদিম ও ভয়ঙ্কর বর্বরতা ও নিষ্ঠুরতাকে মনের সভ্যতার গিল্টি-করা দরজাটা খুলে বাইরে বের করে দিয়েছে। তাই তো আজ জগতে জাতিতে জাতিতে, দেশে দেশে এত হানাহানি, এত রক্তারক্তি, এত যুদ্ধবিগ্রহ।

ইঙ্গ-আমেরিকা আজ চিৎকার করছে বটে, জার্মানকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যই তাদের জগতে এক শান্তিময় জীবনধারা নিয়ে আসা। জার্মানীই যেন এইসব যত দুঃখ ও অমঙ্গলের মূল। কিন্তু মনে মনে ব্রিটিশ, জার্মানী, জাপান সবাই একই দলের পথিক। শুধু বিভিন্ন কর্মধারা মাত্র। ভাল করে ভেবে দেখুন দিকি, প্রকৃতপক্ষে পশুর চাইতে বেশী কি? খুব delicately balanced— একমাত্র উদ্দেশ্য বেঁচে থাকা। খুব দ্রুত এগিয়ে চলাও যেমন জাতি ও দেশের পক্ষে ক্ষতিকর, পেছিয়ে থাকাও তাই। কেবল বেঁচে থাকতে হবে, দ্রুতও নয়, অতি শ্লথও নয়, মাঝামাঝি। দেশ বা জাতি সেও তো সমষ্টিগত মানবই।—কথায় কথায় অনেক দূরে চলে এসেছি।

ডাঃ চক্রবর্তী একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, আমার মনে হয়, গগনেন্দ্রনাথ বহুকাল ধরে বহু লোকের উপরে প্রভুত্ব করে করে, মানুষের উপরে অত্যাচার নিষ্ঠুরতা করে, বেদনা দিয়ে দিয়ে, আজ ওঁর মনের সহজ প্রবৃত্তিই গড়ে উঠেছে ঐ বেদনা দেওয়া ও অত্যাচার করার মধ্যে। সেই প্রাগৈতিহাসিক পাশবিক বর্বর আনন্দ, শুধু আগের মতো শারীরিক বেদনা দেওয়ার পরিবর্তে দিচ্ছে মানসিক বেদনা। এ ধরনের মনোবিকার খুব বড় একটা বেশী দেখা

যায় না। আর এদের সঙ্গে যুদ্ধ করাও বড় কঠিন। সে চায় অন্যের উপরে তার প্রভুত্ব থাকবে। এবং সেই প্রভুত্বের দোহাই দিয়ে অন্যের উপরে করবে সে অত্যাচার। এতেই তার আনন্দ।

প্রতিমা বলেছিল, এটা কি পাশবিক নয়, এইভাবে অত্যাচারের মধ্য দিয়ে আনন্দ ভোগ করা?

নিশ্চয়ই। ডাঃ চক্রবর্তী বলেছিলেন, কিন্তু সবচাইতে মজা হচ্ছে, অত্যাচারী এখানে বুঝতেই পারছে না কী সে করছে, এখানে সে তার অবচেতন মনের দ্বারা চালিত হচ্ছে।

প্রতিমা এরপর জিজ্ঞাসা করেছিল, কিন্তু কাকার এই অত্যাচার থেকে ভাইপোরা নিষ্কৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে না কেন ডাঃ চক্রবর্তী?

ডাঃ চক্রবর্তী জবাব দিয়েছিলেন, ওইখানেই তো আপনার ভুল ডাঃ গাঙ্গুলী। তারা তা পারে না। একটা মুরগীকে একটা ঘরের মধ্যে সাদা চক দিয়ে মেঝের উপরে একটা লাইন টেনে, মুরগীর ঠোঁটটা সেই সাদা লাইনের উপরে রেখে দিলে যেমন তার মনে হবে সেই লাইনের সঙ্গেই সে বাঁধা পড়েছে, আর সে নড়তে পারবে না, গগনেন্দ্রনাথের ভাইপোদেরও মনের অবস্থা ঠিক তাই, তাদের সম্মোহিত করেছে যে সে ছাড়া আর তাদের উপায় নেই, মুক্তি নেই।

আচ্ছা এই যে একটা পরিস্থিতি, এ তো অতগুলো লোকের পক্ষে ভয়ঙ্কর অমঙ্গলজনক। প্রতিমা বললে।

নিশ্চয়ই, সেকথা একবার বলতে, হাজারবার!

প্রতিমা রুদ্ধস্বরে বলেছিল, তবে তো এই শয়তান বুড়োকে খুন করাই উচিত। ওই শয়তানকে খুন করতে পারলে এখনও হয়ত ওদের বাঁচবার আশা আছে। এখনও হয়ত ওদের মনের সব কিছু মরে শুকিয়ে যায়নি। এখনও হয়ত ওদের মনের মাঝে আলো আসে, ফুল ফোটে।

কী বলছেন আপনি প্রতিমা দেবী? বিস্মিত কণ্ঠে ডাঃ চক্রবর্তী জিজ্ঞাসা করলেন।

ঠিকই বলছি, দশজনের মঙ্গলের কাছে একজনের মৃত্যু সে তো বড় বেশী কথা নয়, এর মধ্যে অন্যায় কী-ই বা আছে? একবার ঐ বেচারীদের কথা ভেবে দেখুন তো ডাঃ চক্রবর্তী! দিনের পর দিন দীর্ঘকাল ধরে কী যাতনাটাই না তারা সহ্য করছে!

প্রতিমা নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে গিয়েছিল, সমীরের কথা তার যেন এতক্ষণ মনেই ছিল না। সহসা সমীরের ভয়চকিত কণ্ঠস্বরে ও চমকে উঠল, আমি যাই, অনেক রাত হল। কাকা হয়ত খুঁজবেন।

বসুনা না আর একটু! প্রতিমা বললে।

না না, আমি যাই। একটা ভয়ঙ্কর অস্বস্তিতে যেন সমীরের কণ্ঠস্বর ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, সহসা সে মাতালের মত অস্থির পদে টলতে টলতে চলে গেল।

সেই অন্ধকারে বালুবেলার মধ্যে বসে সমীরের ক্রমঅপস্রিয়মাণ গতিপথের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সহসা কেন জানি না প্রতিমার চোখের কোল দুটি জলে ভরে এল।

সাগরে বুঝি জল উঠেছে, সহসা একটা ঢেউ এসে প্রতিমার পায়ের অনেকখানি ও লুণ্ঠিত শাড়ির আঁচলটা ভিজিয়ে দিয়ে চলে গেল।

অল্প দূরেই কিরীটীর হাওয়াইন গিটারের মধুর সুর সমুদ্রে সাগরবেলায় তখন ছড়িয়ে পড়েছে।

প্রতিমা আকাশের দিকে অশ্রুসজল দৃষ্টি তুলে তাকাল। কালো আকাশের বুকে হীরার

কুচির মত নক্ষত্রগুলি জ্বলছে আর জ্বলছে।

নীচে সাগর তেমনিই ঢেউয়ে ঢেউয়ে মাতামাতি করে চলেছে। উদ্দামতারও বিরাম নেই, গর্জনেরও বিরাম নেই।

*　　　　*　　　　*

'স্বর্গদ্বার' হোটেলের নীচের তলায় বসবার ঘরে তখন অনেকেই জমায়েত হয়েছে। রাত্রি পৌনে আটটা।

ঘরের এক কোণে গগনেন্দ্রনাথ একটা আরাম-কুরসীর উপরে গায়ে একটি দামী শাল জড়িয়ে হেলান দিয়ে বসে আছেন। পাশেই আর একটা চেয়ারে বসে বিনতা উল বুনছে, তার অল্পদূরে বসে বই পড়ছে রণধীর, তার পাশে একটা আরাম-কেদারায় হেলান দিয়ে কিশোর চোখ বুজে পড়ে আছে। অধীর গগনেন্দ্রনাথ বাঁপাশে বসে একটা পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছেন আনমনে। ঘরের অন্যদিকে যতীনবাবু ও বারীনবাবু মুখোমুখি বসে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করছেন। অল্পদূরে একখানা সোফার উপরে বসে ডাঃ চক্রবর্তী কী একটা মোটা ডাক্তারী বই পড়ছেন।

সমীর এখনও এল না? গগনেন্দ্রনাথ প্রশ্ন করলেন যেন কতকটা আপন মনেই। দিনদিনই সে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছে। কপালে ওর অনেক দুঃখ আছে।

এমন সময় ক্লান্তপদে সমীর এসে ঘরে প্রবেশ করল।

গগনেন্দ্রনাথ একবার আড়চোখে সমীরের দিকে তাকিয়ে ধীর গম্ভীর স্বরে প্রশ্ন করলেন, এত রাত্রি পর্যন্ত কোথায় ছিলে সমীর?

সমীর নীরবে মাথা নীচু করে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে রইল।

কী, জবাব দিচ্ছ না কেন? একসঙ্গে সব বেড়িয়ে ফিরছিলাম, কোথায় তুমি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলে?

সমুদ্রের ধারে বেড়াচ্ছিলাম কাকা। মৃদুস্বরে সমীর জবাব দিল।

বেড়াচ্ছিলে? অত্যন্ত অসংযমী ও উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠছ তুমি দিন দিন সমীর! কিছুদিন থেকেই আমি লক্ষ্য করছি, গতিটা তোমার ক্রমে অবাধ হয়ে উঠছে। ধ্বংসের মুখে তুমি ছুটে যাচ্ছ সমীর।

আমি—, সমীর যেন কী বলতে যাচ্ছিল প্রত্যুত্তরে।

গগনেন্দ্রনাথ প্রবল বিরক্তির সুরে বাধা দিয়ে বলে উঠলেন, যাক, তর্ক করো না। দোষী হয়ে দোষ ঢাকবার মত পাপ বা অন্যায় আর নেই। কার হুকুমে তুমি এতক্ষণ বাইরে ছিলে?

এমন সময় ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী এসে ঘরে প্রবেশ করল, ঘরে ঢুকবার পথেই গগনেন্দ্রনাথের শেষের কথাগুলি তার কানে গিয়েছিল, সে সমীরের দিকে স্তব্ধ-বিস্ময়ে তাকিয়ে চেয়ে রইল।

গগনেন্দ্রনাথ তীক্ষ্নকণ্ঠে আবার প্রশ্ন করলেন, কী, চুপ করে আছ কেন, জবাব দাও? এত স্বাধীনতা তোমার কোথা থেকে এল? এত দুঃসাহস তোমার কেমন করে হয়?

প্রতিমা আর সহ্য করতে পারল না। তার মনের মধ্যে যেন আগুন জ্বলছিল, সে এবারে এগিয়ে এল, গগনবাবু, উনি আমার সঙ্গে বসে গল্প করছিলেন, আমিই ওঁকে আটকে রেখেছিলাম ; দোষ এতে যদি কিছু হয়ে থাকে তবে আমার, ওঁর নয়।

গগনেন্দ্রনাথ তীক্ষ্নস্বরে জবাব দিলেন, আপনি কে আমি জানি না। কিন্তু আপনি যেই হোন, আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে একজন তৃতীয় পক্ষের মাথা ঘামানোটা আমি আদপেই

পছন্দ করি না। দয়া করে আর আপনি আমার ভাইপোদের সঙ্গে মিশে কুপরামর্শ দিয়ে উচ্ছন্ন দেবেন না।

এসব আপনি কী যা খুশি তাই বলছেন গগনবাবু! তীব্র প্রতিবাদের সুরে প্রতিমা জবাব দিল।

অসহ্য ক্রোধে ও অপরিসীম লজ্জায় তার সমগ্র মুখখানা তখন রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।

প্রতিমার কথার কোন জবাব না দিয়ে গম্ভীর স্বরে সমীরের দিকে তাকিয়ে গগনেন্দ্রনাথ বললেন, শোন সমীর, এভাবে উচ্ছন্নে যেতে তোমায় আমি দেব না। এ ধরনের অন্যায় যদি আবার কোনদিন তোমার দেখি তবে এমন ব্যবস্থা আমি করব যে, সারা জীবনের চোখের জলেও তোমার মুক্তি মিলবে না। এ অসহ্য! একেবারে অসহ্য এই অমার্জনীয় ঔদ্ধত্য! তারপরই উঠে দাঁড়িয়ে সকলকে লক্ষ্য করে আদেশের সুরে বললেন, চল সব ঘরে!

একটা তীব্র কুটিল দৃষ্টি প্রতিমার দিকে হেনে গগনেন্দ্রনাথ ধীরপদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন, তাঁর পিছু পিছু অন্য সকলে মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা নীচু করে ঘরে থেকে বের হয়ে গেল।

প্রতিমাও একপ্রকার ছুটে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ঘরের অন্য সব প্রাণী স্তম্ভিত বিস্ময়ে স্থাণুর মতই যে যার জায়গায় নীরবে বসে রইল।

* * *

সেই রাত্রে।

রাত্রি বোধ করি দেড়টা হবে। কিরীটীর চোখে ঘুম নেই।

অমিয় তার শয্যার উপরে শুয়ে অঘোরে নাক ডাকাচ্ছে।

কিরীটী একটা সিগারেট ধরিয়ে ঘরের পিছনদিকের জানালার সামনে এসে দাঁড়াল।

বাইরে অন্ধকার প্রকৃতি কালো আকাশের ছায়ায় যেন চোখ বুজে পড়ে আছে।

সমুদ্রের একটানা গুম্ গুম্ গর্জন রাত্রির স্তব্ধ অন্ধকারের দু-কূল ছাপিয়ে যেন কানের কাছে এসে আছড়ে পড়ছে।

সহসা তার কানে এল কারা যেন পাশের ঘরেই চাপা উত্তেজিত স্বরে কী আলোচনা করছে।

না না, এ অসম্ভব। এই পরাধীনতার নাগপাশ, দিনের পর দিন এই অকথ্য অত্যাচার সত্যি আর সহ্য হয় না! প্রাণ আমার হাঁপিয়ে উঠেছে! এভাবে আর বেশীদিন থাকলে বুঝি পাগল হয়ে যাব আমি! অধীর—

মেজদা, এমনি করে অধীর হয়ো না ভাই। আর কটা দিনই বা বুড়ো—কতকাল আর বাঁচবে!

না না, বুড়োর মৃত্যুর আশায় দিন গুনে গুনে আর পারি না। ইচ্ছে করে দু'হতে সব ভেঙে মুচড়ে যেদিকে দু-চোখ যায় চলে যাই।

কিন্তু যাবি কোথায়? পেট চলবে কী করে?

পেটের ভাবনা ভাবছিস তুই অধীর! ভিক্ষে করে খাব, তবু এ আর সহ্য হয় না। ভেবে দেখ্ তুই, ওকে খুন করা ছাড়া আর আমাদের মুক্তির উপায় নেই। ওকে খুন করা উচিত—ও মরুক। ও মরুক। এখন ওর পক্ষে মরণই মঙ্গল।

ছি ছি, এসব কী তুমি বলছো মেজদা?

অনেক দুঃখে, অনেক কষ্টেই বলছি। শীঘ্র যদি ও না মরে, আমিই নিজে হাতে ওকে

এই পৃথিবী থেকে সরাব। হ্যাঁ, আমিই সরাব। এবং তার উপায়ও ভেবে রেখেছি। কেউ জানবে না, কেউ সন্দেহমাত্র করতে পারবে না। অথচ নিঃশব্দে কাজ হাসিল হবে। শোন্ কী উপায় আমি ভেবেছি......

তারপর আর শোনা গেল না।

কিরীটী গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল।

পাশের ঘরেই অধীর থাকে।

কিন্তু...

* * *

দিন-দুই প্রতিমা কতকটা যেন ইচ্ছা করেই ওদের ধার দিয়ে গেল না। এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াল।

কিন্তু আচমকা আবার সেদিন আবছা ভোরের আলোয় সমুদ্র-কিনারে সমীরের সঙ্গে প্রতিমার দেখা হয়ে গেল।

সমুদ্রের বালুবেলায় একাকী সমীর দাঁড়িয়ে আছে।

পরিধানে ধুতি ও গরদের পাঞ্জাবি।

মাথার চুল এলোমেলো রুক্ষ, সাগর-হাওয়ায় আরও এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

যেন এক বিষাদের প্রতিমূর্তি।

করুণায় প্রতিমার হৃদয় দ্রব হয়ে এল। আহা, কী অসহায়! প্রতিমা আর নিজেকে রোধ করে রাখতে পারলে না, এগিয়ে এল, নমস্কার সমীরবাবু!

কে? চমকে সমীর ফিরে দাঁড়াল।

সেই প্রভাতের প্রথম আলোয় প্রতিমার দিকে তাকিয়ে সমীরও মুগ্ধ হয়ে গেল।

কী সুন্দর! কী স্নিগ্ধ!

সত্যিই প্রতিমাকে সে-সময় বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল।

সাগর-নীল রঙের একখানি ছাপা মুর্শিদাবাদ সিল্কের শাড়ি পরিধানে। গায়ে সাদা রঙের জরির কাজ-করা ব্লাউজ। মাথার চুলগুলি এলোমেলো করে কাঁধের উপর হেলে রয়েছে।

পায়ে শ্রীনিকেতনের চপ্পল।

মুগ্ধবিস্ময়ে সে সমীরের দিকে তাকিয়ে। যেন সাগরলক্ষ্মী সাগর-শয্যা হতে এইমাত্র নিদ্রা ভেঙে বালুবেলার উপরে এসে দাঁড়িয়েছে। সত্যি কি সুন্দর আপনি, প্রতিমা দেবী! বড় ভাল লাগে আপনাকে আমার। মুগ্ধকণ্ঠে সমীর বললে।

সহসা প্রতিমার মুখখানা লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু চকিতে সে আপনাকে সামলে নিল, সেদিনকার ঘটনার জন্য সত্যই আমি বড় দুঃখিত ও লজ্জিত সমীরবাবু। তারপরই স্বরটাকে গাঢ় করে বললে, কেন—কেন আপনি এ অত্যাচার সহ্য করছেন? ও শয়তানের খপ্পর থেকে বের হয়ে আসুন! পুরুষমানুষ আপনি, এ দুর্বলতা কেন?

কিন্তু সমীর প্রতিমার কথায় যেন স্বপ্নোত্থিতের মত সজাগ হয়ে উঠল, না না, আপনি যান। আপনি এখান থেকে যান। আপনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন না। আমি আপনার সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না। ভয়চকিত কণ্ঠস্বরে কথাগুলি বলতে বলতে একপ্রকার ছুটেই যেন কতকটা সমীর হোটেলের দিকে চলে গেল।

স্তব্ধ-বিস্মিত প্রতিমার দু-চোখের কোলে জল উপচে উঠল। আহা, সমুদ্রের বুকে কে অদৃশ্য শিল্পী তুমি রক্তরাঙা আবির মুঠো মুঠো ছড়িয়ে দিয়েছ!

এ কি নয়নাভিরাম অপূর্ব দৃশ্য!

হে অদৃশ্য শিল্পী, আমার প্রণাম গ্রহণ কর।

*　　　*　　　*

সেই দিন সন্ধ্যায়।

আজ আর গগনেন্দ্রনাথ সমুদ্রের ধারে সান্ধ্যভ্রমণে বের হননি। সকলেই যে যাঁর বসবার ঘরে বসে আছেন।

কিরীটীও আজ সন্ধ্যায় বের হয়নি, কেননা মাথাটা তার সেই দুপুর থেকে বিশ্রীরকম ধরে আছে।

ঠিক হয়েছে আগামী কাল সকালে সে কোণারক দেখতে যাবে।

দু-চার দিন পরে ফিরবে।

রণধীর সে-ঘরে নেই, নিজের ঘরে শুয়ে আছে।

বিনতা সামনে বসে উল দিয়ে কী একটা বুনছিল, ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত্রি আটটা ঘোষণা করল।

বিনতা হঠাৎ যেন চমকে দাঁড়াল, কাকা, আপনার ওষুধ খাবার সময় হল, ওষুধটা নিয়ে আসি গে!

গগনেন্দ্রনাথ চোখ বুজে ঝিমোচ্ছিলেন, মৃদুস্বরে বললেন, যাও। কিন্তু ওষুধ খাবার সময় আমার আধঘন্টা আগেই হয়েছিল। তোমাদের কি আর সেদিকে খেয়াল আছে! তোমাদের সকলের যে আজকাল কী হয়েছে, তোমরাই তা জান। সময়মত ওষুধটাও দিতে যদি না পার, বললেই তো হয়, আমার নিজের ব্যবস্থা আমি নিজেই করব। কারও সাহায্যেই আমার দরকার নেই।

বিনতা বিনা বাক্যব্যয়ে ঔষধ আনতে ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। রাগে অপমানে একটা নিষ্ফল বেদনায় তার সমগ্র অন্তরাত্মা তখন গর্জাচ্ছে।

চোখ ফেটে জল আসতে চায়।

বিনতার ঘরেই সাধারণত সব ঔষধপত্র থাকত।

সে যখন ঘরে এসে প্রবেশ করল, রণধীর তখন একটা চেয়ারের উপরে শুয়ে আলোয় কী একখানা বই পড়ছে।

ঔষধ কাচের গ্লাসে ঢেলে নিয়ে যেতে যেতে একবার আড়চোখে স্বামীর প্রতি চেয়ে বিনতা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল। গগনেন্দ্রনাথকে ঔষধ খাইয়ে বিনতা ঔষধের গ্লাসটা রাখতে ঘরে ফিরে এল।

রণধীর তখন বইখাতা কোলের উপরে নামিয়ে রেখে কী যেন ভাবছিল।

বিনতা তার সামনে এসে দাঁড়াল।

কে, বিনতা? রণধীর প্রশ্ন করলে।

হ্যাঁ, আমি। কিন্তু তুমি কি আজও এমনি করে নিশ্চিন্তই থাকবে?

রণধীর চমকে সোজা হয়ে বসে বিনতার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করল, কী হয়েছে বিনতা?

কী হয়েছে? নতুন করে কী আর হবে? ওগো, আমি আর সহ্য করতে পারি না, যেখানে হোক চল এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাই—এখুনি, এই মুহূর্তে। কান্নায় বিনতার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

রণধীর রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু কী সে জবাব দেবে এ প্রশ্নের?

কী ভাবছ? আর কতকাল এমনি ভাবে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করব? ওগো, তুমি কি সত্যিই পাষাণ? এইভাবে কষ্ট দেবে বলে কি তুমি বিয়ে করেছিলে?

বিনতা, স্থির হও। কোথায় যাব বল? এ আশ্রয় ছেড়ে গেলে পথে পথে আমাদের অনাহারে ঘুরে বেড়াতে হবে। এই যুদ্ধের দুর্মূল্যের বাজারে কেমন করে দিন চালাব?

চলবে। কেন তুমি ভাবছ, আমি আবার চাকরি নেব।

তোমার রোজগারে আমাকে জীবনধারণ করতে হবে?

এর থেকে কি তাও ভাল নয়?

না।

বিনতা কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পরে গম্ভীর স্বরে বললে, বেশ, তবে তুমি থাক তোমার ঐ অত্যাচারের ঐশ্বর্য নিয়ে, আমি চলে যাব। দু-মুঠো অন্নের আমার অভাব হবে না জেনো।

বিনতা ধীর শান্তপদে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

রণধীর ব্যাকুল স্বরে ডাকলে, বিনতা, শোন—শোন!

কিন্তু বিনতা ফিরে এল না।

* * *

রাত্রি প্রায় পৌনে নটা।

সকলে এবার খেতে যাবে।

কিশোর একটা শোফার উপরে ক্লান্তভাবে শুয়ে ঝিমোচ্ছিল, সকলেই উঠে দাঁড়াল কিন্তু কিশোর উঠল না।

কিশোরের দিকে তাকিয়ে গগনেন্দ্রনাথ ডাকলেন, কিশোর, ওঠ। খেতে চল।

আমি আজ আর খাব না কাকা। আবার বোধ হয় আমার জ্বর হয়েছে।

গগনেন্দ্রনাথ কিশোরের সামনে এসে তার কপালে হাত দিয়ে বললেন, হ্যাঁ। তবে যাও, নিজের ঘরে শুয়ে থাক গিয়ে।

কিশোর কী এক করুণ মিনতিভরা দৃষ্টিতে গগনেন্দ্রনাথের ভাবলেশহীন মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করল, একা একা আমার কোণের ঘরে শুতে বড় ভয় করে কাকা!

ছেলেমানুষী করো না কিশোর, শুতে যাও।

এখন একটু এখানেই থাকি, তোমরা খেয়ে এস, তারপর আমি যাব'খন।

তীব্রস্বরে গগনেন্দ্রনাথ এবারে ডাকলেন, কিশোর?

সভয়ে ত্রস্ত কিশোর উঠে দাঁড়াল।

বিনতা কিশোরের সামনে এগিয়ে এল, চল কিশোর, আমি তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, তাহলে তো ভয় করবে না!

গগনেন্দ্রনাথ গম্ভীর শান্ত স্বরে বলে উঠলেন, না। কেউ ওর সঙ্গে যাবে না। ও একাই যাবে। যাও কিশোর, শুতে যাও। ধীরপদে মাথা নীচু করে একপ্রকার টলতে টলতেই কিশোর ঘর হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

নিজের ঘরে এসে কিশোর অন্ধকারেই শয্যার উপরে কোনমতে লুটিয়ে পড়ল।

সত্যিই তার তখন জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

বসবার ঘরে বারীনবাবু এক কোণায় বসেছিলেন, হঠাৎ তিনি গগনেন্দ্রনাথের দিকে তাকিয়ে, কিশোর চলে গেলে বললেন, সত্যি হয়ত ও ভয় পায় একা একা শুতে, গগনবাবু।

হাজার হোক ছেলেমানুষ তো।

গগনেন্দ্রনাথ তীব্রভাবে ফিরে দাঁড়ালেন, নিজের কাজ নিজে করুন মশাই, অন্যের কাজে মাথা ঘামাবার তো কোন দরকার নেই আপনার!

বারীনবাবুও তীব্রস্বরে জবাব দিলেন, সত্যি, আপনার মত অভদ্র আমি দেখিনি।

তীব্র ব্যঙ্গের স্বরে গগনেন্দ্রনাথ জবাব দিলেন, তাই নাকি!

তারপরই কিছুক্ষণ বারীনবাবুর চোখের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ঘর হতে বের হয়ে যাবার জন্য ফিরে দাঁড়ালেন এবং চলতে চলতে কতকটা আত্মগতভাবে বলেন, আমি কখনও কিছু ভুলি না। মনে রেখো এ কথা। আমি আজ পর্যন্ত আমার এই সুদীর্ঘ ষাট বছরের জীবনের কোন কথাই ভুলিনি। সবই আমার মনে আছে। কোন মুখ আমি ভুলিনি।

* * *

প্রতিমা এতক্ষণ স্তম্ভিত বিস্ময়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল ও শুনছিল।

ওঁরা ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই সে চুপিসাড়ে পায়ে পায়ে গিয়ে কিশোরের ঘরে প্রবেশ করল।

পায়ের শব্দে কিশোর চমকে প্রশ্ন করলে, কে? কে?

চুপ, চেঁচিও না। আমি প্রতিমা। প্রতিমা কিশোরের শয্যার পাশটিতে এসে দাঁড়াল।

কিশোর মৃদুস্বরে বললে, ডাঃ গাঙ্গুলী?

কিশোরের শয্যার পাশটিতে বসে, কিশোরের রোগতপ্ত কপালে হাত বুলোতে বুলোতে গভীর স্নেহের সঙ্গে প্রতিমা বললে, আমাকে তুমি প্রতিমাদি বলেই ডেকো কিশোর। আমার কোন ছোট ভাই নেই, তুমিই আমার ছোট ভাইটি। কেমন, তুমি আমার ভাই হতে তো?

হব।

তুমি বলছিলে একা একা নাকি তোমার এ ঘরে শুতে ভয় করে, কেন তোমার ভয় করে ভাই? প্রতিমা প্রশ্ন করলে।

কি জানি প্রতিমাদি, সত্যি আমার বড় ভয় করে। মনে হয় এই ঘরের আশপাশে অন্ধকারে কারা যেন সব লুকিয়ে আছে। যত রাত্রি বাড়তে থাকে তারা সব আমার বিছানার চারপাশে এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। অন্ধকার থেকে চাপা গলায় ফিসফিস করে কারা যেন আমাকে ডাকে। আমি শুনতে পাই, দিনের বেলাতেও তারা আমাকে ডাকে। তারা গান গায়, তারা হাসে, তারা কাঁদে।

পাগল ছেলে! ও তোমার মনের ভুল। ওসব কিছু না।

বললে তুমি বিশ্বাস করবে না প্রতিমাদি, তাদের আমি খুব ভাল করে দেখতে পাই না বটে, কিন্তু তারা আমার চারপাশে সর্বদা ঘোরে, আমাকে চাপা গলায় কেবলই ডাকে, তা টের পাই।

এবারে আর দেখো ডাকবে না। দাঁড়াও আমি তোমাকে একটা ওষুধ এনে দিচ্ছি। প্রতিমা নিজের ঘরে গিয়ে একটা ভেরনল ট্যাবলেট নিয়ে এসে কিশোরকে খাইয়ে দিল। শীঘ্রই কিশোরের চোখের পাতায় ঘুম নেমে এল।

ঘুম আসছে প্রতিমাদি, ঘুমোই। কতদিন আমি ভাল করে ঘুমোই না।

সস্নেহে প্রতিমা জবাব দিল, হ্যাঁ, ঘুমোও।

অনেকদিন পরে সেরাত্রে কিশোর নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল।

* * *

পরের দিন খুব প্রত্যুষে কিরীটী কোণারক দেখতে চলে গেল, এখানকার আবহাওয়ায় মনটা তার সত্যিই বড় বিষণ্ণ হয়ে উঠেছিল। প্রতিমা নিজের ঘরে বসে কি একখানা মনোবিজ্ঞানের বই পড়ছিল, ডাঃ চক্রবর্তী এসে ঘরে ঢুকল, চলুন প্রতিমা দেবী, সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আসি।

প্রতিমা বই রেখে উঠে দাঁড়াল, চলুন।

বেরুবার পথে হঠাৎ প্রতিমার সমীরের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল, সমীর যেন প্রতিমাকে দেখে কি বলবার জন্য একটু এগিয়ে এল, কিন্তু প্রতিমা সেদিকে লক্ষ্য না করে হনহন করে এগিয়ে গেল। আজ দুদিন থেকে গগনেন্দ্রনাথের শরীরটা অসুস্থ। বসবার ঘরে কাল থেকে আর আসেন না। সর্বদাই তাঁর ঘরের সামনে একটা আরামকেদারায় হেলান দিয়ে গায়ে কমলালেবু রঙের একটা শাল জড়িয়ে বসে থাকেন। মেজাজটা আরও খিটখিটে হয়ে উঠেছে। হোটেলের চাকর-খানসামাদের পর্যন্ত নানা কাজের খুঁত ধরে চেঁচামেচি করেন। খাবার ঘরে যান বটে, কিন্তু এক গ্লাস দুধ ও কিছু ফল খেয়ে উঠে আসেন।

কিশোরের সকালের দিকে জ্বর থাকে না বটে, কিন্তু সন্ধ্যার পরেই একটু ঘুষঘুষে জ্বর আসে। চোখ মুখ গা হাত পা জ্বালা করে। অমিয় ও প্রতিমা কিশোরকে ভাল করে পরীক্ষা করে গোপনে গোপনে কি ঔষধপত্র দিচ্ছে। গগনেন্দ্রনাথ জানতে পারলে আর রক্ষা থাকবে না তা ওরা ভাল করেই জানে। ঠিক বলবেন, অনধিকার চর্চা!

* * *

আজ দুদিন থেকে গগনেন্দ্রনাথও যেমন বিকেলে কোথাও বেড়াতে বের হন না, ভাইপোদেরও যেতে দেন না বাইরে। সর্বদাই তারা ছায়ার মত গগনেন্দ্রনাথের চারপাশে ভিড় করে থাকে। প্রত্যেকের মুখের উপরে যেন একটা বিষাদের কালো মেঘ থমথম করে।

* * *

সেদিন সকাল থেকেই আকাশের বুকে একটা পাতলা কালো মেঘের যবনিকা দুলছে।

সাগর হয়েছে যেন একটু বিশেষ চঞ্চল।

সঙ্গে সঙ্গে হাওয়া বইছে বাঁধনহারা।

সাগরের বুকে ঢেউয়ের সে কি মাতামাতি!

বড় বড় উঁচু কালো ঢেউগুলি যেন সাদা দাঁতের পংক্তি বের করে সমগ্র বিশ্বদুনিয়াকে গিলবার জন্য ক্ষুধিত লালসায় শত বাহু বাড়িয়ে বজ্রহুঙ্কারে ছুটে এসে বালুবেলার উপরে আছড়ে আছড়ে পড়ছে। দ্বিপ্রহরের দিকে হোটেলের উপরতলায় সকলেই প্রায় সেদিনকার সমুদ্রের সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে সাগরকিনারে চলে গেলেন।

গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ঘরের সামনে আরামকেদারায় চুপটি করে বসে আছেন।

কিশোর তার ঘরে শুয়ে, বাকি সবাই গগনেন্দ্রনাথের চারপাশে বসে। হঠাৎ একসময়ে গগনেন্দ্রনাথ ভাইপোদের দিকে তাকিয়ে বললেন, যাও, তোমরাও আজ সব সমুদ্র দেখে এস। দুদিন তোমরা ঘরের মধ্যে আটকা আছ। যাও, সবাই ইচ্ছামত বেড়িয়ে এস। কিন্তু দেখো, সন্ধ্যা পর্যন্ত যেন বাইরে থেকো না।

কাকার কথা শুনে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের মুখ-চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। এ শুধু আশ্চর্যই নয়, অভাবনীয়ও বটে।

এমনি করে বাইরে যাওয়ার অনুমতি আজ পর্যন্ত জ্ঞানত এর আগে কোনদিন তাদের মিলেছে কিনা তারা মনে করতে পারে না।

বদ্ধ ঘরের বদ্ধ হাওয়ায় তীব্র অনুশাসনের গণ্ডির মধ্যেই তারা আবদ্ধ।

সকলেই একে একে উঠে দাঁড়ান। কেননা অসম্ভব অভাবনীয় হলেও কাকার আদেশ বা অনুমতিকে অবহেলা করার মত তাদের কারো দুঃসাহস নেই।

সমীরই সবার আগে গায়ে পাঞ্জাবিটা চড়িয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হল। কয়েক-দিন হল সমর রায় নামে একজন কবি ও আর্টিস্ট এসে বারীনবাবুর পাশের ঘরখানি অধিকার করেছে।

সমরবাবুর বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশের বেশী হবে না। রোগা লিকলিকে দেহের গঠন। মাথা-ভর্তি এলোমেলো ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া বাবরী চুল কাঁধের উপরে লুটিয়ে আছে। গায়ের রং কালো। চোখমুখ বেশ তীক্ষ্ণ তবে একটা মেয়েলী ঢং আছে। চোখে পাঁসনে, একটা সরু সিল্কের কারের সঙ্গে গলদেশে দোদুল্যমান।

সমরবাবু অতি-আধুনিক কবি। রবীন্দ্র-শেষ যুগে যেসব কবি আপনাতে আপনি দ্যুতিমান, নক্ষত্রনিচয় রবি-প্রতিভাকে ম্লান করে দেবার দুর্বার বাসনায় উচ্চকণ্ঠে সগৌরবে আপনাদের বিজয়-দুন্দুভি পিটছেন, সমর রায় তাঁদেরই একজন।

রবীন্দ্রনাথ নাকি কোন একজন অতি আধুনিক কবির কবিতা পড়ে বলেছিলেন, 'অমুকের কবিতা যদি কেউ আমাকে বুঝিয়ে দিতে পারেন, তবে সত্যিই তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।'

জানি না কেউ বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন কিনা তাঁকে।

সমীর চিরদিনই কবিতার ভক্ত। সমরবাবু একজন কবি শুনে তার মনটা সহজেই সমরবাবুর দিকে একটু ঝুঁকেছিল।

দূর থেকে সমরবাবুর উদাস 'বধূ কৈ' 'বধূ কৈ' ভাব সমীরের মনে একটা বিস্ময়ের উদ্রেক করেছিল সন্দেহ নেই।

সে সমরবাবুর সঙ্গে আলাপ করবার জন্য সুযোগ খুঁজছিল।

সমীর যখন কাকার আদেশে হোটেল থেকে সাগরের দিকে বেড়াতে যাবার জন্য বেরুচ্ছে, হঠাৎ দরজায় সমরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সমরবাবুও তাঁর খাতা ও ঝরনা কলম নিয়ে তখন সমুদ্রের দিকে চলেছেন।

দুজনের দরজার গোড়ায় দেখা হতেই সমীর হাত তুলে সমরবাবুকে নমস্কার জানাল। সাগরের তীর ধরে হাঁটতে হাঁটতে সহজেই দুজনের আলাপ-পরিচয় জমে উঠল।

সমীর বলছিল, আপনি যে একজন কবি তা আমি শুনেছি সমরবাবু, কোন্ কোন্ কাগজে আপনি কবিতা লেখেন?

সমরবাবু জবাব দিলেন, সব কাগজেই প্রায় লিখি।

তবু?

যেমন ধরুন, 'পথহারা পাখী', 'কবরখানা', 'কসাইঘর', 'কারা-প্রাচীর'—সব পত্রিকাতেই আমি লিখি।

'ভারতবর্ষ' 'প্রবাসী'র সঙ্গে সমীরের পরিচয় আছে বটে কিন্তু সমরবাবু বর্ণিত কাগজগুলোর নাম দু-একবার শুনলেও চোখে দেখবার সৌভাগ্য তার কোনদিনও হয়নি, অতএব সে চুপ করেই পথ চলতে লাগল।

সহসা একসময় আবার সে প্রশ্ন করলে, এখানে এসে অবধি নতুন কোন কবিতা আপনি লেখেননি সমরবাবু?

হ্যাঁ, একটা লিখছি, শুনবেন? এখনও কিন্তু শেষ হয়নি।

হ্যাঁ, বলুন না?

তবে শুনুন, সমর চলতে চলতেই কবিতা আওড়াতে শুরু করলেন। কবিতার নাম :

পুরীর সমুদ্র

হে সমুদ্র? তুমি কি একটা পাখী,
পশু না হংসডিম্ব?
কিংবা রেলের লাইন, কাঁটা তারের বেড়া
জেলের কয়েদীদের চোখের জল।
তুমি কার বেদনা দীর্ঘশ্বাস;
কার ছেঁড়া চটিজুতো!
কিংবা কোন কেরানীর ছেঁড়া পাতলুন!
পথিকের ক্ষয়ে যাওয়া শুক্‌তলা,
যুদ্ধের ধূসর তাঁবু
তোমার গর্জনে শুনি সৈনিকের মার্চ,
যেন পায়ে অ্যামুনিশন বুট।
কিংবা রাইফেল মেসিনগান
বোমারু হাওয়াই জাহাজ!
আমি হতবাক!

সমরবাবু হঠাৎ থেমে গিয়ে বললেন, এই পর্যন্তই লিখেছি, বাকি এখনও লেখা হয়নি, ভাব তো সব সময় মাথায় আসে না। ভাব বা প্রেরণা মনের একটা অস্বাভাবিক ক্ষণমুহূর্ত। কিন্তু কেমন লাগল কবিতাটা আপনার সমীরবাবু?

সমীর বোকার মতই যেন হঠাৎ বলে ফেললে, বেশ। কিন্তু বুঝলাম না তো!

সমরবাবু সোল্লাসে বলে উঠলেন, বোঝেননি তো? ঐখানেই আমাদের অতি আধুনিক কৃতিত্ব। আমাদের কবিতা ভাবীকালের জন্য। এই যে প্রতীক্ষিত বেদনা, এর একটা বিপুল রূপ—এ তো সকলের চোখে ধরা পড়বার নয়!

* * *

ঘরের মধ্যে খাটের উপরে শুয়ে ডাঃ চক্রবর্তী সমগ্র দেহখানি একটা কম্বলে ঢেকে কি একখানা বই পড়ছিল।

ভিতরে আসতে পারি কি? বাইরে থেকে প্রতিমার গলা শোনা গেল।

ডাঃ চক্রবর্তী শশব্যস্তে উঠে বসল শয্যার উপর, আসুন প্রতিমা দেবী!

প্রতিমা হাসতে হাসতে এসে ঘরে প্রবেশ করল। তারপরই ডাঃ চক্রবর্তীর দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বললে, এ কি, অসময়ে বিছানায় শুয়ে যে?

শরীরটা সকাল থেকেই যেন কেমন ম্যাজম্যাজ করছে, আবার ম্যালেরিয়া জ্বর আসছে কিনা বুঝতে পারছি না। অমিয় বললে।

প্রতিমা হাসতে হাসতে বললে, ডাক্তার মানুষের অসুখ, এ তো ভাল নয়! কই দেখি আপনার নাড়ীটা?

নাড়ী দেখে প্রতিমা বললে, না, জ্বর নেই, তবে pulseটা একটু rapid, চলুন সমুদ্রের ধারে একটু হাওয়ায় বেড়িয়ে আসবেন, হয়ত ভাল লাগতে পারে।

অমিয় জামাটা গায়ে দিতে দিতে উঠে দাঁড়াল, চলুন।

হোটেল থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে দুজনে সমুদ্রের কিনারে কিনারে বালুবেলার উপর দিয়ে হেঁটে চলল।

অনেকটা দূর গিয়ে অমিয় বললে, আসুন প্রতিমা দেবী, এখানে একটু বসা যাক।

* * *

রণধীর ও অধীর দুজনে হোটেল থেকে বের হয়ে গেল। পিছু পিছু বিনতাও বের হয়ে গেল।

একমাত্র কিশোর শুধু গেল না, নিজের ঘরে শুয়ে রইল।

* * *

ধীরে ধীরে দিনের আলো নিভে আসছে।

দিনের শেষের রক্তিমাভ শেষ সূর্যরশ্মি সমুদ্রের নীল জল লাল করে তুলেছে।

অমিয় প্রতিমার দিকে ফিরে বললে, জ্বর বোধ হয় এসে গেল প্রতিমা দেবী, বড্ড শীত-শীত করছে। আমি ফিরে যাই।

প্রতিমা শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালেন, আমিও সঙ্গে যাচ্ছি চলুন।

না না, অমিয় প্রতিবাদ করে উঠল, আমি একাই যেতে পারব, আপনার মিথ্যে কষ্ট করতে হবে না।

কষ্ট! এতে আবার কষ্ট কি বলুন তো?

না না, আমি একাই ফিরে যাচ্ছি।

অমিয় চলে গেল। প্রতিমা সাগরের দিকে চেয়ে গুনগুন করে গাইতে লাগল।

আমার দিন ফুরাল, ব্যাকুল বাদল সাঁঝে,
বনের ছায়ায় জল ছল ছল সুরে
হৃদয় আমার কানায় কানায় পুরে
ক্ষণে ক্ষণে ঐ গুরু গুরু তালে
গগনে গগনে গভীর মৃদঙ্গ বাজে।
কোন দূরের মানুষ কেন এলো কাছে
মনের আড়ালে নীরবে দাঁড়ায়ে আছে,
বুকে দোলে তার বিরহ-ব্যথার মালা,
গোপন মিলন অমৃত গন্ধ ঢালা
মনে হয় তার চরণের ধ্বনি জানি
হার মানি তার অজানা মনের মাঝে।।

প্রতিমা দেবী?

কে? প্রতিমা চমকে ফিরে তাকাল, ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে সমীর।

সমীরবাবু! আসুন, বসুন। বলে প্রতিমা আবার অন্যদিকে মুখ ফেরাল।

আমি আমার সেদিনকার ব্যবহারের জন্য সত্যই অনুতপ্ত প্রতিমা দেবী। আমাকে ক্ষমা করুন। কুণ্ঠিত স্বরে সমীর বললে।

ক্ষমা! কী বলছেন আপনি সমীরবাবু? আপনি তো কোন অন্যায়ই করেন নি। সত্যিই আপনার কাকা যখন আপনাদের অন্যের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন না...

সত্যি প্রতিমা দেবী, মাঝে মাঝে যে আমার কী হয়, কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে

যায় মাথার মধ্যে। সত্যি এ বাঁধন আমার অসহ্য হয়ে উঠছে। কিন্তু আমি নিরুপায়, মুক্তির কোন পথই খুঁজে পাই না...কী আমি করব বলতে পারেন?

চলে আসুন সমীরবাবু, ঘরের বাঁধন ছিঁড়ে চলে আসুন। আমি তো ভেবে পাই না, কী করে দিনের পর দিন এই শাসন সহ্য করে আসছেন! আমি হলে এতদিন পাগল হয়ে যেতাম, না হয় আত্মহত্যা করতাম।

হয়ত শেষ পর্যন্ত আর কিছুদিন এভাবে থাকতে হলে আত্মহত্যাই আমাকে করতে হবে। আমি বড় ক্লান্ত।

পুরুষমানুষ আপনি, আত্মহত্যা করবেন কেন? ছিঃ ছিঃ, ওসব কথা কল্পনায়ও মনে স্থান দেবেন না। এ অত্যাচারকে আপনার জয় করতে হবে। মনে সাহস আনুন।

সত্যি এ বাঁধন আমি ছিঁড়ে ফেলব। এমনি করে কেউ কোনদিনই আমাকে বলেনি। কিন্তু

সহসা সমীর গভীর আগ্রহে প্রতিমার একখানা হাত চেপে ধরে বললে, আমি পারব, তুমি যদি আমার সহায় হও প্রতিমা! তুমি যদি আমার পাশে এসে দাঁড়াও! বল—বল প্রতিমা, তুমি আমার সহায় হবে! আজই আমি এর একটা মীমাংসা করব।

ধীরে ধীরে প্রতিমা তার ধৃত হাতখানা ছাড়িয়ে নিল, সমীর! বললে প্রতিমা, আমি তোমার সহায় হলেই কী তুমি জয়ী হতে পারবে?

পারব। সত্যি তোমার মুখের দিকে চাইলে যেন আমার মনে সাহস আসে, নিজেকে যেন খুঁজে পাই। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে সমীর বললে, এখুনি আমি চললাম প্রতিমা। মনে হঠাৎ যা উঠেছে, এখনি যদি এর সংশোধন না করি, আবার আমি সাহস হারিয়ে ফেলব। আমি যাই। সমীর দ্রুতপদে স্থানত্যাগ করে চলে গেল।

সমীরের ক্রম অপস্রিয়মাণ গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে সহসা গভীর স্নেহে প্রতিমার চোখের কোল দুটি জলে ভরে উঠল।

* * *

যতীনবাবু নিজের ঘরে শুয়ে শুয়ে কি একটা মাসিকের পাতা ওল্টাচ্ছিলেন। সহসা ওপাশের বারান্দা থেকে কি একটা গোলমালের আওয়াজ কানে এল। উনি মুখ তুলে দেখলেন, একটা খানসামা দ্রুতপদে বারান্দা অতিক্রম করে কিশোরের ঘরের দিকে চলে গেল। যতীনবাবু বুঝলেন, কোন কারণে আবার গগনেন্দ্রনাথ খানসামার উপরে চটে গেছেন। তিনিই বোধ হয় তাকে গালাগাল দিচ্ছিলেন। চেয়ে দেখলেন, গগনেন্দ্রনাথ একটা শাল গায়ে দিয়ে নিত্যকারের মত ইজিচেয়ারটার উপর হেলান দিয়ে বসে আছেন। আচ্ছা মাথা খারাপ যাহোক! যতীনবাবু আবার পড়ায় মনোনিবেশ করলেন ; কেননা এ ধরনের ব্যাপার রোজই প্রায় দু-চারবার হয়।

* * *

বারীনবাবু বেড়াতে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়ে যতীনবাবুর ঘরের সামনে দাঁড়ালেন, যতীনবাবু!

কে, বারীনবাবু? আসুন।

চলুন না সাগরের ধার থেকে একটু বেড়িয়ে আসা যাক।

এখুনি যাবেন? আর একটু বেলা পড়লে গেলে ভাল হত না?

হাতঘড়িটার দিকে চেয়ে দেখতে দেখতে বারীনবাবু বললেন, বেলা আর আছে কই, সোয়া চারটে বাজে। শীতকালের বেলা, তারপর আবার মেঘে মেঘে সন্ধ্যা হতে বেশী দেরিও হবে

না।

বেশ চলুন।

যতীনবাবু উঠে জামাটা গায়ে চাপিয়ে বারীনবাবুর সঙ্গে ঘর থেকে বের হলেন।

গগনেন্দ্রনাথ তখনও একই ভাবে চেয়ারটার উপরে চুপটি করে শাল গায়ে জড়িয়ে বসে আছেন।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে বারীনবাবু উচ্চৈঃস্বরে ডেকে বললেন, আজ কেমন আছেন গগনবাবু?

গগনেন্দ্রনাথ জবাবে ঠিক কি যে বললেন তা শোনা বা বোঝা গেল না বটে, তবে বারীনবাবু মুখটা বিরক্তিতে কুঁচকিয়ে বললেন, দেখলেন যতীনবাবু, লোকটা সত্যিই কি অভদ্র! শরীর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম, ঝাঁজাল স্বরে জবাব দিলেন, বেশ আছি। সত্যি, এত অভদ্র আমি জীবনে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না!

যতীনবাবু চলতে চলতেই মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, একে ভদ্রলোকের বেশ খিট্‌খিটে মেজাজ, তারপর আবার অসুস্থ! গভর্নমেণ্টে যাঁরা চাকরি করেন তাঁরা বুড়ো হয়ে পেনশন নেবার পর এইরকম খিট্‌খিটে বদমেজাজী হন।

তার কারণ কি জানেন? বেশীর ভাগ বুড়োরাই আমাদের দেশে active life ছেড়ে দেবার পর dispeptic হয়ে পড়েন। ফলে ভাল করে রাত্রে ঘুম হয় না, খিট্‌খিটে হয়ে ওঠেন। বারীনবাবু জবাব দিলেন।

কিন্তু আপনিও তো বুড়ো হয়েছেন বারীনবাবু! আপনি তো কই খিট্‌খিটে মেজাজের হননি? যতীনবাবু হাসতে হাসতে বললেন, আপনার ও থিওরিটা কিন্তু আমি মানতে পারলাম না বারীনবাবু।

কিন্তু এক-আধজনকে নিয়েই তো আর সকলকে বিচার করা চলে না যতীনবাবু! হাসতে হাসতে বারীনবাবু জবাব দিলেন।

ওঁদের সঙ্গে পথেই হোটেলের কিছু আগে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর দেখা হয়ে গেল।

চক্রবর্তী তখন জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলের দিকে ফিরে আসছে।

অমিয়র মুখের দিকে তাকিয়ে বারীনবাবু প্রশ্ন করলেন, ডাক্তার, অসুস্থ নাকি?

অমিয় কোনমতে জবাব দিলে, হ্যাঁ, জ্বর হয়েছে।

অমিয় দ্রুতপদে হোটেলে গিয়ে প্রবেশ করল।

পথে সমীরবাবুর সঙ্গেও ওঁদের দুজনের দেখা হল। সমীর তখন দ্রুতপদে হনহন করে হোটেলের দিকে ফিরছে।

ডাক্তার ডাকলেন, কিন্তু সমীর কোন জবাব দিল না ওদের ডাকে। সমীরের মাথার মধ্যে তখন উত্তেজনার আগুন জ্বলছে।

বারীনবাবু সমীরের অপস্রিয়মাণ দেহের দিকে তাকিয়ে আপন মনেই বললেন, পাগল! গুষ্টিসুদ্ধই পাগল!

* * *

বেলা প্রায় চারটে-পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় রণধীর একা একা হোটেলে ফিরে এল।

কাকার সঙ্গে দেখা করে সে দ্রুতপদে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল এবং জামা কাপড় সমেতই নিজের শয্যার উপরে গা এলিয়ে দিয়ে পড়ে রইল।

মাথার মধ্যে তখন তার দপ্‌দপ্‌ করছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই রণধীরের স্ত্রী বিনতা ফিরে এল, এবং খুড়শ্বশুরের সঙ্গে কী খানিকটা কথাবার্তা বলে রণধীরের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

* * *

সমীর কিন্তু হোটেলের দোরগোড়া পর্যন্ত এসে আর হোটেলে প্রবেশ করল না। সাগরের কিনারে গিয়ে বসে রইল।

সে যখন হোটেলে ফিরে এল তখন প্রায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। সমীরের ফিরে আসবার কিছু আগেই বারীনবাবু ও যতীনবাবু হোটেলে ফিরে আসেন।

* * *

সন্ধ্যা প্রায় ছটার সময় ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী ফিরে এল এবং হোটেলে ফিরে সটান নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

* * *

সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটার সময় সকলে এসে খাবার ঘরে ঢুকলেন চা খাবার জন্য।

চা খেতে বসে হঠাৎ বিনতা বললে, কাকা তো চা খেতে এলেন না!

সকলেই একবার মুখ-চাওয়াচাওয়ি করলো, কেননা চিরন্তন নিয়মের এ একটা ব্যতিক্রম।

রণধীর একজন হোটেল-ভৃত্যকে গগনেন্দ্রনাথকে চা পান করতে আসবার জন্য ডাকতে পাঠালে।

অল্পক্ষণ বাদেই চাকরটা দ্রুতপদে ফিরে এল, তার সারা মুখে একটা ভীতত্রস্ত ভাব।

বিনতা জিজ্ঞাসা করলে, কিরে, বাবুকে ডেকেছিস?

মু কিছি বুঝি পারিলি নাহি। মু ডাকিলি, বাবু কড়কিছি কহিলে নাহি। আপন আসি দেখন্তু।

সে কি রে! সকলে উঠে দাঁড়াল এবং একসঙ্গে ঘর ত্যাগ করে সকলেই চলে গেল।

একটু পরেই একটা গোলমালের শব্দ শুনে প্রতিমা সেখানে গিয়ে হাজির হল।

সকলে স্তম্ভিত বিস্ময়ে গগনেন্দ্রনাথকে ঘিরে চারপাশে হতবুদ্ধির মত দাঁড়িয়ে আছে। সকলের মুখেই একটা ভীতত্রস্ত ভাব।

ব্যাপার কি, রণধীরবাবু? প্রতিমা ব্যগ্র-ব্যাকুল কণ্ঠে শুধাল।

কী জানি, বুঝতে পারছি না কিছু, দেখুন তো—ডাকছি সাড়া দিচ্ছেন না!

প্রতিমা শশব্যস্তে ভাল করে পরীক্ষা করতেই তার মুখখানা কালো হয়ে গেল, ধীর মৃদুস্বরে বললে, উনি আর বেঁচে নেই, মারা গেছেন।

সকলেই সমস্বরে বললে, সে কি!

কি করে যে এমনি ভাবে হঠাৎ গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যু হল কেউ ভেবে পেল না।

প্রতিমা বললে, শুধু হার্টফেল করে মারা গেছেন। আগে থেকেই তো হার্টের অসুখে ভুগছিলেন!

কিন্তু আশ্চর্য, গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যুকে কেউ এক ফোঁটা চোখের জলও ফেললে না। সকলেই যেন ভয়ানক নিশ্চিন্ত হয়েছে।

একটা যেন ভূতের বোঝা এতদিন তারা বয়ে বেড়াচ্ছিল, তার থেকে যেন সকলে মুক্তি পেয়েছে।

অমিয় যখন ব্যাপারটা শুনল, রাত্রি তখন প্রায় সাড়ে দশটা হবে, সে-ও এল দেখতে। মৃতদেহ ভাল করে পরীক্ষা করেও তার মনটা যেন খুঁতখুঁত করতে লাগল।

* * *

দিন-দুই বাদে কিরীটী কোণারক থেকে ফিরে এল।

গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ শুনে সে-ও স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কয়েকদিনের ঘটনাগুলি তার মনের মাঝে এসে নানা চিন্তার জট পাকাতে লাগল।

।। তিন ।।

মীমাংসার সূত্র

সেদিন সন্ধ্যায় সমুদ্রের কিনারায় বসে কিরীটী ও ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল—গগনেন্দ্রনাথের আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে।

কিরীটী বললে, গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যুটা স্বাভাবিক নয় একথা কেন তোর মনে হচ্ছে কুনো?

দেখ কিরাত, আমি একজন ডাক্তার। মৃতদেহ আমি সেরাত্রে ভাল করেই পরীক্ষা করেছিলাম এবং বুড়োর ডান হাতের উপরে কি দেখেছিলাম, জানিস?

কি?

ছোট একটি রক্তবিন্দু ও হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ ফোটাবার দাগ। একটা pinpoint puncture! সেটা দেখেই আমার মনে কি একরকম সন্দেহ হয়। তাছাড়া আর একটা জিনিস সে-রাত্রে ঘটেছিল। আমি যখন জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলে ফিরে আসি, কুইনাইন্ খাবার জন্য আমার ডাক্তারী ব্যাগটা খুলতে গিয়ে দেখি, ব্যাগের মধ্যে আমার 2.5 c.c.হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা নেই। জ্বরে তখন আমার গা পুড়ে যাচ্ছে। মাথা বনবন করছে। তবুও একবার ব্যাগটা খুঁজলাম, কিন্তু সিরিঞ্জটা পেলাম না। বুঝতে পারলাম না সিরিঞ্জটা কোথায় গেল, কেননা এখানে আসা অবধি সিরিঞ্জটা আমি একদিনও ব্যবহার করিনি। কিন্তু আশ্চর্য হলেও, সে ব্যাপার নিয়ে আর মাথা না ঘামিয়ে শুয়ে পড়লাম কম্বল মুড়ি দিয়ে। তারপর রাত্রি প্রায় দশটার সময় গগনবাবুর মৃতদেহ দেখে আবার ঘরে এসে শুই, এবং রাত্রি তিনটের সময় আবার আর এক দফা কাঁপিয়ে জ্বর আসে।

পরের দিন জ্বর ছাড়লে সকালে মুখ ধুতে উঠে দেখি আমার ব্যাগের উপরেই সিরিঞ্জটা রয়েছে এবং সিরিঞ্জটা হাতে নিয়ে পরীক্ষা করতেই বুঝতে পারলাম, সিরিঞ্জটা ব্যবহৃত হয়েছে। তখন স্পষ্টই বুঝতে পারলাম, সিরিঞ্জটা কেউ নিয়েছিল, আবার রাত্রে কোন একসময় ফিরিয়ে রেখে গেছে।

কিন্তু সিরিঞ্জটা কে নেবে? কেনই বা নেবে? আচম্‌কা তখন গগনেন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ল। নানা চিন্তায় আমার মাথা ঘুরতে লাগল।

বিকেলের দিকে সিরিঞ্জটা নিয়ে শহরের একজন কেমিস্টের কাছে গিয়ে সিরিঞ্জের মধ্যে অবশিষ্ট পদার্থটা পরীক্ষা করাতেই দেখা গেল, সেটা 'ডিজিটক্সিন্'।

সঙ্গে সঙ্গে একটা কথা বিদ্যুৎ-চমকের মত মনে এল। গগনেন্দ্রনাথ হার্টের ব্যারামে ভুগছিলেন ; তবে কি কেউ overdose ডিজিটক্সিন ইনজেক্ট করে তাঁকে হত্যা করেছে?

পাগলের মতো হোটেলে ফিরে এলাম, কেননা আমার ডাক্তারী ব্যাগে এক শিশি 'ডিজিটক্সিন' ছিল, কিন্তু আশ্চর্য, হোটেলে ফিরে এসে ব্যাগের মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজেও কোথাও সে 'ডিজিটক্সিনে'র শিশিটা পেলাম না। ভেবে দেখ্, গগনেন্দ্রনাথ হার্টের ব্যারামে

ভুগছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁকে একটা overdose 'ডিজিটক্‌সিন' দিয়ে মারা কত সহজ!

কিরীটী এতক্ষণ গভীর মনোযোগের সঙ্গে অমিয়র কথা শুনছিল, এখন বললে, হুঁ, ব্যাপারটা আগোগোড়াই সন্দেহজনক! কিন্তু তুই কি একথা কাউকে বলেছিস কুনো?

না। তবে একবার ভেবেছিলাম পুলিসে একটা সংবাদ দেব, কিন্তু পরে সাত-পাঁচ ভেবে তোর অপেক্ষায় বসে আছি। তোর কি মত এখন তাই বল্! বলে অমিয় কিরীটীর মুখেরদিকে তাকাল।

আচ্ছা ধরে নিচ্ছি, গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়, কোন foul play আছে, কিন্তু কে খুন করতে পারে? কিরীটী প্রশ্ন করল।

খুন এক্ষেত্রে ভাইপোদেরই মধ্যে কেউ করতে পারে। গগনেন্দ্রনাথের অত্যাচারে প্রত্যেকেই দিনের পর দিন সহ্যের শেষ সীমানায় এসে পৌঁছেছিল। এক্ষেত্রে বুড়োকে তাদের কার পক্ষেই খুন করাটা অসম্ভব নয়। দীর্ঘদিন একটা tension-এর মধ্যে থেকে থেকে মনের এমন একটা unsecured অবস্থা এসেছিল, যেখানে হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় খুন করাটা এমন কিছুই নয়।

সত্যিই কি সত্য ব্যাপারটা জানতে চাস অমি? তাহলে কিন্তু পুলিসের সাহায্য নিতে হবে, এখানকার থানা-ইনচার্জ কে জানিস?

হ্যাঁ জানি, খোঁজ নিয়েছি, একজন বাঙালী ভদ্রলোক। কটকেই ডোমিসাইলড। নাম অমরেন্দ্রনাথ মিত্র।

পরের দিন অমরবাবুর সঙ্গে দেখা করে কিরীটী ও অমিয় সমগ্র ব্যাপার আলোচনা করল। সমগ্র ব্যাপারটা শুনে অমরবাবু অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

ফলে ঠিক হল, ডাঃ চক্রবর্তীর evidenec-এর উপরে নির্ভর করে ব্যাপারটার একটা investigation করা হবে। রীতিমত আইন অনুযায়ী অনুসন্ধান শুরু হল।

রণধীর প্রথমটা অত্যন্ত আপত্তি তুলেছিল, কিন্তু আইনের যুক্তিতে বাধ্য হয়েই তাকে ঘটনার স্রোতে আপনাকে অসহায়ের মত ছেড়ে দিতে হল।

* * *

অমরবাবুর উপস্থিতিতেই কিরীটী কাজ শুরু করলে। প্রথমে সে প্রত্যেকের (যাঁরা যাঁরা হোটেলের নীচের তলায় ছিলেন) জবানবন্দি নিতে শুরু করলে। প্রথমেই ডাক পড়ল রণধীরের।

কিরীটী প্রশ্ন করতে শুরু করল, আপনার নাম রণধীর মল্লিক?

হ্যাঁ।

আপনি সর্বশেষ কখন আপনার কাকাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পান?

আমি বেড়িয়ে ফিরে এসে কাকাকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাই। কাকার সঙ্গে দু-চারটে কথা বলে যখন নিজের ঘরে গিয়ে হাতঘড়িটা খুলে শুয়ে পড়ি, তখন আমার মনে আছে বেশ স্পষ্টই ঘড়িতে চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিট।

সময়টা আপনার ঠিক মনে আছে?

আছে।

তারপর আর আপনি আপনার কাকার সঙ্গে দেখা করেননি?

না।

অর্থাৎ আপনি বলতে চান যে আপনার কাকা মৃত জানবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত হোটেলে

ফিরে আসা থেকে আর আপনার কাকার সঙ্গে দেখা হয়নি?

না।

বেশ, আপনি বেড়িয়ে এসে ঘরের মধ্যে গিয়ে শুয়েছিলেন কেন?

আমার শরীরটা ভাল ছিল না, মাথাটাও ধরেছিল, তাই।

আপনি যখন ঘরে শুয়েছিলেন, আপনার সঙ্গে আর কারো দেখা হয়েছিল?

হ্যাঁ, প্রায় মিনিট পনের বাদে আমার স্ত্রী এসে আমার ঘরে ঢোকে।

আপনার স্ত্রী আপনাকে কাকার সম্পর্কে কোন কথা বলেছিলেন?

না।

আপনার ঠিক মনে আছে?

হ্যাঁ।

চা খেতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গেই ছিলেন কী সেই ঘরে?

হ্যাঁ।

আপনাদের দুজনের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল জানতে পারি কী?

না, বলতে আমার অত্যন্ত আপত্তি আছে, কেননা সে-সব কথা সম্পূর্ণ আমাদের জীবনের নিজস্ব ব্যাপার।

আচ্ছা আপনি যখন ফিরে এসে কাকার সঙ্গে দেখা করেন, তখন তাঁকে কোন প্রকার অসুস্থ বা অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়েছিল?

যতদূর মনে পড়ে, না।

আপনার কাকার শরীরটা কয়েকদিন থেকে অসুস্থ ছিল?

হ্যাঁ।

আপনার কাকার সম্পত্তি কী ভাবে ভাগ হবে, জানেন কিছু?

হ্যাঁ—আমরা সব কজন ভাই সমানভাবে পাব।

আপনি আপনার কাকাকে ভালবাসতেন?

না।

কাকার ব্যবহারে আপনি দিনের পর দিন অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন নিশ্চয়ই?

তা কতকটা হচ্ছিলাম বৈকি।

আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?

না। তাছাড়া এটাকে আপনারা এভাবে ধরছেনই বা কেন? বুড়ো মানুষ, হার্টের ব্যারামে ভুগছিলেন—হঠাৎ হার্টফেল করে মৃত্যু হয়েছে, এটাই কি স্বাভাবিক নয়? ডাঃ চক্রবর্তী যে কেন ব্যাপারটাকে সন্দেহের চোখে দেখলেন, বুঝতে পারছি না। মিথ্যে একটা family-কে হয়রান করে আপনাদের লাভই বা কি? তাছাড়া যিনি আমাদের প্রতিপালক, তিনি যতই খারাপ হোন না কেন, আমরা কেউ তাঁকে খুন করতে পারি এ কথাটা ভাবাও কি বাতুলতা নয় মিঃ রায়!

আপনি এখন যেতে পারেন, রণধীরবাবু। সমীরবাবুকে পাঠিয়ে দিন।

রণধীর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কিরীটী একটা কাগজে কতকগুলো কি নোট করে নিল।

সমীর এসে ঘরে প্রবেশ করল।

অত্যন্ত রুক্ষ বিষণ্ন তার চেহারা। চোখের কোলে কালি পড়ে গেছে। চোখে একটা

ভয়চকিত চঞ্চল দৃষ্টি।

অত্যন্ত ক্লান্ত ও অবসন্ন।

আসুন সমীরবাবু, বসুন। কিরীটী আহ্বান করলে সমীরকে। সমীর সামনের চেয়ারটার উপরে বসে পড়ল।

সমীরবাবু, আপনাকে কতকগুলো কথা জিজ্ঞাসা করব, আশা করি যথাযথ জবাব দেবেন।

বলুন?

আপনি সর্বশেষ কখন আপনার কাকাকে জীবিত দেখেছিলেন?

প্রায় তখন পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিট হবে।

সঠিক সময়টা আপনি জানলেন কি করে?

আমার রিস্টওয়াচটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফিরে এসে কাকার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন কাকার হাতঘড়িটা দেখে সময় মিলিয়ে নিই।

হুঁ। আচ্ছা সেই সময় আপনার কাকাকে দেখে কোনরূপ অসুস্থ বা কোনপ্রকার অস্বাভাবিক কিছু মনে হয়েছিল?

না।

আপনার কাকার সঙ্গে আপনার কি কথাবার্তা হয়েছিল?

তখনকার আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত উত্তেজিত ও অস্থির ছিল। দীর্ঘকাল ধরে কাকার শাসনের মধ্যে থেকে আমি পাগল হয়ে উঠেছিলাম। এ ভয়ঙ্কর অবস্থা আর আমার সহ্য হচ্ছিল না। আমি কাকার সঙ্গে একটা শেষ বোঝাপড়া করবার জন্যই এসেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোন কথাই আমার বলা হয়নি, তাঁর সামনে এসেই সবটুকু সাহস আমার উবে গিয়েছিল--আমার কোন কথাই আর কাকাকে বলা হল না, ফিরে এলাম নিজের ঘরে।

আপনি যখন বেড়াতে বের হন, তখন কে আপনার সঙ্গে ছিল?

আমি যখন বের হচ্ছি, হোটেলের গোড়াতেই আমার সমীরবাবুর সঙ্গে দেখা হয়, আমরা দুজনে একসঙ্গে সমুদ্রের ধার ধরে হাঁটতে থাকি। দুজনে কথা বলতে বলতে অনেকটা পথ যাবার পর কিছুকষণ এক জায়গায় বসে গল্প করি, তারপর আমি সেখান থেকে উঠে আসি। পথে ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনি সমুদ্রের ধারে বসে গান গাইছিলেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে গল্প করবার পর আমি হোটেলে ফিসে আসি।

ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলীর সঙ্গে আপনার কতদিনের আলাপ?

সামান্য দিনের। মৃদুস্বরে সমীর জবাব দেয়।

হুঁ। আচ্ছা সমীরবাবু, ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলীকে আপনার কী রকম মনে হয়?

চমৎকার। শিক্ষিতা ও অত্যন্ত রুচিসম্পন্না।

ডাঃ গাঙ্গুলীকে আপনার খুব ভাল লাগে, না সমীরবাবু?

কিরীটীর প্রশ্নে সহসা সমীরের সমগ্র মুখখানা সিঁদুরের মত রাঙা হয়ে উঠল, সে কিরীটীর তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিপথ থেকে আপনার দৃষ্টি সরিয়ে নিল।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করলে, সেদিন বিকেলে আপনাদের মধ্যে—মানে আপনার ও ডাঃ গাঙ্গুলীর মধ্যে ঠিক কি ধরনের কথাবার্তা হয়েছিল সমীরবাবু?

মাপ করবেন মিঃ রায়, সে কথাগুলো একান্তই আমাদের দুজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আপনার কাকার সম্পর্কে কোন কথা হয়েছিল কি?

হ্যাঁ, হয়েছিল।

কী ধরনের কথা?

এমন বিশেষ কিছু নয়, এবং আমার মনেও নেই তা।

হুঁ। আচ্ছা আপনার কাকাকে আপনি খুব ভালবাসতেন, না?

মোটেই না, বরং বলতে পারেন ভয় করতাম।

আপনার কাকার ব্যবহার আপনার প্রতি কী রকম ছিল?

বলতে পারি না।

আপনি আপনার বর্তমান জীবনধারার প্রতি একান্ত বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন সমীরবাবু, কেমন না?

তা হয়েছিলাম।

আচ্ছা আপনার কাকার হত্যা সম্পর্কে, যদি ধরে নেওয়া হয় তাঁকে হত্যাই করা হয়েছে, কাউকের সন্দেহ করেন?

না।

আচ্ছা আপনার কাকার এই আকস্মিক মৃত্যু স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক বলে আপনার মনে হয়?

বলতে পারি না।

তবু?

স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। একে তিনি বৃদ্ধ হয়েছিলেন, তারপর হার্টের ব্যারামে দীর্ঘদিন ভুগছিলেন। মরবার দুদিন আগে palpitation অত্যন্ত বেড়েছিল।

আপনার কাকাকে ঔষধপত্র খাওয়াত কে?

সাধারণত বৌদিই কাকার দেখাশুনা করতেন ও ঔষধপত্র খাওয়াতেন, তবে মাঝে মাঝে আমিও করতাম।

আপনি জানতেন যে, আপনার কাকা নিত্য হার্টের অসুখের জন্য যে ঔষধটা ব্যবহার করতেন তার মধ্যে 'ডিজিটক্সিন' ছিল?

না, আমি তো ডাক্তার নই।

আচ্ছা আপনি যেতে পারেন; দয়া করে অধীরবাবুকে পাঠিয়ে দিন এ ঘরে।

নমস্কার। সমীর উঠে দাঁড়াল।

নমস্কার।

কিরীটী টেবিলের উপরে রক্ষিত খাতাটায় কী কতকগুলো নোট করছিল মাথাটা নীচু করে, ধীরে ধীরে অধীর এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

কিরীটী মুখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে—সামনে বসুন। আপনি শ্রীযুক্ত অধীর মল্লিক?

অধীর চেয়ারটার উপরে বসতে বসতে বললে, হাঁ।

অধীরবাবু, আপনাকে আমি কয়েকটি প্রশ্ন করব, আশা করি আপনি তার যথাযথ সত্যি জবাব দেবেন।

নিশ্চয় দেব। কী জানতে চান বলুন?

বেশ, আপনার কথা শুনে সুখী হলাম। আচ্ছা অধীরবাবু, আপনার কাকার এই আকস্মিক মৃত্যু, এটা স্বাভাবিক বলে আপনার মনে হয়, না অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে হয়?

অত্যন্ত স্বাভাবিক। যাঁরা এই সামান্য সাধারণ ব্যাপারের মধ্যে একটা অস্বাভাবিক কিছুর

ধারণা করছেন, তাঁদের মতের সঙ্গে আমি একমত নই।

কেন?

কেন আবার কী, বুড়ো মানুষ, দীর্ঘকাল ধরে হার্টের ব্যারামে ভুগছিলেন, মারা গেছেন হার্ট ফেল করে, এতে অস্বাভাবিক বা আশ্চর্য হবার কী আছে?

কিন্তু আপনার মতের সঙ্গে একজন বিচক্ষণ ডাক্তার মত মেলাতে পারছেন না, তাঁর ধারণা আপনার কাকার মৃত্যু স্বাভাবিক নয়!

কেন?

তার কারণ আপনার কাকার হাতে তিনি ইনজেকশনের দাগ দেখেছিলেন। তাছাড়া তাঁর মেডিকেল ব্যাগের মধ্যে এক শিশি ডিজিটক্সিন ছিল, সেটা ও একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ তাঁর ব্যাগ থেকে আপনার কাকার মৃত্যুর দিন খোয়া যায়! সিরিঞ্জটা পরদিন পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু ঔষধের শিশিটা এখনও পাওয়া যায়নি। ডিজিটক্সিন তীব্র বিষ। ডাঃ চক্রবর্তীর ধারণা, ডিজিটক্সিন overdose-এ কাকার শরীরে প্রবেশ করিয়েই তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটানো হয়েছে। সোজা কথায় বলতে পারেন, তাঁকে খুন করা হয়েছে। আমাদেরও বিশ্বাস তাঁর সে ধারণা নির্ভুল।

অধীর খানিকক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল।

হঠাৎ আবার কিরীটী প্রশ্ন করলে, আপনি সেদিন কখন বেড়িয়ে ফেরেন অধীববাবু?

প্রায় পাঁচটা দশ হবে।

হুঁ। ঠিক সময়টা আপনার মনে আছে কি করে?

আমি হোটেলে ফিরেই খাবার ঘরে গিয়ে খানসামার কাছে এক পেয়ালা চা চাই ; খাবার ঘরের ওয়াল-ক্লকের দিকে আমার নজর পড়ে, তাতে তখন পাঁচটা বেজে পনের মিনিট।

বেশ। আপনি বেড়িয়ে ফিরে এসে আপনার কাকার সঙ্গে দেখা করেছিলেন?

না।

বেড়িয়ে ফিরবার পর থেকে সন্ধ্যাবেলা চা পান করতে যাবার আগে পর্যন্ত আপনি কোথায় ছিলেন, কী করছিলেন?

আমার নিজের ঘরে শুয়েছিলাম।

বেশ। আচ্ছা অধীরবাবু, আমি কোণারকে যাবার আগের রাত্রে আপনার ঘরে, রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা হবে, কার সঙ্গে আপনি কথা বলছিলেন? কে সে?

কিরীটীর প্রশ্নে অধীর যেন সহসা অত্যন্ত চমকে উঠল, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, মেজদার সঙ্গে।

সমীরবাবুর সঙ্গে?

হ্যাঁ।

আপনার মেজদা কী বলছিলেন, মানে কী সম্পর্কে কথা হচ্ছিল আপনাদের দুজনের মধ্যে?

আমার মনে নেই।

কার সম্পর্কে কথা হচ্ছিল, তাও কি মনে নেই?

না। সঠিক আমার মনে নেই।

এবার কিরীটী তীক্ষ্ণ গম্ভীর স্বরে বললে, আপনি মিথ্যা কথা বলছেন অধীরবাবু। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে বলুন তো, আপনি সত্যি কথা বলছেন, আপনার মনে নেই?

অধীর চুপ করে বসে রইল, চোখ নীচু করেই।

শুনুন অধীরবাবু, কিরীটী রায়ের সঙ্গে বোধ হয় আপনার পরিচয় নেই, তাহলে এভাবে মিথ্যে কথা বলতে সাহস পেতেন না। আপনার সেদিকার কথা হয়ত মনে না থাকতে পারে, কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে আছে, আপনাদের সে-রাত্রে যে কথাবার্তা হয়েছিল তার কিছু কিছু আমার কানে গিয়েছিল, দুর্ভাগ্যই হোক আর সৌভাগ্যই হোক। আপনাদের মধ্যে কেউ বলছিলেন, 'না, এ আর সহ্য হয় না, ভেবে দেখ তুই, ওকে খুন করা ছাড়া আর আমাদের মুক্তির উপায় নেই। ওকে খুন করাই উচিত। ও মরুক, ও মরুক। এখন ওর পক্ষে মৃত্যুই মঙ্গল।' এবং সেই একই ব্যক্তি এ কথাও বলেছিলেন, 'আমি নিজে হাতেই ওকে এই পৃথিবী থেকে সরাব। হ্যাঁ, আমিই সরাব এবং তার উপায়ও আমি ভেবেছি।' কে এ কথাগুলি সেরাত্রে বলেছিলেন অধীরবাবু, এবং কাকেই বা এ পৃথিবী থেকে সরাবার ষড়যন্ত্র হচ্ছিল?

উত্তেজনায় ভয়ে তখন অধীরের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে, সে কোনমতে একটা ঢোক গিলে অতি মৃদু ভয়মিশ্রিত কণ্ঠে বললে, মেজদা কথাগুলো বলছিল, কিন্তু আপনি কি বিশ্বাস করেন আমরা তাঁকে খুন করেছি?

খুন করেছেন এমন কথা তো আমি বলছি না অধীরবাবু! কিন্তু কথাগুলো...

মিঃ রায়, আমরা দীর্ঘদিন ধরে কাকার শাসনে নিষ্পেষিত হয়ে, এমন মানসিক অবস্থা আমাদের হয়েছিল যে, কখন কোন উত্তেজনার মুহূর্তে যদি কিছু আলোচনা করে থাকি সেটা কি সত্যি হবে? মানুষ যখন যা মনে ভাবে তাই কি সে করে বা করতে পারে? মনে মনে কখনও খুন করবার কথা ভাবলেই কি খুন করা যায়, আপনি মনে করেন মিঃ রায়?

কিছু করা কি একেবারেই অসম্ভব অধীরবাবু?

না না, এ আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমরা আবোল-তাবোল কিছু উত্তেজনার মুখে আলোচনা করলেও, সেটাকে সত্যতায় পরিণত করবার কল্পনাও করিনি।

আপনি এখন যেতে পারেন অধীরবাবু। আপনার বৌদিকে একটিবার দয়া করে পাঠিয়ে দিন।

* * *

বিনতা দেবী এসে ঘরে প্রবেশ করল।

কিরীটী মুখ তুলে একটিবার বিনতা দেবীর দিকে তাকাল।

মুখের দিকে চাইলে মনে হয় যেন প্রবল একটা ঝড় ওর মনের উপর দিয়ে বয়ে গেছে।

মাথার চুল রুক্ষ, মুখখানা শুকিয়ে গেছে।

কিরীটী বললে, বসুন বিনতা দেবী।

বিনতা ধীরে ধীরে সামনের চেয়ারটার উপরে বসল।

বিনতা দেবী, আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই, আশা করি সঠিক জবাব পাব।

আমার সাধ্যমত আপনার প্রশ্নের জবাব দেব, মিঃ রায়।

আপনি সেদিন বিকেলে কখন ফিরে আসেন?

সাড় চারটের পর, পাঁচ-দশ মিনিট এদিক ওদিক হতে পারে।

আপনি শেষ কখন আপনার খুড়শ্বশুরকে জীবিত অবস্থায় দেখেছিলেন?

বেড়িয়ে ফিরে আসবার পর আমি কাকার সঙ্গে মিনিট পাঁচেক দাঁড়িয়ে কথা বলি, তারপর আমার স্বামীর ঘরে চলে যাই। চা খেতে যাবার আগে পর্যন্ত সেই ঘরেই আমরা দুজনে ছিলাম।

কি কথা হয়েছিল আপনার সেই সময় কাকার সঙ্গে?

বিশেষ কিছুই নয়, তাঁরই শরীর সম্পর্কে দু-একটা কথা হয়েছিল।

সেই সময় তাঁকে কোনপ্রকার অসুস্থ বা কোনরকম অস্বাভাবিক কিছু বলে মনে হয়েছিল?

না।

আপনার শ্বশুরের শুশ্রূষা ও ঔষধপত্র দেওয়ার কাজ আপনিই বরাবর করতেন শুনেছি?

হ্যাঁ, তার কারণ বি. এ. পাস করে চাকরি নেওয়ার আগে আমি কিছুদিন নার্সিং শিখেছিলাম।

তাহলে ডাক্তারী আপনি কিছু কিছু জানেন বলুন?

তা একটু-আধটু জানি বললে বিশেষ ভুল হবে না মিঃ রায়। আমার এক মামাতো ভাই ডাক্তার ছিল, সে-ই আমাকে সাধারণ ডাক্তারী ও নার্সিং সম্পর্কে ছোটোখাটো অনেক কিছু শিখিয়েছিল এবং একসময় আমারও নার্সিং শিখবার প্রবল আগ্রহ ছিল।

হ্যাঁ, ভাল কথা, যে ঔষধের শিশিটা থেকে তিনি ঔষধ খেতেন সেটা কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি!

হ্যাঁ, শিশিটা ভেঙে গিয়েছিল তাই ফেলে দেওয়া হয়েছে।

আচ্ছা আপনার খুড়শ্বশুর যে ঔষধটা প্রত্যহ খেতেন তাঁর হার্টের ব্যারামের জন্য, তার মধ্যে ডিজিটক্সিন ছিল জানতেন?

না।

ডিজিটক্সিন posion—তা জানেন?

জানি।

আপনার স্বামী ও আপনি দুজনেই গগনেন্দ্রনাথের শাসনের আওতায় হাঁফিয়ে উঠেছিলেন?

সুস্থ ব্যক্তি মাত্রেরই সে অবস্থা হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে এ বাড়ির বিষাক্ত আবহাওয়ায় থেকে থেকে আমার স্বামীর মনটা যেন আগাগোড়া শুকিয়ে গিয়েছিল। তিনিও যে একজন মানুষ এবং তাঁকে বাঁচাতে হলে যে মানুষের মত বাঁচা প্রয়োজন, সে কথা তাঁকে হাজারবার বুঝিয়েও বোঝাতে পারিনি। শেষ পর্যন্ত এই বিষাক্ত আবহাওয়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমি এ বাড়ি ও আমার স্বামীকে ছেড়ে চলে যাব, এ কথাও কয়েকদিন আগে আমার স্বামীকে বলেছিলাম, যাতে করে তাঁর ঘুমন্ত মনটা সাড়া দেয়।

আপনার কাকার মৃত্যুটা স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক বলে মনে হয়?

স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। ডাঃ চক্রবর্তীর যুক্তি মানতে আমি রাজী নই। তাছাড়া তাঁর মৃত্যুতে এরা সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছে ; এত দীর্ঘদিন অশান্তির পর আজ যদি এরা শান্তি একটু পেয়েই থাকে, সে শান্তিটা আপনি নষ্ট করতে এভাবে উদ্যত হয়েছেন কেন মিঃ রায়? এরা তো আপনার কোনও অনিষ্ট করেনি। আপনি জানেন না, কিন্তু আমি জানি, দিনের পর দিন এরা কী মানসিক যাতনাই সহ্য করেছে! মিঃ রায়, আপনাকে মিনতি জানাচ্ছি, এ প্রহসন বন্ধ করুন। এদের একটু শান্তিতে থাকতে দিন।

শুনুন বিনতা দেবী, আমি বিশেষ কোন একটা ঘটনার স্রোতে ভাসতে ভাসতে এখানে এসেছিলাম এবং এখানকার ঘটনা দেখে কেবলই আমার মনে হচ্ছে কোথায় যেন একটা যোগসূত্র আছে। তাছাড়া সত্যের পূজারী আমি, এমন কথা এখনও প্রমাণ হয়নি বা আমি বলিনি যে, আপনাদের মধ্যেই কেউ না কেউ দোষী। তাছাড়া সত্যিই যদি গগনেন্দ্রনাথ খুন

হয়েই থাকেন, তবে কি সমাজের পক্ষে, জনসাধারণের পক্ষে এটা একটা প্রকাণ্ড দোষ নয়? খুনীকে নির্বিবাদে সকলের মধ্যে বিচরণ করতে দেওয়াটা কি দোষের নয়? ব্যাপারটা আমি শুধু আপনাদের দিক থেকে বিচার করছি না, করছি ব্যাপক ভাবেই। তাছাড়া এরকম একটা সন্দেহ যখন উঠেছেই, তখন সেই সন্দেহ নিয়ে বেঁচে থাকার চাইতে সন্দেহটাকে মিটিয়ে নেওয়াটাই কি মঙ্গলজনক নয়? আচ্ছা এখন আপনি যেতে পারেন। কিশোরকে একটিবার দয়া করে এ ঘরে পাঠিয়ে দেবেন, তাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞসা করতে চাই।

বিনতা ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

কিরীটী নিশ্চিন্ত ভাবে খাতার মধ্যে কতকগুলো কি নোট করতে লাগল।

ভীতচকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে রুগ্ন এক বালক এসে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করল।

কিরীটী ওর মুখের দিকে তাকান, কী নাম তোমার খোকা? ঐ চেয়ারেই বস।

কিশোর চেয়ারের উপরে বসে পড়ল।

আমার নাম?

হ্যাঁ, কী নাম তোমার?

দাঁড়ান। হ্যাঁ, আমার নাম কিশোর।

কিশোর! বাঃ, বেশ নামটি তোমার! তোমাকে সব চাইতে কে বেশী ভালবাসে কিশোর?

ভাল আমাকে কেউ বাসে না। আমি একা একা ঘরে শুয়ে থাকি। বড্ড ভয় করে আমার। সারারাত কারা যেন আমার বিছানার চারপাশে ঘোরে। তারা কেবলই আমাকে ডাকে। ওদের কাছে তো আমি যাব না—ওরা নিশ্চয়ই কাকার মত কেবল আমাকে বকবে। এই বড় বড় ছুরি তাদের হাতে, আমাকে নিশ্চয়ই তারা খুন করবে।— তারাই, হ্যাঁ তারাই কাকাকে মেরে ফেলেছে। সেদিন আমার ঘরে তাদের একজন এসেছিল, সাদা ধবধবে পরীর মত পোশাক পরা। এমন সময় শুনলাম ডাঃ চক্রবর্তী যেন আমাকে ডাকছেন।

কবে দেখেছিলে তুমি?

কেন, যেদিন কাকা মারা যায়! সেই সাদা পরীদের একজন আমার ঘরেও আমাকে মারতে এসেছিল।

কখন?

বিকেলবেলা! আমি তখন ঘুমিয়ে আছি, আমার ঘরে এসে ঢুকেছিল। —আমি যাই। তারা এখুনি হয়ত আবার এসে পড়বে। কিশোর ত্রস্তে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

বস বস, ভয় নেই। আমরা তো আছি।

না না, আমি প্রতিমাদির কাছে যাই, সে আমাকে বড্ড ভালবাসে। বলো না কিন্তু ও-কথা কাউকে। প্রতিমাদি মানা করে দিয়েছে। না, আমি যাই। কিশোর একপ্রকার যেন দৌড়েই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

কিরীটী একটা বড় রকমের দীর্ঘশ্বাস নিল।

* * *

এরপর ডাক পড়ল সমরবাবুর।

কিরীটী সমরবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলে, আপনার নাম?

সমর রায়। আধুনিক কবি সমর রায়ের নাম শোনেননি?

দুর্ভাগ্য আমার, শুনিনি তো! তা সে যা হোক, আপনি এখানে মানে পুরীতে বেড়াতে

এসেছেন?

হ্যাঁ।

গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিন আপনি এই হোটেলেই ছিলেন?

ছিলাম।

আপনি ও সমীরবাবু সেদিন বিকেলে একসঙ্গে বেড়াতে বের হন?

তা হয়েছিলাম বোধ হয়।

বোধ হয় তো মানে?

কত লোকের সঙ্গেই তো কত সময় আমরা বেড়াতে বের হই, সব কি আর মনে থাকে, না সেটা মনে করে রাখাই আমার কাজ?

এবার জবাব দিলেন দারোগাবাবু, মশাই, আপনাকে যা জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে তার ঠিক ঠিক জবাব দিন। আপনি সমীরবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বের হয়েছিলেন কিনা?

হ্যাঁ।

কতক্ষণ সমীরবাবু আপনার সঙ্গে ছিলেন?

তা প্রায় আধ ঘণ্টাটাক হবে।

হুঁ, আপনি কখন হোটেলে ফিরে আসেন?

বারীনবাবু ও যতীনবাবুদের সঙ্গেই ফিরে আসি, তখন সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে।

গগনেন্দ্রনাথকে যখন মৃত আবিষ্কার করা হয়, তার আগে কিছু জানতে পেরেছিলেন কি?

না। খাবার সময়ও যেমন তাঁকে বারান্দায় চেয়ারের উপরে একা চুপটি করে বসে থাকতে দেখেছিলাম, ফেরার সময় তেমনিই তাঁকে দূর থেকে বসে থাকতে দেখি।

বেড়িয়ে ফিরে এসে সাড়ে ছটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?

নিজের ঘরে।

আচ্ছা আপনি যেতে পারেন। বারীনবাবুকে একটিবার পাঠিয়ে দিন।

নমস্কার। সমর ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

প্রশান্ত সৌম্য চেহারার বারীনবাবু হাসতে হাসতে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

কিরীটী সসম্ভ্রমে বারীনবাবুর দিকে তাকিয়ে বললে, বসুন। আপনবার নামই বারীন...

আজ্ঞে আমার নাম বারীন্দ্র চৌধুরী।

আপনি এখানে বেড়াতে এসেছেন?

হ্যাঁ। চাকরি থেকে বিশ্রাম নেওয়া অবধি এইভাবে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আপনি কোথায় চাকরি করতেন?

পাঞ্জাবে লুধিয়ানার এক কলেজে।

বহুকাল আপনি সেখানেই ছিলেন?

হ্যাঁ। প্রায় ত্রিশ-বত্রিশ বছরেরও বেশী হবে।

বাংলাদেশে আপনি কতদিন ফিরেছেন?

তাও প্রায় বছর পাঁচেক হয়ে গেল বৈকি!

বাংলায় এসে কোথাও আপনি স্থায়ীভাবে নিশ্চয়ই বসবাস করেননি?

না, বসবাস করবার কোথাও স্থায়ীভাবে আর ইচ্ছা নেই, একা মানুষ, ঘুরে ঘুরে বেড়াতেই ভাল লাগে।

গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যুর দিন আপনি কখন বেড়াতে বের হন?

আমি ও যতীনবাবু সোয়া চারটের সময় বেড়াতে বের হই।

আবার কখন ফিরে আসেন?

বোধ হয় সাড়ে পাঁচটার পর আমি, যতীনবাবু ও সমরবাবু ফিরে আসি।

বেড়াতে যাবার আগে আপনি হোটেলেই ছিলেন?

হ্যাঁ, আমার নিজের ঘরে। এখানে একটা কথা বললে বোধ হয় অন্যায় হবে না। বেলা তখন বোধ করি পৌনে চারটে কি চারটে হবে—ওদিককার বারান্দায় গগনবাবু যেখানে বসেছিলেন তারই কাছে একটা গোলমাল শুনি এবং দেখি একজন সাদা উর্দি পরা খানসামা ছুটে পালাচ্ছে কিশোরের ঘরের দিকে। গগনবাবু অত্যন্ত খিটখিটে প্রকৃতির লোক ছিলেন, চাকরবাকরদের প্রায়ই গালাগালি দিতেন। ওই রকমেরই কিছু হবে বলে আমার মনে হয় সেদিনকার ব্যাপারটাও।

আপনি ঠিক স্পষ্ট দেখেছিলেন সাদা উর্দি পরা ছিল লোকটার?

হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখেছিলাম।

আপনি দেখছি রঙীন কাচের চশমা ব্যবহার করেন, চোখের অসুখ আছে নাকি কিছু?

না, চোখ আমার ভালই ; তবে আলোটা তেমন সহ্য হয় না।

আচ্ছা বারীনবাবু, সেই খানসামাটাকে আপনি চিনতে পেরেছিলেন?

না, লোকটা দৌড়ে চলে গেল, তেমন চিনতে পারিনি।

ওঃ, আচ্ছা আপনি যেতে পারেন, যতীনবাবুকে একটিবার পাঠিয়ে দেবেন কি?

নিশ্চয়ই। নমস্কার। বারীনবাবু চলে গেলেন।

* * *

আসুন যতীনবাবু, ওই চেয়ারটায় বসুন। আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।

চেয়ারটার উপরে বসতে বসতে যতীনবাবু বললেন, নিশ্চয়ই, করুন। আমার দ্বারা যদি আপনাদের তদন্তের কোন সাহায্য হয় আমি সর্বদাই তার জন্য প্রস্তুত আছি।

আচ্ছা সেদিন বিকেলে আপনি বারীনবাবুর সঙ্গে বেড়াতে যাবার আগে একটা কোন গোলমাল শুনেছিলেন?

হ্যাঁ, আমি তখন আমার ঘরে বসে বই পড়ছিলাম।

কাউকে আপনি দেখেছিলেন?

হ্যাঁ, একজন খানসামাকে দৌড়ে যেতে দেখেছিলাম।

আপনি তাকে চিনতে পেরেছিলেন?

না। তবে আমরা যখন বেড়াতে বের হচ্ছি, দূর থেকে দেখেছিলাম বিনতা দেবী গগনবাবুর সঙ্গে কি কথা বলছেন।

এরপরই প্রতিমা গাঙ্গুলী এলো।

আপনার নামই ডাঃ গাঙ্গুলী? বসুন। কিরীটী বললে।

প্রতিমা চেয়ারটার উপরে বসতে বসতে বললে, হ্যাঁ।

আপনাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞসা করতে চাই প্রতিমা দেবী।

বলুন?

ঐদিন আপনি কখন বেড়াতে বের হন?

বেলা প্রায় সোয়া তিনটে হবে।

বেড়াতে গিয়ে সমুদ্রের ধারে সমীরবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল?

হ্যাঁ।

কী ধরনের কথাবার্তা আপনাদের হয়েছিল বলতে বাধা আছে কি?

তা একটু আছে। কেননা আমাদের দুজনের নিজস্ব সে-সব কথা । এ কেসের সঙ্গে কোন সম্পর্কই নেই।

আপনার সঙ্গে সমীরবাবুর কতদিনের আলাপ?

এখানে এসেই আলাপ হয়।

সমীরবাবু লোক কেমন বলে আপনার মনে হয়?

ভালই। প্রতিমার মুখখানা সহসা কেন না-জানি রাঙা হয়ে উঠল।

কিরীটী মনে মনে হাসতে হাসতে আবার প্রশ্ন করলে, ভালই মানে? আপনার তাকে ভাল লাগে, বলুন?

এ প্রশ্নের জবাব দিতে আমি বাধ্য কি, মিঃ রায়?

আচ্ছা কখন আপনি হোটেলে ফিরে আসেন?

সন্ধ্যা প্রায় ছটার সময়।

আপনি প্রথমে গগনেন্দ্রনাথের মৃতদেহ পরীক্ষা করে বলেন যে তিনি মারা গেছেন?

হ্যাঁ।

আচ্ছা আপনি যখন গগনেন্দ্রনাথের দেহ পরীক্ষা করেন, তার কতক্ষণ আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল বলে আপনার মনে হয়?

ঘন্টাখানেক আগেই বলে মনে হয়েছিল।

তাহলে আপনার ডাক্তারী মতে গগনেন্দ্রনাথকে মৃত আবিষ্কৃত হবার এক ঘণ্টা আগে তাঁর মৃত্যু হয়েছিল?

হ্যাঁ, তাই।

আপনারা, মানে আপনি, বারীনবাবু ও সমরবাবু একসঙ্গে বেড়িয়ে ফিরেছিলেন?

হ্যাঁ।

আচ্ছা আপনি যেতে পারেন।

* * *

পরের দিন যতীনবাবু কিরীটীর ঘরে এসে বললেন, মিঃ রায়, আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ কথা ছিল।

বলুন?

যতীনবাবু পকেট থেকে একটা সিরিঞ্জ বের করে কিরীটীর হাতে দিতে দিতে বললেন, এই সিরিঞ্জটা আমি গগনবাবু যেদিন মারা যান, সেদিন একজনকে ঘরের পিছনদিককার জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলতে দেখি। আগের দিন রাত্রে কয়েকটা বাজে কাগজের সঙ্গে আমার একটা জরুরী চিঠি বাড়ির পিছনদিকে ভুলে ফেলে দিয়েছিলাম, পরদিন সকালবেলা যখন সেটা খুঁজতে যাই, হঠাৎ সামনের দিকে আমার একটা জানালা খোলার শব্দে নজর পড়ায় দেখতে পাই, অধীরবাবু তাঁর ঘরের পিছনদিককার জানালা থেকে এটা ফেলে দিলেন। তিনি আমাকে দেখতে পাননি কিন্তু আমি তাঁকে স্পষ্ট দেখেছিলাম, পরে কৌতূহল হতে গিয়ে দেখি একটা সিরিঞ্জ। কাল রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবলাম এটা হয়ত আপনার কাজে লাগতে

পারে, তাই এটা আপনাকে দিতে এসেছি।

আপনাকে বিশেষ ধন্যবাদ যতীনবাবু, একটা সন্দেহ আমার মিটল।

।। চার ।।

আলোকের সন্ধানে

কিরীটীর বসবার ঘর।

রাত্রি তখন প্রায় পৌনে নটা হবে।

খাওয়াদাওয়া সকলের হয়ে গেছে, কিরীটী একটা খোলাখুলি আলোচনা করবার জন্য সকলকেই তার ঘরে আহ্বান করেছে। রণধীর, বিনতা দেবী, সমীর, অধীর, কিশোর, ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী, ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী, বারীন চৌধুরী, যতীনবাবু, সমর রায় ও স্থানীয় থানা-ইনচার্জ অমরেন্দ্রবাবু।

* * *

কিরীটী বলছিল, ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, আজ রাত্রে আপনাদের এখানে কেন আমি ডেকে পাঠিয়েছি জানেন? একটা খোলাখুলি আলোচনা করবার জন্য। একটা কথা সর্বাগ্রে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া উচিত, ডাঃ অমিয় চক্রবর্তীর মতের সঙ্গে আমিও একমত। অর্থাৎ গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যু স্বাভাবিক নয়। তাঁকে খুন করা হয়েছে। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এবং আমি তা প্রমাণ করব। কিন্তু করবার আগে আমি সকাতরে অনুনয় জানাচ্ছি, যদি আপনাদের মধ্যে কেউ কোন কথা গোপন করে থাকেন তবে আমাকে এখনও বলুন।

কিন্তু সকলেই স্তম্ভিত হয়ে বসে রইল, কারও মুখে কোন কথা নেই।

বেশ তবে শুনুন, গম্ভীর স্বরে কিরীটী বলতে শুরু করল, প্রথম থেকে চিন্তা করে দেখতে গেলে, ডাঃ চক্রবর্তীর মতামতটা অবহেলা করলে চলবে না। তিনি তাঁর মতটা চিন্তা করেই দিয়েছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন এই হত্যাকাণ্ড দলবদ্ধভাবে হয়েছে, না কোন একজনের দ্বারাই হয়েছে! কথা হচ্ছে মানসিক উত্তেজনার ফলে কেউ কাউকে খুন করতে পারে কিনা? ডাঃ চক্রবর্তী, আপনি একজন সাইকিয়াট্রিস্ট, আপনার এ বিষয়ে মতামত কি?

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, হ্যাঁ, তা হতে পারে, অত্যন্ত মানসিক চিন্তা বা উত্তেজনার ফলে খুন করা কিছুই অসম্ভব নয়।

কিরীটী জবাব দিল, সেরকম মানসিক উত্তেজনা এঁদের সকলেরই ছিল। বহুদিন ধরে এঁরা প্রত্যেকে এঁদের জীবনের সঙ্গে অন্যের জীবনের তুলনামূলক পার্থক্যটা সব সময় রূঢ় ভাবেই দেখতেন। রণধীরবাবুর মনের অবস্থা যা ছিল, সমীরবাবুরও তাই। একটা মানসিক বিদ্রোহ তিল তিল করে বহুদিন ধরে নিরন্তর একটা মানসিক উত্তেজনার ফলে গড়ে উঠেছে। অধীরবাবুর মানসিক অবস্থাটাকে apathy বলা চলে, কিন্তু কিশোরের অবস্থা আপনার কি বলে মনে হয় ডাঃ চক্রবর্তী?

মানসিক অবস্থা তার ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ডাঃ চক্রবর্তী বলতে লাগলেন, সে ইতিমধ্যে Schizophreniaর symptoms দেখতে শুরু করেছিল। তার জীবনের প্রতি রূঢ়তা ও নির্বিমুখতা তাকে নিরন্তর পীড়িত করছিল। এক কথায় যাকে suppression বলা চলে,

তা থেকে সে ক্রমে একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার দিকে এগিয়ে চলেছিল। তার মন সব অদ্ভুত deluison বা স্বপ্নের মধ্যে বিচরণ করছিল। সে নিজেকে কখনো কখনো শত্রু ও ভয়ঙ্কর সব লোকেদের দ্বারা পরিবেষ্টিত দেখত। এটা বিশেষ চিন্তার কথা। কেননা এই ধরণের মনের অবস্থা থেকেই অনেক সময় খুন করবার একটা প্রবৃত্তি জেগে ওঠে। এখানে suferer খুন করে খুন করবার জন্য নয়। নিজেকে অত্যাচার থেকে বাঁচাবার জন্য। ওদের মানসিক বিকারের দিক থেকে বিচার করে দেখতে গেলে এটা খুবই rational—স্বাভাবিক।

হঠাৎ কিরীটী প্রশ্ন করলে, তবে কি তোমার মনে হয় ডাক্তার, কিশোরই তার কাকাকে খুন করেছে?

সকলেই উদগ্রীব হয়ে উঠল, প্রত্যেক ভাইয়ের মুখেই যেন একটা ভীতি-চিহ্ন স্পষ্ট ফুটে উঠেছে।

কিন্তু আর একটা কথাও এই সঙ্গে ভাবতে হবে কিরীটী, যেভাবে সাজিয়ে খুন করা হয়েছে, ততখানি জ্ঞান বা মনের গঠনশক্তি কিশোরের ছিল কিনা সন্দেহ। অবশ্য এ ধরনের মানসিক বিকারগ্রস্তেরা খুব সহজ ও সাধারণ ভাবেই খুন করে। ভেবেচিন্তে চাতুর্যের সঙ্গে করে না, যেটা এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে। সে যদি খুন করত, তবে একটা spectacular ভাবেই খুন করত—যা এক্ষেত্রে হয়নি।

কিরীটী আবার প্রশ্ন করল, আচ্ছা খুন হবার পর, তোমার কি মনে হয় ডাক্তার, বাকি সবাই জানতে পেরেছিল?

ডাক্তার বললেন, হ্যাঁ। আমার মনে হয় এঁরা জানতেন এবং সেটাই আমার মনে সর্বপ্রথম সন্দেহের উদ্রেক করে। এমন ধরনের একদল ভীতু লোক ইতিপূর্বে আমি দেখিনি। এঁদের দেখলেই মনে হয়, যেন এঁরা প্রত্যেকেই ইচ্ছা করে কিছু গোপন করে রেখেছেন!

তাই যদি হয়, কিরীটী জবাব দিল, তবে এঁদের মুখ দিয়েই বলিয়ে নেব আসল ব্যাপারটি কি?

ডাঃ চক্রবর্তী বললেন, অসম্ভব। তা তুমি পারবে না।

না, অসম্ভব নয়। তুমি হয়ত জান না, সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে দিয়েই এঁদের মুখ দিয়ে আমি অনেক সত্য কথা ইতিপূর্বে বের করি নিয়েছি এবং বাকি সত্যটুকুও আজকের আলোচনার মধ্য দিয়ে বলিয়ে নেব। মোটামুটি ভাবে সাধারণত মানুষ সত্য কথাই বলতে চায় বা বলেও থাকে।

তার কারণ মিথ্যা কথা বলবার চাইতে সত্য কথাটা বলা অনেক সহজ। কেননা সত্য কথা বলতে ভাবতে হয় না বা চিন্তা করতে হয় না, আপনা থেকে যেন আপনিই বের হয়ে আসে। তুমি একটা মিথ্যা কথা বলতে পার, দুটো বা তিনটি বলতে পার, কিন্তু কেবলই অনবরত একটার পর একটা শুধু মিথ্যা কথাই বলে যেতে পার না। সেটা অসম্ভব।

সত্য একসময় তোমার অজান্তেই মুখ দিয়ে বের হয়ে আসবেই এবং তখুনি সব পরিষ্কার হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে এঁদের প্রশ্ন করে ও খোঁজ নিয়ে যতটুকু জেনেছি, তার থেকে মোটামুটি ভাবে কতকগুলো point খাড়া করেছি। যেমন :

১। গগনেন্দ্রনাথ তাঁর হার্টের ব্যারামের জন্য প্রত্যহ নিয়মিত ভাবে এমন একটা ঔষধ খাচ্ছিলেন, যার মধ্যে একটা ingredient হচ্ছে 'ডিজিট্যালিন্'।

২। ডাঃ চক্রবর্তীর একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ তাঁর মেডিকেল ব্যাগ থেকে খোয়া যায় সেদিন।

৩। গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ফ্যামিলির কাউকে বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে দিতে একেবারেই পছন্দ করতেন না ও কোথাও বের হতে দিতেন না।

৪। কিন্তু ঐদিন বিকালে সকলকেই বাইরে যাবার অনুমতি দিয়েছিলেন এবং হোটেলে তিনি একা ছিলেন।

৫। সমীরবাবু তাঁর জবানবন্দিতে প্রথমে বলেছিলেন তিনি বেড়িয়ে যখন ফিরে আসেন তখন ঠিক সময় কত তা তিনি জানতেন না, কেননা তাঁর ঘড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। পরে বলেন, তিনি তাঁর কাকার হাতের রিস্টওয়াচ দেখে সময় ঠিক করে নেন।

৬। ডাঃ চক্রবর্তী ও কিশোর পাশাপাশি ঘরে থাকতেন।

৭। সাড়ে ছটার সময় চা খাবার জন্য যখন সকলে প্রস্তুত তখন সবাই খাবার ঘরে বসে, তবু একজন ভৃত্যকে গগনেন্দ্রনাথকে চা খেতে আসবার জন্য ডাকতে পাঠানো হয়েছিল।

৮। গগনেন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, আমি কখনও কিছু ভুলি না, মনে রেখো এ কথা। আমি আজ পর্যন্ত আমার এই সুদীর্ঘ ষাট বছরের জীবনের কোন কথাই ভুলিনি, সব আমার মনে আছে। সব মুখই আমার মনে আছে।

যদিচ আমি প্রশ্নগুলো, কিরীটী বলতে লাগল, আলাদা আলাদা ভাবে টুকেছি, তথাপি একসঙ্গে সব কটি point বিচার করা যায়। যেমন প্রথম দুটো পয়েন্ট, গগনেন্দ্রনাথ তাঁর হৃদরোগের জন্য নিয়মিত ভাবে একটা ঔষধ পান করতেন, যার মধ্যে একটা ingredient ছিল 'ডিজিট্যালিন'। ডাঃ চক্রবর্তীর একটু হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ খোয়া যায়। ঐ দুটো পয়েন্টই এই কেসে আমার মনকে সর্বপ্রথম সন্দেহান্বিত করে তোলে। আমার আর এখন বলতে বাধা কিছুই নেই যে, এই দুটি প্রশ্ন আমার বিচারে অত্যন্ত আশ্চর্যজনক এবং অমিল বলে মনে হয়। বুঝতে পারছেন না আপনারা বোধ হয় আমি কি বলতে চাচ্ছি। শীঘ্রই সব আমি বুঝিয়ে দেব। শুধু এইটুকুই সকলে মনে রাখুন, উপরিউক্ত এই দুটি point আমার কাছে মনে হয়, যার মীমাংসা সর্বপ্রথম হওয়া প্রয়োজন এই কেসে। সকলেরই জবানবন্দি আমি নিয়েছি, এখন সেই জবানবন্দি থেকে যেটুকু তথ্য আপনাদের সকলের মুখ থেকে আমি সংগ্রহ করতে পেরেছি সেই সম্পর্কেই আলোচনা করা আমাদের এই মিলনের মুখ্য উদ্দেশ্য।

কিরীটী একটুখানি থেমে একটা সিগারেট ধরিয়ে আবার বলতে শুরু করলে, গোড়া থেকেই শুরু করছি। সর্বপ্রথম সমীরবাবুর কথাই বিচার করে দেখা যাক। তাঁর পক্ষে তাঁর কাকার জীবন নেওয়া সম্ভব ছিল কিনা? তিনি একদিন গভীর রাত্রে তাঁর ভাই অধীরবাবুর সঙ্গে তাঁদের কাকার জীবন নেওয়ার সংকল্প করছিলেন আমি তা নিজের কানে শুনেছিলাম। আমি জানি সেসময় সমীরবাবু একটি ভয়ানক মানসিক উত্তেজনার মধ্যে ছিলেন। ঐ ব্যাপারের সময় তাঁর মনে আরও একটা অন্য উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলীর সস্নেহ আকর্ষণেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, প্রতিমা দেবীর দিকে তাঁর মন তখন ঝুঁকেছে। তাঁর তখনকার মানসিক অবস্থায় তাঁর পক্ষে যে-কোন কাজ করা আশ্চর্য নয়। তিনি তাঁর বর্তমান জীবনের প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে উঠেছিলেন। এবং সেই অবস্থায় তাঁর কাকার সম্মোহন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শেষ উপায় বেছে নেওয়াটাও খুবই স্বাভাবিক। অথবা যে কল্পনাটা তাঁর একদা মানসিক উত্তেজনার মধ্যে উদ্ভাবিত হয়েছিল, সেটাকেও কার্যে পরিণত করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। ভাল কথা, কথাপ্রসঙ্গে আপনাদের ঐদিনকার ঐ সময়ের গতিবিধির একটা তালিকা তৈরী করেছি, সে সম্পর্কেও একটু আলোচনা

করে নেওয়া যাক।

১। সমীরবাবুরা সকলে ও সমরবাবু তিনটে পাঁচ মিনিটের সময় হোটেল থেকে বেড়াতে বের হন।

২। তিনটে পনের মিনিটের সময় ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী ও ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী বেড়াতে বের হন।

৩। চারটে পনের মিনিটের সময় বারীনবাবু ও যতীনবাবু বেড়াতে যান।

৪। চারটে কুড়ি মিনিটের সময় ডাঃ চক্রবর্তী জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলে ফিরে আসেন।

৫। চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় রণধীরবাবু বেড়িয়ে হোটেলে ফিরে আসেন।

৬। চারটে চল্লিশ মিনিটের সময় তাঁর স্ত্রী বিনতা দেবী ফিরে আসেন ও ফিরে তাঁর খুড়শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করেন।

৭। চারটে পঞ্চাশ মিনিটের সময় বিনতা দেবী তাঁর স্বামীর ঘরে যান।

৮। পাঁচটা দশ মিনিটের সময় অধীরবাবু বেড়িয়ে ফিরে আসেন।

৯। পাঁচটা চল্লিশ মিনিটের সময় বারীনবাবু, যতীনবাবু ও সমরবাবু ফিরে আসেন।

১০। পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় সমীরবাবু ফিরে আসেন।

১১। ছটার সময় ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী ফিরে আসেন।

১২। ছটা তিরিশ মিনিটের সময় ভৃত্য গগনেন্দ্রনাথকে চা খেতে ডাকবার জন্য গিয়ে দেখে তিনি মৃত।

* * *

কিরীটী বলতে লাগল, উপরিউক্ত সময়ের তালিকা বিচার করলে দেখা যাচ্ছে তিনটে পাঁচ মিনিটের সময় সমীরবাবু অন্য ভাইদের সঙ্গে হোটেল থেকে বেড়াতে বের হন। গগনবাবু তখন বেঁচে ছিলেন। বেড়াতে গিয়ে সমীরবাবু ও প্রতিমা গাঙ্গুলীর সঙ্গে কথাবার্তা হয়। প্রতিমা দেবীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ একসময় তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলের দিকে ফিরে আসেন। তাঁর কথামত পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় হোটেলে এসে ঢোকেন। তিনি হোটেলে এসে তাঁর কাকার সঙ্গে দেখা করেন ও কথাবার্তা বলেন ; তারপর নিজের ঘরে চলে যান ও ছটার সময় সকলের সঙ্গে চা খেতে খাবার ঘরে আসেন। তিনি তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন, পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটের সময়ও নাকি তাঁর কাকা বেঁচে ছিলেন। কিন্তু পরের একটা ব্যাপারে বোঝা যাচ্ছে স্পষ্টই যে তাঁর কথা ঠিক নয় বা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সাড়ে ছটার সময় গগনবাবুকে চা পান করতে ডাকতে গিয়ে ভৃত্য তাঁকে মৃত অবস্থায় পায়। ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী নিজে একজন ডাক্তার। তিনি বলেছেন তাঁর ডাক্তারী বিদ্যানুযায়ী গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যু, যখন তাঁকে মৃত বলে আবিষ্কার করা হয়, তারও একঘণ্টা আগে ঘটেছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে ডাঃ গাঙ্গুলী ও সমীরবাবুর কথা যদি সত্যি বলে মেনে নিই, তবে একজনের statement অন্যজনের statement-এর সঙ্গে আদপেই মিলছে না। Conflicting statements ! যদি মেনে নিই যে ডাঃ গাঙ্গুলী ঠিক বুঝতে পারেননি....

সহসা এমন সময় কিরীটীকে বাধা দিয়ে প্রতিমা বলে উঠল, না মিঃ রায়, আমি আপনাকে আগেও বলেছি এখনও বলছি ভুল আমার হয়নি। তাছাড়া অত সহজে আমি ভুল করি না।

কিরীটী বললে, বেশ, তাই যদি মেনে নিই, তবে এই ধরনের conflicting statement থেকে দুটো conclusion আমরা করতে পারি। হয় ডাক্তার গাঙ্গুলী অথবা সমীরবাবু দুজনের

একজন ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলছেন!

প্রতিমা কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিরীটী তাকে বাধা দিয়ে বলতে লাগল, কিন্তু ধরে নিই যদি সমীরবাবুই এক্ষেত্রে মিথ্যা কথা বলছেন, দেখা যাক কেন তিনি মিথ্যা কথা বলছেন। তাঁর এ ধরনের মিথ্যা বলবার গোপন উদ্দেশ্য আছে কিনা? ধরে নেওয়া গেল ডাঃ গাঙ্গুলীর কথাই সত্য, তাঁর ভুল হয়নি বা তিনি ইচ্ছা করে মিথ্যা কথা বলছেন না, সমীরবাবু হোটেলে ফিরে এসে কাকার সঙ্গে যখন দেখা করেন, তার আগেই তাঁর কাকা মারা গেছেন, অর্থাৎ তিনি গিয়ে তাঁর কাকাকে মৃত অবস্থায় দেখতে পান এবং ধরে নিই, যদি সত্যি তাই হয়েই থাকে, তবে সেই অবস্থায় তাঁর পক্ষে তখন কি করা সম্ভব?

হয় তিনি ঘাবড়ে গিয়ে সাহায্যের জন্য সকলকে ডাকাডাকি শুরু করতে পারেন, অথবা ধীরভাবে তখুনি গিয়ে সকলকে ব্যাপারটা জানান কি হয়েছে। অথবা এমনও হতে পারে ঘটনার আকস্মিকতায় তিনি প্রথমে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে যান। তারপর কোন কিছু ভেবে কাউকে ও বিষয়ে কোন কথা না বলাই শ্রেয় বিবেচনা করে নিঃশব্দে সে স্থান ত্যাগ করে সরে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করেন। কী বলেন আপনি সমীরবাবু, তাই নয় কি?

সমীরবাবু বাধা দিয়ে বললেন, ব্যাপারটা তাহলে একেবারে হাস্যকর বা ছেলেমানুষির মত দাঁড়ায় না কি?

তাহলে বলতে হয়, কিরীটী বললে, ডাঃ গাঙ্গুলীই হঠাৎ ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে গিয়ে গগনেন্দ্রনাথের মৃত্যুসময় সম্বন্ধে ভুল করেছেন! কিন্তু তার আগে আমরা ভাবব, এ ধরনের ব্যবহার করা আপনার পক্ষে তখন সম্ভব ছিল কিনা। কেননা তাতে এও প্রমাণ হয় যে, আপনি নির্দোষ। কেননা আপনি যখন আপনার কাকার সঙ্গে দেখা করতে যান, তিনি তখন মৃত। বেশ এখন ধরা যাক, তাই যদি ঘটে থাকে এবং সত্যিই সমীরবাবু নির্দোষ হন, তবে তাঁর ঐদিনের ঐ অদ্ভুত ব্যবহারের একটা মীমাংসায় আমরা আসতে পারি কিনা? এর মীমাংসা সহজেই হয়, যদি তাঁকে নির্দোষ ধরে নেওয়া হয়। সেই সঙ্গে তাঁর সেই রাত্রের কথাগুলো, যা তিনি তাঁর ভাইকে বলেছিলেন তাঁর কাকার সম্পর্কে সেটাও মনে রাখতে হবে আমাদের। তিনি হোটেলে ফিরে এসে কাকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে যখন দেখলেন তাঁর কাকা মৃত, তাঁর দোষী মন ও দোষী স্মৃতিতে সহজেই একটা সম্ভাবনা জেগে ওঠা স্বাভাবিক যে তাঁদের সেই রাত্রের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দাঁড়িয়েছে—কিন্তু তাঁর দ্বারা হয়নি। অর্থাৎ তিনি যখন সে পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করেননি তখন নিশ্চয়ই তাঁর সঙ্গী করেছে। ফলে প্রথমেই হয়ত তাঁর ছোটভাই অধীরের কথা মনে পড়ল। কেননা তাঁরা দুজনেই এ কল্পনা করেছিলেন।

সহসা এমন সময় সমীর উত্তেজিত ভাবে বলে উঠল, না না, কখনও না। একেবারে মিথ্যা কথা।

কিন্তু সমীরবাবুর প্রতিবন্ধকে কোনরূপ কান না দিয়েই কিরীটী বলে যেতে লাগল, বেশ তাই যদি হয়, তাহলে এখন দেখা যাক, অধীরবাবুর দ্বারা তাঁর কাকাকে খুন করা সম্ভব কিনা? অধীরবাবুর বিরুদ্ধে প্রমাণ কি? তাঁরও মানসিক অবস্থা তাঁর মেজদা সমীরবাবুর মতই ছিল এবং দু ভাই কতকটা একই মনোবৃত্তির। কেননা তাঁর সঙ্গেই সেরাত্রে সমীরবাবু তাঁদের কাকাকে খুন করার পরিকল্পনা করেছিলেন।

অধীরবাবু পাঁচটা দশ মিনিটের সময় হোটেলে ফিরে আসেন। তিনিও বলেছেন তিনি ফিরে এসেই সোজা প্রথমে তাঁর কাকার সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তিনিও নাকি তাঁর

কাকার সঙ্গে কথাও বলেছিলেন। অথচ সেই সময় কেউই তাঁকে তাঁর কাকার সঙ্গে কথা বলতে দেখেননি। অর্থাৎ কেউ তাঁর উক্তির সাক্ষী নেই। এক্ষেত্রে অধীরবাবুর চমৎকার একটা alibi আছে। কেউ তখন সেখানে ছিল না। বারীনবাবু, যতীনবাবু ও সমরবাবু বাইরে চলে গেছেন। ওঁদের সকলের movement -এর সময়তালিকা থেকেই তা প্রমাণিত হয়। তাই যদি হয় এবং তাঁর ঐ alibi প্রমাণিত না হয়, তবে অধীরবাবুর পক্ষে এক্ষেত্রে তাঁর কাকাকে খুন করা এতটুকুও অসম্ভব বা আশ্চর্যজনক নয়।

অধীর কিরীটীর দিকে সহসা চোখ তুলে চাইল। কী একটা করুণ মিনতি, কী দারুণ অবসন্নতায় ভরা তার দু-চোখের দৃষ্টি!

কিরীটী আবার বলতে লাগল, আরও একটা কথা, যেদিন গগনেন্দ্রবাবু খুন হন, তার পরদিন সকালে অধীরবাবুকে কেউ তাঁর জানালা দিয়ে কোন একটা বস্তু বাড়ির পিছনের দিকে ফেলে দিতে দেখেছিলেন এবং সেটা হচ্ছে একটা হাইপোডারমিক সিরিঞ্জ।

সহসা এমন সময় ডাঃ চক্রবর্তী বলে উঠল, কিন্তু আমিও পরদিন সকালে আমার হারিয়ে যাওয়া সিরিঞ্জটা আমার ঔষধের ব্যাগের উপরেই পাই।

কিরীটী বললে, হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি আপনার সিরিঞ্জটা পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু এটা আর একটা সিরিঞ্জ। এ বিষয়ে আপনার মতামত কি অধীরবাবু?

অধীর জবাব দিলে, সেটা আমার নিজস্ব সিরিঞ্জ ছিল।

তাহলে আপনি স্বীকার করছেন যে, আপনিই সেদিন সকালে সে সিরিঞ্জটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলেন?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। কেন স্বীকার করব না?

সহসা এমন সময় বিনতা অধীরকে বাধা দিয়ে প্রবলভাবে বলে উঠল, অধীর, অধীর, এ তুমি কি বলছো ভাই! কিছুই তো আমি বুঝতে পারছি না!

বিস্মিত ও রাগান্বিত ভাবে অধীর তার বৌদির দিকে ফিরে তাকাল, এতে আশ্চর্য হবার বা না বুঝবার মত তো কিছুই নেই বৌদি। পুরাতন একটা সিরিঞ্জ আমার এক ডাক্তার বন্ধু আমাকে একসময় দিয়েছিল। সেটা সেদিন সকালে ফেলে দিয়েছি ; কিন্তু আমি কাকাকে খুনও করিনি বা বিষও দিইনি।

এমন সময় প্রতিমা বলে উঠল, আমিই সিরিঞ্জটা কয়েক দিন আগে অধীরবাবুকে দিয়েছিলাম।

আশ্চর্য! সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সিরিঞ্জের ব্যাপারটা। তবু মনে হচ্ছে, কিরীটী বলতে লাগল, এর একটা মীমাংসাও যেন খুঁজে পাচ্ছি। দুটো সিরিঞ্জও পাওয়া যাচ্ছে। এবং তা থেকে দুটো ব্যাপার আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠছে। প্রথমটায় অধীরবাবুকে দোষী প্রমাণ করতে পারলে, হয়ত সমীরবাবুর নির্দোষিতা প্রমাণ হয়ে যায়, কিন্তু সব দিক ভাল করে দেখেশুনে আমাদের সুবিচারই করতে হবে। দেখা যাক, অধীরবাবু যদি নির্দোষ হন, তবে কিভাবে ব্যাপারটা ঘটতে পারে। তিনি হোটেলে ফিরে এলেন। তিনি তাঁর কাকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন তিনি মৃত (?), তাঁর তখন মনে হতে পারে যে হয়ত তাঁর মেজদাই কাকাকে খুন করেছেন। কেননা তাঁরা দুজন মাত্র কয়েকদিন আগে এক রাত্রে তাঁদের কাকাকে এ পৃথিবী থেকে সরাবার কল্পনা করেছিলেন। ফলে ঐ কথাটা সহসা মনে উদয় হওয়ায় হয়ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলেন। কী করবেন, কী ঐ সময় করা উচিত—এই সব নানা সাত-পাঁচ ভেবে হয়ত শেষে তিনি ঐ সময় কোন কিছু না প্রকাশ করাই সব দিক

থেকে বুদ্ধিমানের কাজ বিবেচনা করে সরে পড়েন এবং এর কিছুক্ষণ বাদে সমীরবাবু ফিরে এসে কাকার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে যখন জানতে পারলেন যে তাঁর কাকা মৃত তখন তিনিও ঐ এক কারণেই কিছু প্রকাশ না করে চুপ করে সরে পড়লেন। এদিকে হয়ত অধীরবাবু ঘরে ঢুকেই তাঁর ঘরে সিরিঞ্জটা দেখতে পান এবং সাত-পাঁচ ভেবে সেটা সঙ্গে সঙ্গে লুকিয়ে ফেলেন। পরের দিন সকালে সেটা বাড়ির পিছনদিকে ফেলে দেন। কেননা হয়ত তাঁর সন্দেহ হয়েছিল, তাঁর মেজদাই এ সিরিঞ্জ দিয়ে কাকাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছেন।

এ ছাড়াও আর একটা দিক দিয়ে মনে হয় অধীরবাবু নির্দোষ! তিনি আমাকে তার একটু আগে দৃঢ়ভাবে বলেছিলেন যে তিনি দোষী নন। কিন্তু এমন কথা বলেননি যে 'তাঁরা' দোষী নন, কেননা তাঁর মনে মেজদার প্রতি দৃঢ় সন্দেহ ছিল। কিন্তু আমার কানে ঐ 'তিনি' ও 'তাঁরা'র পার্থক্যটা এড়ায়নি। এর থেকেই হয়ত অধীরবাবুর নির্দোষিতা প্রমাণ হতে পারে।

ঘরের প্রত্যেকটি প্রাণীই যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত কিরীটীর কথা শুনছে। কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই।

কিরীটী একটুখানি থেমে একটা নতুন সিগারেট ধরিয়ে মৃদু একটা টান দিল ও একগাল ধোঁয়া ছেড়ে আবার বলতে শুরু করল, আচ্ছা, এবারে সমীরবাবু নির্দোষ কিনা এইভাবে বিচার করে দেখা যাক। ধরা যাক, অধীরবাবুর কথাই সত্যি। গগনেন্দ্রনাথ পাঁচটা ত্রিশ মিনিটের সময় বেঁচেই ছিলেন। তাই যদি হয়, তবে কি ভাবে সমীরবাবু দোষী হতে পারেন? আমরা ধরে নিতে পারি, পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিটের সময় যখন তিনি বেড়িয়ে হোটেলে ফিরে আসেন, যখন তাঁর কাকার সঙ্গে গিয়ে কথা বলেন, সেই সময় তাঁকে তিনি খুন করেন। সে-সময় আশেপাশে লোক ছিল বটে, কিন্তু শীতের সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। সেই স্বল্পালোকে অন্যের অজান্তে তাঁর পক্ষে তাঁর কাকাকে খুন করাটা এমন কিছু কষ্টসাধ্য বা আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। কিন্তু তাহলে ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলীর কথা মিথ্যে হয়ে যায় যে, তাঁর মতে গগনেন্দ্রনাথের দেহ পরীক্ষা করবার অন্তত এক ঘণ্টা আগে মৃত্যু হয়েছে।

প্রতিমা দেবী বাধা দিয়ে বলে উঠল, আমার ধারণা নির্ভুল।

কিরীটী বলতে লাগল, আরও একটা সম্ভাবনা এক্ষেত্রে আছে। ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী সমীরবাবুর ফিরবার কিছু পরেই হোটেলে ফিরে আসেন। যদি সমীরবাবুর কথামত সে-সময় তাঁর কাকা বেঁচেই থেকে থাকেন, তাহলে আমাদের ধরতে হবে ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলীই নিশ্চয়ই গগনবাবুকে খুন করেছেন। তিনি জানতেন গগনবাবু অসুস্থ। মানসিক বিকৃতি তাঁর ঘটেছে। সমাজেরও বিশেষ করে এঁদের family-র পক্ষে তিনি মূর্তিমান অমঙ্গল ও অশান্তি। এবং সেই সঙ্গে এই অত্যাচারিতদের দেখে এঁদের জন্যে তাঁর মনে একটা অনুকম্পাও জেগেছিল। হয়ত সেই কারণেই এঁদের বাঁচাতে নিজ হাতে গগনেন্দ্রনাথকে খুন করেছেন।

সহসা ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী বাধা দিয়ে বলে উঠল, না, আমি খুন করিনি।

কিন্তু মনে পড়ে কি প্রতিমা দেবী, আপনি একদিন ডাঃ চক্রবর্তীকে বলেছিলেন, 'ঐ শয়তান বুড়োকে খুন করা উচিত। ঐ শয়তানকে খুন করতে পারলে এখন হয়ত ওদের বাঁচবার আশা আছে.....দশজনের মঙ্গলের কাছে একজনের মৃত্যু সে তো বড় বেশী কথা নয়...'

প্রতিমা বললে, হ্যাঁ, এ কথা একদিন কথায় কথায় ডাঃ চক্রবর্তীকে বলেছিলাম বটে, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা করে বলতে পারি, সেই শয়তান দুর্দান্ত অত্যাচারী বিকৃতমস্তিষ্ক লোকটাকে যতই আমি ঘৃণা করি না কেন, তাকে সত্যি সত্যি খুন করব এমন কথা স্বপ্নেও আমি কোনদিন

ভাবিনি। না, তাকে খুন করা দূরে থাক, তাকে মরবার পর ছাড়া স্পর্শ পর্যন্ত করিনি।

কিরীটী গম্ভীরভাবে বললে, তাহলে বাধ্য হয়েই আমাকে বলতে হয় ডাক্তার যে, আপনি না হয় সমীরবাবু আপনাদের মধ্যে একজন নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছেন!

এবারে সমীর সহসা চিৎকার করে বলে উঠল, আপনারই জিত হল মিঃ রায়। সত্যিই আমি মিথ্যা কথা বলেছি। আমি যখন বেড়িয়ে ফিরে কাকার সঙ্গে দেখা করতে যাই তখন তিনি মৃত। আমি অত্যন্ত ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই ঘটনার আকস্মিকতায়। কী করব প্রথমটা বুঝে উঠতে পারি না, সব গোলমাল হয়ে যায়। আমি তাঁকে বলতে যাচ্ছিলাম, তাঁর নাগপাশের অধীনে আর আমি থাকব না। আমি চলে যাব। আজ থেকে আর আমি এ বাড়িতে থাকব না। আমি মুক্ত, আমি স্বাধীন। রাস্তায় রাস্তায় আমি ভিক্ষা করে খাব তবু তোমার মত শয়তানের কৃপাপ্রার্থী হয়ে এ কয়েদখানায় আর আমি বাঁচতে চাই না। কিন্তু গিয়ে দেখলাম তখন তিনি মৃত, তাঁর শরীর বরফের মত ঠাণ্ডা প্রাণহীন। আমার মনে ঠিক সেই কথাটাই জেগেছিল, যা একটু আগে আপনি অধীর সম্পর্কে বলেছিলেন, যে অধীর হয়ত শেষে কাকাকে খুন করেছে এবং আমি কাকার ডান হাতের উপরে একবিন্দু রক্ত দেখেছিলাম, তাতে মনে হয়েছিল যে তাঁকে কোন কিছু ইনজেকশন করা হয়েছে।

কিরীটী সহসা বলে উঠল, এই একটা পয়েন্ট যাতে আমি স্থিরনিশ্চিত হতে পারিনি যে, কীভাবে আপনি আপনার কাকার প্রাণ নেবার সংকল্প করেছিলেন। তবে একটু ধারণা করেছিলাম যে, আপনার কল্পনার সঙ্গে সিরিঞ্জের একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। আমাকে যদি বিশ্বাস করেন তবে বাকিটা বলুন!

সবই বলব মিঃ রায়, একটা ইংরাজী বইতে পড়েছিলাম, একজন একজনকে ইনজেকশন করে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেছিল। সেই থেকেই ঐভাবেই খুন করবার একটা দুষ্ট চিন্তা সর্বদা আমার মাথায় ঘুরত।

এখন বোঝা যাচ্ছে, ঐজন্যই আপনি শেষ পর্যন্ত একটা সিরিঞ্জ কিনেছিলেন।

না, কিনিনি, বৌদির বাক্স থেকে সেটা চুরি করে নিয়েছিলাম।

সহসা বিনতা দেবী যেন লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বললে, কিন্তু আমি—আমি সে কথা জানতাম না।

কিরীটী বললে, এতক্ষণে দুটো সিরিঞ্জের রহস্য উদঘাটিত হল। যেটা বিনতা দেবীর ছিল, সমীরবাবু সেটা চুরি করলেন। পরে অধীরবাবু সমীরবাবুর ঘরে সেটা পেয়ে সন্দেহবশে মেজদাকে বাঁচাবার জন্য বাড়ির পিছনে ফেলে দিলেন। বেশ, তাহলে আবার আমাদের সময়-তালিকাটি পুনর্বিচার করে দেখা যাক।

তিনটে পাঁচ মিনিটের সময় সমীরবাবু, সমরবাবু ও রণধীরবাবু সব বেড়াতে বের হন।

তিনটে পনের মিনিটের সময় ডাঃ চক্রবর্তী ও ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী বেড়াতে বের হন।

চারটে পনের মিনিটের সময় বারীনবাবু ও যতীনবাবু বেরিয়ে যান।

চারটে কুড়ি মিনিটের সময় জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে ডাঃ চক্রবর্তী ফিরে আসেন।

চারটে পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় রণধীরবাবু ফিরে আসেন।

চারটে চল্লিশ মিনিটের সময় বিনতা দেবী ফিরে এসে গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যান এবং তাঁর সঙ্গে কথা বলে স্বামীর ঘরে যান প্রায় চারটে পঞ্চাশ মিনিটের সময়।

পাঁচটা দশ মিনিটের সময় অধীরবাবু ফিরে আসেন।

পাঁচটা চল্লিশ মিনিটের সময় বারীনবাবু ও যতীনবাবু ফিরে আসেন।

পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটের সময় সমীরবাবু ফিরে আসেন।

ছটার সময় ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী ফিরে আসেন।

ছটা তিরিশ মিনিটের সময় গগনেন্দ্রনাথ মৃত আবিষ্কৃত হন।

এই সময় তালিকা সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, চারটে পঞ্চাশ মিনিটের সময় বিনতা দেবী যখন ফিরে এসে তাঁর খুড়শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলে রণধীরবাবুর ঘরে চলে যান ও পাঁচটা দশ মিনিটের সময় যখন অধীরবাবু ফিরে আসেন—এই যে কুড়ি মিনিট সময় তার মধ্যে (অধীরবাবুর কথা যদি সত্যি বলে মেনে নিই) গগনেন্দ্রনাথ খুন হয়েছেন।

এখন কথা হচ্ছে, ঐ কুড়ি মিনিট সময়ের মধ্যে কে তাঁকে খুন করতে পারে! ঐ সময় ডাঃ গাঙ্গুলী ও সমীরবাবু দুজনে এক জায়গায় ছিলেন। যতীনবাবুর (যাঁর গগনেন্দ্রনাথকে খুন করবার মত কোন সঙ্গত কারণই থাকতে পারে না) একটা alibi আছে বটে, তিনি, বারীনবাবু ও সমরবাবু একসঙ্গে ছিলেন। রণধীরবাবু ও তাঁর স্ত্রী বিনতা দেবী পাশের ঘরেই ছিলেন ; ঐ সময়ে ডাঃ অমিয় চক্রবর্তী তাঁর ঘরে একা একা শুয়ে জ্বরে গোঙাচ্ছেন। হোটেলে নীচের তলায় আর কেউই প্রায় ছিল না। ঐ সময় কারো কাউকে খুন করবার অপূর্ব সুযোগ হতে পারে। এমন কি কেউ হোটেলের নীচের তলায় ঐ সময় ছিল যে গগনেন্দ্রনাথকে খুন করতে পারে? বলতে বলতে কিরীটী আড়চোখে একটিবার অদূরে উপবিষ্ট কিশোরের দিকে তাকাল। তারপর আবার বলতে লাগল, একজন সে-সময় সেখানে ছিল—সে হচ্ছে কিশোর। কিশোর সেদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আগাগোড়া হোটেলে নিজের ঘরেই ছিল। হোটেলের বাইরে যায়নি।

এ কথাও ঠিক যে বেলা তিনটে থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত কিশোর তার নিজের ঘরে ছিল না। তার প্রমাণ পেয়েছি। কিশোর তার জবানবন্দিতে একটা বিশেষ কথা বলেছিল। ডাঃ চক্রবর্তী নাকি জ্বরের ঘোরে তার নাম ধরে ডাকছিলেন। কিন্তু কিশোর যে ঘরে থাকে সেখান থেকে ডাঃ চক্রবর্তীর ঘর দূরে, জ্বরের ঘোরে সেখান থেকে ডাকলেও সে ডাক শোনা যেতে পারে না। তাছাড়া ডাঃ চক্রবর্তীও জ্বরের ঘোরে কিশোরকে নাকি স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু আসলে ডাক্তারের সেটা স্বপ্ন নয়, কিশোরকে সশরীরেই তাঁর ঘরে সেদিন দেখেছিলেন তাঁর শয্যার পাশে। তিনি মনে করেছিলেন, ওটা তাঁর স্বপ্ন বা জ্বরবিকার। আসলে সত্যি সত্যি কিশোর সে-সময় ডাঃ চক্রবর্তীর ঘরে গিয়েছিল। এমনও তো হতে পারে, কিশোর সেই সময় তার কাকাকে খুন করে ডাক্তারের ঘরে সিরিঞ্জটা রাখতে গিয়েছিল!

কিশোর মুখ তুলে কিরীটীর দিকে তাকাল। তার মাথার তৈলহীন রুক্ষ এলোমেলো চুলগুলি মুখের চারপাশে ও ঘাড়ের উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। বড় বড় সুন্দর টানা টানা দুটি চক্ষু। সে চোখের দৃষ্টিতে কোন ভাব নেই। যেন সহজ অসহায় উদাস ব্যথায় ক্লান্ত, অশ্রুআবিল।

এমন সময় ডাঃ চক্রবর্তী বলে উঠল, আশ্চর্য!

কিন্তু মনোবিজ্ঞানের দিক দিয়ে এটা কি একেবারেই অসম্ভব ডাঃ চক্রবর্তী? কিরীটী প্রশ্ন করলে।

কিন্তু তাদের বাধা দিয়ে বিনতা দেবী যেন একপ্রকার চিৎকার করেই বললে, না না, এ অসম্ভব! এ অসম্ভব! এ হতে পারে না!

কেন হতে পারে না বিনতা দেবী?

তীক্ষ্ম ধারাল সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে কিরীটী বিনতা দেবীর দিকে তাকাল। সাপের দৃষ্টির মত

সম্মোহন সে দৃষ্টিতে, যেন অন্তর্ভেদী ধারাল তীক্ষ্ণ আলোর রশ্মির মত অনুসন্ধানী। বিনতার অন্তস্তল পর্যন্ত ভেদ করছে। বিনতা বললে, হ্যাঁ, অসম্ভব। এ শুধু অবিশ্বাস্যই নয়, এ আপনার বাতুলতা।

কিশোর চেয়ারটার উপরে একটু নড়েচড়ে বসল। তার ভাবলেশহীন পাথরের মত খোদাই করা মুখের উপরে যেন সহসা একটা চাপা কৌতূহলের আভা স্ফুরিত হচ্ছে।

কিরীটী একবার মাত্র তীব্র দৃষ্টিতে বিনতা দেবীর দিকে তাকিয়ে আবার বলতে লাগল, আপনি একজন সত্যিকারের বুদ্ধিমতী মহিলা বিনতা দেবী। আপনারবুদ্ধির প্রশংসা কিরীটী রায়ও করছে।

আপনি কি বলতে চান, মিঃ রায়? তীক্ষ্ম স্বরে বিনতা দেবী প্রশ্ন করল।

আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই বিনতা দেবী যে, এতক্ষণে সত্যিই আমি বুঝতে পেরেছি তীক্ষ্ণ ধারাল বুদ্ধির একটা চমৎকার মুখোশ আসল সত্যিকারের রূপটাকে ঢেকে রেখেছে। সত্যিই আপনি প্রশংসার যোগ্য। বাংলাদেশের সাধারণ ঘরোয়া মেয়েদের মধ্যে এতখানি বুদ্ধির প্রাখর্য ইতিপূর্বে আমার চোখে আর পড়েছে কিনা বলতে পারি না।

কুণ্ঠায় ও লজ্জায় বিনতা দেবীর দৃষ্টি নত হয়ে এল।

কিরীটী বলতে লাগল, লজ্জিত হবেন না মিসেস মল্লিক। তোষামোদ বা চাটুকার্য আমার পেশা নয়। এ বাড়ির অদ্ভুত জীবনধারার সঙ্গে আপনি আপনার নিজস্ব গড়ে-ওঠা জীবনধারাকে অতি কৌশলের সঙ্গে যেন খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন। বাইরে আপনি আপনার খুড়শ্বশুরের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করতেন, তাঁর মতেই মত দিয়ে চলতেন। কিন্তু ভিতরে ভিতরে আপনি তাঁকে সমস্ত অন্তর দিয়েই ঘৃণা করতেন, তাঁর সমগ্র কাজ ও ব্যবহারকে অন্যায় অবিচার বলে অবজ্ঞা করতেন। কিছুদিন থেকে আপনি ভাবছিলেন এবং আপনার স্বামীকে নিয়ে এ বাড়ি ত্যাগ করে চলে যাবার জন্য উত্তেজিত করছিলেন। আপনি ভেবেছিলেন তা যদি পারেন তবেই নিশ্চিন্ত হতে পারবেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে তিল তিল করে যে নাগপাশের বন্ধনে আপনার স্বামী বাঁধা পড়েছিলেন, তার প্রভাবকে অস্বীকার করবার মত মনের শক্তি আর আপনার স্বামীর ছিল না।

অনেক চেষ্টাতেও যখন আপনি আপনার স্বামীকে আপনার মতে আনতে সক্ষম হলেন না, তখন অতি অদ্ভুত উপায়ে আপনার স্বামীর ঘুমিয়ে পড়া মনকে জাগিয়ে তুলবার জন্য আঘাত হানবার কল্পনা করলেন। তাঁকে ভয় দেখালেন, আপনি এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন। স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জন করবেন। আপনি সত্যিই আপনার স্বামীকে ভালবাসেন। এটা আপনার স্বামীকে মাত্র ভয় দেখানোর উপায় ভেবেছিলেন, একথা শুনলে যদি আপনার স্বামী শেষ পর্যন্ত ফিরে দাঁড়ান। এবং হয়েছিলও তাই। আপনার কথায় সত্যি এতদিন পরে রণধীরবাবুর ঘুমিয়ে পড়া পৌরুষের গোড়ায় আঘাত লাগল। এতদিনকার কাকুতিমিনতি যা করতে পারেনি, এক কথায় সেটা সম্ভব হল। এমনিই হয়। কখন কী সামান্য ঘটনা হতে যে মানুষের মনের মূলটা পর্যন্ত নড়ে ওঠে, চিরদিনকার যুক্তি শিথিল হয়ে আসে, কেউ তা বলতে পারে না। রণধীরবাবুর মনের গোড়াতেও ঝড় উঠল। তিনি হয়ত ভাবলেন, যার জন্য এত দুঃখ, এত কষ্ট, তাকে শেষ করে ফেলতে পারলেই সব আপদের শান্তি হয়, তাই হয়ত তিনি শেষ পর্যন্ত...

বিনতা প্রবল ভাবে বাধা দিল, না, না, এ আপনার ভুল কিরীটীবাবু। আপনি ভেবেছেন আমার স্বামীকে আমি সেদিন ঐ কথা বলবার পর আমার স্বামী খুব রেগে বা চঞ্চল হয়ে

উঠেছিলেন, কিন্তু আসলে তা তিনি হননি। তাছাড়া আমি সেদিন বিকেলে বেড়িয়ে ফিরে আমার খুড়শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করে সোজা আমার স্বামীর ঘরে গিয়ে প্রবেশ করি, এবং চা খেতে যাওয়ার আগে পর্যন্ত আমরা দুজনে সে ঘরে বসে গল্প করেছি। তাঁর মৃত্যুর জন্য আমি হয়ত বা দায়ী হতে পারি, অর্থাৎ আমার শ্বশুরকে আমার মনের অভিসন্ধির কথা বলে তাঁর দুর্বল শরীরে আঘাত দিতে পারি, হয়ত সে আঘাতের ফলে তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হওয়াও অস্বাভাবিক কিছু নয়, এবং সত্যি যদি হয়ে থাকে, তাহলেও আমার বিরুদ্ধে আপনার কোন প্রমাণই নেই মিঃ রায়।

কিরীটী গম্ভীর স্বরে বললে, আছে বৈকি। আমার সময়-তালিকাটার বারো নম্বর পয়েন্টটা বিবেচনা করে দেখুন। সাড়ে ছটার সময় যখন চা খেতে সকলে খাবার ঘরে গেছেন, গগনেন্দ্রনাথকে চা পান করতে ডাকবার জন্য ভৃত্যকে তাঁর কাছ পাঠানো হয়েছিল।

সমীর বললে, আপনার কথাটা ঠিক বুঝলাম না মিঃ রায়!

অধীরও সঙ্গে সঙ্গে বললে, আমিও বুঝলাম না।

কিরীটী জবাব দিলে, ও বুঝতে পারছেন না, না? গগনেন্দ্রনাথকে ডাকতে একজন ভৃত্যকে পাঠানো হয়েছিল কেন? চিরদিন আপনার ভাইরা একজনের মধ্যে যে কেউ বা বিনতা দেবীই তাঁকে চা পান করবার বা খাবার সময় ডাকতে যেতেন। কেননা সেটাই আপনাদের কাকা বেশী পছন্দ করতেন। কাকাকে ডাকতে যাওয়া আপনারা আপনাদের একটা কর্তব্য বলেই মেনে নিয়েছিলেন। বিশেষ করে ইদানীং সর্বদাই আপনাদের মধ্যে একজন না একজন তাঁর কাছে কাছে থাকতেন। সমীরবাবু ও বিনতা দেবী দুজনেই তাঁদের জবানবন্দীতে একথা স্বীকার করেছেন। তাই যদি হয়, তবে সেদিন সন্ধ্যায় চা পান করবার জন্য আপনাদের মধ্যে কেউ একজন তাঁকে না ডাকতে গিয়ে ভৃত্যকে পাঠানো হয়েছিল কেন? এ বাড়ির প্রচলিত নিয়মের কেন ব্যতিক্রম হয়েছিল সেদিন সন্ধ্যায়?

কেউ আপনারা ডাকতে যাননি, কেননা ঘটনার আকস্মিকতায় আপনারা সকলেই তখন বিমূঢ় ও বিবশ হয়ে গিয়েছিলেন। কী করা উচিত না-উচিত এ প্রশ্নটাই আপনাদের প্রত্যেককে তখন বিচলিত করে তুলছিল। প্রত্যেকেই নিজ নিজ মনে আপনারা ভাবছিলেন, কেন আপনাদের মধ্যে একজন কাকাকে ডাকতে যাচ্ছে না! তার কারণ একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদের জন্য মনে মনে আপনারা প্রত্যেকেই তখন অবশভাবে অপেক্ষা করছিলেন।

বিনতা দেবী জবাব দিলেন, না, তা হয়। আমরা প্রত্যেকেই সেদিন ক্লান্ত ও অবসন্ন। অবশ্য স্বীকার করি আমাদেরই একজনের কাউকে ডাকতে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু যেহেতু আমাদের মধ্যে কেউ যায়নি বলেই যে আমাদের মধ্যে কেউ দোষী এ যুক্তিটা ছেলেমানুষের যুক্তির মত হল না?

কিরীটী বললে, হয়ত বা তাই। কিন্তু বিনতা দেবী, আপনি বা সমীরবাবুই বেশীরভাগ সময় ও কাজটা করতেন, সেকথা দুজনেই তো আপনারা স্বীকার করেছেন। কিন্তু সেদিন রাত্রে ইচ্ছা করেই আপনি তাঁকে ডাকতে যাননি। কিন্তু কেন আপনি যাননি জানেন? কিরীটীর স্বর সহসা যেন ছুরির ফলার মত তীক্ষ্ণ ও ধারাল হয়ে উঠল, তার কারণ আপনি তখন জানতেন যে আপনার শ্বশুর মৃত। হ্যাঁ, আপনি জানতেন। গভীর উত্তেজনায় কিরীটীর গলার স্বর কাঁপতে লাগল।

বিনতা দেবী প্রত্যুত্তরে কী যেন বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু কিরীটী তার কথায় ভ্রূক্ষেপমাত্র না করে বলতে লাগল, না না, আমি আপনার কোন কথা বা কোন যুক্তিই মানতে চাই না।

শুনুন মিসেস মল্লিক, আমি—হ্যাঁ আমি কিরীটী রায় বলছি, আমাকে চেনবার ও জানবার অবকাশ হয়ত আপনার হয়নি, তাহলে এভাবে নিজেকে লুকোবার এই হাস্যকর প্রয়াস নিশ্চয়ই করতেন না।

স্বীকার করি আপনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা এবং অনেকের চাইতে ঢের বেশী বুদ্ধি রাখেন। কিন্তু তবু আমার চোখে ধুলো দেবার মত ক্ষমতা আপনার নেই। অবিশ্যি এটা ঠিকই যে বেড়িয়ে ফিরে এসে যে সময় আপনি গগনবাবুর সঙ্গে দেখা করেন, সে সময় বারীনবাবু ও যতীনবাবু হোটেলেই ছিলেন এবং তাঁরা আপনাকে গগনবাবুর সঙ্গে কথা বলতেও দেখেছেন। তাঁরা শুধু দূর থেকে আপনাকে গগনবাবুর সঙ্গে কথা বলতেই দেখেছিলেন, কিন্তু কী কথা যে আপনি বলছিলেন তা তাঁরা শুনতে পাননি। কেননা এত দূর থেকে সেটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আসলে সে-সময় আপনি যে সেখানে কী করছিলেন তার কোন প্রমাণই আমাদের হাতে নেই। তবু এ বিষয়ে আমার একটা theory আছে বা কল্পনা করেছি।

আগেই বলেছি আপনার বুদ্ধি আছে। খুব তাড়াতাড়ি যদি আপনি যে কোন ভাবেই হোক আপনার খুড়শ্বশুরকে এ সংসার থেকে সরাবার ইচ্ছা করতেন তবে সেটা সহজেই এবং অনেকদিন আগেই করতে পারতেন। একটুখানি বুদ্ধি আর তার সঙ্গে একটুখানি সুযোগের যোগাযোগ। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজটা না শেষ করে হয়ত বিশেষ একটা সুযোগ ও সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন। আপনি হয়ত সকালবেলা কোন এক সুযোগে ডাঃ চক্রবর্তীর ঘরে ঢুকে ডিজিট্যালিনের শিশিটা ও সিরিঞ্জটা চুরি করে এনেছিলেন। কাউকে খুন করবার মত ঔষধ বেছে নেওয়া আপনার পক্ষে বিশেষ কষ্টকর ছিল না। কেননা নার্সিং আপনি কিছুদিন শিক্ষা করেছিলেন। ডাক্তারী ঔষধপত্র সম্পর্কে বেশ কিছু জ্ঞান আপনার আছে। আপনি ইচ্ছা করেই ডাক্তারী ব্যাগ থেকে ডিজিট্যালিনের শিশিটা বেছে নেন, ঠিক যে ধরণের ঔষধ আপনার শ্বশুর খেতেন। আপনি সিরিঞ্জে ঐ ঔষধ ভরে রাখেন ও উত্তেজনার বশে গগনেন্দ্রনাথের শরীরে প্রয়োগ করে তাঁকে খুন করেন। কিন্তু কাজ হাসিল হয়ে যাবার পর সিরিঞ্জটা আর ডাঃ চক্রবর্তীর ঘরে রাখবার সুযোগ পাননি, কেননা সেই সময় ডাঃ চক্রবর্তী তাঁর ঘরে শুয়ে জ্বরের ঘোরে কাঁপছিলেন।

আগে থাকতেই সব আপনি plan করে রেখেছিলেন। দূর থেকে বারীনবাবু ও যতীনবাবু গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে দেখেছেন মাত্র। আপনি অনায়াসেই গগনেন্দ্রনাথের হাতে ইনজেকশন করে বিষপ্রয়োগ করেছিলেন। বুড়ো রোগগ্রস্ত মানুষ, বাধা দেবার বা চিৎকার করবারও সুযোগ পাননি হয়ত এবং বিষপ্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যু ঘটেছিল। কাজ শেষ করে আবার হয়ত কথা বলবার ভান করে বা অভিনয় করে আবার তাঁর পাশে এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যান। দূর থেকে যতীনবাবু ও বারীনবাবু সে সময় আপনাকে দেখতে পান। তাঁরা ভেবেছেন আপনি তার সঙ্গে কথা বলছেন, খুবই এটা স্বাভাবিক। কে আপনাকে এক্ষেত্রে সন্দেহ করতে পারে বলুন! তারপর আপনি সেখান থেকে ফিরে আপনার স্বামীর ঘরে ঢুকে বাকি সময়টা তাঁর সঙ্গেই কথাবার্তা বলে কাটান, সেখান থেকে আর অন্য কোথাও যাননি।

কাজ হাসিল হয়ে গিয়েছিল, কোথাও আর যাবার তো দরকার ছিল না। আপনি জানতেন, কেউ আপনাকে সন্দেহ করতে পারবে না। বহুদিন থেকে গগনেন্দ্রনাথ হার্টের ব্যারামে ভুগছিলেন সকলেই ভাববেন তিনি হঠাৎ হার্টফেল করেই মারা গেছেন। সবই ঠিক ছিল বিনতা দেবী, কিন্তু সামান্য একটা কারণের জন্য আপনার সমগ্র plan ভেস্তে গেল। আপনি

কাজ হাসিল করবার পর সিরিঞ্জটা আর আগের জায়গায় রেখে আসবার সুযোগ বা সুবিধা পাননি। কেননা ডাঃ চক্রবর্তী তখন তাঁর ঘরে ছিলেন। যদিও আপনি জানতেন না যে, ডাক্তার ইতিপূর্বেই তাঁর সিরিঞ্জটা যে খোয়া গেছে তা জানতে পেরেছিলেন। বিনতা দেবী, এই একটিমাত্র গলদেই সব ভেস্তে গেল। নচেৎ চমৎকার একটি perfect crime হয়েছিল।

সহসা যেন ঘরের মধ্যে একটা বজ্রপাত হয়েছে। স্তম্ভিত হতবাক হয়ে সবাই বসে রইল, কারও মুখে টুঁ শব্দটি পর্যন্ত নেই!

শ্মশানের মতই একটা জমাট স্তব্ধতা যেন সমগ্র ঘরখানির মধ্যে থমথম করছে।

সবাই যেন বোবা হয়ে গেছে বিস্ময়ে আতঙ্কে ও ঘটনার আকস্মিকতায়।

এমন সময় রণধীর উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে এবং প্রতিবাদের সুরে বললে, না না, এ একেবারে মিথ্যে কথা। ও নির্দোষ, সম্পূর্ণ নির্দোষ। ও কিছুই করেনি। আমার কাকা তার আগেই মারা গিয়েছিলেন।

কিরীটী চোখ দুটো সহসা যেন অস্বাভাবিক এক উজ্জ্বলতায় ঝক্‌ঝক্ করে উঠল, মৃদু-স্বরে সে বলল, আঃ। তাহলে শেষ পর্যন্ত আপনিই গগনেন্দ্রনাথকে খুন করেছিলেন, বলুন?

আবার মুহূর্তের জন্য স্তব্ধতা।

রণধীর ততক্ষণে চেয়ারের উপরে আবার থপ্ করে বসে পড়েছে। গভীর উত্তেজনায় তখনও তার সর্বশরীর কাঁপছে। ক্লান্তক্লিষ্ট স্বরে কোনমতে শুধু উচ্চারণ করলে, হ্যাঁ, হ্যাঁ--আমিই তাঁকে খুন করেছি।

কিরীটী প্রশ্ন করলে, আপনিই তাহলে ডাঃ চক্রবর্তীর ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ ও ডিজিট্যালিনের শিশিটা চুরি করেছিলেন?

হ্যাঁ।

কখন?

একটু আগে আপনিই তো তা বললেন মিঃ রায়!

কেন আপনি তাঁকে খুন করলেন?

সে কথা আমাকে আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারেন কি মিঃ রায়?

হ্যাঁ, আমি জিজ্ঞাসাই করছি। বলুন? জবাব দিন?

জানেন তো আমার মনের অবস্থা তখন কী রকম হয়েছিল! কিন্তু কেন, কেন আমাকে আপনি এ প্রশ্ন করছেন মিঃ রায়? রণধীরের কণ্ঠ থেকে যেন একটা প্রবল বিরক্তির ঝাঁজ ঝরে পড়ল, কী হবে আপনার এসব শুনে?

কিরীটী বললে, অনেক কিছুই হবে রণধীরবাবু। আমি চাই এখনও আপনি যা জানেন তা গোপন না করে খুলে সব বলুন। এখনও সত্য কথা বলুন।

সত্য কথা বলব?

হ্যাঁ হ্যাঁ, সত্যি কথা বলুন।

হা ভগবান, তাই আমি বলব। কিন্তু জানি না, সেকথা বিশ্বাস করবেন কিনা। তবু—তবু আমি বলব। একটা দীর্ঘশ্বাস রণধীরের বুকখানা কাঁপিয়ে বের হয়ে এল। রণধীর বলতে লাগল, সেইদিন দুপুরে আমার মনের অবস্থা অত্যন্ত unbalanced ছিল। আর এ জীবন সহ্য হচ্ছে না। এ বন্ধন যেন নাগপাশের মতই আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। মুক্তি—মুক্তি চাই। এমনি ভাবে আর বেশীদিন থাকলে আমি বোধ হয় পাগল হয়েই যাব। আমার কেবলই কদিন থেকে মনে হচ্ছিল, আমিই এ সব কিছুর জন্য দায়ী। আমি সকলের বড়। ছোট ভাইরা সব আমার

মুখের দিকেই তাকিয়ে আছে। তাদের অসহায় যন্ত্রণাকাতর মুখের দিকে তাকিয়ে কতদিন--কতদিন আমি ভেবেছি, এই শৃঙ্খল আমি ছিঁড়ে ফেলব। সকলকে আমি মুক্তি দেব। সকলকে আবার বাঁচিয়ে তুলব। দিনের পর দিন এক বৃদ্ধ বিকৃত-মস্তিষ্কের নিষ্ঠুর খেয়ালের নাগপাশে বন্দী হয়ে জর্জরিত হবার চাইতে বুঝি মৃত্যুও ভাল। কী যে সে যন্ত্রণা আমি ভোগ করেছি তা কেউ জানত না।

আপনাকে আমি কী বলব মিঃ রায়, কতদিন রাত্রে শিশুর মতই আমি একা একা শয্যায় শুয়ে বালিশে মুখ গুঁজে কেঁদেছি। কিশোরের মনের অবস্থা দিন দিন যেভাবে সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলছিল, সে আর যেন দেখতে পারছিলাম না। আমার সহ্যশক্তি যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। বাপ-মা-হারা ছোট ভাইটির সেই অসহায় করুণ মুখখানা যেন আমার হৃদয়ে নিশিদিন ব্যর্থ অনুশোচনার দাবাগ্নি জ্বালাত। সাপ যেমন তার চোখের দৃষ্টিতে শিকারকে সম্মোহিত করে রাখে, আমারও হয়েছিল সেই অবস্থা।

কাকার উম্মাদ পরিকল্পনা যেন অক্টোপাশের মত অষ্টবাহুতে আমাকে আঁকড়ে ধরে আমার রক্ত শোষণ করছিল। সমস্ত রাত্রি ধরে কত সঙ্কল্পের পর সঙ্কল্পই না আঁটতাম, কিন্তু সকালবেলা কাকার মুখের দিকে চাইলেই বন্যার মুখে স্রোতের কুটোর মত সব ভেসে যেত। অহর্নিশি অন্তর ও বাইরের এই দ্বন্দ্ব যেন আমায় পাগল করে তুলছিল, সামান্য শব্দে কেঁপে উঠতাম, সামান্য উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপত। বোঝাতে পারব না আপনাকে আমার সেই অসহায় অবস্থার কথা। শেষকালে আর স্থির থাকতে পারলাম না। সেদিন বিকালে অনেক সাহস সঞ্চয় করে একটা উত্তেজনার মধ্যেই কাকার কাছে এগিয়ে গেলাম এর একটা শেষ মীমাংসা করতে।

সহসা অধীর ও সমীর চিৎকার করে উঠল, দাদা! দাদাভাই!—

রণধীর তখন পাগলের মতই হয়ে উঠেছে, সে ভাইদের কথায় প্রবলভাবে চিৎকার করে বলে উঠল, না না, তোরা থাম্। তোরা থাম্। আজ তোরা আমায় বলতে দে। আজ আমার সকল সঙ্কোচ ভেঙেছে। দীর্ঘ একুশ বছরের এ অসহ্য যন্ত্রণা আর পুষে রাখতে পারছি না।

হ্যাঁ শুনুন মিঃ রায়, তারপর কাকার সামনে গিয়ে কি দেখলাম জানেন, দেখলাম তিনি মৃত। মৃতদেহ সেখানে চেয়ারের উপরে বসে আছে। আমি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলাম, কী করব—কী করা উচিত! চিৎকার করে সকলকে একবার যেন ডাকতে গেলাম, কিন্তু কণ্ঠ দিয়ে আমার কোন স্বর বের হল না। তখন আমি ধীরে ধীরে আমার ঘরে ফিরে এসে শুয়ে পড়লাম। কাউকে কোন কথা বললাম না। আমিও তাঁর হাতে ইন্‌জেকসনের দাগ দেখেছিলাম। আমি জানি কেউ আমার কথা বিশ্বাস করবে না। করতে পারে না। তবু আপনাকে বললাম। বলে রণধীর হাঁপাতে লাগল।

ডাঃ চক্রবর্তী বললে, খুব স্বাভাবিক এটা রণধীরবাবু, যা আপনি করেছেন। একেই দীর্ঘদিন ধরে আপনি অন্তরে ও বাইরে উত্তেজিত ছিলেন, আপনার ঐ মানসিক অবস্থায় ওভাবে হঠাৎ কাজ করা কিছুই আশ্চর্য নয়। খুব স্বাভাবিক। আপনার তখন মানসিক পক্ষাঘাত হয়েছে।

কিরীটী এতক্ষণে বললে, রণধীরবাবু, আপনার এ কথা আমি বিশ্বাস করি। এবং ঐজন্যই বিনতা দেবী গগনেন্দ্রনাথকে মৃত জেনেও সেকথা গোপন করে গেছেন, তাই নয় কি?

রণধীর বললে, তাই। কিন্তু মিঃ রায়, সত্যি কি আপনি আমাকে সন্দেহ করেছিলেন?

ঠিক তাই নয়, কিরীটী বললে, তবে একবার মনে হয়েছিল, আপনার দ্বারা তাঁকে খুন করা একেবারে অসম্ভব নয়!

তবে, রণধীর বললে, আমাদের মধ্যে যদি কেউই তাকে খুন করে থাকি, তবে কে তাকে

খুন করলে? কী সত্যি ঘটেছিল? আসল ব্যাপারটা কি?

জানতে চান কি তবে সত্যি সত্যি কী ঘটেছিল? কিরীটী বলতে লাগল, শুনুন বলছি। সিরিঞ্জ ও ডিজিট্যালিন ডাঃ চক্রবর্তীর ব্যাগ থেকে খোয়া গিয়েছিল। গগনেন্দ্রনাথের হাতেও ইন্‌জেকশনের দাগ ছিল, সে আপনারা অনেকেই দেখেছেন ও বিশ্বাস করেন। ময়না-তদন্ত হলেই সে কথা আমরা জানতে পারতাম। কিন্তু তার আর উপায় নেই। আমাদের যখন সন্দেহ হয়েছে তখন আসল সত্যটা জেনে আমাদের সন্দেহটা মিটিয়ে নেওয়া ভাল, যখন খুনী আমাদের মধ্যে বসে আছে নির্ভয়ে স্বচ্ছন্দ চিত্তে।

সমীর বললে, এখনও আপনি বিশ্বাস করেন মিঃ রায় যে, আমাদের মধ্যেই কেউ কাকাকে হত্যা করেছি!

কিরীটী চুপ করে রইল।

(আমার পাঠক-পাঠিকাগণ,

আপনারা প্রথম থেকেই সমগ্র ব্যাপারগুলো পড়েছেন। কী করে রহস্যটা গড়ে উঠল, সেটাও আপনাদের চোখের উপরেই। প্রত্যেকটি চরিত্র নিয়েই কিরীটী সূক্ষ্ম বিচার করেছে এবং আলোচনার মধ্যে দিয়ে সে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গেছে খুনী কে? আপনাদের জিজ্ঞাসা করছি, বলুন দেখি কে খুনী এবং কেন তাকে আপনারা সন্দেহ করছেন?

লেখক)

কিরীটী বলতে লাগল, শুনুন প্রথম থেকেই দুটো ব্যাপার আমার কাছে একটু আশ্চর্য ঠেকেছিল। যার কোন মীমাংসাই পাচ্ছিলাম না খুঁজে। গগনেন্দ্রনাথ নিত্য একটু ঔষধ সেবন করতেন, যার মধ্যে একটা ingredient Digitalin; দ্বিতীয়ত, ডাঃ চৌধুরীর হাইপোডারমিক সিরিঞ্জটা কিছুক্ষণের জন্য হারিয়ে গিয়েছিল। এই দুটো পয়েন্টকে একসঙ্গে বিচার করে দেখুন, তাহলেই দেখতে পাবেন ঐ দুটো point-এর জন্য আপনাদের সকলকেই সন্দেহ করা যেতে পারে। অথচ সূক্ষ্ম বিচার ও আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল আপনারা ভাইরা বা বিনতা দেবী কেউই দোষী নন।

যে লোকটা আগে থেকেই হার্টের ব্যারামে ভুগছিল এবং প্রত্যহ ঔষধের সঙ্গে ডিজিট্যালিন সেবন করছিল, তাকে মারতে হলে ঔষধের সঙ্গে একটু বেশীমাত্রায় ডিজিট্যালিন সেবন করিয়ে দিলেই সবচাইতে সহজ ও বুদ্ধিমানের কাজ হত। আপনাদের মধ্যেই যদি কেউ হত্যাকারী হতেন, তাহলে ঐভাবে আপনাদের কাকাকে হত্যা করতে হলে কী করতেন? যে শিশি থেকে তিনি নিয়মিত ঔষধ সেবন করতেন, তার মধ্যে বেশীমাত্রায় ডিজিট্যালিন মিশিয়ে রাখতেন। কেউ টের পেত না। কেউ জানতেও পারত না, অথচ নির্ঝঞ্ঝাটে কাজটা হাসিল হয়ে যেত এবং এভাবে কাজটা একমাত্র সম্ভব হত তাদের দ্বারা যারা তাঁর বাড়ির লোক বা যারা তাঁকে সেই ঔষধ খাইয়ে দিলে কেউই সন্দেহ করতে পারবে না। যখন বিনতা দেবীর মুখে শুনলাম ঔষধের শিশিটা ভেঙে গেছে তখন ঐ সন্দেহটা বেশী করে আমার মনে উঠেছিল।

ওভাবে মারা গেলে এবং শিশির ঔষধটা পরীক্ষা করলে যখন দেখা যেত যে, তার মধ্যে বেশীমাত্রায় ডিজিট্যালিন আছে, তখন অনায়াসেই ওটার একটা explanation খাড়া করা যেতে পারত। বলা যেত, ভুল করে হয়ত ঔষধের দোকানদার যে ঔষধটা dispense করেছে, তাতে

বেশী ডিজিট্যালিন মিশিয়ে ফেলেছে। এতে বাড়ির লোকের দোষ কী? এমন ভুল তো দোকানদাররা মাঝে মাঝে করেও থাকে, ফলে কিছুই ওই শিশি থেকে প্রমাণ করা যেত না। কিন্তু ওই সঙ্গে আর একটা সম্ভাবনাকে অস্বীকার করতে পারিনি। সেটা হচ্ছে মৃতের দেহে ইনজেকশনের দাগ ও সেই সঙ্গে ডাক্তারের ঘর থেকে ডিজিট্যালিনের শিশিটা ও সিরিঞ্জটা চুরি যাওয়া। এর দুটি মাত্র মীমাংসা হতে পারে। এক ডাক্তারেরই দেখার ভুল, সিরিঞ্জ বা ঔষধ মোটেই চুরি যায়নি। অথবা হত্যাকারী সিরিঞ্জ ও ঔষধ চুরি করেছিল এইজন্য যে, গগনেন্দ্রনাথের নিত্য-ব্যবহৃত শিশিটার মধ্যে অন্যের অলক্ষে ডিজিট্যালিন ঢালার অবকাশ পায়নি বলে। অর্থাৎ এর থেকেই প্রমাণ হচ্ছে যে, হত্যাকারী বাড়ির কেউ নয়, বাইরের লোক।

এ ব্যাপারটা যে আগে আমার মনে উদয় হয়নি তা নয়। কিন্তু রণধীরবাবুদের দিকটা ভেবে দেখতে গেলে, ওঁদের দিক থেকে কাকাকে হত্যা করবার এত সঙ্গত কারণ ছিল যে, তাঁদের বাদ দিতে পারিনি প্রথমটায় আমার সন্দেহের তালিকা থেকে এবং তখনই ভাবতে লাগলাম, এও কি সম্ভব! ওঁদের দোষী সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ওঁরা নির্দোষ। এখন এইটাই আমাদের মীমাংসা করতে হবে। হত্যাকারী একজন বাইরের লোক। অর্থাৎ গগনেন্দ্রনাথকে এমন একজন কেউ হত্যা করেছে যে গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে এত পরিচিত নয়, যাতে করে সে অনায়াসেই তাঁর ঘরে ঢুকে ঔষধের শিশিটার মধ্যে বেশী করে ডিজিট্যালিন মিশিয়ে রেখে আসতে পারে। এই ঘটনার সময় গগনেন্দ্রনাথের কাছাকাছি বা আশেপাশে বাইরের লোক কারা ছিল সেইটাই এখন বিচার করে দেখতে হবে।

সমরবাবু, যতীনবাবু, ডাঃ চক্রবর্তী, ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলী ও বারীনবাবু—এঁরাই এখানে ছিলেন।

প্রথমেই ধরা যাক যতীনবাবুর কথা। যতীনবাবুর সঙ্গে এঁদের কোন পরিচয়ই ছিল না। তাছাড়া তিনি যদি খুনই করে থাকেন, কী উদ্দেশ্যে খুন করবেন! তাঁর পক্ষে কোন strong motive তো নেই। একমাত্র Homicidal maniacছাড়া তাঁর পক্ষে ওভাবে গগনেন্দ্রনাথকে হঠাৎ খুন করবার কোন সঙ্গত কারণই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। এবং এও আমরা জানি তিনি সে ধরনের লোক নন। অসুস্থ হলেও মস্তিষ্ক তাঁর সম্পূর্ণ সুস্থ।

যতীনবাবু এতক্ষণে কথা বললেন, মিঃ রায়, এটা কি সত্যই হাস্যকর নয়? যদিও তাঁর ভাইপোদের প্রতি তাঁর ব্যবহার এতটুকুও পছন্দ করতাম না এবং মাঝে মাঝে আমার ভীষণ রাগ হত তার প্রতি ও তাঁকে সর্বান্তঃকরণেই আমি ঘৃণা করতাম, তথাপি সেই সামান্য কারণে একজন অপরিচিত রোগগ্রস্ত বৃদ্ধকে খুন করতে কখনই কেউ পারে না। তাছাড়া তাঁকে খুন করবার মত সুযোগও তো আমার মেলেনি। কেননা আমি বারীনবাবু ও সমরবাবুর সঙ্গেই আপনার বর্ণিত ঐ কুড়ি মিনিট সময়ের মধ্যে ছিলাম।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, তা জানি। আচ্ছা এখন দেখা যাক, ডাঃ প্রতিমা গাঙ্গুলীই খুন করেছেন কিনা সেটা বিচার করে। তাঁর পক্ষে ঐভাবে ডিজিট্যালিন ইনজেক্ট করে গগনেন্দ্রনাথকে মারা এমন কিছুই অসম্ভব নয়, কেননা তিনি একজন শিক্ষিত ডাক্তার। কিন্তু যেহেতু তিনি সাড়ে তিনটের আগেই হোটেল ছেড়ে চলে যান ও ফিরে আসেন সন্ধ্যা ছটায়, তাঁর পক্ষে গগনেন্দ্রনাথকে খুন করবার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব ছিল। তাছাড়া এক্ষেত্রে তাঁর খুন করবার উদ্দেশ্যই বা কি থাকতে পারে?

তারপর ধরা যাক ডাঃ চক্রবর্তীকে। তিনি, রণধীরবাবুর কথা মেনে নিলে, সাড়ে চারটের সময় যখন জ্বরে কাঁপতে কাঁপতে হোটেলে ফিরে আসেন—তার আগেই গগনবাবু খুন

হয়েছেন। বারীনবাবুর ও যতীনবাবুর evidence-এ প্রমাণ হয় চারটে ষোল মিনিটের সময় গগনবাবু বেঁচেই ছিলেন। তার মানে, এক্ষেত্রে ঐ কুড়ি মিনিটের পাকে ডাঃ চক্রবর্তীকে ফেলা যায় না। অবশ্য ডাঃ চক্রবর্তী হোটেলে ফিরে আসবার পথে কী করেছেন না করেছেন তার কোন প্রমাণ নেই। কেননা ঐ সময় কেউ তার সাক্ষী ছিল না সেখানে। তাহলে একদিক দিয়ে ঐ সময় ডাঃ চক্রবর্তীর পক্ষে গগনবাবুকে খুন করা মোটেই আশ্চর্য বা অসম্ভব নয়।

কিন্তু এও ভাবতে হবে যে, তিনিও একজন শিক্ষিত ডাক্তার। অবশ্য একটা কথা আমার বরাবরই মনে হয়েছে। ডাক্তার যদি খুনী হন, তবে তিনিই প্রথম এ ব্যাপারে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন কেন যে এ ব্যাপারে কোন রহস্য আছে, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু নয়? তাছাড়া গগনেন্দ্রনাথকে খুন করবার তাঁর উদ্দেশ্যই বা কি থাকতে পারে? গগনবাবুর সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও ছিল না। এক্ষেত্রে ডাঃ চক্রবর্তী সম্পূর্ণ একজন তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি নিজেই যদি দোষী হতেন তবে ব্যাপারটাকে এভাবে খুঁচিয়ে না তুলে বুদ্ধিমানের মত চুপচাপই থাকতেন। আমাদের common sense কি অন্তত তাই বলে না?

কিন্তু ঐ সময় আর একজন হোটেলে ছিল, সে হচ্ছে কিশোর। সে অনায়াসেই ডাক্তারের অনুপস্থিতিতে সিরিঞ্জ চুরি করে নিয়ে গগনেন্দ্রনাথকে খুন করতে পারত। কিন্তু প্রমাণিত হয়েছে সেও করেনি। তবে কে হত্যা করলে?

একটু থেমে আবার কিরীটী বলতে লাগল, এইবার আসুন আমার তৃতীয় ও চতুর্থ পয়েণ্টে। গগনেন্দ্রনাথ তাঁর ফ্যামিলির কাউকে বাইরের কোন তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে মিশতে দিতে একেবারেই পছন্দ করতেন না ও কোথাও বের হতে দিতেন না। অথচ সেদিন বিকালে তিনি তাঁর ভাইপোদের ইচ্ছামত অন্য সকলের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যেতে বললেন, কোন আপত্তিই করলেন না। দুটো ব্যাপারই একটা আশ্চর্য নয় কি! এটা তাঁর স্বভাবের একেবারেই বিপরীত।

এবার গগনেন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থাটা একটু আলোচনা করে দেখা যাক। অদ্ভুত প্রকৃতির লোক ছিলেন তিনি।

তাঁর মনে অন্যের উপরে শাসন ও প্রভুত্ব করবার একটা উন্মাদ পৈশাচিক আকাঙ্ক্ষা ছিল। এই যে একটা প্রভুত্ব করবার আকাঙ্ক্ষা, একটা শক্তিপ্রয়োগের লোভ, এটাকে জয় করার মত তাঁর মানসিক শক্তি ছিল না। এবং তাঁর দীর্ঘ কর্মজীবনে ঐ জিনিসটা বরাবরই উপভোগ করে এসেছিলেন ও অপ্রতিহত ভাবে প্রথমে আন্দামানের কয়েদীদের উপর ও জেলার-জীবনে কয়েদীদের উপর, পরে নিজের অসহায় ভাইপোদের প্রতি প্রয়োগ করেছিলেন। অথচ মজা হচ্ছে এই যে, আসলে তিনি একজন পরের প্রতি প্রভুত্ব করবার মত শক্তিশালী লোক ছিলেন না। শুধু সুযোগ ও সুবিধা তাঁর সহায় হয়েছিল মাত্র। এবং এইভাবে অন্যের প্রতি অন্যায় প্রভুত্ব করবার একটা নেশা তাঁকে শেষ পর্যন্ত পেয়ে বসেছিল।

এবারে আসা যাক আমাদের আট নম্বর পয়েণ্টে। তিনি একদিন বলেছিলেন, 'আমি কখনও কিছু ভুলি না। মনে রেখো এ কথা। আমি আজ পর্যন্ত আমার এই সুদীর্ঘ ষাট বছরের জীবনের কোন কথাই ভুলিনি। সবই আমার মনে আছে। সব মুখই আমার মনে আছে।' কথাগুলো সেদিন হয়ত ডাঃ গাঙ্গুলীর মনে অনেকখানি চঞ্চলতা এনেছিল। কিন্তু আসলে এ কথাগুলো সেদিন তিনি ডাঃ গাঙ্গুলীকে বলেননি। হঠাৎ তাঁর আশেপাশে অন্য কোন বিশেষ এক পরিচিত ব্যক্তির মুখ দেখেই ও কথাগুলো সেই লোককে উদ্দেশ করেই বলেছিলেন।

কিরীটী আবার একটু থেমে বলতে লাগল, আবার ভেবে দেখা যাক গগনেন্দ্রনাথের হত্যার

দিন বাইরের অন্য কোন লোক সে সময় হোটেলে ছিল কিনা। একমাত্র কিশোর ছাড়া রণধীরবাবুরা প্রত্যেকেই বেরিয়ে গিয়েছিলেন। গগনেন্দ্রনাথ একা তাঁর ঘরের সামনে বারান্দায় চেয়ারের উপরে হেলান দিয়ে বসেছিলেন।

এবারে বারীনবাবু ও যতীনবাবুর কথাগুলো ভাল করে বিচার করে দেখা যাক। যতীনবাবুর দৃষ্টিশক্তিকে আমি প্রশংসা করতে পারি না। সে প্রমাণ আমি পেয়েছি যখন তিনি বলেছিলেন তাঁর ঘরের অল্পদূর দিয়েই খানসামাটা প্রায় যখন ছুটে গিয়েছিল তিনি তাকে চিনতে পারেননি। তাছাড়া যতীনবাবু ও বারীনবাবুর ঘর পাশাপাশি ; এক ঘরের লোক অন্য ঘরের লোককে দেখতে পারেন না। অথচ দুজনের ঘর থেকেই বারান্দায় যেখানে গগনেন্দ্রনাথ বসেছিলেন সেখানটা স্পষ্ট দেখা যায় এবং দুজনেই দেখেছিলেন একজন খানসামা গগনবাবুর কাছে গিয়ে কোন কারণে গালাগালি খেয়ে কিশোরের ঘরের দিকে ছুটে পালায়। বেলা চারটের সময় যতীনবাবু যখন নিজের ঘরে বসে বই পড়ছেন, বারীনবাবু তাঁকে বেড়াবার জন্য ডাকতে যান। বারীনবাবু তাঁর জানবন্দিতে বলেন. একজন খানসামা গগনবাবুর কাছে যায়, তারপরই একটা গোলমাল শোনা যায়, খানসামাটা আবার কিশোরের ঘরের দিকে চলে যায়।

সহসা এমন সময় ডাঃ চক্রবর্তী প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি তুমি বলতে চাও কিরীটী যে, হোটেলের একজন খানসামাই শেষ পর্যন্ত গগনেন্দ্রনাথকে খুন করেছে?

দাঁড়াও দাঁড়াও ডাক্তার, ব্যস্ত হয়ো না। আমি এখনও আমার বক্তব্য শেষ করিনি। খানসামা গগনবাবুর কাছে বকুনি (?) খেয়ে কিশোরের ঘরের দিকে ছুটে পালায়। যতীনবাবু ও বারীনবাবু দুজনেই তা দেখেছেন। অথচ আশ্চর্য, কেউই তার মুখ দেখতে পাননি বা চিনতে পারেননি। কিন্তু মজা এই যে, বারীনবাবুর ঘর থেকে বারান্দায় যেখানে গগনেন্দ্রনাথ বসেছিলেন তার দূরত্ব মাত্র একশত গজ।

বারীনবাবু খানসামার সাদা রঙের পোশাকের চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি খানসামার পোশাকের অমন নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারেন পলায়নপর খানসামাকে দেখে , অথবা তার মুখটা দেখতে পেলেন না বা তাকে চিনতে পারলেন না, এটা কি আশ্চর্য ও অবিশ্বাস্য নয়? অথচ তাঁর নাকি চোখের অসুখ, সর্বদা রঙীন কাচের চশমা ব্যবহার করেন। চোখে আলো সহ্য হয় না। সহসা ডাঃ চক্রবর্তী চিৎকার করে উঠলেন, তবে কি—তবে কি—

কঠিন শান্ত কণ্ঠে কিরীটী জবাব দিল, হ্যাঁ, তাই। বারীনবাবুই গগনেন্দ্রনাথের হত্যাকারী।...এবং শুধু গগনেন্দ্রনাথেরই নয়, ইতিপূর্বে কিছুকাল ধরে কলকাতা শহরে যে কয়েকটি নৃশংস অমানুষিক হত্যা বা খুন হয়েছে, সব কটি হত্যা-রহস্যেরই মেঘনাদ...বলতে বলতে কিরীটীর চোখ সৌম্য-শান্ত অদূরে উপবিষ্ট বারীনবাবুর প্রতি ন্যস্ত হল। সহসা বারীনবাবু চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মতই কিরীটীর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

মেঝের উপরে দুজনে দুজনকে আঁকড়ে ধরে গড়িয়ে পড়ল। কিন্তু অসীম বলশালী কিরীটীর কাছে অল্পক্ষণের মধ্যেই বারীনাবুকে পরাস্ত হতে হল।

সকলে মিলে বারীনবাবুর হাত বেঁধে চেয়ারের উপরে বসাল। বারীনবাবুর মুখে একটি কথা নেই। সর্বশরীর তাঁর রাগে তখন ফুলছে। চোখের রঙীন চশমা কোথায় ছিটকে পড়েছে। গোল গোল দুটো চোখ থেকে যেন ক্ষুধিত জিঘাংসার একটা অগ্নিশিখা ছুটে বেরিয়ে আসছে।

কিরীটী গায়ের জামা-কাপড় একটু ঠিকঠাক করে নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে বললে, মনে পড়ে বন্ধু! এক মাস আগে রসা রোডের মোড়ে এক গভীর রাত্রের কথা? আজও তোমার সেই ভয়ঙ্কর রাক্ষুসে রক্তলোলুপ দৃষ্টির কথা আমি ভুলিনি!

অমরবাবু, নিরঞ্জন কাঞ্জিলাল ওরফে বারীন চৌধুরী ওরফে মহীতোষ রায় চৌধুরী—কলকাতা কর্পোরেশনের কাউন্সিলার, দানেধ্যানে প্রাতঃস্মরণীয় ডাঃ এন. এন. চৌধুরী, চেতলার অবসরপ্রাপ্ত আলিপুর জেলের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডাঃ অমিয় মজুমদার, রাণাঘাট লোকাল ট্রেনের সেই হতভাগ্য যুবকের হত্যাকারী নরখাদককে আপনার হাতে তুলে দিলাম।

ঘরের মধ্যে যেন মৃত্যুর মতই স্তব্ধতা থম্‌থম্‌ করছে।

সহসা বারীনবাবু বলে উঠল, কিরীটী রায়, তুমি আমায় ধরবে বটে! বলতে বলতে বিদ্যুৎবেগে সে উঠে দাঁড়াল এবং চোখের পলকে ঘর থেকে ছুটে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেল।

ঘটনার আকস্মিকতায় সকলেই স্তম্ভিত হয়ে গেল। কী করে যে ইতিমধ্যে সকলের অলক্ষ্যে সে তার হাতের বাঁধন খুলে ফেলেছিল কেউ তা টের পায়নি।

আসলে বারীনের হাতের কবজিতে একটা তীক্ষ্ণ ছুরি বাঁধা থাকত, তার সাহায্যে সে সকলের অলক্ষ্যে বাঁধন কেটে ফেলেছিল।

সমস্ত পুরী শহরটা তন্নতন্ন করে খুঁজেও মহীতোষের সন্ধান পাওয়া গেল না।

কলকাতায় সুব্রতকে ইতিপূর্বেই সকল কথা জানিয়ে কিরীটী তার করে দিয়েছিল। মহীতোষ সেখানেও যায়নি।

দিন পাঁচেক পরের কথা।

পরদিন সকলে কলকাতার পথে যাত্রা করবে।

রাত্রি তখন বোধ করি সাড়ে নটা। অন্ধকার রাত্রি। সকলে সাগরের তীরে বসে আছে। অন্ধকারে উলঙ্গ সাগর ক্রুদ্ধ দানবের মত গর্জাচ্ছে।

আকাশে তারাগুলি মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে আর নিভছে।

ডাঃ চক্রবর্তীই প্রশ্ন করলে, বারীনবাবুকে কি তুমি প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলে কিরীটী?

কিরীটী বললে, তবে শোন। মানুষের প্রতিভা যখন বিপথে যায় তখন এমনি করেই বুঝি ধ্বংসের মুখে ছুটে যায়। মানুষের খেয়ালের অন্ত নেই। বারীনবাবুর মত লোকেরা মানুষের দেহে শয়তান। এ একটা মানসিক বিকার। বিকৃত-মস্তিষ্কের একটা অদ্ভুত পৈশাচিক অনুভূতি। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় ইদানীং কিছুকাল ধরে কলকাতার উপরে যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলছিল তার সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। শুধু যে খুন করে রক্ত দেখবার একটা নেশাতেই মহীতোষ খুন করত তা নয়। পিছনে তার অতীত জীবনের কিছুটা সম্পর্কও ছিল। বিখ্যাত ডাঃ অমিয় মজুমদার খুন হবার কিছুকাল পরেই সুব্রতর সাহায্যে মহীতোষের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে কেবলই আমার মনে হত যে, তার মত অদ্ভুত শিক্ষিত বিকৃত-মস্তিষ্ক ইতিপূর্বে আর আমি দেখিনি এবং সেই থেকেই তার প্রতি আমি নজর রাখি।

মহীতোষ সম্পর্কে খোঁজ করতে করতে জানতে পারি, কলকাতা শহরে কেউ তার পাঁচ বছর পূর্বেকার জীবনের কোন কথাই জানেনা এবং জানবার চেষ্টাও করেনি। লোকটা যেন হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছিল। ডাঃ অমিয় মজুমদারের খুনের দিন মহীতোষের চোখের যে দৃষ্টি আমি সহসা দেখেছিলাম, অন্তরের অন্তস্থলে তা আমার গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। এখানে মহীতোষের চোখের তারার সেই দৃষ্টিই খুঁজে পেয়েছিলাম সেইদিন যেন। আমি মহীতোষের পূর্ব-জীবনের সন্ধান করতে শুরু করলাম এবং কেমন করে সব কথা আমি অনুসন্ধানের

ফলে জানতে পেরেছিলাম তাও আমি বলব।

তোমার আহ্বানে আমি যখন পুরীতে এলাম, প্রথম দিনই হঠাৎ দূর থেকে বারীনবাবুকে দেখে আমি যেন চমকে উঠলাম। মুখে সাদা দাড়ি, চোখে রঙীন কাচের চশমা, কেবলই যেন মনে হতে লাগল এমনি লম্বা চেহারার একজনকে কোথায় দেখেছি। এমনি চলার ভঙ্গি, এমনি কণ্ঠস্বর, এমনি হাসি। কেন যেন কেবলই আমার মনে হত বৃদ্ধের ছদ্মবেশের অন্তরালে যেন কোন একটা পরিচিত চেনা লোক লুকিয়ে আছে। সহসা একদিন এমন সময় আচমকা কয়েক সেকেণ্ডের জন্য বারীনের চশমাহীন চোখ আমি তার অজ্ঞাতেই দূর থেকে দেখেছিলাম। সে দৃষ্টি তো আমার ভুলবার নয়, চকিতে মনের কোণে সন্দেহের বিদ্যুৎ জেগে উঠল। আমি সতর্ক হয়ে উঠলাম এবং সেই থেকেই একটা চিন্তা আমার মনে কেবলই ঘুরপাক খেতে লাগল, এই ছদ্মবেশে মহীতোষ এখানে কেন?...

ইতিপূর্বে মহীতোষের পূর্ব ইতিহাস আমি অনেকটা অনুসন্ধানের ফলে সংগ্রহ করেছিলাম। মহীতোষের আসল নাম নিরঞ্জন কাঞ্জিলাল। ওর জন্ম হয় সামান্য এক ঘাতকের ঘরে এবং সে কথা আমি জানতে পারি ওর অনুপস্থিতিতে একদিন রাত্রে ওর শোবার ঘরে হানা দিয়ে, দেওয়ালে টাঙানো এক এনলার্জড় ফটো দেখে। ওর ঠাকুর্দা ছিল আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের ঘাতক। ছবিটি তারই। যেসব হতভাগ্যদের ফাঁসির হুকুম হত, তাদের ফাঁসির দড়িতে লটকাবার কাজ করত প্রথমে ওর ঠাকুর্দা, পরে ওর পিতা। পুরুষানুক্রমে ওরা ওই ঘাতকের ব্যবসা করত। ওর বাপ রামশরণ কাঞ্জিলালকে একপ্রকার বাধ্য হয়েই পিতার ব্যবসা গ্রহণ করতে হয়েছিল শিক্ষার অভাবে। কিন্তু বোধ হয় নিরঞ্জনের বাপ সে কাজ ঘৃণা করত এবং সেই জন্যই হয়ত সে তার পুত্রকে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলে।

নিরঞ্জন কাঞ্জিলাল কলিকাতা ইউনিভার্সিটি থেকে এম. এ. পাস করে পাটনায় প্রফেসারী করত। কিন্তু রক্তের যা ঋণ, তার দাবি বড় ভয়ানক। সে ভয়ঙ্কর পৈশাচিক কর্মের অনুভূতি তার পিতা ও ঠাকুর্দার রক্তের মধ্যে প্রবাহিত ছিল, সেটা নিরঞ্জন কাঞ্জিলালের রক্তেও সংক্রামিত হয়েছিল। খুন করবার একটা দুর্জয় লালসা ও পৈশাচিক অনুভূতি নিরঞ্জনের অবচেতন মনের মধ্যে প্রথমে ক্রমে ক্রমে প্রভাব বিস্তার করতে থাকে। সে তার শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও সেই অবচেতন পশুমনের পৈশাচিক অনুভূতির কাছে আপনার অজ্ঞাতেই আপনাকে ধরা দিতে বাধ্য হয়েছিল। দুই পুরুষের রক্তের ঋণ তাকেও শোধ করতে হল। এ ছাড়া তার আর উপায় ছিল না এবং পরে সে এইভাবে সংক্রামিত হয়ে খুন করে একটা পৈশাচিক আনন্দ অনুভব করত।

একবার রাঁচি শহরে ওইভাবে কোন এক ভদ্রলোককে খুন করতে গিয়ে ও ধরা পড়ে, বিচারে ওর পাঁচ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয় এবং ওকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়। সেই সময় গগনেন্দ্রনাথ আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের জেলার ছিলেন। যা হোক জেল থেকে মুক্তি পাবার পর নিরঞ্জন আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। কিন্তু তার শিক্ষা হয়ত তার সেই অবচেতন প্রবৃত্তির সামনে এসে শিক্ষা ও প্রকৃতিগত পৈশাচিকতার সঙ্গে বাধায় সংঘর্ষ। অবশেষে শয়তানেরই হয় জয়। রক্তের ঋণ! রক্তের ঋণ! নিরঞ্জনের মুখ চেনা বলেই সেদিন গগনেন্দ্রনাথ ওই কথা বলেছিলেন। তাকে হয়ত হঠাৎ চিনতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর মুখ দিয়ে ওকথা বের হয়েছিল।

ছদ্মবেশেও নিরঞ্জন আপনাকে গগনেন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতে পারেনি এবং নিরঞ্জনও ব্যাকুল হয়ে ওঠে, কেননা গগনেন্দ্রনাথকে ইহসংসার থেকে সরাবার মতলবেই

সে পুরীতে তার পিছু পিছু ধাওয়া করে এসেছিল। ডাঃ অমিয় মজুমদারও পাটনায় প্রথম জীবনে ডাক্তারী করতেন ও হয়ত নিরঞ্জনকে চিনতেন। ডাঃ এন. এন. চৌধুরীও নিরঞ্জনের বাপকে ও তাকে চিনতেন। আলিপুরের সুপারও তাকে চিনতেন। নিরঞ্জন যখন ছদ্মনামে ছদ্মবেশে নতুন জীবন শুরু করল, তার স্বতই মনে হল তার চেনা লোকদের না সরাতে পারলে হঠাৎ হয়ত কোন একদিন তার আসল ও সত্যকারের পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়বে। ফলে তার সব স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে। সেও একটা কথা এবং তার প্রকৃতিগত পৈশাচিকতা দুটোতে মিলে তাকে খুনের নেশায় মাতিয়ে তুলল।

কিন্তু সে আশা করেনি হয়ত যে, গগনেন্দ্রনাথ তার ছদ্মবেশের ভিতর থেকেও তাকে চিনতে পারবেন। ফলে নিরঞ্জন মরীয়া হয়ে উঠল এবং সুযোগ খুঁজতে লাগল। সুযোগ মিলেও গেল হঠাৎ। বারীনকে আমি সন্দেহ করলেও আমার মনে তখনও একটা সন্দেহের কাঁটা খচ খচ করছিল, কিন্তু তার evidence শোনবার পর আর কোন সন্দেহ রইল না। বুঝলাম এ সেই নিরঞ্জন কাঞ্জিলাল এবং এই গগনেন্দ্রনাথের হত্যাকারী। কাঞ্জিলাল তার evidence -এ দুটি মাত্র ভুল করেছিল, যাতে করে আমার চোখের দৃষ্টি খুলে যায় ও সমস্ত সন্দেহ মিটে যায়। এক নম্বর হচ্ছে, সে পলায়নপর খানসামার বেশভূষার নিখুঁত description দিলে, অথচ তাকে চিনতে পারলে না এবং ভুলে গিয়েছিল যে সে চোখের ব্যারামের অজুহাতে রঙীন কাচের চশমা ব্যবহার করছে! ২ নং সে ভুল করে, সিরিঞ্জটা ডাক্তারের ঘরে রাখতে গিয়ে প্রথমেই কিশোরের ঘরে গিয়ে ঢোকে। সে আগে থাকতেই ওদিন কোন এক সময় ডাক্তারের ব্যাগ থেকে সিরিঞ্জ ও ঔষধের শিশিটা চুরি করেছিল, পরে খানসামার বেশ পরে গগনেন্দ্রনাথকে হত্যা করে তাড়াতাড়ি ভুল করে ডাঃ চক্রবর্তীর ঘর ভেবে কিশোরের ঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ে। ডাঃ চক্রবর্তী তখন নিজের ঘরে শুয়ে জ্বরের ঘোরে গোঙাচ্ছেন। টের পাননি। কিন্তু ইনজেকশন দেবার সময় নিশ্চয়ই গগনেন্দ্রনাথ বাধা দিয়েছিলেন, এবং তাতেই গোলমাল শোনা যায়, যতীনবাবু ভেবেছিলেন গগনবাবু বুঝি নিত্যকারের মত ভৃত্যকে গালাগাল করছেন। পরে গগনেন্দ্রনাথকে খুন করে বারীন যখন সিরিঞ্জ রেখে আসে ডাঃ চক্রবর্তীর ঘরে, ডাঃ চক্রবর্তীও টের পাননি। তারপর বারীন তার খানসামার বেশ বদল করে নিজ বেশে এসে যতীনবাবুকে বেড়াতে যাবার জন্য আহ্বান করে ও দুজনে বেড়াতে বের হন। এবং বারান্দার সামনে দিয়ে যাবার সময় যতীনবাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিরঞ্জন গগনেন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলবার অভিনয় করে। আসলে কিন্তু তার কথায় গগনেন্দ্রনাথ কোন জবাবই দেননি। কিন্তু অন্যমনস্ক যতীনবাবু সেটা বুঝতে পারে নি। তাছাড়া আগেই বলেছি, যতীনবাবুর দৃষ্টিশক্তি তত প্রখর নয়। বারীন নিজের মনগড়া ভাবে যতীনবাবুকে বুঝিয়ে দেয় ও বলে, দেখলেন, ভদ্রলোক জবাবটা পর্যন্ত ভাল করে দিলেন না! যতীনবাবুও তাই বুঝে চুপ করে রইলেন। তিনিও জানতেন যে গগনেন্দ্রনাথ অভদ্র ও বদমেজাজী। তা ছাড়া তিনি তো তখন জানতেন না যে গগনেন্দ্রনাথ মৃত!

কিশোরের স্বপ্নও মিথ্যা নয় বা সেটা delirium -ও নয়। সে দেখছিল একজন সাদা পোশাক পরা পরী তার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে তার বিকৃত স্বপ্নাতুর কল্পনায় বারীনের খানসামার সাদা পোশাককে পরীর পোশাক বলে ভুল করেছিল। কিন্তু এই প্রমাণেই তো তাকে দোষী বলে ধরা যায় না। আমি প্রথম যেদিন তাকে রসা রোডে রাত্রে দেখি, সে তাড়াতাড়ি পালাবার সময়, তার নামের আদ্যক্ষর 'এন' লেখা রুমালটা ফেলে যায়। তাছাড়া তার আঙুলের ছাপ কায়দা করে নিয়েছি ও সেটা কলকাতায় কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়েছিলাম,

সেখানকার অপরাধীদের ফাইলে রক্ষিত আঙুলের ছাপের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে। ডাঃ চক্রবর্তীর সিরিঞ্জের গায়েও তার আঙুলের ছাপ ছিল, সেটাও নেওয়া হয়েছিল। সব হুবহু এক, মিলে গেছে। আমারই ভুল হয়েছিল তাকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে আলোচনা করা। তা না হলে হয়ত সে পালাবার সুযোগ পেত না।

কিরীটী চুপ করলে। অদূরে অন্ধকারে সমুদ্রের কালো কালো ঢেউগুলো সাদা ফেনার উচ্ছ্বাস বুকে নিয়ে যেন ক্রুদ্ধ গর্জনে এদিকে ছুটে আসছে।

তুমি কি সত্যই কোণারকে গিয়েছিলে কিরীটী? অমিয় জিজ্ঞাসা করল।

কিরীটী জবাব দিল, না। কলকাতায় বারীনের আসল ইতিহাসের খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম। কিন্তু বারীন যে এত তাড়াতাড়ি খুন করবে তা ভাবতে পারিনি।

মোমের আলো

।। এক ।।

সারাটা রাত ধরে যেমন ঝড় তেমনি বৃষ্টি।

অবিশ্রান্ত বর্ষণের সঙ্গে সোঁ সোঁ হাওয়া।

আর সেই সঙ্গে ছিল থেকে থেকে মেঘের গুরু গুরু ডাক।

ঐ ঝড় জল বৃষ্টির মধ্যেই কোন এক সময় সম্ভবত ঘটনাটা ঘটেছে বলে অবনী সাহার ধারণা।

নাইট ডিউটি ছিল সুশান্ত চ্যাটার্জির।

ট্রেনের গার্ড সুশান্ত চ্যাটার্জি।

আগের দিন সকালে বের হয়ে গিয়েছিল ডিউটি দিতে, ফিরেছে পরের দিন খুব ভোরে।

ট্রেনটা ইন করেছিল অবিশ্যি রাত আড়াইটে নাগাদ এবং ডিউটিও সুশান্তর তখন শেষ হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তখনো সে ফেরেনি, রেস্টিং রুমে নাকি সকাল হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিল।

পরে ভোর সাড়ে পাঁচটা নাগাদ সুশান্ত কোয়ার্টারে ফিরে এসেছে এবং ঘরে ঢুকেই থমকে নাকি দাঁড়িয়ে গিয়েছিল সে, শয্যায় শায়িতা স্ত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে।

ওর স্ত্রী শকুন্তলা অবিশ্যি বেশ দীর্ঘকাল ধরেই নানা রোগে ভুগছিল এবং ইদানীং প্রায় শয্যাশায়ীই থাকত।

সংসারের কাজকর্ম কিছুই সে করতে পারত না।

মেজাজটাও যেন কেমন খিট্‌খিটে হয়ে উঠেছিল এবং নিজে বেশির ভাগ সময়ই অসুস্থ থাকত বলে ঘরের কাজকর্ম দেখার জন্য মাস-ছয়েক আগে মিত্রাণীকে নিয়ে এসেছিল নিজেই স্বামীকে অনুরোধ করে মালদহ থেকে।

সুশান্ত নাকি প্রথমটায় রাজী হয়নি।

অবশেষে স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে রাজী হয়েছিল।

শকুন্তলার দূরসম্পর্কীয়া বোন মিত্রাণী।

মালদহে ছিল, সেখান থেকেই তাকে আনানো হয়েছিল।

বাড়িতে প্রাণীর মধ্যে চারজন।

সুশান্ত—তার বৃদ্ধ হাঁপানির রোগী বাপ সুকান্ত, আট বছরের একটি ছেলে রাহুল, রুগ্না স্ত্রী শকুন্তলা আর ইদানীং মাস-ছয়েক হয় এসেছিল ওদের সংসারে মিত্রাণী—শকুন্তলার দূরসম্পর্কীয়া বোন।

সুশান্তর চিৎকারেই মিত্রাণী রান্নাঘর থেকে দৌড়ে আসে।

কি—কি হয়েছে জামাইবাবু? মিত্রাণী জিজ্ঞাসা করে।

মিত্রা, তোমার দিদি—সুশান্ত তার কথা শেষ করতে পারে না।

কি হয়েছে দিদির?

মিত্রাণী তখনও ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি।

মনে হচ্ছে বেঁচে নেই—দেখ—

সে কি। না না—মিত্রাণী তার দিদি শকুন্তলার মুখের দিকে তাকিয়ে যেন একটা অস্ফুট

আর্তনাদ করে ওঠে।

হ্যাঁ, ছুঁয়ে দেখ, একেবারে ঠাণ্ডা—বরফ! মনে হচ্ছে সী ইজ ডেড—মারা গেছে—

সুশান্তর কথায় মিত্রাণী যেন একেবারে বোবা পাথর হয়ে গিয়েছিল।

কী একটা অজ্ঞাত আতঙ্কে তার সমস্ত দেহ যেন তখন একেবারে হিম হয়ে গিয়েছে।

মিত্রাণী ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে যেন বোকার মতই কিছুক্ষণ সামনের দিকে।

শকুন্তলা এমনিতেই রীতিমত ফরসা, তার উপর দীর্ঘদিন ধরে ভুগে ভুগে কেমন যেন মোমের মত ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল।

রক্তহীন ফ্যাকাশে।

গালটা ভেঙে তুবড়ে গিয়েছিল। সেই তোবড়ানো গালে কোটরগত চোখের তারা দুটো যেন কি এক অজ্ঞাত জিজ্ঞাসায় ঠেলে বের হয়ে এসেছে।

শুধু জিজ্ঞাসা নয়, তার সঙ্গে যেন একটা বিভীষিকাও জড়িয়ে আছে।

রুক্ষ মাথার পর্যাপ্ত চুল বালিশের উপর পড়ে আছে।

ডান হাতটা দেখা যাচ্ছে না।

বাঁ হাতটা অসহায়ভাবে বালিশের উপর পড়ে আছে।

আর সেই হাতের পাশেই পড়ে আছে একটা ছোট শিশি।

লাল লেবেল আঁটা শিশির গায়ে লেখা ইংরেজীতে—পয়জন।

শকুন্তলা যে তখন আর বেঁচে নেই, সে যে মরে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে—সেটা বুঝতে মিত্রাণীরও কষ্ট হয়নি।

শকুন্তলার মুখের দিকে তাকাবার পরই সেটা বুঝতে পেরেছিল।

এবং বিষের শিশিটা তার পাশেই শয্যার উপর তখনও পড়ে আছে। এটা বুঝতে কষ্ট হয় না, শকুন্তলা ঐ মালিশের ঔষধটা খেয়েই মারা গিয়েছে।

সত্যি সত্যিই মারা গিয়েছে, না আত্মহত্যা করেছে তার দিদি শকুন্তলা!

আত্মহত্যা? শকুন্তলা—তার দিদি আত্মহত্যা করেছে! কিন্তু কেন আত্মহত্যা করেছে? হঠাৎ যেন একটা কথা মনে হয় মিত্রাণীর।

কাল রাত্রে—

কাল রাত্রে শোবার আগে—

আকাশে প্রচণ্ড মেঘ করেছিল।

মেঘে মেঘে একেবারে আকাশটা কালো কালির মত হয়ে উঠেছিল যেন, মিত্রাণীর মনে পড়ছে।

বৃষ্টি হয়ত এখুনি নামবে।

তাই শোবার আগে মিত্রাণী কাজকর্ম সেরে তার দিদির ঘরে এসেছিল জানলাগুলো বন্ধ করে দিতে।

শকুন্তলা তখনো জেগেই ছিল।

যদিও রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা।

রাহুল অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছে। পাশের ঘরে সুশান্তর বাবার থেকে থেকে কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

শকুন্তলা যে তখনও ঘুমোয়নি মিত্রাণী সেটা জানত।

ইদানীং মাস-দুই প্রায়—বলতে গেলে শকুন্তলা সারাটা রাত ধরে জেগেই থাকত।

ঘুম একটা তার বড় হত না।

প্রথম প্রথম ঘুমের ঔষধ দিত, ইদানীং কিছুদিন কী যে হয়েছিল শকুন্তলার, ঘুমের ঔষধ কিছুতেই খেতে চাইত না।

সারারাত জেগে থাকবে তবু ঔষধ খাবে না কিছুতেই। জিদ ধরে থাকত।

ঘুমের ঔষধের কথা বললেই বলত, না, খাবো না, ঘুমের ঔষধ আমি খাবো না—

সুরেন ডাক্তার দীর্ঘদিনের পরিচিত ওদের।

সে হয়ত বলেছে, কেন—কেন খাবেন না?

না, খাবো না—চেঁচিয়ে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছে শকুন্তলা।

খেলে ঘুম হবে, ঘুমোতে পারলে দেখবেন অনেকটা সুস্থবোধ করছেন আপনি মিসেস চ্যাটার্জি। আপনার ঘুমের দরকার।

ডাক্তার বার বার চেষ্টা করেছেন।

না না, আমি খাব না, আপনি জানেন না—

সেই জিদ আর আপত্তি।

কি জানি না? ডাক্তার শুধিয়েছেন।

আসুন না, একটু কাছে সরে আসুন বলছি—

শকুন্তলা তখন বলেছে।

কৌতূহলে সুরেন ডাক্তার একটু কাছে এসে শুধিয়েছেন, কি বলুন তো?

সুবিধা—

সুবিধা!

হুঁ।

কি বলছেন?

সুবিধা হবে যে ওদের—

কাদের? কাদের সুবিধা হবে? সুরেন ডাক্তার আবার শুধিয়েছেন।

কেন, আমার স্বামীর আর ঐ কালসাপিনীর।

কি বলছেন আপনি মিসেস চ্যাটার্জি?

ঠিকই বলছি। ঘুমের মধ্যে ওরা আমাকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলবে—

না না, তাই কি হয়!

হয়, হয়—আপনি জানেন না।

সুরেন ডাক্তার বলেছেন, আপনি আবোলতাবোল ভাবছেন।

আবোলতাবোল ভাবছি, তাই না? আপনি জানেন না ডাক্তারবাবু, ওরা সেই সুযোগের অপেক্ষায়ই তো আছে। আর সেইজন্যই তো আমি ঘুমোই না, সারা-রাতই জেগে থাকি—চোখ মেলে।

ছি, কি যে বলেন মিসেস চ্যাটার্জি আপনি। মিঃ চ্যাটার্জি আপনাকে কত ভালবাসেন—

ভালবাসেন! হুঁ! দিন পল মুহূর্ত গুনছে—কখন কবে আমি শেষ হয়ে যাব, কবে ও মিতুকে বিয়ে করবে—

সত্যি, ঐ এক ধারণা হয়ে গিয়েছিল ইদানীং শকুন্তলার।

সুশান্ত আর মিত্রাণী—ওরা যেন দিবারাত্র ঐ চিন্তাই করছে।

কবে মরবে রুগ্না শকুন্তলা, আর ওরা নিশ্চিন্ত হয়ে হাত ধরাধরি করে হাসতে হাসতে সাজগোজ করে রেজিস্ট্রী অফিসে গিয়ে বিয়ে করে আসবে!

কথাটা সুশান্তই বলেছিল তার জবানবন্দিতে যেদিন থেকে মনের মধ্যে শকুন্তলার ঐ ধারণাটা বাসা বেঁধেছে—মনের মধ্যে যেন একটা বিষের ধোঁয়া পাক খেয়ে খেয়ে ফিরেছে।

প্রথম প্রথম মুখভার করে থেকেছে, তারপর একটু-আধটু হাবভাবে প্রকাশ করতে শুরু করেছে এবং ইদানীং মাস-দেড়েক হবে স্পষ্টাস্পষ্টিই তো বলতে শুরু করেছিল।

সুশান্তকে বলেছে, ভাবো বুঝি না—না? তোমাদের মনের কথাটা বুঝতে পারি না—না? রোগে জীর্ণ হয়ে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছি একটা ঘরের মধ্যে, তোমরা কি কর না কর কিছু টের পাই না, চোখে দেখি না বলে কানেও শুনি না?

সুশান্ত প্রথম প্রথম জবাব দেয়নি।

মৃদু মৃদু হেসেছে কেবল।

কখনও কখনও হয়ত কৌতুক করে বলেছে, টের পাও সব, না কুন্তু?

হ্যাঁ হ্যাঁ—সব—সব টের পাই। দিন গুনছো কবে এ আপদ মরবে, আর তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে হাত-ধরাধরি করে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে বিয়ে করে আসবে।

কী করে বুঝলে বল তো? পুনরায় কৌতুকভরে শুধিয়েছে সুশান্ত স্ত্রীকে।

ও বুঝতে হয় না, বুঝলে? তোমরা পুরুষগুলো এত হ্যাংলা, নিষ্ঠুর, এত স্বার্থপর, এত নির্লজ্জ যে একটা অন্ধেরও সেটা চোখে পড়ে—

কার কার চোখে পড়েছে বল তো?

সবার—পৃথিবীসুদ্ধ সবার চোখে পড়েছে।

বল কি! সবাই তাহলে জেনে ফেলেছে ব্যাপারটা?

হ্যাঁ। কিন্তু জেনো, তা আমি হতে দেবো না। তোমাদের ওই সুখের আশায় আমি ছাই দিয়ে দেবো।

বেশ, তাই দিও।

দেবোই তো। এই মরা কঙ্কালসার দেহ নিয়েই আমি বেঁচে থাকব। আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন তো আর বিয়ে করতে পারবে না!

কেন পারব না? সুশান্ত কৌতুক করে বলেছে, যদি আমি ডিভোর্স করি তোমায় অসুস্থ পঙ্গু বলে?

তাহলে—তাহলে তোমাকে আমি ঠিক জেনো তার আগে ফাঁসিকাঠে চড়াবার ব্যবস্থা করে যাব। নতুন করে আবার তুমি ঘর বাঁধবে তা আমি হতে দেব না—না—

অবশেষে শকুন্তলার ঐ মনোবিকৃতিতে ক্লান্ত হয়ে বলেছিল একদিন সুশান্ত, আচ্ছা এ পোকা তোমার মাথার মধ্যে কেমন করে ঢুকল বল তো কুন্তু? মিত্রাণীকে আমি বিয়ে করব এ তুমি কেমন করে ভাবতে পারলে?

তুমিই তো ভাবিয়েছ?

আমি?

হ্যাঁ হ্যাঁ—তুমি। কিসের তোমাদের অত হাসাহাসি, কিসের অত ফুসুরফুসুর গুজুরগুজুর কথা সর্বক্ষণ!

কে বলেছে তোমায় ঐ কথা?

মিথ্যা—মিথ্যা বলতে চাও?

আচ্ছা তুমি কি সত্যি-সত্যিই পাগল হলে কৃষ্ণ! সুশান্ত বলেছে।

পাগল? তাই হতে পারলেই বোধ হয় ভাল হত!

আচ্ছা তোমার কি ধারণা বল তো? দুটো কথা কারো সঙ্গে বললেই—

বুকে হাত দিয়ে বল তো, সে কেবলমাত্র কথাই, আর কিছু নয় তোমার?

সুশান্ত চুপ করে থেকেছে।

কী, চুপ করে রইলে কেন? বল, তোমাদের মনে সত্যিই কোন পাপ নেই?

বিশ্বাস কর, সত্যিই—

তোমার ছেলের মাথায় হাত দিয়ে বলতে পার, তোমাদের দুজনের পরস্পরের মধ্যে—

কৃষ্ণ, তুমি সর্পে রজ্জুভ্রম করছো—

ঐ সাপই তোমায় একদিন দংশন করবে জেনো।

।। দুই।।

অবনী সাহা বলছিল কিরীটীকে।

ব্যাপারটা যদিও প্লেন ও সিম্পল সুইসাইড কেস বলেই সকলের ধারণা হয়েছে, তবু কেন যেন অবনী মনে মনে ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে পারেনি।

অথচ মনের কথাটা কাউকে খুলেও বলতে পারে না।

হঠাৎ মনে পড়েছিল থানায় বসে কেসটার ডাইরী লিখতে লিখতে কিরীটীর কথা।

সন্ধ্যাবেলা তাই সোজা চলে এসেছিল কিরীটীর ওখানে।

কিরীটী তার বসবার ঘরে নিত্যকার মত দাবার ছক সাজিয়ে নিয়ে কৃষ্ণার সঙ্গেই খেলছিল।

আগে আগে কৃষ্ণার ঐ দাবা খেলাটা আদৌ ভাল লাগত না, কিন্তু ইদানীং বোধ হয় দাবা খেলায় রস পেতে শুরু করেছিল সে।

কিরীটী ডাকলেই বসে পড়ত টুলটা টেনে।

কিরীটীর অবিশ্যি তাতে করে সুবিধাই হয়েছে।

সে বলে, যাক, দাবাটা তাহলে নেহাত তোমার কাছে এখন একেবারে নিরস ব্যাপার বলে মনে হয় না কৃষ্ণা?

না।

কিন্তু কি করে এই অঘটন সম্ভবপর হল বল তো?

কি করে আবার? সঙ্গদোষে?

কৃষ্ণা হাসতে হাসতে বলেছে।

যা বলেছ। সঙ্গদোষে সাধুও চোর হয়ে যায়।

তা যায়, আবার চোরও সাধু হয়।

কিন্তু এবারে তোমার মন্ত্রী সামলাও, বোড়ের চাল দিতে দিতে কিরীটী বলে।

তার আগে এই নাও কিস্তি।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে শ্রীমান জংলীর আবির্ভাব, বাবু!

কিরীটী বিহ্বলভাবে তখন কিস্তি সামলাতে ব্যস্ত।

মুখ না তুলেই বললে, আজ্ঞা করুন—

আজ্ঞে, অবনীবাবু এসেছেন।

কিরীটী পূর্ববৎ খেলার দিকে নজর রেখে বলে, কোন্ অবনী—সেন, চাটুয্যে, বাঁড়ুজ্যে, না মিত্তির, না সাহা—

জিজ্ঞাসা করিনি তো!

জিজ্ঞাসা করে এস তা হলে।

বাইরেই দাঁড়িয়ে আছেন আজ্ঞে।

জবাব দিল এবারে কৃষ্ণা, বললে, যা। ঘরে নিয়ে আয়।

জংলী বের হয়ে গেল।

বেলেঘাটা থানার ইনচার্জ অবনী সাহা প্রবেশ করল একটু পরেই ঘরে।

কি ব্যাপার? কিরীটী শুধায় এবং বলে, বসুন।

একটু দরকার ছিল।

কৃষ্ণা ততক্ষণে উঠে পড়েছে।

কৃষ্ণা, দু কাপ চা—অবনীবাবু চলবে তো?

আপত্তি নেই।

কৃষ্ণা অন্দরে অদৃশ্য হল।

পাইপটা ইতিমধ্যে নিভে গিয়েছিল। নতুন করে পাইপের গহ্বরে টোবাকো ঠাসতে ঠাসতে কিরীটী তাকাল অবনীর মুখের দিকে, মনে হচ্ছে যেন মিঃ সাহা, কোন জটিল সমস্যায় পড়েছেন?

না, সেরকম কিছু না, তবে—

তবে?

আমার এলাকায় একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে। অবিশ্যি কাল রাত্রে কোন এক সময়। ডিটেকটেড হয়েছে আজ ভোর পাঁচটায়।

কি ব্যাপার—খুনটুন নাকি?

কিরীটী পাইপটায় লাইটারের সাহায্যে অগ্নিসংযোগ করল।

আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্যি মনে হচ্ছে আত্মহত্যাই—এ কেস অফ সুইসাইড। তবে—

আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে, আপনার মনটা যেন একটু খুঁতখুঁত করছে!

তাই।

স্ত্রী না পুরুষ?

স্ত্রী।

বয়স কত?

ওর স্বামীর স্টেটমেন্ট অনুযায়ী এই সাতাশ-আটাশ হবে।

তাহলে বিবাহিত?

হ্যাঁ।

জংলী দু কাপ চা নিয়ে এল ট্রেতে করে ঐ সময়।

একটা কাপ কিরীটী নিজে তুলে নিল, অন্যটা অবনীর দিকে এগিয়ে দিল, নিন।

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কিরীটী বলে, স্বামীটী কেমন? তার সঙ্গে কথাবার্তা

হয়েছে?

হয়েছে। সুশান্ত চ্যাটার্জি। ক্রিশ্চান, রেলের গার্ড, বেলেঘাটার কোয়ার্টারে থাকে।

বাড়িতে কে কে আছে আর?

স্ত্রী শকুন্তলা আজ বছর দুই থেকে নানা রোগে ভুগছিল, বেশীর ভাগ সময়ই শয্যাগত থাকত এবং ইদানীং মাস-তিনেক একেবারেই শয্যাশায়িনী হয়ে পড়েছিল। হাঁপানী রোগী বুড়ো বাপ, একটি বছর আষ্টেকের ছেলে, আর—

আর?

আর আছে মিত্রাণী বলে একটি মেয়ে।

মেয়ে?

হ্যাঁ—মানে তরুণী, এই বছর কুড়ি-একুশ হবে বয়েস। ঐ শকুন্তলারই দূর-সম্পর্কীয় বোন। ওকে আবার শকুন্তলা নিজের সুবিধার জন্যই সংসারে নিয়ে এসেছিল। তারও সংসারে কেউ নেই, কাকার গৃহে আশ্রিতের মত একধারে পড়েছিল।

হুঁ। তাহলে দুর্ঘটনার মধ্যে এক তরুণীও আছে! তা দেখতে কেমন মহিলাটি?

মহিলাটি?

হুঁ।

মিত্রাণীর চেহারার একটা মোটামুটি বর্ণনা দেন অবনী সাহা।

কালো, রোগা, ছিপছিপে.....কিন্তু কালোর উপর একটা অপূর্ব আলগা শ্রী আছে যেন মুখে ও চেহারায় মেয়েটির। অবনী বলে।

আর কিছু? কিরীটী শুধায়।

মেয়েটির আর একটি গুণ আছে—চমৎকার সেতার বাজায়।

আর?

স্বভাব শান্ত। মুখে বড় একটা কথাই নেই কখনও।

কিরীটী একটু থেমে আবার প্রশ্ন করে, বল তাহলে, যাকে বলে নিঃশব্দচারিণী।

কতকটা তাই।

হুঁ, তা ঐ সুশান্তর সঙ্গে তার শ্যালিকার সম্পর্কটি কেমন?

ঐখানেই তো আমার সন্দেহ!

কি রকম?

যদিও শকুন্তলাই বলে-কয়ে এনেছিল মিত্রাণীকে তার গৃহে—তারপর সে-ই হয়ে উঠেছিল ইদানীং একান্ত বিরূপ যেন ঐ মেয়েটির উপরে।

খুব স্বভাবিক। নারীচরিত্র তো! সন্দেহ—তাই না?

হুঁ। স্বামীকে সে সন্দেহ করতে শুরু করল, তাতেই অশান্তি ক্রমশঃ বেড়ে ওঠে।

অবশেষে ঐ দুর্ঘটনায় ঐ পরিস্থিতি তো? কিরীটী বলে।

হ্যাঁ—কিন্তু কথা হচ্ছে এখন ব্যাপারটা বাইরে থেকে সুইসাইড মনে হলেও আমার কিন্তু কিরীটীবাবু মনে হচ্ছে কেন যেন কোথায় একটা গোলমাল আছে।

তা কি অসুখে ভুগছিলেন শকুন্তলা?

সুরেন ডাক্তারের সঙ্গে আমি কথা বলেছিলাম, তিনি বললেন—প্রথম দিকে ফ্লুতে ভুগছিলেন, পরে ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছিল সম্পূর্ণ নিউরটিক—

কি রকম?

আসলে তাঁর মানে ডাক্তারের মতে কোন রোগই ছিল না, অথচ শকুন্তলা দেবীর ধারণা হয়ে গিয়েছিল, পা দুটো তার প্যারালিসিস হয়ে গিয়েছে। কোন শক্তি নেই পায়ে। হাঁটা-চলা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্পূর্ণভাবে শয্যাশায়িনী হয়ে পড়েছিল।

তারপর?

সুরেন ডাক্তার তাকে বোঝাবার অনেক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু শকুন্তলা দেবীকে কিছুতেই বোঝাতে পারেননি যে তাঁর পায়ে কোন রোগ নেই। ইচ্ছা করলেই তিনি হাঁটতে পারবেন।

মানসিক রোগ এক এক সময় এমনিই কঠিন হয় বটে। আচ্ছা অবনীবাবু—

বলুন?

সুশান্ত ও মিত্রাণীর মধ্যে রিলেশানটা কেমন?

যতদূর জানতে পেরেছি খুব প্রীতির এবং স্নেহের। শ্যালিকা ও ভগ্নীপতির যেমন হয়।

হুঁ। তা মিত্রাণীর জবানবন্দি থেকে কিছু জানা গেল না?

অবনী প্রশ্ন করেছিলেন নানাভাবে মিত্রাণীকে।

আপনি তার সেবা-শুশ্রূষা করতেন?

হ্যাঁ।

যদিও ইদানীং মিত্রাণীকে একেবারে সহ্য করতে পারত না শকুন্তলা, তথাপি একমুহূর্ত মিত্রাণীকে না হলে চলতও না শকুন্তলার।

কেবলই থেকে থেকে ডেকে উঠত,—মিতা—মিতা—

মিত্রাণী ছুটে ছুটে আসত, ডাকছিলে দিদি?

কি করা হচ্ছিল মহারাণীর? গলা চিরে গেল ডেকে ডেকে—সাড়া নেই—

দুধ এনে দেবো, খাবে?

দুধ! এক বাটি বিষ এনে দাও। তাই তো মনে মনে চাইছ তোমরা সর্বক্ষণ—কখন এ আপদ মরবে!

মিত্রাণী মৃদু মৃদু হেসেছে।

গায়ে মাখেনি কোন তিরস্কার মিত্রাণী তবু।

দুধ এনে বলেছে, খেয়ে নাও দিদি দুধটা।

আগে ঐ বিড়ালকে একটু দে ঐ দুধ থেকে, তারপর খাব। কই, দে।

ভয় নেই তোমার, এতে বিষ নেই।

যা বলছি তাই শোন্।

শেষ পর্যন্ত বিড়ালকে দুধ খাওয়াবার পর তবে সেই দুধ খেয়েছে শকুন্তলা।

কখনও আবার জিজ্ঞাসা করেছে, কাল সারারাত ধরে অত ফুসুরফুসুর কার সঙ্গে করছিলি?

কার সঙ্গে আবার করব? মিত্রাণী বলেছে।

ঢাকবার চেষ্টা করিস না মিতা, তোর জামাইবাবুর সঙ্গে আমি জানি সারারাত কথা বলেছিস!

জামাইবাবুর তো কাল নাইট-ডিউটি ছিল।

দেখ্, মিথ্যা বলিস না। আমি জানি ও কাল ডিউটিতেই যায়নি।

মিত্রাণী আর কি বলবে, চুপ করে থেকেছে।

চুপ না করে থাকা ছাড়া আর উপায়ই বা কি!

তারপর? কিরীটী শুধায়।

অবনী বলল, এ ধরনের টর্চারের একটা সীমা আছে। তাই আমার মনে হয়—হয়ত ঐ সুশান্ত, শকুন্তলার স্বামী, শেষ পর্যন্ত ডেসপারেট হয়ে—

নিজের স্ত্রীকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে।

অসম্ভব কি কিছু?

না, তা নয়। তবে—

কি?

অবনী কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

আচ্ছা এখন সুশান্তবাবুর ওখানে গেলে তার সঙ্গে দেখা হতে পারে?

পারে। কারণ আমি তাকে দুদিন বাড়িতেই সর্বক্ষণ থাকতে বলে এসেছি।

তবে চলুন না একবার সুশান্তবাবুর ওখান থেকে ঘুরে আসা যাক।

বেশ তো চলুন।

।। তিন।।

সুশান্ত চ্যাটার্জি গৃহেই ছিল।

পর পর সব এক সাইজের এক প্যাটার্নের কোয়ার্টার।

১৮নং কোয়ার্টারই সুশান্ত চ্যাটার্জির।

বাইরে থেকে কোন আলো দেখা যায় না।

অন্ধকার।

ওরা গাড়ি থেকে নেমে নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে গেট ঠেলে দুজনে বারান্দার দিকে অগ্রসর হতেই অন্ধকারে আবছা দুটো ছায়ামূর্তি পাশাপাশি চেয়ারের উপর বসে আছে চোখে পড়ল এবং একজন তার মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় ওদের গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে উঠে দাঁড়াল।

ঐ সঙ্গে অস্পষ্ট নারীকণ্ঠে শোনা গেল, জামাইবাবু, কারা যেন আসছে—

পুরুষকণ্ঠে প্রশ্ন আসে, কে?

জবাব দেয় অবনী সাহা, সুশান্তবাবু আমি অবনী সাহা, থানার ও-সি।

সঙ্গে সঙ্গে বারান্দার ইলেকট্রিক আলো জ্বলে উঠল।

কিরীটীর নজরে পড়ল, সামনেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে বত্রিশ-তেত্রিশ বৎসরের এক যুবক।

যুবকের চেহারাটি সত্যিই সুন্দর। রোগা পাতলা চেহারা। গাত্রবর্ণ রীতিমত গৌর। মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। মুখখানি একটু লম্বাটে ধরনের। চোখ দুটো ভাসা-ভাসা। দেখলেই মনে হয় যেন সরল গোবেচোরা গোছের মানুষ।

সমস্ত মুখখানি যেন কেমন বিষণ্ণ, ক্লান্ত।

পরনে পায়জামা ও পাঞ্জাবি। পায়ে রবারের চপ্পল।

আসুন অবনীবাবু, বসুন।

সুশান্ত চ্যাটার্জি আহ্বান জানায়।

আজ ডিউটিতে তাহলে যাননি?

না। আপনিই তো বারণ করে গিয়েছেন। সাত দিনের ছুটি নিয়েছি।

খুব ভাল করেছেন। মনের এ অবস্থায় ডিউটি ভাল করে করতেও পারতেন না।

ডিউটি গত দেড় মাস থেকেই তো ভাল ভাবে করতে পারিনি!

কেন? প্রশ্ন করেন অবনী।

কেন আর? শকুন্তলার জন্য। ও সত্যিই ইদানীং জীবনটা আমার একেবারে যেন দুর্বিষহ করে তুলেছিল। কী জানেন অবনীবাবু, যদিও এটা ক্রুয়েল তবু অকপটে বলছি, ও যদি নিজে থেকেই বিষ খেয়ে সুইসাইড না করত—শেষ পর্যন্ত একদিন আমিই ওর গলা টিপে হত্যা করে ফাঁসি যেতাম!

ছি ছি, কী বলছেন মিঃ চ্যাটার্জি?

কথাটা এতটুকু মিথ্যা নয়। ও যে ইদানীং কী ভাবে অত্যাচার করত আমাদের ওপর-–অথচ সমস্ত ব্যাপারটা বেসলেস একেবারে, সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সবই তো সকালে আপনাকে বলেছি মিঃ সাহা!

হ্যাঁ, বলেছেন বটে।

বসুন না, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

অবনী ও কিরীটী দুজনে দুটো চেয়ার টেনে বসে।

একটু বসুন, মিতাকে দু কাপ চায়ের কথা বলে আসি।

বাধা দিল কিরীটী, না না, মিঃ চ্যাটার্জি, বসুন, তার কোন প্রয়োজন নেই। এইমাত্র চা খেয়ে আসছি। বসুন আপনি।

ওঁকে তো চিনতে পারছি না, মিঃ সাহা?

অবনী মিথ্যা কথা বললেন, আমাদেরই একজন লোক, মিঃ রায়।

ও।

উনি আপনাদের কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করতে চান। অবনী বলেন।

কী কথা?

কিরীটীই এবারে জবাব দিল, এমন বিশেষ কিছু না। সে হবে'খন। তার আগে শকুন্তলা দেবী যে ঘরে ছিলেন সেই ঘরটা একবার দেখতে চাই মিঃ চ্যাটার্জি।

বেশ তো, চলুন।

রেলওয়ে কোয়ার্টার যেমন হয়।

সামনে ছোট একটি বারান্দা, তারপরই পূব-মুখো একটা বড় সাইজের ঘর, লাগোয়া একটা বারান্দা। ও ছোট্ট একটা স্টোর-রুম।

বারান্দার একদিকে রান্নাঘর, অন্যদিকে পাশাপাশি দুটো ঘর, তার মধ্যে একটা ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল।

অন্য ঘরটার দরজা খোলা, ভিতরে আলো জ্বলছিল।

ঘরের দরজায় পর্দা ঝুলছে, ভিতরটা নজরে পড়ে না।

অবনী বললেন, তালা-দেওয়া ঐ ঘরটাতেই শকুন্তলা দেবী ছিলেন।

তালা দিল কে? কিরীটী শুধায়।

আমিই যাবার সময় তালা দিয়ে গিয়েছিলাম আজ সকালে।

অবনী পকেট থেকে চাবি বের করে ঘরের তালাটা খুলে দিলেন। তিনজনে অতঃপর ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে।

ঘরটা অন্ধকার।

আলোটা জ্বালুন, অবনীবাবু।

সুশান্তই সুইচ টিপে ঘরের আলোটা জ্বালাবার চেষ্টা করল কিন্তু আলো জ্বলল না, খুট করে একটা শব্দ হল মাত্র।

সুশান্ত বললে, ঘরের বাল্‌বটা বোধ হয় ফিউজ হয়ে গিয়েছে।

কাল এ ঘরে আলো জ্বলেনি? কিরীটী ঐসময় শুধায়।

না। সুশান্ত বলে।

কেন?

ইলেকট্রিক আলো ইদানীং কুন্তু চোখে সহ্য করতে পারত না বলে ঘরে একটা মোমবাতি জ্বালানো থাকত।

মোমবাতি!

হ্যাঁ, দাঁড়ান, মোমবাতিটা জ্বেলে দিই।

অন্ধকারেই এগিয়ে গেল সুশান্ত এবং অনায়াসেই পাশ থেকে দেশালাইটা নিয়ে একটা মোমবাতি জ্বালিয়ে দিল।

নরম স্নিগ্ধ মোমের আলোয় ঘরটা মৃদুভাবে আলোকিত হয়ে উঠল ধীরে ধীরে।

কিরীটী চেয়ে দেখল, একটা বড় সাইজের মোমবাতি—প্রায় অর্ধেকেরও বেশী পুড়ে গিয়েছে।

একটা কাঠের চেস্ট-ড্রয়ারের উপর একটা ভাঙা কাচের প্লেটের উপরে মোমবাতিটা বসানো।

মাঝারি আকারের ঘরটা।

দুটি দরজা। একটি দরজা বন্ধ। বোধ হয় পাশের ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। অন্যটি দিয়ে তারা একটু পূর্বে ভিতরে প্রবেশ করেছে।

তিনটি জানালা। দুটি দক্ষিণ দিকে, বন্ধ। অন্যটি পশ্চিম দিকে অন্দরমুখী।

সব কটি জানালাই বন্ধ ছিল।

আসবাবপত্র ঘরে সামান্যই।

একটা শূন্য খাট, তার পাশে একটা গোলাকার টেবিল, তার উপরে কিছু ঔষধপত্রের শিশি, হরলিকসের বোতল, একটা জলের গ্লাস ও কাপ তখনও রয়েছে দেখা গেল।

পশ্চিম দিকে দেওয়াল ঘেঁষে একটা আলমারি—প্রমাণ সাইজের আয়না বসানো। তার পাশে একটা আলনায় কিছু শাড়ি ঝুলছে।

দেওয়ালের গায়ে একটা ক্যাম্প খাট ফোল্ড করা রয়েছে। একটি চেয়ার ও একটি টুল।

এ ঘরে কি একা শকুন্তলা দেবীই থাকতেন? কিরীটী প্রশ্ন করে।

না, আমিও থাকতাম। ঐ ক্যাম্প খাটটা পেতে আমিও এই ঘরেই শুতাম যখন বাড়িতে থাকতাম। জবাব দেয় সুশান্ত।

আর আপনার ছেলে রাহুল?

সে তার মাসীমণির কাছেই এখানে আসা অবধি শোয়।

মানে মিত্রাণী দেবীর সঙ্গে?

হ্যাঁ।

আপনার ছেলে বাড়িতে নেই?

আছে। সকাল থেকে ওর জ্বর।

জ্বর!

হ্যাঁ, খুব জ্বর। মাঝে মাঝে ভুল বকছে।

ডাক্তার আসেননি?

হ্যাঁ। সুরেন ডাক্তার এসেছিল। ঔষধ দিয়ে গিয়েছে।

কিরীটী এবার বলে, চলুন, একবার পাশের ঘরটা দেখব যে ঘরে মিত্রাণী দেবী থাকেন।

চলুন। সুশান্ত বলে।

।। চার ।।

পাশের ঘরটিও ঠিক বলতে গেলে একই সাইজের।

একটি খাটের উপর রাহুল চোখ বুজে শুয়ে মধ্যে মধ্যে জ্বরের ঘোরে বিড়বিড় করে ভুল বকছে।

কিরীটী শয্যায় শায়িত ছেলেটির দিকে তাকাল।

ছেলেটি ভারী রুগ্ন। তার বাপের ফর্সা রং পায়নি। কালো।

শয্যার একপাশে মিত্রাণী বসেছিল চুপচাপ।

ওদের ঘরে ঢুকতে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

কিরীটী তাড়াতাড়ি বলে, না না, আপনাকে উঠতে হবে না, আপনি বসুন।

মিত্রাণী কিন্তু বসে না, দাঁড়িয়েই থাকে।

কিরীটী চেয়ে দেখে মিত্রাণীর দিকে।

অবনীবাবু ঠিকই বর্ণনা দিয়েছিলেন মেয়েটির চেহারার।

রোগা, পাতলা এবং কালোর উপরে ভারি চমৎকার দেখতে। চোখে-মুখে যেন একটা অপূর্ব শ্রী।

মুহূর্তের জন্য চোখাচোখি হয় কিরীটীর সঙ্গে।

মিত্রাণী সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ভূমিতলে নিবদ্ধ করে। কিন্তু সেই মুহূর্তের চাউনিতেই বুঝতে কষ্ট হয় না কিরীটীর, তীক্ষ্ণ বুদ্ধির দীপ্তি যেন চোখের মণি দুটো থেকে উঁকি দিচ্ছে মেয়েটির।

পরনে মলিন একটা রঙিন জলডুরে শাড়ি। বগল-কাটা ব্লাউস গায়ে। হাতে একগাছা করে সোনার রুলি। আর দেহের কোথাও কোন গহনা নেই।

মাথার চুল রুক্ষ, কিন্তু পর্যাপ্ত চুল মাথায়।

ঘরে আসবাবপত্রের মধ্যে একটি বড় সাইজের খাট, একটি দেরাজ এবং দেরাজের পাশেই একটি দরজা।

এ ঘরে তিনটি দরজা।

একটা দিয়ে তারা ঘরে এসেছে, একটা দুই ঘরের মধ্যবর্তী। সেটা এদিক থেকে বন্ধ। অন্যটা দক্ষিণ দেওয়ালে দেরাজের পাশে, সেটাও বন্ধ ছিল।

অন্য দিকের দেওয়ালে একটা আলনা ও ছোট একটা ড্রেসিং টেবিল।

কিরীটী দক্ষিণের দরজাটার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে, ঐ দরজাটা?

সুশান্ত বলে, ওটা হচ্ছে এ বাড়ির পিছনে যাবার। ওদিকে একটা ছোট বাগান মত আছে।

দরজাটা ব্যবহার হয় তাহলে বলুন?

সুশান্ত বলে, তা হয় বোধ হয় মধ্যে মধ্যে।

কে ব্যবহার করেন, আপনি?

না, আমি ওদিকে বড় একটা যাই না।

কিরীটী এবারে ঘুরে তাকাল মিত্রাণীর দিকে, আপনি?

আমি?

হ্যাঁ, আপনি ব্যবহার করেন ঐ দরজা?

তা মধ্যে মধ্যে করি।

কথা বলতে বলতেই হঠাৎ কিরীটী নীচু হয়ে খাটের নীচে থেকে একটা সিগারেটের টুকরোর শেষাংশ কুড়িয়ে পেল।

মিঃ চ্যাটার্জি!

বলুন?

আপনি তো সিগারেট খান, কি ব্র্যাণ্ড খান?

আমি—আমি তো স্মোক করি না!

করেন না?

না।

কখনও মধ্যে-সধ্যেও না?

না। তবে এককালে ছিল, এখন আর—

ড্রিংক করেন?

মধ্যে মধ্যে করি।

একটু যেন ইতস্তত করেই কথাটা বলেন সুশান্ত চ্যাটার্জি।

ঐসময় বিড়বিড় করে রাহুল বলে ওঠে, মাসীমণি, বড় অন্ধকার—আলোটা জ্বালো না। তারপরই চেঁচিয়ে ওঠে কেমন যেন ভয়ার্ত কণ্ঠে, কে-কে-কে ওখানে মাসীমণি? কে?

মিত্রাণী তাড়াতাড়ি ঝুঁকে পড়ে রাহুলের সামনে, কই, কেউ তো নয় বাবা, কেউ নয়, তুমি ঘুমোও।

রাহুল আবার শান্ত হয়ে যায়।

কিরীটী এগিয়ে গিয়ে রাহুলের কপাল স্পর্শ করে, জ্বরে যেন একেবারে পুড়ে যাচ্ছে ছেলেটার গা। খুব কম হলেও একশো চার ডিগ্রীর নীচে নয়।

মিত্রাণী দেবী!

কিরীটীর ডাকে মিত্রাণী চোখ তুলে তাকাল ওর দিকে।

রাহুলের গায়ের চাদরটা ঠিক করে দিচ্ছিল মিত্রাণী।

এ ঘরটা ঝাঁট দেওয়া হয়নি কদিন?

অ্যাঁ! কি বললেন?

এ ঘরটা ঝাঁট দেওয়া হয়নি কদিন?

পরশুও তো ঝাঁট দিয়েছি। আজ অবিশ্যি দেওয়া হয়নি এখনো পর্যন্ত।

তাহলে পরশুও ঝাঁট দিয়েছেন!

হ্যাঁ, বিকেলে।

আপনিই দেন বোধ হয়?

হ্যাঁ, আমিই দিই।

কেন, ঝি নেই?

হ্যাঁ, একজন তোলা ঝি আছে। ইদানীং কিছুদিন হল আমাদের পুরনো ঝি ছুটি নিয়ে মাস-দুয়েকের জন্য দেশে গিয়েছে, নতুন ঝি ওসব করতে চায় না।

আচ্ছা মিত্রাণী দেবী, আজ সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত অবনীবাবু ও সুশান্তবাবু ছাড়া আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি এখানে এসেছিলেন?

· কই না!

ভালো করে মনে করে দেখুন?

এবারে জবাব দিল সুশান্ত, কে আসবে এখানে মিঃ রায়? সকাল থেকে যা দুর্যোগ চলেছে--তাছাড়া আমার বাড়িতে কেউ এলেও এ ঘরে কেন আসবে?

কিন্তু আসতেও তো পারে মিঃ চ্যাটার্জি! শান্ত কণ্ঠে একটা পাইপ পকেট থেকে বের করে সেটায় তামাক ভরতে ভরতে বলে কিরীটী।

কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি মিঃ চ্যাটার্জি। আজ সারাদিন যদি কেউ না এসে থাকেনও, পরশু বিকেল থেকে রাতের মধ্যে অর্থাৎ ঐ বারো ঘন্টার মধ্যে আপনার কোয়ার্টারের এই ঘরে কেউ যে এসেছিল সে সম্পর্কে আমি নিঃসন্দেহ।

কিন্তু—

শুনুন মিঃ চ্যাটার্জি, আপনি হয়ত জানেন না, কিন্তু মিত্রাণী দেবী নিশ্চয়ই জানেন—তাই ওঁকেই তো কথাটা জিজ্ঞাসা করছি। কি মিত্রাণী দেবী, আসেননি কেউ?

শান্ত ধীর কণ্ঠে জবাব দেয় মিত্রাণী, না।

ঠিক বলছেন?

হ্যাঁ।

কেউ আসেননি তাহলে?

না।

কিরীটী ক্ষণকাল নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মিত্রাণীর দিকে। মনে হল ঈষৎ বাঁকা ঠোঁটের কোণে যেন একটা চাপা হাসির বিদ্যুৎ খেলছে।

তারপর ধীরে ধীরে আবার তাকাল সুশান্তর দিকে।

সুশান্তবাবু!

কিছু বলছেন?

হ্যাঁ! আজ শনিবার—আপনি তো বৃহস্পতিবার অর্থাৎ পরশু সকালেই ডিউটিতে বের হয়ে যান?

হ্যাঁ।

বেলা তখন কটা হবে?

সকাল পৌনে নটা।

আপনার ডিউটি ছিল কটা থেকে?

দশটা থেকে।

ফিরেছেন আপনি আজ সকালে?

হ্যাঁ।

কখন ডিউটি শেষ হল?

ডিউটি অবিশ্যি আমার সন্ধ্যাতেই শেষ হবার কথা, কিন্তু ট্রেনের লেটের জন্য ফিরেছি আমি রাত প্রায় আড়াইটায়—

তখন বাড়ি আসেননি?

না।

কেন?

রেস্টিং রুমেই শুয়েছিলাম আমি, আর—আর একজন টি. টি. আই., অত রাত্রে আর বাড়ি আসতে ইচ্ছা করল·না বলে। তাছাড়া—

তাছাড়া?

বাড়িতে এলেই তো সেই অশান্তি। তাই—

তাই যতটা সম্ভব বাড়ি এড়িয়ে চলতেন?

তাই।

কিরীটী আর কোন কথা বলল না।

এগিয়ে গিয়ে দক্ষিণ দিকের যে দরজাটা বন্ধ ছিল ভিতর থেকে, সেটা খুলে বাইরে পা বাড়াল।

ছোট একফালি জমি।

সীমানায় কাঁটাতারের বেড়া। তার ওদিকে সরু একটা রাস্তা।

তারও ওদিকে রেলওয়ে ইয়ার্ড।

কিছু ফুলের গাছ আছে। অযত্নরক্ষিত।

শুধু একটা টগর গাছে রাশি রাশি সাদা ফুল ফুটে আছে।

হঠাৎ নজরে পড়ল কিরীটীর, গতরাত্রে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে জমি নরম হয়ে গিয়েছিল, এখানে ওখানে কিছু জল জমে আছে আর নরম কাদা তখনও।

নরম কাদায় এলোমেলো কিছু জুতোর ছাপ রয়েছে।

কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জুতোর ছাপগুলো পরীক্ষা করে দেখল। এক ধরনের জুতোর ছাপ নয়, দুরকমের জুতোর ছাপ পড়েছে।

তার মধ্যে একটা হালকা, অন্যটা যেন ভারী, চেপে বসেছে।

একটা কিছু অস্পষ্ট, অন্যটা বেশ স্পষ্ট।

একটা মনে হয় চামড়ার সোলের, অন্যটা মনে হয় রবার সোলের কেডস্ জাতীয় কোন জুতোর ছাপ যেন।

কিরীটী ফিরে এল আবার ঘরে।

চলুন অবনীবাবু।

সকলে বের হয়ে এল অতঃপর ঘর থেকে।

বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে কয়েক জোড়া জুতোর উপরে নজর পড়ল কিরীটীর।

চার-পাঁচটা জেন্টস, লেডিস্, ও বাচ্চার জুতো, তার মধ্যে একজোড়া ব্রাউন রঙের ভারী সোলের জুতোও রয়েছে।

মুহূর্তের জন্য থামল কিরীটী।

ভাল করে নজরে করে দেখল ভারী ব্রাউন জুতোজোড়া।

জুতোর সোলে তখনও কাদা শুকিয়ে আছে।

মিঃ চ্যাটার্জি।

বলুন?

ঐ ব্রাউন ভারী সোলের জুতোজোড়া নিশ্চয়ই আপনার?

হ্যাঁ।

পরশু ডিউটিতে কোন্ জুতো পরে গিয়েছিলেন? ঐ জুতোজোড়াই বোধ হয়?

হ্যাঁ।

বুঝতে পেরেছিলাম! চলুন অবনীবাবু।

কিছু বলছেন?

না। ভাল কথা, পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা কখন পাওয়া যাবে?

কাল পেতে পারি বিকেল নাগাদ। অবনী জবাব দেন।

রিপোর্ট পেলে একবার আমার ওখানে আসবেন?

নিশ্চয়ই।

চলুন রাত হল, এবারে ফেরা যাক।

কিরীটীর কথায় যেন মনে হল অবনী সাহা একটু অসন্তুষ্ট হয়েছেন কিন্তু মুখে সেটা প্রকাশ করেন না।

কিরীটীর সঙ্গে সঙ্গে কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে আসেন।

অবনীর জীপেই ফিরছিল ওরা।

অবনী জীপ চালাচ্ছিলেন, কিরীটী পাশে বসেছিল।

রাত মন্দ হয়নি তখন—প্রায় পৌনে নটা।

তাহলেও কলকাতা তখন রীতিমত প্রাণচঞ্চল।

আলোকিত, শব্দ-মুখরিত, যানবাহন ও মানুষের ভিড়ে চঞ্চল শব্দময়ী কলকাতা।

অবনী সাহা মৃদুকণ্ঠে ডাকেন, কিরীটীবাবু!

উঁ?

কী মনে হল আপনার?

।। পাঁচ।।

অবনী সাহা উৎসুক দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করেন।

কিসের?

মানে বলছিলাম ঐ সুশান্ত চ্যাটার্জি আর মিত্রাণীকে—

একটা কথাই ওদের সম্পর্কে মনে হচ্ছে আপাততঃ—

কী?

ভাবছি, দুজনেই যেন মনে হল মিথ্যা কথা বলল।

মিথ্যা কথা!

হুঁ। সুশান্ত ও মিত্রাণী দেবী মনে হচ্ছে দুজনেই মিথ্যা বলছে!

কি মিথ্যা বলেছে?

প্রথমতঃ আমার মনে হচ্ছে, কাল রাত্রে—মানে ভোর হবার অনেক আগেই সুশান্ত কোন একসময় বাড়ি ফিরেছিল।

আপনার তাই মনে হয়?

হ্যাঁ, তাই। তারপর আবার ফিরে গিয়ে ভোরনাগাদ কোয়ার্টারে ফিরে এসেছে আজ।

কিন্তু—

ভাবছেন সে বলেছে যে রাত আড়াইটের ডিউটি থেকে ফিরে অশান্তির ভয়ে ভোররাত পর্যন্ত স্টেশনের রেস্টিং রুমে ছিল! তা কিন্তু নয় বলেই আমার মনে হয়, যদিও তার অ্যালিবিটা খুব স্ট্রং।

তা যদি সত্যিই হয় তো সেটা তো অনায়াসেই আমরা খোঁজ নিয়ে জানতে পারব।

না, তা হয়ত পারবেন না।

পারব না?

না।

কেন, না?

যেহেতু তার ব্রাদার অফিসার, যে কাল রাত্রে ওর সঙ্গে একই স্টেশনে রেস্টিং রুমে ছিল, সে হয়ত সত্যিই ঘুমিয়ে ছিল।

কি বলছেন?

ঠিক তাই অবনীবাবু, তার ঘুমের মধ্যেই কোন এক সময় তো অনায়াসেই সুশান্তবাবু উঠে আসতে পারে তার কোয়ার্টারে, তারপর আবার ফিরে যেতে পারে ইচ্ছা করলে। ধরুন যদি ঐসময় অন্যজনের ঘুম ভেঙেও যেত, সে কখনই মনে করতে পারত না যে সুশান্তবাবু ইতিমধ্যে তার কোয়ার্টারে গিয়ে ফিরে আসতে পারে এবং—সে যাই হোক সুশান্তবাবু যে এসেছিল রাত আড়াইটে থেকে ভোর সাড়ে চারটে এই দুই ঘণ্টার মধ্যে কোন এক সময় তার কোয়ার্টারে সে বিষয়ে আমি অন্ততঃ নিঃসন্দেহ। কিন্তু এখন কথা হচ্ছে, কেন—কেন এসেছিল? আবার ফিরেই বা গিয়েছিল কেন?

কেন?

সেই তো ভাবছি! অবিশ্যি দুটো কারণ তার থাকতে পারে।

কি—কি?

আপনিও একটু চিন্তা করলে সে কারণ দুটো খুঁজে পাবেন।

কিরীটী যেন ইচ্ছে করেই প্রশ্নটা এড়িয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল।

বললে, তাই বলছিলাম, সুশান্তবাবু যেমন মিথ্যা বলেছে, তেমনি মিত্রাণী দেবীও মিথ্যা বলেছে যে কাল রাত্রে তার ঘরে সুশান্তবাবু ও আপনি ছাড়া আর তৃতীয় কোন ব্যক্তি যায়নি।

তবে—

তাই তো ভাবছি, কে সে? কে যেতে পারে কাল কোন এক সময় রাত্রে তার ঘরে?

কেন, আপনি যা বলছেন তাতে তো সুশান্তবাবুও সেই লোক হতে পারেন।

পারে না যে তা নয়, তবে—

কী, তবে?

মনে হয় না সে ব্যক্তি সুশান্তবাবু।

তাহলে আপনি বলতে চান যে সত্যিই কোন তৃতীয় ব্যক্তি কাল রাত্রে মিত্রাণীর ঘরে প্রবেশ করেছিল?

হ্যাঁ। আর—

কি?

তার প্রমাণও আমি পেয়েছি।

প্রমাণ!

হ্যাঁ, প্রমাণ। ১নং—

কিন্তু কিরীটী কথাটা শেষ করল না, হঠাৎ আবার কথার মোড় ঘুরিয়ে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। বললে, আচ্ছা অবনীবাবু!

বলুন?

আপনার কি মনে হয় আপনার সন্দেহটা খুব সত্যি?

কোন্ সন্দেহ?

সুশান্ত আর মিত্রাণী তাদের পরস্পর পরস্পরের প্রতি সত্যিই একটা আকর্ষণ—মানে আপনাদের ভাষায় 'লভ্' আছে?

আমার অন্ততঃ তো তাই মনে হয়।

অবিশ্যি সেটা খুব একটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ঐ রুগ্ন বিকৃত-মস্তিষ্ক স্ত্রীর নিরন্তর একটানা ঘৃণা, তারই পাশে এক তরুণীর সস্নেহ আচরণ—ওয়েল, অনায়াসেই সেরকম কিছু একটা ওদের পরস্পরের মধ্যে গড়ে ওঠা বিচিত্র নয়!

কিন্তু—

কি?

তাহলে দুজনকেই আমরা হত্যাকারী বলে সন্দেহ করতে পারি?

পারিই তো, আর তাই তো আমি বলতে চাই—

অবিশ্যি পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা পেলে সেটা আমরা ভাল করে বিচার করে দেখতে পারি। কারণ সর্বাগ্রে আমাদের নিঃসন্দেহ হতে হবে শকুন্তলা দেবীর মৃত্যুটা সুইসাইড না মার্ডার—অর্থাৎ তাকে খুন করা হয়েছে কিনা!

ইতিমধ্যে জীপটা রসা রোড়ের কাছাকাছি এসে গিয়েছিল।

কিরীটী বলে, এখানেই আমাকে নামিয়ে দিন অবনীবাবু।

এখানে নামবেন?

হ্যাঁ। একটা কাজ ছিল এদিকে, সেরে যাই।

অবনী সাহা জীপ থামালেন।

কিরীটী জীপ থেকে নেমে চলে গেল।

।। ছয়।।

শকুন্তলার পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পরের দিন নয়, তার পরের দিন পাওয়া গেল।

শকুন্তলার মৃত্যুর কারণ বিষ নয়, শ্বাসরোধ করে বিচিত্র এক কৌশলে তাকে হত্যা করা হয়েছে।

অর্থাৎ শ্বাসরোধ হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে।

তার মুখের মধ্যে অবিশ্যি কিছুটা মালিশের ঔষধ পাওয়া গিয়েছে কিন্তু সেটা তার মৃত্যুর কারণ নয় বলেই ডাক্তারের মত।

তাঁর সন্দেহ সেটা সম্ভবত তার মৃত্যুর পর কৌশলে তার মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া

হয়েছিল।

কিরীটী মৃদু শান্ত কণ্ঠে বললে, যাক, দুটো ব্যাপারে আমরা নিশ্চিন্ত হলাম ১নং—শকুন্তলা আত্মহত্যা করেনি, কেসটা সুইসাইড নয়, কেসটা হোমিসাইড এবং ২নং—মৃত্যুর কারণ বিষ নয়, শ্বাসরোধে মৃত্যু। অতএব দেখা যাচ্ছে কেসটাকে হত্যাকারী একটা সুইসাইড প্রমাণ করবার জন্যই সম্ভবত ঐভাবে সাজিয়েছে।

অবনী সাহা বলেন, প্রথম থেকেই মনের মধ্যে ঐ সন্দেহটা আমার জেগেছিল।

ঠিক সন্দেহ করেছিলেন আপনি।

আর এও আমার সন্দেহ কিরীটীবাবু—

কি?

ঐ ওদের দুজনেই একজন হত্যাকারী—মার্ডারার।

মানে আপনি বলতে চান সুশান্তবাবু ও মিত্রাণী দেবীর মধ্যে কোন একজন?

হ্যাঁ। কেন, আপনারও তাই মনে হচ্ছে না এখন?

প্রশ্নটা করে অবনী সাহা কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকান।

হত্যাকারী একজন যে আছে সে বিষয়ে তো কোন সন্দেহই নেই সত্যি, তবে—

কিরীটী কথাটা যেন অসমাপ্ত রেখেই থেমে যায় মুহূর্তের জন্য। তারপর আবার বলে, কথা হচ্ছে এখনও কোন নির্ভরযোগ্য সত্যিকারের প্রমাণ ওদের বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রহ করতে পারিনি।

আমার তো মনে হয় কিরীটীবাবু—

কি?

অবিলম্বে ওদের দুজনকে অ্যারেস্ট করে হাজতে পুরে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেই ওরা ওদের অপরাধ স্বীকার করতে বাধ্য হবে। আর কোন প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজনই হবে না।

না, না—অবনীবাবু, অমন কাজ করবেন না। হত্যাকারী যদি সত্যিই ওরা হয়, তাহলে আপাততঃ ওরা কেউ যাতে কোনরকমে আমাদের সন্দেহমাত্রও না করতে পারে সেটাই সর্বাগ্রে দেখতে হবে।

কিন্তু তাতে করে যদি বিপরীত হয়?

কি হবে?

মানে বলছিলাম, যদি ওরা গা-ঢাকা দেয়?

দেবে না। আর দিলেই বা। আপনাদের চোখকে এড়িয়ে যেতে পারবে না।

কিরীটী মৃদু হাসে।

অবনী বলেন, তাহলে আপনি বলছেন ওদের অ্যারেস্ট করব না?

নিশ্চয়ই না। শুনুন, কাল সকালে আর একবার চলুন, ওদের সঙ্গে আলাদা আলাদা ভাবে কথা বলে আসা যাক। মানে আরও কিছু প্রশ্ন ওদের আমি করতে চাই অবনীবাবু।

অবনী সাহা কিরীটীর যুক্তিটা তেমন করে মনের মধ্যে গ্রহণ করতে না পারলেও পরের দিন সকালের দিকে কিরীটীর সঙ্গে গিয়ে হাজির হন সুশান্তর কোয়ার্টারে।

গাড়িতে যেতে যেতেই একটা কথা বলেছিল কিরীটী, সেদিন আমাদের একটা ভুল হয়ে গিয়েছে অবনীবাবু।

ভুল?

হ্যাঁ।

কি রকম?

আপনি বলেছিলেন না, সুশান্তর বাবা বৃদ্ধ হাঁপানীর রোগী সুকান্ত ঐ বাড়িতেই থাকেন!

হ্যাঁ।

তাঁর সঙ্গে তো কই দেখা করিনি। এবং কোন্ ঘরে তিনি থাকেন সে ঘরটাও দেখা হয়নি!

আমি প্রথম দিন সুশান্তর বাবা সুকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা অবিশ্যি করেছিলাম।

করেছিলেন?

হুঁ। রান্নাঘরের পিছনে যে একটা ছোট ঘর আছে, ঘরটা ঠিক শকুন্তলা যে ঘরে থাকত তার লাগোয়া, সেই ঘরেই আছেন সুকান্তবাবু।

আজ একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

বেশ তো।

ওরা যখন কোয়ার্টারে এসে পৌঁছাল বেলা তখন প্রায় পৌনে নটা।

সুশান্ত বাড়িতে ছিল না। বাজারে গিয়েছে।

মিত্রাণীই ওদের সাড়া পেয়ে এসে দরজা খুলে দিয়ে অভ্যর্থনা জানাল।

সুশান্তবাবু আছেন? কিরীটীই শুধায়।

না, তিনি তো বাজারে গিয়েছেন। মিত্রাণী মৃদুকণ্ঠে জবাব দেয়।

কখন ফিরবেন?

এখনই হয়ত ফিরবেন।

মিত্রাণীর চোখের দৃষ্টি ভূমিতলে নিবদ্ধ।

কতক্ষণ গিয়েছেন?

অনেকক্ষণ গিয়েছেন।

মিত্রাণী দেবী!

বলুন?

সুশান্তবাবুর বাবা এ বাড়িতে আছেন, না?

আছেন।

তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পারি?

হ্যাঁ। একটু আগে ঘুম থেকে উঠেছেন, চা খাচ্ছিলেন। আসুন।

চলুন।

যেতে যেতে কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, সুশান্তবাবুর ছেলে রাহুল কেমন আছে মিত্রাণী দেবী?

একটু ভাল। জ্বরটা সকাল থেকে আজ কমেছে।

ভুল বকছে না আর?

না।

ভিতরের বারান্দার শকুন্তলার ঘরের পাশেই ছোট ঘরটা। ঘরের দরজা ভেজানো ছিল। সকলে গিয়ে দরজাটা ঠেলে ভেতরে প্রবেশ করল।

ছোট অপরিসর ঘরটা। একটি মাত্র ছোট জানালা ও একটিমাত্র ছোট দরজা।

জানালাটা খোলা থাকা সত্ত্বেও দেখা গেল ঘরটা দিনের বেলাতেও অন্ধকার বেশ।

ঘরের বদ্ধ বাতাসে একটা রোগের ঔষধের মিশ্র কটু গন্ধ যেন।

ঘরের মধ্যে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে গন্ধটা নাকে এসে ঝাপটা দেয়।

ঘরজোড়া একটা তক্তপোশ, তারই উপরে অযত্ন-মলিন শয্যায় এক বৃদ্ধ উবু হয়ে বসে শ্বাস টানছিলেন।

প্রাণপণে যেন বাতাস থেকে অক্সিজেন টানবার চেষ্টা করছেন।

সামনের একটা টুলের উপরে কিছু ঔষধের শিশি।

চায়ের কাপ, জলের গ্লাস আর তার মধ্যে একটা শূন্য পিতলের ফুলদানি।

ভদ্রলোকের বয়েস সত্তরের ঊর্ধ্বে বলেই মনে হয়।

পরনে একটা মলিন ছেঁড়া লুঙ্গি ও গায়ে একটা ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জি, তার উপর একটি মলিন বালাপোশ আলগাভাবে জড়ানো।

কঙ্কালসার দেহ।

পদশব্দে বৃদ্ধ সুকান্তবাবু মুখ তুলে তাকালেন, কে?

জবাব দিল মিত্রাণীই, তাওইমশাই, থানার দারোগাবাবু এসেছেন, আপনার সঙ্গে কি কথা বলতে চান।

কে?

অবনী বললেন, আমি থানা থেকে আসছি—ও-সি।

খনখনে বিরক্তিভরা কর্কশ গলায় সুকান্ত প্রশ্ন করলেন, কেন, আমার কাছে কি দরকারটা আবার আপনাদের?

আপনি সুশান্তবাবুর বাবা? কিরীটী শুধায়।

না, সৎ বাপ—স্টেপ ফাদার, বুঝলেন?

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বিরক্তিভরা কণ্ঠে বলে ওঠেন।

কিরীটী বুঝতে পারল বৃদ্ধের ঐ একটিমাত্র কথাতেই—যে কোন কারণেই হোক বৃদ্ধ বাপ পুত্রের প্রতি আদৌ সন্তুষ্ট নন।

বৃদ্ধ বলতে লাগলেন, কি জন্যে এসেছেন, আর কেনই বা এসেছেন? বৌটা মালিশের ওষুধ খেয়ে মরেছে, আমিও তাই মরব একদিন। তারপর ওরা নিশ্চিন্ত হবে।

সুকান্তবাবু! কিরীটী ডাকে।

বাবু বলছেন কেন? দেখছেন না কি হালে আছি? বলুন চাকর!

সুশান্তবাবুই তো আপনার একমাত্র ছেলে?

নচেৎ এখানে এই নরক-যন্ত্রণার মধ্যে এমনি করে পড়ে থাকি আজও?

উনি বুঝি আপনার যত্ন নেন না? কিরীটী শুধায়।

যত্ন? দিন গুনছে কবে যাব! জানেন মশাই, মুখ বুজে পড়ে আছি—নচেৎ জানি না কী, বুঝি না কী দারোগাবাবু? সেদিন আপনাকে আমি বলিনি, বলতে সাহস পাইনি—ওরা দুটোতে মিলে নিশ্চয়ই আমার বৌমাকে বিষ দিয়ে হত্যা করেছে।

এ আপনি কি বলছেন? কিরীটী বলে।

ঠিকই বলছি—ওরাই ওকে হত্যা করেছে। নচেৎ আমার মালিশের ওষুধটা ওর—বৌমার ঘরে গেল কি করে বলতে পারেন?

আপনার মালিশের ওষুধ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, পরেরদিন দুপুরে খোঁজ করতে গিয়েই তো জানতে পারলাম, শিশিটা আমার টুলের উপরে নেই।

অবনীবাবু?

বলুন?

শিশিটা আছে না আপনার কাছে?

হ্যাঁ, থানায় আছে।

ওষুধের শিশির গায়ে লেবেলে কার নাম আছে দেখেছিলেন?

না।

আচ্ছা সুকান্তবাবু!

কি?

আপনার পুত্রবধূ তো আপনার এই ঘরের লাগোয়া ঘরটাতে থাকতেন, সে রাত্রে কোনরকম শব্দ-টব্দ কিছু শুনেছিলেন?

শুনব কি মশাই—যে ঝড়-জল-বৃষ্টি! জানালা দিয়ে জল আসছিল, চেঁচিয়ে গলা ফাটালাম; তাও কেউ এলো না। তবে আমি যা বলছি তার মধ্যে ভুল নেই জানবেন। ওরাই আমার সতীলক্ষ্মী বৌমাকে দুজনে ষড়যন্ত্র করে বিষ খাইয়ে মেরেছে।

বলতে বলতে বুড়ো কাশতে শুরু করেন।

।। সাত।।

কিরীটীর আর জিজ্ঞাস্য বা জানার কিছু ছিল না সুকান্তর কাছে।

ওরা বের হয়ে এল অতঃপর ঘর থেকে।

চলুন অবনীবাবু।

বারান্দায় বের হতেই সুশান্তবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। সে এইমাত্র ফিরেছে বাজার থেকে বাজারের থলি হাতে।

রুক্ষ মলিন বিষণ্ণ চেহারা।

মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে যেন দু'দিনেই।

সুশান্তবাবু, নমস্কার। কিরীটী বলে।

নমস্কার।

আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা ছিল।

আপনারা বারান্দায় গিয়ে বসুন, আমি আসছি। সুশান্ত শান্তকণ্ঠে বলে।

ওরা বারান্দায় এসে চেয়ারে বসে।

আকাশে মেঘ জমেছে। বেশ মেঘ।

চারিদিক কালো হয়ে এসেছে। বেশ জোরেই একপশলা বৃষ্টি নামবে বলে মনে হয়।

অবনী মৃদুকণ্ঠে ডাকলেন, কিরীটীবাবু।

বলুন?

এখন আপনার কোন সন্দেহের আর অবশিষ্ট আছে?

কিসের বলুন তো?

যে ওরাই খুন করেছে শকুন্তলা দেবীকে?

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে, না, এখনও আমি আপনার মতের সঙ্গে পুরোপুরি একমত হতে পারছি না অবনীবাবু!

কেন? শুনলেন তো সুকান্তবাবুর কথাগুলো? কিছু একটা সেরকম ব্যাপার সত্যি সত্যি ভিতরে না থাকলে, বাপ কখনও তার ছেলের সম্পর্কে অমন রুড্ রিমার্কস্ পাস করতে পারে?

অবনীবাবু, বয়স আপনার অল্প। সংসারে যে কত বিচিত্র মানুষ আছে, মানুষের মনে যে কত বিচিত্র সব দ্বন্দ্ব থাকে যদি জানতেন—

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না।

সুশান্ত চ্যাটার্জির পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

কিরীটী বললে, সুশান্তবাবু আসছেন, এসব আলোচনা এখন থাক।

সুশান্ত এসে ওদের সামনে দাঁড়াল।

বসুন মিঃ চ্যাটার্জি। কিরীটীই বলল।

সুশান্ত একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

কিরীটীই প্রশ্ন করে, মিঃ চ্যাটার্জি!

বলুন?

একটা কথা আপনাকে জানানো দরকার।

সুশান্ত কিরীটীর কণ্ঠস্বরে চকিতে ওর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

সুশান্তর দুচোখের দৃষ্টিতে একটা সংশয়, একটা ভীতির ছায়া পড়েছে যেন।

কাল আপনার স্ত্রীর—মানে মিসেস চ্যাটার্জির ময়না-তদন্তের রিপোর্ট আমরা পেয়েছি।

সুশান্ত চেয়ে আছে নিঃশব্দে কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী বলে চলে, রিপোর্ট কি বলছে জানেন?

কি?

ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্নটা উচ্চারিত হল যেন একটা অস্পষ্ট শব্দের মত।

আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর কারণ কোন বিষ—মানে পয়জন নয়!

তবে কি?

তাঁকে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে?

কি বলছেন? কি করে মারা হয়েছে!

শ্বাসরোধ করে তাঁকে কেউ হত্যা করেছে। নচেৎ—

না না, তা কি করে হয়? হাউ অ্যাবসার্ড!

তাই হয়েছে মিঃ চ্যাটার্জি। ব্যাপারটা সুইসাইড নয়, হোমিসাইড মার্ডার এবং শ্বাসরোধ করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

কিন্তু কে—কে করবে তাকে শ্বাসরোধ করে হত্যা মিঃ রায়? আর কেনই বা করবে?

কেন করবে, কে করবে সে তো পরের কথা। আমাদের সেটা অনুসন্ধান করে বের করতে হবে। তবে যা ফ্যাক্ট—আমরা যতটা জানতে পেরেছি, যা সত্যি বলে ও সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে আমাদের, তাই আপনাকে বলছি।

না, না—মিঃ রায়—

সুশান্তর দু-চোখের কোলে জল ভরে আসে—টলটল করতে থাকে জল। সে বললে, ঠিকই, এক এক সময় তার ইদানীংকার ব্যবহারে আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। এমন

কি মনে হয়েছে ওকে শেষ করে দিই, কিন্তু পরের মুহূর্তেই যখন মনে পড়েছে কি কষ্টটাই না পাচ্ছে বেচারী ঐভাবে দিনের পর দিন শয্যাগত থেকে, তখনই সব রাগ আমার জল হয়ে গিয়েছে। জানেন মিঃ রায়, আজ সে নেই, আমার এগার বছরের সাথী এতদিন পঙ্গু হয়ে ঘরের মধ্যে ছিল, অসুস্থ ছিল—তবু ছিল। আজ দুদিন থেকে মনে হচ্ছে এ বাড়ি যেন আমার খালি হয়ে গিয়েছে।

দু-ফোঁটা চোখের জল আবার গড়িয়ে পড়ে সুশান্তর গাল বেয়ে।

সুশান্ত আবার বলে, এ বাড়িতে আমি যেন আর এক মুহূর্তও টিকতে পারছি না।

কিরীটী শান্তকণ্ঠে বলে, তবু মিঃ চ্যাটার্জি, সত্য যা ফ্যাক্ট যা—তাকে তো অস্বীকার করা এখন যাবে না। কাজেই সর্বপ্রকার অনুসন্ধানই আমাদের চালাতে হবে—আর আপনিও নিশ্চয়ই চান, যে হত্যাকারী অমন নিষ্ঠুরভাবে আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেছে সে ধরা পড়ুক, তার যথোচিত শাস্তি হোক। শুনুন, যে প্রশ্নগুলো এবারে আমি করব তার জবাব দিন।

রুমাল দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে সুশান্ত বলে, বলুন।

সে রাত্রে, মানে যে রাত্রে মিসেস চ্যাটার্জি নিহত হন, সে রাত্রে রাত আড়াইটেয় আপনার ডিউটি শেষ হবার পর এবং এখানে এসেছেন ভোর সাড়ে পাঁচটায়—এই তিন ঘণ্টা সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

আপনাদের তো সে কথা আগেই বলেছি—বাড়ি ফিরিনি, রেস্টিং রুমে শুয়ে ছিলাম।

না! কিরীটী শান্ত গলায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়।

কি বলছেন আপনি? প্রশ্নটা করে সুশান্ত চ্যাটার্জি তাকায় কিরীটীর মুখের দিকে।

ঠিকই বলছি। ভাল করে মনে করে দেখুন। আপনি সত্যি কথা বলছেন না!

সত্যি কথা বলছি না?

না।

তবে সত্যিটা কি?

আপনি ঐ তিন ঘণ্টা সময়ের মধ্যে কোন এক সময় এখানে এসেছিলেন, এসে আবার ফিরে গিয়েছেন রেস্টিং রুমে।

এসেছিলাম—এসে ফিরে গিয়েছি!

হ্যাঁ, হ্যাঁ। কিন্তু কেন? কেন এসেই আবার ফিরে গিয়েছিলেন? বলুন, চুপ করে থেকে লাভ নেই মিঃ চ্যাটার্জি। আমি জানি আপনি এসেছিলেন এবং তার প্রমাণও আমার কাছে আছে জানবেন।

অকস্মাৎ যেন ভেঙে পড়ে সুশান্ত।

তার সমস্ত প্রতিবাদ অসহায় কান্নায় যেন আত্মসমর্পণ করল।

বললে, হ্যাঁ, আমি—আপনি ঠিকই বলেছেন মিঃ রায়, আমি এসেছিলাম—এসেছিলাম—

কিন্তু কেন—কেন? যদি এসেই ছিলেন তো আবার ফিরে গিয়েছিলেন কেন? বলুন, চুপ করে থাকবেন না, বলুন?

আ-আমি—

বলুন?

আমি—

আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রীর ঘরে ঢুকেছিলেন সে-রাত্রে।

হ্যাঁ ঢুকেছিলাম, কিন্তু তখন সে মৃত।

তবু তখন জানাননি কথাটা কাউকে কেন? বলুন কেন কথাটা চেপে গেলেন?

না, না-না-বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, আমি কিছু জানি না। কৃষ্ণকে আমি হত্যা করিনি।

কিন্তু তাহলে কেন ঢুকেছিলেন আপনার স্ত্রীর ঘরে? কেনই বা আবার ফিরে গিয়েছিলেন তাঁকে মৃত দেখেও? তা তো বললেন না এখনও?

সে—সে কথা আমি বলতে পারব না।

বলতে পারবেন না?

না।

বললে বোধ হয় ভাল করতেন মিঃ চ্যাটার্জি। নিদারুণ সন্দেহ থেকে আপনি নিষ্কৃতি পেতেন।

।। আট ।।

সুশান্ত বলে, বিশ্বাস করুন, বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, তাকে আমি হত্যা করিনি। সে আমার স্ত্রী—

আমি বিশ্বাস করলেই কিছু হবে না মিঃ চ্যাটার্জি। আইনকে বিশ্বাস করাতে হবে।

আইন?

হ্যাঁ, আপনি বলুন—কেন এসেছিলেন?

বলতে পারলে আমি বলতাম মিঃ রায়, কিন্তু—

ঠিক আছে, বলবেন না। কিন্তু এ কথাটা তো আর অস্বীকার করবেন না যে মিত্রাণী দেবীকে আপনি ভালবাসেন?

না, না—এ কি বলছেন?

আপনি ভালবাসেন মিঃ চ্যাটার্জি, অস্বীকার করে লাভ নেই।

আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়—

একটা কথা কি জানেন মিঃ চ্যাটার্জি, কিরীটী শান্ত গলায় বলে, স্ত্রীলোকের চোখে অনেক কিছুই ফাঁকি দেওয়া গেলেও, তারই প্রিয়জনের অন্য এক নারীর প্রতি আকর্ষণকে ফাঁকি দেওয়া শুধু দুঃসাধ্যই নয়, অসম্ভবও।

কিন্তু মিঃ রায়, আমার স্ত্রী—

হয়ত আপনার স্ত্রীর মধ্যে রোগে ভুগে ভুগে কিছুটা হিস্টিরিয়া ডেভেলাপ করেছিল, কিন্তু তবু আমি বলব—তাঁর হিস্টিরিয়াটা ষোল আনাই হয়ত হিস্টিরিয়া ছিল না।

কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ রায়, কৃষ্ণকে সত্যিই আমি ভালবাসতাম, প্রতি মুহূর্তে সারাটা অন্তর দিয়ে তার আরোগ্যকামনাই করতাম। সে ভাল হয়ে উঠুক, সুস্থ হয়ে উঠুক, আমাদের সংসার আবার আনন্দের হয়ে উঠুক—ঈশ্বরের কাছে সর্বদা মনে মনে ঐ প্রার্থনাই জানিয়েছি।

মিঃ চ্যাটার্জি, মানুষের মন বিচিত্র আর মানুষের প্রবৃত্তিটাও অতিশয় বিচিত্র। ঐ বিচিত্র আকাঙ্ক্ষা বা প্রেরণা মানুষকে যেমন সময়বিশেষে এক ধরনের সর্বনাশের পথে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি তাকে সাধারণ থেকে অসাধারণের পর্যায়েও নিয়ে যেতে পারে। প্রতিভা দুঃসাহস

ও অনন্যতাও অনেক ক্ষেত্রে ঐ বোধ থেকেই পূর্ণ বিকাশলাভ করে। কিন্তু যাক সে কথা, মিত্রাণী দেবীকে কিছু জিজ্ঞসা করতে চাই। তাঁকে যদি এখানে একটিবার পাঠিয়ে দেন—

সুশান্ত ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল।

ক্লান্ত শিথিল পায়ে নিঃশব্দে অন্দরে গিয়ে প্রবেশ করল।

কিরীটীবাবু! অবনী ডাকেন।

বলুন।

আপনি তাহলে মিঃ চ্যাটার্জিকে সন্দেহ করছেন?

তা করছি বৈকি।

তাহলে—

কি তাহলে?

ওকে আমরা—

ব্যস্ত হবেন না অবনীবাবু।

কিন্তু হত্যাকারীকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও যদি রশি আলগা দিই—

ভুলে যাচ্ছেন কেন একটা কথা অবনীবাবু, শুধু জানাই নয়—কাউকে পেনাল কোডের আওতায় ফেলতে হলে প্রমাণ চাই সর্বাগ্রে। সেই প্রমাণই এখনও কিছু আপনার হাতে আসেনি। তাছাড়া একটা কথা আপনাকে আমি জোর গলায় বলতে পারি—

কি?

সুশান্ত চ্যাটার্জি আর যাই করুক, পালাবে না।

কিন্তু—

নিশ্চিন্ত থাকুন, তার ঐ ছেলে রাহুলকে ফেলে সে কোথায়ও যাবে না।

কি করে বুঝলেন?

তাই আমার ধারণা।

ইতিমধ্যে অত্যন্ত লঘু পদসঞ্চারে কখন যে ওদের পাশে এসে মিত্রাণী দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে ওরা টেরই পায়নি।

হঠাৎ কিরীটীর নজর পড়ে।

এই যে মিত্রাণী দেবী, আপনি এসেছেন—বসুন—

মিত্রাণী একটা চেয়ারে উপবেশন করল।

মনে হচ্ছে কিছুক্ষণ আগে সে স্নান করেছে।

সিক্ত চুলে একটা স্নিগ্ধ কেশতৈলের সুবাস পাওয়া যায়।

পরনে আজ একটা হালকা আকাশ-নীল রঙের চওড়াপাড় মিলের শাড়ি।

মিত্রাণী দেবী!

মিত্রাণী নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকাল। সেই চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ-চঞ্চল।

মিত্রাণী দেবী, সেদিন আপনার জবানবন্দিতে একটি কথা আমাদের কাছে স্বীকার করেননি—

কি কথা?

সে রাত্রে অর্থাৎ যে রাত্রে দুর্ঘটনাটা ঘটে, সেই রাত্রে আপনার ঘরে আপনার জামাইবাবু বাদে কে তৃতীয় ব্যক্তি এসেছিল?

কেউ তো আসেনি।

এসেছিল।

আপনি দেখছি এখনও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না আমার কথাটা।

না মিত্রাণী দেবী, বিশ্বাস করা সম্ভব নয় বলেই পারছি না। কিন্তু আমিও সত্য বুঝতে পারছি না, কেন আপনি কথাটা এখনও স্বীকার করছেন না?

কারণ কথাটা মিথ্যা বলে।

মিথ্যা?

হ্যাঁ।

তাহলে কেউ আসেনি বলতে চান?

হ্যাঁ। শান্ত গলায় জবাব দেয় মিত্রাণী। তার কণ্ঠস্বরে কোথায়ও ত্রুটির দ্বিধা বা কম্পন পর্যন্ত নেই যেন।

একটা সহজ সত্য কথাকে যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে বলছে মিত্রাণী।

কিরীটী মিত্রাণীর মুখের দিকে ক্ষণকাল চেয়ে রইল।

তার চোখের দৃষ্টিতে যেন একটা চকিত বিদ্যুৎ স্ফূরণ।

এবং পুনরায় কিরীটী কথাটা যেন পুনরাবৃত্তি করল। বললে, তাহলে বলতে চান কেউ আসেনি সে রাত্রে আপনার ঘরে?

হ্যাঁ।

হঠাৎ ঐ সময় কিরীটীর নজরে পড়ল ও-পাশের জানালার পাশ থেকে কে যেন চকিতে সরে গেল।

কিরীটী কিন্তু ব্যাপারটা দেখেও দেখল না।

কতকটা যেন না দেখার ভান করে ব্যাপারটা. তাকায়ও না সেদিকে।

মিত্রাণী দেবী। কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

বলুন।

দেখুন সূর্যের আলোকে যেমন চাপা দেওয়া যায় না, তেমনি সত্যকে চাপা দেওয়া যায় না। সত্য যা, আজ হোক বা দুদিন পরে হোক প্রকাশ পাবেই। তাই বলছিলাম—

আপনাকে আমি মিথ্যা বলিনি কিরীটীবাবু।

সেই শান্ত স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর মিত্রাণীর।

কিন্তু আমি বলছি—

কী?

আপনি সত্য গোপন করছেন।

কী বললেন?

আপনি সত্য গোপন করছেন!

না।

কিরীটী মৃদু হাসল। তাপরা শান্ত গলায় বললে, থাক ও কথা। তবে একটা কথা বোধ হয় আপনার জানা প্রয়োজন মিত্রাণী দেবী—

মিত্রাণী কোন কথা না বলে কিরীটীর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাল।

চোখে চোখ রেখে কিরীটী বললে, আপনার দিদি মিসেস শকুন্তলা চ্যাটার্জি কিন্তু আত্মহত্যা করেননি, আমরা জানতে পেরেছি।

সে মালিশের ঔষধের বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেনি বলতে চান?

হ্যাঁ, তিনি আত্মহত্যা করেননি। ব্যাপারটা এমনই স্বেচ্ছামৃত্যু নয়—তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

কী বললেন?

দু চোখ তুলে তাকাল মিত্রাণী একবার কিরীটীর মুখের দিকে।

হ্যাঁ মিত্রাণী দেবী, তাঁকে হত্যা করাই হয়েছে। কিরীটী আবার পুনরাবৃত্তি করল।

তবে ঐ মালিশের ঔষধ তার ঘরে তার বিছানার উপর এল কি করে?

কিরীটী হেসে ফেলল।

ওটা একটা eye-wash মাত্র। হত্যাকারীর একটা চাল বা অন্যের চোখে ধুলো নিক্ষেপ করবার একটা প্রয়াস বলতে পারেন।

না, না—

হ্যাঁ, তাই। তাঁকে—মানে এক অসুস্থ ভদ্রমহিলাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছে।

হত্যা!

হ্যাঁ, হত্যা। আর কি করে হত্যা করা হয়েছে, জানেন?

কিরীটীর কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ।

মিত্রাণীর চোখে যেন ভীত বোবা দৃষ্টি।

কেমন যেন অসহায় ভাবে মিত্রাণী তখন তাকিয়ে আছে কিরীটীর মুখের দিকে।

।। নয় ।।

কিরীটী থামে না।

সে বলে চলে পূর্ববৎ তীক্ষ্ণ ভাষায়। মিত্রাণীর চোখে চোখ রেখে।

গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে একটি অসুস্থ অসহায় ভদ্রমহিলাকে!

আ-আপনি বলতে চান, দিদিকে হত্যা করা হয়েছে? না না, আমি যে কিছুতেই ভাবতে পারছি না ব্যাপারটা—

পোস্টমর্টেম রিপোর্ট তাই বলছে, মিত্রাণী দেবী! কিরীটী আবার বলে।

তাকে হত্যা করা হয়েছে? ব্যাপারটা যেমন অসম্ভব তেমনি অবিশ্বাস্য!

কিন্তু আমরা জেনেছি—

কী?

ব্যাকুল দৃষ্টিতে তাকায় মিত্রাণী কিরীটীর মুখের দিকে।

আপনার দিদির মনেও ঐরকম একটা ধারণা হয়েছিল—তাঁকে হত্যা করবারই চেষ্টা করা হচ্ছে।

জানি। কিন্তু সবটা তো তার অসুস্থ মনের একটা বিকৃত কল্পনা, আর.....

মিত্রাণী বলতে বলতে থেমে যায়।

বলুন! কিরীটী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল মিত্রাণীর মুখের দিকে।

ডাক্তারবাবুও, যিনি বরাবর তাকে দেখছিলেন, ঐ কথাই বলতেন। তাছাড়া আর একটা কথা—

কি?

কিরীটী সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে আবার তাকায় মিত্রাণীর মুখের দিকে।

মিত্রাণী বলে, সেরকম একটা কিছু ঘটলে আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম, কিরীটীবাবু!

হয়ত জানতে পারেননি, কারণ সে-রাত্রে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি হয়েছিল।

তবু —তবু তা অসম্ভব।

অসম্ভব?

হ্যাঁ। আমি—আমি জানতে পারতামই, কারণ আমিও জেগেই ছিলাম।

জেগে ছিলেন আপনি?

কথাটা হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে কিরীটীর মনে হল, মিত্রাণী কেমন যেন একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েছে।

সে যেন থতমত খেয়ে হঠাৎ থেমে যায়।

স্তব্ধ হয়ে যায়।

আপনি জেগে ছিলেন সে রাত্রে?

হ্যাঁ, মানে রাহুলের খুব জ্বর ছিল, তাকে নিয়ে জেগেই আমার রাতটা কেটেছিল।

কিরীটী আবার পুনরাবৃত্তি করে বলে, তাহলে আপনি জেগেই ছিলেন সে রাত্রে?

হ্যাঁ। ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেয় মিত্রাণী।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

কী যেন সে ভাবছে মনে হয়।

আচ্ছা এবার আপনি যেতে পারেন, মিত্রাণী দেবী। কিরীটী অতঃপর শান্ত গলায় কথাটা বলে।

মিত্রাণী উঠে দাঁড়াল।

তারপর কোন দিকে না তাকিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী সেই দিকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকে।

আবনী সাহা কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে ডাকেন, কিরীটীবাবু!

কিছু বলছিলেন?

কিরীটী প্রশ্নটা করে অবনী সাহার মুখের দিকে তাকাল।

হ্যাঁ।

বলুন কি বলছিলেন?

আমার যেন মনে হচ্ছে—

কী?

হয়ত মিত্রাণী দেবী নির্দোষ।

কিরীটী মৃদু হাসল। মৃদুকণ্ঠে তারপর প্রশ্ন করে, হঠাৎ ও কথা আপনার মনে হল যে?

আমাদের পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট অনুযায়ী সত্যি-সত্যিই যদি শকুন্তলা দেবীকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েই থাকে, সেটা কি একজন মিত্রাণী দেবীর মত স্ত্রী লোকের পক্ষে সম্ভব?

সম্ভব নয় বুঝি?

না। মন যেন মানতে চায় না। তাছাড়া—

কী?

হাজার হলেও শকুন্তলা দেবী তাঁর বোন তো! বোনকে বোন অমন নিষ্ঠুর ভাবে—

হত্যা করতে পারে না, তাই না? কিন্তু অবনীবাবু, দুজন স্ত্রীলোক যখন একই পুরুষকে ভালবাসে তখন তারা বাঘিনীর চাইতেও হিংস্র নিষ্ঠুর হতে পারে।

মানে—আপনি বলতে চান—

বলতে আমি এখনই কিছুই চাই না অবনীবাবু, আমি কেবল বলতে চাই , ওর চাইতেও নিষ্ঠুরভাবে একজন স্ত্রীলোককে অন্য এক স্ত্রীলোককে হত্যা করতে দেখেছি।

তবে—

না না, মিত্রাণী দেবী যে অপরাধিনী এক্ষেত্রে তা অবশ্য আমি বলছি না– কিন্তু এবারে ওঠা যাক, আজকের মত চলুন।

কিন্তু সুশান্তবাবু গেলেন কোথায়? অবনী সাহা বলেন।

ঐ সময় সুশান্ত চ্যাটার্জি এসে ঘরে ঢুকল।

দু' হাতে তার দু কাপ চা।

অবনী বাধা দিয়ে বলে ওঠেন, এ কি! চা আবার আনতে গেলেন কেন?

না, না—এ আর কি—

কিরীটী চেয়ে ছিল সুশান্তর মুখের দিকে। তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে বলে, দিন দিন, সত্যিই পিপাসা পেয়েছিল। Thanks!

কিরীটী চায়ের কাপ নিয়ে চুমুক দেয়।

।। দশ ।।

বাঃ, চা-টা চমৎকার হয়েছে তো! কে তৈরী করল?

কিরীটী সুশান্ত চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে।

মৃদু হেসে সুশান্ত বলে, আমি।

বুঝতে পেরেছি। কিরীটী আরাম করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলে, সত্যিই দেখছি আপনি রীতিমত কুশলী লোক।

আজ্ঞে—

চমকে যেন সুশান্ত কিরীটীর দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তির মত কথাটা উচ্চারণ করে।

বলছিলাম সত্যিই আপনি গুণী লোক। কি বলেন অবনীবাবু?

অবনী সাহার মুখের দিকে তাকাল কিরীটী।

অবনী সাহা কোন জবাব দেন না।

কিন্তু সুশান্তবাবু, আপনি দাঁড়িয়ে কেন? বসুন না!

সুশান্ত চ্যাটার্জি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

আচ্ছা সুশান্তবাবু! কিরীটী প্রশ্ন করে।

বলুন!

মিত্রাণী দেবী—মানে আপনার শ্যালিকা—ওঁর তো সংসারে কেউ নেই?

না। সত্যি ভাগ্যটাই ওর খারাপ।

হ্যাঁ, অবনীবাবুর কাছে তাই শুনছিলাম বটে। আচ্ছা উনি তো বেশ কিছুদিন আপনাদের এখানে আছেন?

হ্যাঁ।

Dont mind—একটা কথা delicate হলেও জিজ্ঞাসা করছি—

বলুন?

মেয়েটিকে আপনার কি রকম বলে মনে হয়?

মানে?

মানে বলছিলাম—মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র—

না, না—সে রকম কিছু নেই—অত্যন্ত innocent type-এর।

আচ্ছা মালদহে যখন উনি ছিলেন?

না, কোন কিছু ওর সম্পর্কে শুনিনি। কিন্তু এসব কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন বলুন তো?

মানে বলছিলাম এইজন্য যে, সেখানে মানে মালদহে তাঁর কোন ভালবাসার জন তো থাকতেও পারে।

সুশান্ত যেন হঠাৎ কেমন চমকে ওঠে। বলে, কী বলছেন মিঃ রায়?

না, বলছিলাম থাকতেও পারে। হয়ত আপনি জানেন না।

না, না, সে রকম কিছু হলে—

কিরীটী সুশান্ত চ্যাটার্জির মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

দু'চোখের পাতা যেন পড়ছে না।

সুশান্ত বলতে থাকে, আমি নিশ্চয়ই জানতে পারতাম।

সুশান্তর গলায় যেন একটা কঠিন আত্মপ্রত্যয়ের সুর।

না মশাই, তিনি তাঁর গোপন মনের খবর আপনাকে বলতে যাবে কেন? আপনি তো আর তাঁর বন্ধু নন—জামাইবাবু—গার্জিয়ান—

না, না, আপনি জানেন না—

কী জানি না?

সুশান্ত ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। বলে, হ্যাঁ, আমি জানতে পারতাম সেরকম কিছু থাকলে।

কিরীটী আর কোন কথা বলল না।

হঠাৎ অতঃপর উঠে দাঁড়ায় এবং অবনী সাহার দিকে তাকিয়ে বলে, চলুন অবনীবাবু, অনেক রাত হয়ে গেছে।

অবনী সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান।

আচ্ছা মিঃ চ্যাটার্জী, আমরা তাহলে চলি!

কিরীটী অবনী সাহাকে নিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল।

গাড়িতে যেতে যেতে হঠাৎ একসময় কিরীটী বলে, আচ্ছা অবনীবাবু—

বলুন?

যে দাওয়াই দিয়ে এলাম, সেটা ঠিক কাজ করবে বলে মনে হয়?

কী বলছেন!

না, কিছু না। আচ্ছা—কিরীটী প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়, মিত্রাণী দেবী তাঁর জামাইবাবুকে ভালবাসে বলে আপনার মনে হয়?

অসম্ভব নয় কিছু।

তা বটে, আচ্ছা আপনি সন্দেহের বিষে কখনো জর্জরিত হয়েছেন?

সন্দেহের বিষে!

প্রশ্নটা করে কেমন যেন অসহায় ভাবে, একটু যেন নির্বোধের মতই অবনী সাহা পার্শ্বে উপবিষ্ট কিরীটীর মুখের দিকে তাকান।

কিরীটী তার কথাটার পুনরাবৃত্তি করে, বলে, হ্যাঁ—সন্দেহের বিষে!

কেন বলুন তো?

না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হঠাৎ ঐ প্রশ্ন?

বললাম তো এমনিই। কিন্তু আমি জানি—

কি?

ও বিষ বড় সাংঘাতিক বিষ!

মিঃ রায়!

কিছু বলছিলেন?

হ্যাঁ। মিত্রাণী দেবীকে আপনি কি সত্যিই সন্দেহ করছেন?

কিরীটী হেসে ফেলে। বলে, মিত্রাণী দেবীকে দেখছি আপনি কিছুতেই ভুলতে পারছেন না! যাই বলুন, একটা অদ্ভুত আকর্ষণ সত্যিই আছে ভদ্রমহিলার মধ্যে। কিন্তু আকাশে কি রকম মেঘ করেছে দেখছেন!

সত্যিই আকাশে মেঘ করেছিল। একটা ঠাণ্ডা বাতাসও বইছিল।

অবনীবাবু! কিরীটী আবার ডাকে।

বলুন?

একটা অনুরোধ কিন্তু আছে আপনার কাছে—

অনুরোধ!

হ্যাঁ।

কী, বলুন?

আপাততঃ কিছুদিনের জন্য ঐ সুশান্ত ও মিত্রাণীকে আপনার ভুলে যেতে হবে।

ভুলে যেতে হবে?

হ্যাঁ। Completely! একেবারে মনের পাতা থেকে মুছে ফেলতে হবে।

কিন্তু—

সাপ ধরার আগে—আমি কালনাগিনীর কথা বলছি—ধরতে হলে প্রথমদিকে কিছুটা তাকে তার ইচ্ছামত চলতে দিতে হয়। শেষে যখন ফণা তুলবে তখন ধরবেন। কিন্তু বৃষ্টি বোধ হয় সত্যিই নামল!

কিরীটীর সে-রাত্রে গৃহে ফিরতে বেশ রাত হয়ে যায়।

এবং গৃহে যখন সে পৌঁছল তখন বেশ ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি নেমেছে।

কলিংবেল টিপতেই জংলী এসে দরজাটা খুলে দিল।

কিরীটী সোজা সিঁড়ির দিকে এগিয়ে যায়। সিঁড়ির দু-চার ধাপ অতিক্রম করতেই সেতারে মল্লারের আলাপ তার কানে আসে।

বুঝতে পারে, কৃষ্ণা এখনও ঘুমোয়নি।

সেতার বাজাচ্ছে কৃষ্ণাই।

কিরীটী ধীরে ধীরে সোপান অতিক্রম করতে থাকে।

বসবার ঘরে মেঝেতে কার্পেটের উপর বসে কৃষ্ণা সেতার বাজাচ্ছিল।

জানালা খোলা। বাইরে ঝম্‌ঝম্‌ করে বৃষ্টি হচ্ছে। এলোমেলো হওয়ায় জানালার পর্দা উড়ছে।

কিরীটী নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে একটা সোফার উপর বসল। কৃষ্ণা টেরও পায় না। সেতার বাজানোর মধ্যেই নিমগ্ন হয়ে থাকে।

অনেকক্ষণ বাজাবার পর থামতেই, এতক্ষণে নজর পড়ে কৃষ্ণার কিরীটী বসে আছে সোফার উপরে।

তুমি কতক্ষণ? কৃষ্ণা সেতারটা নামিয়ে রেখে শুধায়।

অনেকক্ষণ।

বস তুমি, খাবার সব ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণা উঠে পড়ে।

আরে শোন শোন প্রিয়ে—কিরীটী পিছন থেকে কৃষ্ণাকে ডাকে।

কী হল আবার? ফিরে দাঁড়ায় কৃষ্ণা।

আচ্ছা কৃষ্ণা—

কী?

ভালবাসা কি অপরাধ?

কেন? বুড়ো বয়সে কারো আবার প্রেমে পড়লে নাকি?

বাঁকা চোখে তাকিয়ে স্মিত হাস্যে প্রশ্ন করে কৃষ্ণা।

খুব যে দুঃসাহস দেখছি!

তা একটু আছে বৈকি।

এত বিশ্বাস!

হুঁ।

কথাটা বলে কৃষ্ণা আর দাঁড়ায় না। একটা গভীর কটাক্ষ স্বামীর প্রতি নিক্ষেপ করে ঘর ছেড়ে চলে যায়।

।। এগারো ।।

দিন-পনের পরের কথা।

ইতিমধ্যে সুশান্ত আবার কাজে জয়েন করেছিল। প্রাত্যহিক ডিউটি যেমন দেয় দিতে আরম্ভ করেছিল। অবনী সাহা কয়েকদিন আগে সুশান্তর ওখানে এসে বলে গিয়েছিলেন, আপনি যেমন ডিউটি করছিলেন করতে পারেন।

শকুন্তলা—তার স্ত্রী—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেনি।

তাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে, কথাটা সত্যিই যেন কেমন একটু বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল তাকে।

সেই সঙ্গে যে মনের মধ্যে একটা আশঙ্কাও দানা বেঁধে ওঠেনি তাও নয়।

সর্বক্ষণ কেমন যেন একটা ভয়-ভয়।

এমন সময় অবনী সাহা এসে ঐ কথা বললেন।

মনে হল অবনী সাহার কথায় যেন সুশান্তর মনের উপর থেকে একটা পাষাণভার নেমে যায়।

এবং বোধ হয় আরও বেশী করে নিশ্চিন্ত হবার জন্যই প্রশ্ন করে, মিঃ সাহা!

কিছু বলছিলেন?

হ্যাঁ, মানে—এখনো কি আপনাদের ধারণা—

কী?

মানে বলছিলাম, আমার স্ত্রী আত্মহত্যা করেনি, তাকে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে কেউ হত্যা করেছে!

আরে মশাই, যত সব উদ্ভুট idea মিঃ রায়ের—plain simple case of suicide, অথচ তিনি বলতে চান তাঁকে হত্যা করা হয়েছে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে।

কিন্তু তিনি যে কি বলেছিলেন—

কী?

আপনাদের পোস্টমর্টেম রিপোর্ট নাকি—

হ্যাঁ, ছেড়ে দিন তো! ডাক্তারগুলোও হয়েছে তেমনি!

সত্যি মশাই, সুশান্ত বলে, সেদিন তো কিরীটীবাবুর মুখে ঐ কথা শুনে আমি অবাক। বলেন কি! তাছাড়া মিত্রাণী তাহলে ব্যাপারটা কি জানতে পারত না? সে তো জেগেই ছিল বলতে গেলে সে-রাত্রে!

অবনী সাহা অতঃপর জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনার ছেলে রাহুল কেমন আছে?

ভাল—ভাল হয়ে গেছে।

আর সেরকম ভয়টয় পায় না তো?

না।

আচ্ছা তাহলে আমি উঠি সুশান্তবাবু।

বসুন বসুন—চা খেয়ে যান।

না, এখন আর চা খাব না।

না না, বসুন না—চা না খান, কফি কিংবা ওভালটিন—

না, কিছু প্রয়োজন নেই। মৃদু হেসে অবনী সাহা বলেন, আমি তাহলে উঠি।

অবনী উঠে পড়েন।

সুশান্ত একটা সিগারেট ধরায়। এবং ধূমপান করতে করতে একসময় সুশান্ত এসে জানালাটার সামনে দাঁড়ায়।

বাইরে আলোঝলমল প্রকৃতি।

গেটের সামনে এই কোয়ার্টারে এসে শকুন্তলা শখ করে একটা রক্তকরবীর গাছ এনে পুঁতেছিল।

হঠাৎ নজরে পড়ল সুশান্তর, গাছটা একেবারে ফুলে ফুলে যেন ছেয়ে গিয়েছে।

থোকা থোকা লাল ফুল।

কেবল রক্তকরবীই নয়। শকুন্তলার বরাবর ফুলের শখ।

সে আবার নানা প্রকারের ফুলগাছ এনে কোয়ার্টারের সামনে যে ছোট জমিটুকু—সেই জমিতে পুঁতেছিল।

গরীবের ঘর থেকে নিজে পছন্দ করে শকুন্তলাকে বিয়ে করে এনেছিল সুশান্ত।

তখনও তার চাকরি বেশী দিন হয়নি। সামান্য দু'বছর মাত্র হয়েছে। নিজের আলাদা ফ্যামিলি-কোয়ার্টারও পায়নি। কোয়ার্টার তো মাত্র বছর-তিনেক হল পেয়েছে সুশান্ত।

কোয়ার্টার পাওয়ার আগে শকুন্তলা তো তার মায়ের কাছেই ছিল কৃষ্ণনগরে। যাতায়াত করত সুশান্ত সেখানে।

শাশুড়ীরও ঐ একমাত্র মেয়ে।

কী আনন্দ কোয়ার্টারে এসে শকুন্তলার! সুখের ছোট্ট সংসারটি। স্বামী-স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে রাহুল।

আনন্দের—শান্তির সংসার।

কিন্তু দেড়টা বছরও গেল না, অনেকদিন পরে দ্বিতীয়বার সন্তান হতে গিয়ে একটি মৃত সন্তান প্রসব করে শকুন্তলা অসুস্থ হয়ে পড়ল।

শকুন্তলার শরীরটা যেন ভেঙে গেল।

রেলের ডাক্তারকে দেখানো হল। তিনি বললেন স্প্রু।

ক্রমশঃ শকুন্তলা রোগে রোগে জীর্ণ হয়ে যেন শয্যাশায়ী হয়ে পড়ল।

সেই সময়—হ্যাঁ, সুশান্তর মনে পড়েছে, রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করে করে শকুন্তলাও যেমন ক্রমশঃ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। সুশান্তও যেন ক্রমশঃ তেমনি বিরক্ত হয়ে পড়েছিল।

রোগ রোগ, আর রোগ। কেবল রোগের আর ঔষধের ফিরিস্তি।

সেই সময়ই একটু একটু করে সুশান্ত যেন সংসার থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে যেটুকু সময় পেত, বাড়িতে আসতে মন যেন কিছুতেই চাইত না। হয় বন্ধু বান্ধবের বাসায়, না হয় ক্লাবে আড্ডা দিয়ে বাইরে বাইরেই কাটিয়ে আসত। ঐসময় বাপ সুকান্তও যেন ক্রমশঃ অথর্ব হয়ে পড়তে থাকেন।

বরাবরই হাঁপানী রোগ ছিল।

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেই হাঁপানী রোগটা যেন আরও বেশী করে সুকান্তকে আক্রমণ করে। তিনি একপ্রকার শয্যাশায়ীই হয়ে পড়েন।

দুধারে দুজন রোগী—এক ঘরে স্ত্রী, অন্য ঘরে বাপ সুকান্ত।

সংসারটা ক্রমশঃ অচল হয়ে উঠতে থাকে।

সুশান্তর মন-মেজাজ ক্রমশঃ বিশ্রী হয়ে উঠতে থাকে যেন।

ভাল লাগে না—কিছু তার ভাল লাগে না।

হাতের সিগারেটটা নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল, সেটা ছুঁড়ে জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সুশান্ত।

ঘুরে দাঁড়াতেই দেওয়ালে টাঙানো শকুন্তলার ফটোটার ওপরে নজর পড়ল।

বিয়ের পরে তোলা শকুন্তলার ফটো। যৌবনলাবণ্যে যেন ঢলঢল করছে।

শকুন্তলা হাসছে।

মিত্রাণী বোধ হয় রাঁধছে, বাতাসে চমৎকার মাংসের গন্ধ ভেসে আসছে।

মিত্রাণী!

ও-ঘর থেকে সুকান্তর কাশির শব্দ আসছে।

সুশান্ত ঘর থেকে বের হয়ে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

রান্নাঘরের দরজাটা খোলা। মিত্রাণী রান্নাঘরে রাঁধছে।

বেশী বেলা হয়নি। মাত্র সোওয়া এগারোটা।

সুকান্ত বড্ড বেশী কাশছে আজ।

কী যে হয়েছে সুকান্তর, সে তাঁর ঘরের সামনে গেলেই ভ্রূকুটি করে তার দিকে তাকায়। যেন মনে হয় তাকে একেবারে দৃষ্টি দিয়ে ভস্ম করে দেবে।

সুকান্তর সেই দৃষ্টি যেন মিত্রাণীর সর্ব্বাঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেবে।

তবু মিত্রাণী রান্নাঘরে ঢুকে এক কাপ চা তৈরী করল বেশী দুধ চিনি ও আদার রস দিয়ে, তারপর চায়ের কাপটা হাতে সুকান্তর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

একটু যেন ইতস্ততঃ করল, তারপর ভেজানো দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকল।

সুকান্ত চিরদিনই একটু চায়ের ভক্ত। দিনে-রাত্রে আট-দশ বার চা পান করত।

এখানে এসে প্রথম প্রথম সে চা করেও দিয়েছে বার বার সুকান্তকে।

কথাটা শকুন্তলাই তাকে বলে দিয়েছিল।

বাবা একটু চা খেতে ভালবাসেন, ওঁকে মাঝে মাঝে চা করে দিস।

প্রথম দিন চা করে নিয়ে যাবার পর এক দ্বিপ্রহরে সুকান্ত কি সন্তুষ্টই না হয়েছিল। বলেছিল, কী—চা?

হ্যাঁ।

আনন্দে সুকান্তর চোখের তারা দুটো চকচক্ করে ওঠে। বলে, দাও।

চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে একটা চুমুক দিয়ে সুকান্ত বলেছিল, বাঃ, চায়ের হাতটা তো তোমার চমৎকার।

মিত্রাণী চুপ করে ছিল।

কিন্তু কেমন করে জানলে? সুকান্ত চায়ে চুমুক দিতে দিতে প্রশ্নটা করে।

কী?

আমি চা একটু বেশী ভালবাসি।

দিদি বলেছে।

বৌমা! সত্যি বৌমার মত আর মেয়ে হয় না। কী যে অসুখ ধরেছে ওকে। একটু যত্ন-আত্তি করো।

মিত্রাণী কোন জবাব দেয়নি সে কথার।

তারপর দিনের মধ্যে পাঁচ-সাতবার কাজের ফাঁকে ফাঁকে একটু ফুরসৎ পেলেই সুকান্তকে চা করে দিয়ে এসেছে।

সুকান্ত খুশি হয়েছে।

মধ্যে মধ্যে সুকান্তও ডেকেছে, মিতু মা!

যাই তাওইমশাই—

মিত্রাণী হয়তো কাজ করতে করতে জবাব দিয়েছে এবং বুঝতে পেরেছে কেন সুকান্ত ডাকছে।

তাড়াতাড়ি এক কাপ চা করে নিয়ে ঘরে ঢুকেছে।

চায়ের কাপটা হাতে নিতে নিতে সুকান্ত বলেছে, কেমন করে বুঝলে মা যে আমার চায়ের পিপাসা পেয়েছে?

মিত্রাণী কোন জবাব দেয়নি।

কিন্তু ইদানীং কয়েক মাস ধরে যেন সুকান্ত মিত্রাণীকে সহ্যই করতে পারছিল না।

এমন কি চা দিয়ে গেলেও বিরক্ত হত। মুখটা ভার-ভার এবং মিত্রাণীর দিকে না তাকিয়েই বলেছে, রেখে যাও।

প্রথম প্রথম ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি।

তখনও শকুন্তলা একটু-আধটু হাঁটা-চলা করতে পারত। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরের ঘরে যেত শ্বশুরের খবরাখবর নিতে।

বাবা, কেমন আছেন?

আমার কথা ছেড়ে দাও, তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ।

মিত্রাণী জানে, বুঝতে পেরেছিল, শকুন্তলাই সুকান্তর মনটা বিষিয়ে দিয়েছিল। তার প্রতি, যার ফলে ইদানীং সুকান্ত মিত্রাণীর প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠেছিল।

মিত্রাণী তাই বুঝি সুকান্তর ঘরে যাওয়াটা ক্রমশঃ কমিয়ে দিয়েছিল।

দিদিও তার প্রতি বিরক্ত, সুকান্তও বিরক্ত। ভাল লাগত না মিত্রাণীর ব্যাপারটা।

মধ্যে মধ্যে মনে হয়েছে, দিদিকে সে বলবে মালদহে তাকে আবার রেখে আসতে। একদিন কথাটা বলেও ছিল।

দিদি!

কি?

একটা কথা ভাবছিলাম—

ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকায় শকুন্তলা বোনের দিকে, কী কথা?

আমি মালদহেই আবার ফিরে যাই।

অকস্মাৎ যেন ক্ষেপে উঠেছিল সে কথায় শকুন্তলা।

বলেছিল, চোখের আড়াল হতে পারলে আরও সুবিধা হয়, না? জানি—তোমার ঐ ভগ্নীপতিটির পরামর্শ, তাই না?

মিত্রাণী চুপ করে ছিল।

শকুন্তলা বলেছিল, কিন্তু তা হবে না বলে দিও তোমার জামাইবাবুটিকে, সর্বনাশ যা ঘটতে চলেছে আমার চোখের সামনেই ঘটুক। তোমরা যে আমার আড়ালে গিয়ে তোমাদের ইচ্ছামত বেলেল্লাপনা করবে তা আমি হতে দেব না বলো তাকে। ঘাসজল খাই না, ঐ ছল-চাতুরীটুকু বোঝবার মত আমার বুদ্ধি আছে।

বলতে বলতে ক্ষোভে আক্রোশে কেঁদে ফেলেছিল শকুন্তলা, কেন, সবই তো চলেছে, বেলেল্লাপনার তো কোন কমতিই নেই, তবে আবার চোখের আড়াল হতে চাওয়া কেন?

বলাই বাহুল্য, অতঃপর মিত্রাণী আর কোনদিন ওকথা তোলেনি।

কিন্তু সত্যিই যেন তার ভাল লাগছিল না।

চলেও হয়ত যেত। কিন্তু পারেনি ঐ রাহুল আর ভগ্নীপতি সুশান্তর জন্যে।

সুশান্ত বার বার বলেছে, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে এখানে, আমি জানি মিত্রা—

না না, কষ্ট কি!

সত্যিই কুন্তলা যেন ক্রমশঃ ইনকরিজিবিল হয়ে উঠছে—

অসুস্থ মানুষ—

কিন্তু সব কিছুরই একটা সীমা আছে, মিত্রা।

সব কথাই কদিন ধরে নতুন করে যেন বার বার মনে পড়ছে মিত্রাণীর।

শকুন্তলা যেন মরেনি।

তার শরীরী উপস্থিতিটাই শুধু চোখের সামনে নেই কিন্তু তবু সে যেন আছে—সর্বক্ষণ যেন তার বিদেহী একটা উপস্থিতি মিত্রাণী অনুভব করে এ বাড়ির সর্বত্র।

শকুন্তলার ঘরের বন্ধ দরজার দিকে তাকালেই যেন মনে হয়—শকুন্তলা মরেনি—ঐ ঘরের মধ্যেই এখনও আছে।

দরজাটা খুললেই দেখা যাবে—এই দিকে তাকিয়েই সে বসে আছে এখনও।

দু'চোখের দৃষ্টিতে ঘৃণা আক্রোশ আর সন্দেহ।

চা তৈরী করতে করতেও ঐ কথাই ভাবছিল আজ মিত্রাণী।

।। বারো ।।

ভেজানো দরজাটা ঠেলে মিত্রাণী ঘরের মধ্যে পা দিল।

কে?

কাশতে কাশতেই চোখ তুলে তাকাল সুকান্ত।

মিত্রাণী কোন কথা না বলে চায়ের কাপটা নিঃশব্দে সুকান্তর শয্যার সামনে টুলটার ওপর নামিয়ে রাখল।

বিষ দিতে এসেছ—দাও দাও—এ কাজটাই বা আর বাকি থাকে কেন?

ঐ এক বুলি হয়েছে শকুন্তলার মৃত্যুর পর থেকে সুকান্তর।

খাবার দিতে ঘরে ঢুকলেই ঐ এক কথা।

বিষ—বিষ দিতে এসেছ—দাও দাও—কিন্তু এভাবে slow poisoning করছ কেন—ধীরে ধীরে না মেরে একেবারে বেশ খানিকটা বিষ দিয়ে শেষ করে দাও না, ল্যাঠা চোকে আর তোমরাও বাঁচ।

আজও সেই কথারই পুনরাবৃত্তি করে নিতান্ত যেন অনিচ্ছার সঙ্গেই চায়ের কাপটা তুলে নিল সুকান্ত।

মিত্রাণী ঘর থেকে বেরুবার জন্য পা বাড়ায়।

সুকান্ত পিছন থেকে ডাকে, শোন—

ফিরে দাঁড়ায় মিত্রাণী।

কিন্তু তোমরা যদি ভেবে থাক, ঐভাবে জ্যান্ত একটা মানুষকে বিষ দিয়ে হত্যা করে তোমরা বিয়ে করে সুখী হবে তো ভুল করছ—

মিত্রাণী কোন কথা বলে না।

বুড়োর মুখের দিকে চেয়ে থাকে নিঃশব্দে।

চেয়ে আছ কি? বুড়োর কথা সত্যি কি মিথ্যা জানতে পারবে একদিন। তারপর একটু বেশ দম নিয়ে বলে, হয় না—হয় না—এভাবে একজনের সর্বনাশ করে সুখ পাওয়া যায় না। কেউ কোনদিন পায়নি।

মিত্রাণী আর দাঁড়ায় না। ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

রাহুল ডাকছে।

মাসী—মাসীমণি দরজা খোল।

রাহুল স্কুল থেকে বোধ হয় ফিরল। তাড়াতাড়ি গিয়ে মিত্রাণী সদর দরজা খুলে দেয়।

কি করছিলে? এত যে ডাকছি, শুনতে পাও না?

এত তাড়াতাড়ি চলে এলে?

বাঃ, আজ না শনিবার—হাফ্‌ডে!

সত্যিই তো! আজ শনিবার—মিত্রাণীর মনেই ছিল না দিনটা।

মাসীমণি!

কি বাবা?

বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, কিছু খেতে দাও না।

হাত-মুখ ধুয়ে নাও, আমি খাবার আনছি।

মিত্রাণী রান্নাঘরের দিকে চলে গেল।

রাহুল ঘরের মধ্যে বইগুলো রাখছিল—সুকান্তর ডাক শোনা গেল।

দাদু—দাদুভাই!

রাহুল একটু পরে সুকান্তর ঘরে এসে ঢুকল।

আমাকে ডাকছিলে দাদু?

শোন, আয়, কাছে আয়—ফিস্ ফিস্ করে ডাকে সুকান্ত নাতিকে।

কী দাদু?

আয় না, কাছে আয়।

রাহুল এগিয়ে যায়, বল!

খাস না, বুঝলি—খাস না ও যা দেবে—

কী খাব না?

বিষ—বিষ দেবে তোকে—তোর মাকে ওরা মেরেছে, এখন আমাদের দুজনকে মারতে পারলেই—ব্যস্, সব চুকে গেল—নিশ্চিন্ত!

তাওইমশাই?

মিত্রাণীর তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরে চকিতে মুখ তুলে তাকায় সুকান্ত দরজার দিকে।

কখন ইতিমধ্যে দরজার উপর এসে মিত্রাণী দাঁড়িয়েছে সুকান্ত টেরও পায়নি।

ওসব কি যা-তা বলছেন ঐ একটা বাচ্চাকে?

তীক্ষ্ণ গলায় একটা ধমক দিয়ে ওঠে মিত্রাণী সুকান্তকে যেন।

সুকান্ত প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল, কিন্তু পরক্ষণেই সে ভাবটা সামলে নিয়ে বলে, বেশ করেছি বলেছি। সত্যি কথা বলব না কেন, একশ বার বলব। মারনি—মারনি তোমরা বৌটাকে আমার বিষ দিয়ে?

রাহুল, যাও এখান থেকে, যাও এ ঘর থেকে!

রাহুল সত্যিই মিত্রাণীকে ভালবাসে। সে মিত্রাণীর নির্দেশ লঙ্ঘন করতে সাহস পায় না। ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

মিত্রাণী আবার সুকান্তর দিকে ফিরে তাকায়।

কঠিন কণ্ঠে বলে, জানেন—আপনি জানেন তাকে বিষ দিয়ে মারা হয়েছে?

মেরেছ—নিশ্চয়ই মেরেছ।

না।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভাব আমি কিছু বুঝি না? কিছু শুনিনি? জানিনি? সব—সব শুনেছি, সব

জেনেছি—

কী—কী জেনেছেন আপনি? কী শুনেছেন?

যা সবাই জেনেছে, যা সবাই শুনেছে!

তাই তো জিজ্ঞাসা করি, কি জেনেছে কি শুনেছে?

তোমরা দুজনে মিলে—

থামুন। ধমকে ওঠে মিত্রাণী আবার সুকান্তকে।

কেন—কেন থামবো শুনি?

আপনি কি আপনার ছেলেকে ফাঁসির দড়িতে ঝোলাতে চান?

চাই, চাই—তাকে একলা নয় শুধু, সেই সঙ্গে তোমাকেও—বুঝলে, তোমাকেও।

একটা কুটিল হিংসায় যেন ফেটে পড়ে সুকান্ত।

প্রত্যেকটি কথার মধ্যে যেন একটা আক্রোশ ঝড়ে পড়ে, একটা ঘৃণা।

আপনি না তার বাবা?

না, না, আমি তার কেউ নয়—কেউ নয়। He is not my son, I am not his father!

মিত্রাণী যেন বিস্ময়ে একেবারে পাথর হয়ে যায়।

কোন বাপ তার ছেলের সম্পর্কে এত বড় কঠিন কথা উচ্চারণ করতে পারে?

ও কি সত্যিই বাপ?

মিত্রাণী যেন আর দাঁড়াতে পারে না। ঘর থেকে বের হয়ে যায়।

সত্যিই সে বুঝি বোবা হয়ে গিয়েছে।

মিত্রাণী সোজা নিজের ঘরে এসে ঢোকে। এবং ঢুকেই থমকে দাঁড়ায়।

রাহুল জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ফুলে ফুলে কাঁদছে।

কী—কী হয়েছে রাহুল?

মিত্রাণী এসে তাড়াতাড়ি রাহুলকে বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

মাথার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বলে, কাঁদছ কেন বাবা, কি হয়েছে?

মা—আমার মা—

কি হয়েছে?

সত্যিই মাকে তোমরা—তুমি আর বাবা বিষ দিয়ে মেরেছ মাসীমণি?

ছি বাবা, ওসব কথা বলতে নেই। মিথ্যে কথা।

তবে যে দাদু বলল একটু আগে!

দাদু কিছু জানে না।

জানে না?

না, তোমার মা অসুখে মারা গিয়েছে।

অসুখে?

হ্যাঁ, চল—হাত মুখ ধুয়ে খাবে চল। তোমার জন্য আমি চিংড়িমাছের কাটলেট করে রেখেছি।

সত্যি?

আনন্দে রাহুলের চোখের মণি দুটো জ্বলজ্বল করে ওঠে।

ভিজে চোখে খুশির আলো।

হ্যাঁ—চল।

সেই দিনই রাত্রে। রাত্রি তখন বোধ করি দশটা হবে।

পাড়াটা নিঝুম হয়ে এসেছে। মধ্যে মধ্যে কেবল একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে।

মিত্রাণী জেগে বসে ছিল। বসে বসে একটা বই পড়ছিল, আর মধ্যে মধ্যে বাড়ির পশ্চাতের বাগানের দিককার খোলা জানালা-পথে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাচ্ছিল।

বইয়ের পাতায় যে তার মন নেই সেটা বোঝা যায়।

রাহুল সামনের শয্যায় নিদ্রিত।

ও-ঘর থেকে মধ্যে মধ্যে সুকান্তর ঘং ঘং কাশির শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কয়েক দিন থেকেই যেন কাশিটা বেড়েছে ওর।

সুশান্ত সন্ধ্যের দিকে খবর পাঠিয়েছে রাত্রে সে আসবে না। সে কাজে জয়েন করার সঙ্গে-সঙ্গেই তার ডিউটি পড়েছে। গাড়ি নিয়ে সে লালগোলা গিয়েছে।

আকাশটা বেশ পরিষ্কার। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি। আকাশ-ভরা তারা।

বারান্দায় টাঙানো ওয়াল-ক্লকটায় একসময় ঢং ঢং করে রাত এগারটা ঘোষিত হল, মিত্রাণী উঠে দাঁড়ায় হাতের বইটা পাশে রেখে।

ড্রয়ার থেকে একটা মোমবাতি বের করে বাতিটা জ্বালায়। প্রজ্বলিত মোমবাতিটা বাগানের ধারের জানালাটার একেবারে মুখোমুখি আলমারির উপর বসায়।

বাতির শিখাটা মৃদু মৃদু কাঁপছে হাওয়ায়।

মিত্রাণী এসে খোলা জানালাটার সামনে দাঁড়ালো।

।। তেরো ।।

মিত্রাণী পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে।

মাথার চুল বেণীবদ্ধ। একটা কালো সাপ যেন পিঠের উপর এলিয়ে পড়ে আছে।

পরনে একটি ফিকে গোলাপী রঙের চওড়াপাড় মিলের শাড়ি। সেই শাড়ির উপর মৃদু মোমবাতির আলো পড়েছে।

মিত্রাণী তার শ্রবণেন্দ্রিয় যেন উৎকর্ণ করে জানালার বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকে।

কিন্তু মিত্রাণীর প্রতীক্ষা যেন বৃথাই যায়।

আরও একটা ঘন্টা অতিবাহিত হয়ে গেল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করে রাত বারোটা বেজে গেল। মিত্রাণী যেন এবার একটু চিন্তিত হয়ে ওঠে। একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস যেন ওর বুকটা কাঁপিয়ে বের হয়ে আসে মনে হল।

জানালার ধার থেকে মিত্রাণী সরে এল।

রাহুলের শয্যাপাশে এসে দাঁড়াল। রাহুল ঘুমোচ্ছে।

মাথার চুলগুলো ঘুমন্ত রাহুলের কপালের উপর থেকে সরিয়ে দিল ধীরে ধীরে মিত্রাণী।

কি ভেবে যেন বসল রাহুলের শয্যার পাশটিতে।

একদৃষ্টে ঘুমন্ত রাহুলের মুখের দিকে চেয়ে থাকে মিত্রাণী।

শকুন্তলা—তার দিদি—ঐ একটিমাত্র সন্তানকে তার যেন সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। অসুস্থা রুগ্না হয়েও সর্বক্ষণ যেন দুটো চোখ মেলে রাখত।

রাহুল এতটুকু কাঁদলে বা কিছু করলে অশ্রাব্য কুশ্রাব্য ভাষায় শকুন্তলা মিত্রাণীকে গাল

দিত। অথচ মিত্রাণী সত্যিই রাহুলকে ভালবাসত।

এখানে আসতে-না-আসতেই রাহুলকে সে যেন আপন করে নিয়েছিল।

আর রাহুলও—রাহুলও মিত্রাণীকে সত্যিই ভালবাসে।

মাসীমণি বলতে সে যেন অজ্ঞান।

তথাপি যে কেন শকুন্তলা রাহুলের ব্যাপারেও তাকে সন্দেহ করত সেটাই যেন কিছুতেই বুঝে উঠতে পারেনি মিত্রাণী। ভাল লাগছে না আর মিত্রাণীর এখানে থাকতে।

শকুন্তলা যেমন একদিন তাকে এখানে এনে আশ্রয় দিয়েছিল, ঠিক তেমনি মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তার সেই দেওয়া আশ্রয়টা যেন নিজেই আবার ভেঙে দিয়ে গিয়েছে।

তাই এক মুহূর্তও যেন এখানে আর মন টিকছে না তার।

ইচ্ছা করছে ফিরে যায় সে আবার মালদহে।

কিন্তু—

মৃদু একটা খস্‌খস্‌ শব্দ শোনা যায় জানালার বাইরে অন্ধকার বাগানে।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল মিত্রাণী।

এগিয়ে গিয়ে জানালার সামনে আবার দাঁড়ায়।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বাইরের অন্ধকারে কি যেন সে খোঁজে, কিন্তু দেখতে পায় না কিছু।

কিছুই তার নজরে পড়ে না।

প্রিয়তোষ বলে ছেলেটি এখনও বাগানের ওদিকে একটা গাছের নীচে চুপটি করে দাঁড়িয়ে ছিল।

তার দৃষ্টি স্থিরনিবদ্ধ—মিত্রাণীর ঘরের দিকে।

ঘরের মধ্যে মোমবাতির আলো জ্বলছে।

মিত্রাণী জেগে আছে।

অনেকক্ষণ জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল বাইরে তাকিয়ে। ফিরে গেল। আবার কিছুক্ষণ বাদে জানালার সামনে ফিরে এল।

প্রিয়তোষ ওখানে রাত নটা থেকে ডিউটি দিচ্ছে।

কাঁটাতারের বেড়ার পরেই সরু একটা পায়ে-চলা কাঁচা রাস্তা।

তারও ওদিকে রেলওয়ে ইয়ার্ড।

রেললাইন চলে গিয়েছে এঁকেবেঁকে পাশাপাশি আড়াআড়ি সমস্ত ইয়ার্ডটা জুড়ে।

কিছু দূরে মালগাড়ির কয়েকটা ওয়াগন দাঁড়িয়ে রয়েছে বিচ্ছিন্ন ভাবে যেন।

এদিকটায় বিশ্রী মশার উৎপাত।

মাঝে মাঝে হাওয়া যখন জোরে বইছে মশা থাকে না—হাওয়া কমে গেলেই মশা ছেঁকে ধরে যেন। একসময় ক্রমশঃ ভোর হয়ে এল।

ভোরের আলো চারিদিকে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল।

প্রিয়তোষ ফিরে গেল।

বেলা সাতটা নাগাদ সুশান্ত ডিউটি সেরে ফিরে এল।

রাত্রি-জাগরণের ক্লান্তি, চোখের তারা দুটো লাল। মাথার চুল বিস্রস্ত।

মেজাজটা যেন ভাল নয়।

মিত্রাণী রান্নাঘরে ছিল। রাহুল তাড়াতাড়ি খেয়ে স্কুলে যায়—উনুনে ভাতের হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। তরকারির ধামায় গতদিনের আনা সামান্য যা তরকারি অবশিষ্ট ছিল তাই একটা থালায় বঁটি পেতে কুটে কুটে রাখছিল মিত্রাণী।

রাহুল তার ঘরে বসে পড়ছে।

মিত্রা!

নিজের ঘরে ঢুকতে ঢুকতে সুশান্ত ডাকে মিত্রাণীকে।

মিত্রাণী সাড়া দেয়, আসছি—

ভাতের হাঁড়িটা উনুন থেকে নামিয়ে কেতলীতে চায়ের জল চাপিয়ে দিয়ে মিত্রাণী এসে সুশান্তর ঘরে ঢোকে।

শকুন্তলার ঘরটায় তালা দেওয়া থাকায় ইদানীং ছোট যে স্টোর-রুমের মত একটা ছিল তারই ঘরের লাগোয়া সেই ঘরেই শুচ্ছিল সুশান্ত।

ঐ ঘরটা খোলাবার কোন চেষ্টাও করেনি সুশান্ত।

ঐ ঘরটার দিকে তাকালেই যেন সুশান্তর মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

ছোট্ট ঘর—একটিমাত্র জানালা। এত ছোট্ট যে ঘরটায় কোন মানুষ থাকতে পারে না। কিন্তু উপায় কি!

তাছাড়া একটিমাত্র দরজা যাতায়াতের। কোনমতে ক্যাম্প-খাটটা পড়েছে, তাতেই যেন ঘরের সব জায়গাটা ভরে গিয়েছে।

সুশান্ত ক্যাম্প-খাটটার উপর বসে গায়ের জামাটা খুলছিল।

আমাকে ডাকছিলেন জামাইবাবু?

মিত্রাণী দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াল।

জামাটা গা থেকে খুলে একপাশে রেখে সুশান্ত মিত্রাণীর দিকে তাকাল, হুঁ, এক কাপ চা খাওয়াতে পার?

চায়ের জল চাপিয়েছি, এখুনি করে এনে দিচ্ছি। টোস্ট না বিস্কুট দেব?

আরে না না, কিছু না। শুধু চা।

মিত্রাণী ফিরে যাচ্ছিল।

সুশান্ত ডাকে, আরে শোন—শোন।

কি? ফিরে দাঁড়াল মিত্রাণী।

একটা কথা—

কি?

ভাবছি আজ একবার নিউ মার্কেটে যাব।

নিউ মার্কেটে!

হ্যাঁ, অনেকদিন কেক, মাটন-পেস্ট্রি এসব খাইনি, নিয়ে আসি—কি বল? রাহুলও বলছিল।

মিত্রাণী কোন জবাব দেয় না।

তুমি বরং চা-টা জলদি দাও। চা-টা খেয়ে তাড়াতাড়ি এখুনি বের হয়ে পড়ি।

মিত্রাণী চলে গেল নিঃশব্দে।

সুশান্ত আপনমনে গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজে।

একটু পরে মিত্রাণী চায়ের কাপ হাতে সুশান্তর ঘরে এসে প্রবেশ করল।

এনেছ—দাও?

হাত বাড়িয়ে দেয় চায়ের কাপটা নেবার জন্য সুশান্ত, কিন্তু তার আগেই সামনে ছোট টুলটার উপর চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখে মিত্রাণী।

সুশান্ত ভ্রূকুটি করে তাকায় মিত্রাণীর দিকে। হাতটা গুটিয়ে নেয়।

চায়ের কাপটা টুলটার উপরে নামিয়ে রেখে মিত্রাণী চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই সুশান্ত ডাকল, মিতা!

মিত্রাণী ঘুরে দাঁড়াল নিঃশব্দে। সুশান্তর মুখের দিকে তাকাল মিত্রাণী।

তোমার ব্যাপারটা কি বল তো?

প্রশ্নটা করে সুশান্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায় মিত্রাণীর দিকে।

মিত্রাণী চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা বলে না।

সুশান্ত আবার বলে আজ কদিন থেকেই দেখছি তুমি যেন আমার উপরে একটু বিরক্ত!

বিরক্ত হব কেন?

কেন হবে তা তুমিই জান। তবে দেখছি তাই—তুমি কি—

কি?

মিত্রাণী!

বলুন?

একটা কথার সত্যি জবাব দেবে?

কি?

সত্যি করে বল তো, কুন্তলার মৃত্যুর জন্য কি আমাকে তুমি সন্দেহ করছ?

কথাটা বলতে বলতে সুশান্ত উঠে দাঁড়ায়।

দু-পা এগিয়ে এসে মিত্রাণীর একেবারে মুখোমুখি দাঁড়ায়।

তুমি কি আমাকে সত্যিই সন্দেহ কর নাকি?

এসব কি বলছেন আপনি? ছি!

শোন মিতা, কারো মনে যদি আমাদের কোন সন্দেহ থাকে পরস্পরের প্রতি, সেটার স্পষ্টাস্পষ্টি একটা মীমাংসা হয়ে যাওয়াই ভাল নয় কি?

আমি যাই, ভাতটা ফুটে গিয়েছে—

না, দাঁড়াও।

জামাইবাবু, এসব কথা থাক্!

না, কথাটা যখন উঠেছে শেষ করতে হবে।

আমাকে যেতে দিন জামাইবাবু!

সুশান্ত ইতিমধ্যে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল।

মিত্রাণী যাবার চেষ্টা করে বোধ হয় পাশ কাটিয়ে।

জামাইবাবু—জামাইবাবু—

হঠাৎ যেন ক্ষেপে ওঠে সুশান্ত, কে তোমার জামাইবাবু—আমি তোমার জামাইবাবু নই!

কি বলছেন আপনি?

ঠিকই বলছি। ভারি তো দূর-সম্পর্কীয় বোন—

মিত্রাণী যেন কেমন ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকায় সুশান্তর মুখের দিকে।

তারপর মৃদুকণ্ঠে বলে, আপনি হয়ত জানেন না জামাইবাবু, কুন্তদির সঙ্গে আমার তেমন কোন নিকটতম সম্পর্ক না থাকলেও আমার নিজের মায়ের পেটের বোনের চাইতেও বেশী

ছিল সে।

তাই বুঝি!

হ্যাঁ, আপনি জানেন না, আমার নিজের কোন সহোদরা বোন নেই, কিন্তু থাকলেও বোধ হয় সে কুন্তদির চাইতে আপন হত না।

ব্যঙ্গভরে জবাব দেয় কটুকণ্ঠে সুশান্ত, তাই বুঝি বোনটি তোমাকে এত ভালবাসত!

কথাটায় কান দিল না বা দাঁড়াল না মিত্রাণী। ধীরে ধীরে পাশ কাটিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সুশান্ত কিছুক্ষণ অপলক দৃষ্টিতে মিত্রাণীর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকে ; তার মুখের ওপর একটা বিচিত্র কুটিল ছায়া যেন ভেসে ওঠে।

হাত বাড়িয়ে সুশান্ত চায়ের কাপটা তুলে নেয়। চায়ের কাপে চুমুক দেয়। কিন্তু অত্যন্ত বিস্বাদ যেন লাগে চা-টা সুশান্তর। গলা পর্যন্ত যেন তার তেতো হয়ে গিয়েছে।

ঠক্ করে চায়ের কাপটা পুনরায় টেবিলের উপর নামিয়ে রাখে।

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে একটা সিগারেট ধরায়, কিন্তু মুখটা যেন আরও বেশী বিস্বাদ হয়ে যায় তাতে করে। সিগারেটটা জানালা-পথে বাইরে নিক্ষেপ করে।

অতঃপর ঐ ছোট্ট ঘরটার মধ্যেই পায়চারি করতে থাকে। পায়চারি করতে করতে হঠাৎ কি ভেবে পায়চারি থামিয়ে জামাটা আবার গায়ে দিয়ে নেয় সুশান্ত। জুতোর মধ্যে পা গলিয়ে বের হয়ে আসে ঘর থেকে।

রান্নাঘরের সামনেই মিত্রাণীর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। মিত্রাণী শুধায়, কোথায় যাচ্ছেন আবার এসময়?

চুলোয়! বলে সুশান্ত হনহন করে বাইরের দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

মিত্রাণী বুঝি শেষ চেষ্টা করে বলে, সারাটা রাত ডিউটি করে এসেছেন। রান্না হয়ে গিয়েছিল, স্নান করে খেয়ে বেরুলেই পারতেন জামাইবাবু!

সুশান্ত ফিরে তাকাল মিত্রাণীর দিকে একবার।

দু-চোখে তার অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি।

।। চৌদ্দ ।।

অগ্নিবর্ষী দৃষ্টি দিয়ে দু-চোখে যেন মিত্রাণীকে ঝলসে দিয়ে সুশান্ত মুখটা ঘুরিয়ে আবার দরজার দিকে এগিয়ে যায়।

জামাইবাবু? আবার ডাকল মিত্রাণী।

ঘুরে দাঁড়াল সুশান্ত, আমার নিমন্ত্রণ আছে বাইরে।

নিমন্ত্রণ!

হ্যাঁ, তুমি খেয়ে নিও। তাছাড়া রাত্রে হয়ত আমি না-ও ফিরতে পারি।

একটা কথা বলছিলাম—

মিত্রাণীর কণ্ঠস্বরে সুশান্ত আবার ঘুরে তাকায় ওর মুখের দিকে।

বলছিলাম কি—আপনি একটা অন্য ব্যবস্থা করে নিন।

তার মানে? কিসের ব্যবস্থা?

রাহুল ও আপনাকে দেখাশোনা করার জন্য একজন লোকের দরকার হবে তো আমি চলে গেলে!

কেন, তুমি চলে যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ।

কোথায় যাবে শুনি? মালদহে ফিরে গেলে আর তোমাকে তারা জায়গা দেবে মনে কর নাকি?

নাই যদি দেয় তো কি আর করা যাবে! মৃদু হেসে শান্ত গলায় কথাটা শেষ করে মিত্রাণী, মালদহই তো পৃথিবীর শেষ একটিমাত্র স্থান নয়!

ওঃ, পৃথিবীটা চিনে ফেলেছ তাহলে?

চিনতে তো হবেই।

তাই বুঝি?

নচেৎ আমাদের মত মেয়েদের চলবে কি করে?

কিন্তু হঠাৎ এ মতলব কেন? সুশান্তর গলার স্বরটা যেন হঠাৎ কেমন করুণ শোনায়।

মতলব আর কি, দিদির জন্যই তো এসেছিলাম, সে-ই যখন—তাছাড়া—

কি?

এখানে যেন আর এক মুহূর্তও আমি টিকতে পারছি না। দম যেন আমার বন্ধ হয়ে আসছে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে!

আপনি একজন লোক ঠিক করে নিন—

হুঁ, কারণটা কি তাই, না অন্য কোথায়ও আশ্রয়ের প্রতিশ্রুতি পেয়েছ কারও কাছ থেকে?

মিত্রাণী হাসল। বললে, কে দেবে আশ্রয়? গলগ্রহ যারা অন্যের হয় তাদের লজ্জা বা অনিচ্ছা বলে কিছুর বালাই না থাকলেও যারা আশ্রয় দেবে তাদের সর্বক্ষেত্রেই প্রায় বলতে গেলে ঐ দুটোই যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেজন্য আপনাকে ভাবতে হবে না।

ভাবতে হবে না।

না। তেমন যদি বিপাকে পড়িই, অন্ততঃ রাস্তা বলেও একটা জায়গা তো আছেই সংসারে, সেখানে তো অন্ততঃ ঢোকবার বা বেরুনোর জন্য কেউ দরজার সৃষ্টি করে রাখেনি।

বেশ, তাই তবে যেও।

কিন্তু রাহুলের--

আমাদের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি আসবার আগেও যদি আমাদের চলে গিয়ে থাকতে পারে, তুমি চলে যাবার পরও চলে যাবে। যেদিন যখন খুশি তোমার যেতে পার।

সে তো নিশ্চয়, কার জন্য আর আটকে থাকে এ সংসারে।

কথাটা বলে মিত্রাণী ঘুরে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে।

সুশান্ত তথাপি কয়েকটা মুহূর্ত স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে থাকে।

ইচ্ছা হচ্ছিল তার, ছুটে গিয়ে মেয়েটার গালে ঠাস্ ঠাস্ করে কয়েকটা চড় বসিয়ে দেয়। বলে, অকৃতজ্ঞ—ঝিয়েরও অধম হয়ে সেখানে পড়েছিলি—ভাত তো পেটভরে দুবেলা জুটতই না, উপরন্তু লাথি-ঝাঁটা—এই বুঝি সেই কৃতজ্ঞতারই ঋণশোধ?

কিন্তু কিছুই বলল না সুশান্ত। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একসময় বের হয়ে এল বাড়ি

থেকে।

আজ দিনে বা রাত্রে আর ডিউটি নেই। ডিউটি পড়েছে সেই কাল ভোরের ট্রেনে।

কিন্তু হাঁটতে হাঁটতে সুশান্ত অফিসের দিকেই চলে। খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে। কাল রাত্রে ক্যানটিনে পেটভরে খাওয়া হয়নি। স্টেশনে পৌঁছে রেলওয়ে ক্যানটিনেই শেষ পর্যন্ত গিয়ে ঢুকল সুশান্ত। পেটে কিছু না পড়লে আর চলছে না। ক্যানটিনে ঐসময় বিশেষ ভিড় ছিল না। একটা লাঞ্চের অর্ডার দিয়ে সুশান্ত কোণের একটা টেবিলে গিয়ে বসল।

মিত্রাণী চলেই যাবে মনে হচ্ছে!

যদি চলে যায়—একটা ব্যবস্থা করতে হবেই, রাহুলকে দেখাশোনা করবার জন্য—তাছাড়া অসুস্থ বাপ—একজন লোক না হলে মুশকিল। সে নিশ্চিন্তে ডিউটিও করতে পারবে না। মামার বাড়িতে যে ছেলেটাকে পাঠিয়ে দেবে তার উপায় নেই—হাঁসের পালের মত একপাল ওর মামার সংসারে সর্বক্ষণ প্যাঁক প্যাঁক করছে।

ক্যানটিন-বয় এসে সামনের টেবিলে ভাতের প্লেটটা নামিয়ে রাখল।

একটা অল্পবয়সের দুঃস্থ গরীবের মেয়ে রাখলে কেমন হয়? দেখাশোনাও করবে এবং রান্নাবান্নাও করবে। কিন্তু চট্ করে মিলবে কোথায়? লোকের কথা যে সুশান্ত ভাবেনি তা নয়—মিত্রাণীর কথা ছেড়ে দিয়েও সে কদিন ধরে ঐ কথাটাই ভাবছিল।

সমরেশকে কথাটা বলায় সে বলেছিল, পেপারে একটা বিজ্ঞাপন দে।

বিজ্ঞাপন দিয়ে কি হবে? সুশান্ত শুধিয়েছিল।

বিজ্ঞাপনে অনেক সময় অনেক সন্ধান পাওয়া যায়—ভাল কাজ হয়।

সন্ধান পাওয়া যায়—কিন্তু—

কি?

সেরকম খাটতে পারে অল্পবয়সের মেয়ে পাব কোথায়?

সমরেশ ঠাট্টা করে বলেছিল, তা ছেলেমানুষেরই বা দরকার কি? মাঝবয়সী বা বুড়ো—

না, ওগুলো কোন কর্মের হয় না, খালি খায় আর পড়ে পড়ে ঘুমোয়!

সমরেশ চোখ নাচিয়ে বলেছিল, তাহলে বল্ house-keeper housewife— একজন বয়সে তরুণী—

সুশান্ত বাধা দিয়েছিল, কি যা-তা বলিস? মুখে আর কিছু আটকায় না। যত সব অশ্লীল—

অশ্লীল! কি বলছিস সুশান্ত? জীবনের যেটা সর্বাপেক্ষা বড় কথা, সেটাই হয়ে গেল অশ্লীল!

থাম্ তো!

থামিয়ে দিয়েছিল সমরেশকে সুশান্ত।

এ কি, সুশান্ত!

চমকে মুখ তুলে তাকাতেই সমরেশের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল সুশান্তর।

সামনে দাঁড়িয়ে সমরেশ।

কি ব্যাপার রে, ক্যানটিনে খাচ্ছিস ডিউটি-অফ্ ডে-তে?

গৃহে যে আজ অরন্ধন।

অরন্ধন?

হ্যাঁ।

তোদের আবার ওসব আছে নাকি? তাছাড়া আজ তো অরন্ধন নয়।

পাঁজিতে না থাকলেই কি অরন্ধন গৃহে থাকতে নেই?

বেশ একটুকরো মাছের সঙ্গে একগ্রাস ভাত মুখে তুলেছিল সুশান্ত, মাছের সঙ্গে একটা বড় কাঁটা মুখে চলে গিয়েছিল, সেটা দু-আঙুলে টেনে বের করতে করতে কথাটা বলে সুশান্ত।

সমরেশ ততক্ষণে সামনের একটা চেয়ার টেনে সুশান্তর মুখোমুখি বসে গিয়েছে।

সে বলে, তাহলে বৌদি যেতে-না-যেতেই তোর হাঁড়ির এই হাল হয়েছে বল্!

হুঁ, নিজে তো মরেছেই আমাকেও মেরে রেখে গিয়েছে। সুশান্ত জবাব দেয়।

কিন্তু তুই না সেদিন বলছিলি তোর এক শ্যালিকা গৃহে আছে, সংসার ও ছেলের ব্যাপারে তুই নিশ্চিন্ত!

হ্যাঁ, পুরোপুরি।

তার মানে?

বুঝলি সমরেশ—প্লেট থেকে মুখ তুলে তাকাল সুশান্ত, ঐ মেয়ে জাতটা—

কি?

মানে ঐ মেয়ে জাতটার মত নিমকহারাম ও স্বার্থপর দ্বিতীয় প্রাণী আর নেই সংসারে!

তোর তাহলে মত বদলেছে বল্ আবার?

হ্যাঁ।

দেখ্, এক কাজ কর্—

কি?

তুই তো বলছিলি তোর শ্যালিকাটি তোরই আশ্রিতা একপ্রকার এবং এখনও অবিবাহিতা—

তাই কি?

বিয়ে করে ফেল্ না তাকে—সেও বেঁচে যাবে, তোরও এভাবে ছুটির দিনে ক্যানটিনের ভাত এসে গিলতে হবে না।

যেন চমকে ওঠে সুশান্ত।

কি যে বলিস!

কেন, খারাপটা কি বললাম?

যাঃ, তাই হয় নাকি!

হয়, হয়—হামেশাই হচ্ছে, আকছার হচ্ছে। প্রস্তাব করেই দেখ্—

হুঁ—তারপর রাজী যদি না হয়?

কেন রে? কণ্ঠস্বরে তোর মনে হচ্ছে, প্রস্তাব করেছিলি! করেছিলি নাকি?

না, না—

তবে?

কি তবে?

প্রস্তাবটা পেশ করেই দেখ্ না!

যদি না করে দেয়?

করলেই অমনি হল! তাছাড়া তোর বয়সই বা কি এমন হয়েছে?

সুশান্তর ইতিমধ্যে খাওয়া হয়ে গিয়েছিল। সে উঠে পড়ে।

সমরেশ ঐসময় বেয়ারাটাকে এক কাপ চা দিতে বলে।

হাত-মুখ ধুয়ে সুশান্ত এসে চেয়ারে পুনরায় বসে একটা সিগারেট ধরায়।

তুই আবার সিগারেট ধরলি কবে থেকে রে?

ধরলাম! উদাস কণ্ঠে জবাব দেয় সুশান্ত।

বেয়ারাটা এক কাপ ধূমায়িত চা এনে নামিয়ে রেখে গেল টেবিলে।

সমরেশ চায়ের কাপটা টেনে নেয়।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সমরেশ বলে, তোর দেখছি সত্যিই আবার একটা বিয়ে করা দরকার।

সুশান্ত কোন জবাব দেয় না, কেমন যেন অন্যমনস্ক। মনে হয়, যেন কি ভাবছে।

সমরেশ আবার বলে, যা বললাম তাই কর্—ওসব বলাবলির মধ্যে যাস না। আবার মেয়ে জাতটার হচ্ছে পেটে ক্ষিধে মুখে লাজ—শ্যালিকাটিকে সিনেমা দেখবার নাম করে বের হয়ে সোজা চলে যা রেজিস্ট্রি অফিসে—

হুঁ, তারপর?

তারপর আবার কি? একেবারে husband and wife!

মৃদু হাসে সুশান্ত।

হাসছিস?

না, উঠলাম। সুশান্ত উঠে দাঁড়ায়।

সমরেশের কথাটা তখনও তার মনের মধ্যে একটা গুঞ্জন তুলে ফিরছে।

।। পনেরো ।।

বেলা এগারটা নাগাদ সেই যে সুশান্ত বের হয়ে গিয়েছে, এখনও ফেরেনি। রাত প্রায় এগারটা হল।

রাহুল ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে। মিত্রাণী একা দাঁড়িয়ে ছিল জানালাটার সামনে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে। অন্ধকার রেলওয়ে ইয়ার্ডে বোধ হয় শানটিং হচ্ছে কোথাও, তারই আওয়াজ মধ্যে মধ্যে ভেসে আসছে।

পশ্চাতে টেবিলের উপরে সদ্য শেষ করা একটা চিঠি। চিঠির মুখটা বন্ধ করা। উপরে ঠিকানা লেখা। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত চিঠিটা লিখছিল মিত্রাণী। চিঠিটা শেষ করে ঐ জানালার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

মিত্রাণী একবার ফিরে তাকায় ঘুমন্ত রাহুলের দিকে।

রাহুল গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। এখন আর তার ঘুম ভাঙবে না। মিত্রাণী এগিয়ে এসে আলনা থেকে একটা চাদর টেনে নিল—চাদরটা গায়ে জড়িয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে এল। ঘরের দরজাটা নিঃশব্দে ভেজিয়ে দিল।

সদর দরজা খুলে বের হল। সদরে ইয়েল লক লাগানো। দরজার কপাট দুটো টেনে দিতেই দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

গেট দিয়ে বের হয়ে মিত্রাণী দ্রুত হেঁটে চলে।

নির্জন চারিদিক—জনপ্রাণীর চিহ্নমাত্রও নেই কোথাও। কিছুদূর এগিয়ে যায় মিত্রাণী হনহন করে। রাস্তার মোড়ে একটা লেটার-বক্স্—তার মধ্যে চিঠিটা ফেলে দিল মিত্রাণী।

হনহন করে বাড়ির দিকে আবার ফিরে চলে।

হাতেই চাবি ছিল মিত্রাণীর। চাবি দিয়ে দরজাটা খুলে ভিতরে প্রবেশ করল। নিজের ঘরে এসে ঢুকে রাহুলের দিকে একবার তাকাল। রাহুল ঘুমোচ্ছে। বোধ হয় দু-মিনিটও হয়নি সদর দরজা খোলার শব্দ পায় মিত্রাণী।

মিত্রাণী বুঝতে পারে সুশান্ত ফিরল।

তার কাছে একটা চাবি থাকে, সেই চাবি দিয়েই রাত্রে এলে দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে। অনেক সময় রাত্রে তাকে ফিরতে হয়, সে-সময় সে কাউকে ডাকাডাকি করে না।

মিত্রাণী কান পেতে থাকে। রাত সাড়ে এগারোটা বাজে। টেবিলের উপরে রাখা টেবিল-ক্লকটার দিকে তাকিয়ে দেখে মিত্রাণী। খাবারটা বোধ হয় ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। খাবারটা গরম না করে দিলে সুশান্ত খেতে পারবে না। মিত্রাণী ঘর থেকে বের হয়ে রান্নাঘরের দিকে গেল।

সুশান্তর ঘরের দরজাটা খোলা। দরজা-পথে আলোর আভাস আসছে।

সুশান্তই এসেছে।

ঘরের সামনে আসতেই চোখে পড়ল সুশান্ত ঘর থেকে বের হয়ে আসছে। ঘর থেকে বের হয়ে সুশান্ত মুহূর্তের জন্য দাঁড়াল, রান্নাঘরের দিকেই তার দৃষ্টি মনে হল মিত্রাণীর।

ভাতটা একেবারেই ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। নিবন্ত চুল্লীর উপরে যদিও ভাতের হাঁড়িটা বসিয়ে রেখেছিল মিত্রাণী, চুল্লীর আগুন একেবারে নিভে গিয়েছে। মিত্রাণী তাই ভাবছিল, কি করে ঠাণ্ডা ভাতটা গরম করবে!

সুশান্ত এসে রান্নাঘরের খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল।

মিতা!

আপনি ঘরে গিয়ে বসুন জামাইবাবু, ভাতটা একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে, একটু গরম করে আনছি।

জনতা স্টোভটায় আগুন দিয়ে মিত্রাণী ভাতটা গরম করবার জন্য ব্যস্ত ছিল।

তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না, আমি বাইরে থেকে খেয়ে এসেছি।

খেয়ে এসেছেন!

হ্যাঁ, তুমি একটু আমার ঘরে এস, তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

আপনি যান, আমি আসছি।

সুশান্ত তার ঘরে ফিরে গেল।

গায়ের জামাটা খুলে একটা পায়জামা পরেছিল সুশান্ত। গলাটা কি রকম যেন শুকিয়ে যাচ্ছে, অত্যধিক মদ্যপান করেছে আজ সুশান্ত। সমরেশের ওখানে মধ্যে মধ্যে ড্রিঙ্ক করত দুই বন্ধুতে।

আজ একটু সুবিধাই হয়েছিল। সমরেশের স্ত্রী গৃহে ছিল না, সন্ধ্যা থেকে বসে বসে দুই বন্ধুতে পুরো একটা বোতল শেষ করেছে। খাওয়ার কথা মিথ্যা বলেছে সুশান্ত।

খাওয়া মানে দুই বন্ধুতে আকণ্ঠ মদ্যপান!

রাত অনেক হতে একসময় সমরেশ জিজ্ঞাসা করে, কি রে, যাবি না বাড়ি?

বাড়ি!

হুঁ, রাত প্রায় সোয়া এগারটা—

তাই নাকি?

ঐ দেখ্ টেবিল-ক্লকটার দিকে চেয়ে।

সুশান্ত অতঃপর টলতে টলতে উঠে দাঁড়ায়। মাথা হাল্কা, শরীরটাও হাল্কা হয়ে গিয়েছে নেশায়। হেঁটে আসার ক্ষমতা ছিল না সুশান্তর। একটা ট্যাক্সি নিয়েই সে ফিরে আসে। মোড়ের মাথাতেই ট্যাক্সিটা ছেড়ে দিয়ে সুশান্ত বাকি পথটুকু হেঁটে এসেছিল। বাড়ির গেটের কাছে এসেই মিত্রাণীর ঘরের আলো জ্বলছে দেখতে পায়।

আরো দেখতে পায় জানালার সামনে মিত্রাণী আছে। মিত্রাণী তাহলে জেগেই আছে। সুশান্ত এগিয়ে এসে পকেট থেকে চাবিটা বের করে সদর দরজার লক্‌টা খুলে ভিতরে প্রবেশ করে।

মিত্রাণী এসে ঘরের দরজার সামনে দাঁড়াল।

সুশান্ত একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছিল।

আমাকে ডাকছিলেন জামাইবাবু?

হ্যাঁ—এস, ভেতরে এস।

মিত্রাণী একবার সুশান্তর মুখের দিকে তাকাল।

দু-পা এগিয়ে দরজার গোড়াতেই দাঁড়িয়ে বললে, বলুন—

একটা কথা ভাবছিলাম—

কি?

তুমি তখন বললে চলে যাবে—

হ্যাঁ।

ব্যাপারটার অন্যভাবে একটা মীমাংসা হতে পারে না?

মীমাংসা!

হ্যাঁ।

আপনি ঠিক কি বলতে চান বুঝতে পারছি না!

যদি ধর তোমাকে আমি বিয়ে করি—

ছি!

পরিপূর্ণ একটা ঘৃণায় যেন কথাটা উচ্চারিত হল মিত্রাণীর কণ্ঠ হতে।

ছি কেন? আমার বয়স বেশী বলে একটু?

না।

তবে?

তা সম্ভব নয়।

তাই তো জিজ্ঞাসা করছি, কেন সম্ভব নয়? বাধাটা কোথায়? কিসেরই বা বাধা আমাদের বিয়েতে?

আমি যাচ্ছি। যাবার জন্যই বোধ হয় মিত্রাণী ঘুরে দাঁড়ায়—পা বাড়ায়।

সুশান্ত তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

দু'পা এগিয়ে এসে বলে, দাঁড়াও—শোন মিতা—

না, বললাম তো না!

সুশান্ত হঠাৎ হাত বাড়িয়ে মিত্রাণীর একটি হাত চেপে ধরে। বলে, বল—কেন না, মিতা?

আঃ ছাড়ুন, কি করছেন।

পাশের ঘর থেকে ঐ সময় সুশান্তর বাপ সুকান্তর কাশির শব্দ শোনা গেল।

হঠাৎ সুকান্ত কাশতে সুরু করেছে।

সুশান্ত চাপা কণ্ঠে মিত্রাণীর হাতটা আরও দৃঢ় মুষ্টিতে চেপে ধরে বলে, না, বলতেই হবে তোমাকে, বল—বল—

সুশান্ত যেন ক্ষেপে গিয়েছে।

ভরভর করে সুশান্তর মুখ থেকে মদের গন্ধ বের হচ্ছে।

কেঁপে ওঠে মিত্রাণী যেন। এক ঝটকা দিয়ে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নেয় মিত্রাণী এবং সুশান্ত কিছু বুঝবার আগেই ছুটে গিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে মিত্রাণী ঘরের দরজাটা বন্ধ করে ভিতর থেকে খিল তুলে দেয়। সে তখনও রীতিমত হাঁপাচ্ছে। বুকের ভিতরটা তখনও তার যেন থরথর করে কাঁপছে।

সুশান্ত বন্ধ দরজার গায়ে মৃদু ধাক্কা দিতে দিতে চাপা কণ্ঠে ডাকে, মিতা, মিতা!

দু-হাতে মুখ ঢেকে ফেলে মিত্রাণী। দু চোখের কোল ছাপিয়ে হু হু করে জল নেমে আসে। সুশান্তর ইদানীংকার চোখের দৃষ্টিটার তাৎপর্য যেন এক্ষণে স্পষ্ট হয়ে ওঠে মিত্রাণীর কাছে।

সুশান্তর মনে তাহলে এই ছিল? ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

কুন্তলাদি এইজন্যই তাহলে ইদানীং তার ওপরে এত বিরক্ত হয়ে উঠেছিল?

সে স্ত্রী হয়ে তার স্বামীর চোখের দৃষ্টিকে ভুল করেনি। আর স্বাভাবিক ভাবেই হয়তো সে ভেবে নিয়েছিল মিত্রাণীরও সায় আছে।

ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

ঘৃণায় লজ্জায় ও একটা অবিমিশ্র ধিক্কারে নিজেকে যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে ইচ্ছে করে মিত্রাণীর। এর পর আর এক মুহূর্তও কি তার এখানে থাকা নিরাপদ বা যুক্তিসঙ্গত হবে?

।। সতেরো ।।

প্রিয়তোষই লেটার-বকস্ থেকে পরের দিন বিটের পিওনের সাহায্যে চিঠিটা সংগ্রহ করে এনেছিল।

অবনী চিঠিটা পেয়েই কিরীটীকে ফোনে সংবাদ দিয়েছিল।

একটা চিঠি পাওয়া গিয়েছে কিরীটীবাবু!

কিরীটী ঐসময় কৃষ্ণার সঙ্গে বসে দাবা খেলছিল।

মনটার মধ্যে তখনও দাবার ছকটা ও দাবার ঘুঁটিগুলোই ঘোরাফেরা করছিল।

বলে, চিঠি!

হ্যাঁ।

কার?

মিত্রাণীর।

মিত্রাণী চিঠি দিয়েছে নাকি!

না না—

তবে?

সে লিখেছিল একজনকে।

কাকে?

সঞ্জীব দত্তকে। আপনি আসুন একবার।

এতক্ষণে যেন কিরীটী তার নিজের মধ্যে ফিরে আসে। মনোযোগী হয়ে ওঠে। বলে, মিত্রাণী মানে সেই সুশান্ত চ্যাটার্জির শ্যালিকা?

হ্যাঁ।

আসছি আমি।

কিরীটী ফোনটা নামিয়ে রাখল।

আর দেরি না করে জামাটা কোনমতে গায়ে চড়িয়ে তখুনি সোজা থানায় চলে আসে।

প্রিয়তোষ তখনও তার কথা ফলাও করে অবনীকে বলছিল।

কিরীটীকে থানায় প্রবেশ করতে দেখে সে থেমে যায়।

এই যে আসুন—শেষ পর্যন্ত আপনার ফাঁদেই পা দিয়েছেন দেবী—

হাসতে হাসতে অবনী বলে।

কই, দেখি কি চিঠি?

খোলা চিঠিটা কিরীটীর হাতে এগিয়ে দেয় অবনী মিত্র।

সযত্নে জলের সাহায্যে চিঠিটা খুলে ফেলেছিল অবনী মিত্র।

খাম থেকে চিঠিটা টেনে বের করে কিরীটী।

উপরে সঞ্জীব দত্তর নাম-ঠিকানা থাকলেও ভিতরে চিঠিতে কোন সম্বোধন নেই।

এক সংক্ষিপ্ত চিঠি ঃ

'তোমার ব্যাপার কি সত্যিই বুঝতে পারছি না!'

রাগ করেছ নাকি? নাকি খুব কাজে ব্যস্ত! কুড়ি-পঁচিশ দিনেরও বেশী হয়ে গেল একটিবার দেখা করবারও সময় পেলে না?

আমার বিপদটা কি তুমি বুঝতে পারছ না? সত্যি সর্বক্ষণ আমার বুকটা কাঁপছে ভয়ে আর দুশ্চিন্তায়। কি হবে বুঝতে পারছি না। দারোগাবাবু বোধ হয় কিছু সন্দেহ করেছেন।

আরও কি সেদিন বলে গেছেন জান? কৃষ্ণদি নাকি বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেনি। তাকে হত্যা করা হয়েছে। তাছাড়া এখানে জামাইবাবুরও চোখের দৃষ্টি, কথাবার্তা ইদানীং যেন কেমন মনে হচ্ছে।

লক্ষ্মীটি, চিঠি পাওয়া মাত্রই তুমি এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে।

দরজায় টোকা দিলেই দরজা খুলে দেব।

আমি জেগেই থাকব।

ইতি—তোমার মিতুয়া'

কিরীটী বার-দুই চিঠিটা আগাগোড়া পড়ল।

তারপর চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে অবনী মিত্রের দিকে তাকাল।

চিঠিটা কোথায় পেয়েছেন?

প্রিয়তোষ এনেছে, তবে আর বলছি কি। ভাগ্যে আপনি বাড়িটার ওপর সর্বক্ষণ ওয়াচ রাখতে বলেছিলেন। অবনী মিত্র পরিতৃপ্তির হাসি হাসেন।

কোথায় পেলেন, প্রিয়তোষবাবু? কিরীটী প্রিয়তোষের মুখের দিকে তাকায়।

ওদের কোয়ার্টারের কাছে ঠিক রাস্তার মোড়ে যে লেটার-বক্সটা আছে, কাল এক-সময় মিত্রাণী দেবী এসে তার মধ্যে চিঠিটা ফেলে দেয়। আজ সকালে চিঠিটা পিওনের সাহায্যে হাতিয়েছি।

হুঁ! কিরীটী কি যেন ভাবছে।

কি ভাবছেন মিঃ রায়?

কিরীটী সে কথার জবাব না দিয়ে নিজের হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলে, বেলা সোয়া আটটা—চলুন—উঠুন—

উঠব।

হ্যাঁ, চলুন একবার ঘুরে আসি।

কোথায়?

সুশান্ত চ্যাটার্জির কোয়ার্টারে।

যাবেন?

হ্যাঁ, চলুন।

ওরা আর দেরি করে না। অবনী মিত্রের জীপেই দুজনে বের হয়ে পড়ে। ওরা যখন সুশান্ত চ্যাটার্জির কোয়ার্টারের সামনে এসে জীপ থেকে নামল, নটা বাজতে তখনও মিনিট-কুড়ি বাকি।

কলিং বেল টিপতেই একটু পরে দরজাটা খুলে গেল।

সামনে দাঁড়িয়ে মিত্রাণী। তার চোখে-মুখে যেন রাত্রি-জাগরণের একটা বিষণ্ণ ক্লান্তি। মিত্রাণী ওদের ঐ সময় দেখে যেন একটু অবাকই হয়।

কিরীটীই প্রশ্ন করে, সুশান্তবাবু বাড়িতে আছেন?

হ্যাঁ।

কি করছেন তিনি?

ওরা ভিতরে গিয়ে ঢুকল।

দুজনে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে দুটো চেয়ার অধিকার করে বসে।

কি করছেন তিনি?

কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

ঘুমোচ্ছেন বোধ হয়।

এখনও ঘুমোচ্ছেন?

কিরীটীর প্রশ্নে মিত্রাণী মাথাটা নীচু করে। কোন জবাব দেয় না।

রাত্রে ডিউটি ছিল বুঝি মিঃ চ্যাটার্জির? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

না।

তবে এমনি বেলা পর্যন্তই ঘুমোন নাকি উনি?

সে প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে মিত্রাণী বলে, আমি ডেকে দিচ্ছি তাঁকে।

মিত্রাণী ভিতরের দিকে পা বাড়ায়। কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেয়। বলে, শুনুন শুনুন, ব্যস্ত হবেন না, একটু পরে তাঁকে ডাকলেও চলবে।

মিত্রাণী তাকায় কিরীটীর মুখের দিকে।

বসুন, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।

মিত্রাণী কিরীটীর মুখের দিকে তখনও তাকিয়ে আছে।

বসুন!

মিত্রাণী কিন্তু বসে না। দাঁড়িয়েই থাকে।

রাহুল কোথায়?

স্কুলে গেছে।

আর ভয় পায়নি তো?

ভয়!

হ্যাঁ, আমার মনে হয় কোন কারণে ভয় পেয়েই বোধ হয় ওর হঠাৎ সেদিন জ্বর হয়েছিল।

ভয় কেন পাবে?

পেতেও তো পারে। যেমন ধরুন আচমকা কাউকে জানালার ধারে অন্ধকারে দেখে হঠাৎ ঘুম ভেঙে—

মিত্রাণী কিরীটীর মুখের দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তখনও।

যাক সে কথা। সেদিন আপনি আমাদের প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন, দুর্ঘটনার দিন রাত্রে তৃতীয় কোন ব্যক্তি আপনার শোবার ঘরে আসেনি।

হ্যাঁ।

কিন্তু, যদি বলি আপনি deliberately—ইচ্ছা করেই মিথ্যা কথা বলেছেন?

মিথ্যা!

হ্যাঁ, মিথ্যা—আপনি মিথ্যা বলেছেন।

আমি—

শুনুন মিত্রাণী দেবী, আমি জানি সে-রাত্রে কেউ আপনার ঘরে এসেছিল ; আবার আমি জিজ্ঞাসা করছি—এখনও বলুন, কে তৃতীয় ব্যক্তি সে-রাত্রে আপনার ঘরে এসেছিল?

কিরীটীর কণ্ঠস্বর কঠিন তীক্ষ্ণ, চোখের দৃষ্টি যেন অন্তস্তল ভেদ করে যাচ্ছে।

কিরীটীর কণ্ঠস্বর—বিশেষ করে অন্তর্ভেদী কিরীটীর চোখের সেই দৃষ্টি সহসা মিত্রাণীকে যেন কেমন বিবশ করে দেয়।

বলুন, কে এসেছিল?

মিত্রাণী যেন পাথর।

সঞ্জীব দত্ত এসেছিল, তাই না?

না, না—

জানেন—একটু থেমে কিরীটী বলে, শুনুন মিত্রাণী দেবী, সত্যকে আপনি চাপা দিয়ে রাখতে পারবেন না, প্রকাশ তা পাবেই। সূর্যের আলোকে চাপা দেওয়া যায় না, এখনও বলুন—এখনও স্বীকার করুন সে রাত্রে কে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল?

মিত্রাণী যেন পাথর হয়ে গিয়েছে। কোন সাড়া নেই, কোন শব্দ নেই তার মুখে। ওষ্ঠে এতটুকু কুঞ্চনও নেই। দু-চোখে ভাষাহীন বোবা দৃষ্টি।

এখনও বলুন মিত্রাণী দেবী, কে এসেছিল আপনার ঘরে সে-রাত্রে? এখন না বললেও জানবেন—আজ হোক কাল হোক সব বলতে আপনাকে হবেই। কিরীটী বলতে থাকে, স্বীকার আপনাকে করতেই হবে, নচেৎ অবনীবাবু আপনাকে আপনার বোন শকুন্তলা দেবীর হত্যাপরাধে গ্রেপ্তার করবেন।

হত্যাপরাধে!

হ্যাঁ, শকুন্তলা দেবী যে সে-রাত্রে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেননি, সে-কথা আপনি জানেন।

আমি বিশ্বাস করি না সে-কথা।

বিশ্বাস না করলেও তাই সত্য বলে জানবেন। তিনি আত্মহত্যা করেননি। তাঁকে শ্বাসরোধ করে হত্যা—খুন করা হয়েছে।

না, না—

হ্যাঁ, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে—নিষ্ঠুর, নৃশংস হত্যা। এখনও বলুন, সে-রাত্রে আপনার জামাইবাবু ছাড়াও তৃতীয় ব্যক্তি কে আপনার ঘরে এসেছিল? বলুন?

কিরীটীর কণ্ঠস্বর, তার চোখের ধারালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মিত্রাণীকে যেন কেমন বিবশ করে দেয়।

।। আঠারো ।।

বিশেষ করে কিরীটীর মুখে উচ্চারিত শেষের কথাগুলো মিত্রাণীকে যেন সত্যিই পাথর করে দেয়, সে তার প্রতিরোধ-ক্ষমতা হারায়।

কিরীটী চেয়ে আছে তখনও মিত্রাণীর দিকে।

সে-রাত্রে কেউ তাহলে আপনার ঘরে এসেছিল।

মৃদু—অত্যন্ত মৃদু কণ্ঠে এবার জবাব দেয় মিত্রাণী। সে বলে, হ্যাঁ।

কে? কে সে?

সঞ্জীব।

সে তাহলে আপনার বিশেষ পরিচিত?

হ্যাঁ। মালদহে আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম।

তার সঙ্গে আপনার তাহলে বলুন অনেক দিনের পরিচয়। কিরীটী পুনরায় শুধায়।

হ্যাঁ।

কত দিনের পরিচয়?

আট-নয় বছর হবে।

কি করে সে?

জানি না, কলকাতা পোর্ট কমিশনারে যেন কিছুদিন হল কি একটা চাকরি পেয়েছে।

এখানে কোথায় থাকে?

মানিকতলায় থাকে, তবে কোথায় তা ঠিক জানি না।

জানেন আপনি, মিথ্যা বলছেন। বলুন তার ঠিকানা কি?

সে একটা বস্তী শুনেছি—খালের ওপারে।

হুঁ। তা অত রাত্রে কেন এসেছিল সঞ্জীব দত্ত? আপনার সঙ্গে দেখা করতে নিশ্চয়ই?

হ্যাঁ।

এর আগে কখনও এসেছে?

হ্যাঁ।

নিশ্চয়ই সব সময় রাত্রেই সে এসেছে?

হ্যাঁ।

দিনের বেলা এলে পাছে জানাজানি হয়ে যায় বলে বোধ হয়?

হ্যাঁ।

সুশান্তবাবু বা তাঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই জানতেন ব্যাপারটা?

না।

সে-রাত্রে বোধ হয় ঘর অন্ধকার করে সঞ্জীবকে ঘরে এনেছিলেন?

হ্যাঁ।

তাই—তাই রাহুল মধ্যে মধ্যে অন্ধকারে সঞ্জীববাবুকে দেখত বলেই বোধ হয় ভয় পেয়েছে। ঠিক আছে আপনি যান, সুশান্তবাবুকে একবার পাঠিয়ে দিন।

মিত্রাণী উঠে দাঁড়াল।

শিথিল ক্লান্ত পায়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল মিত্রাণী।

অবনী এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল ওদের কথাবার্তা। একটি কথাও বলেনি। মিত্রাণী চলে যেতে সে কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে ডাকে, মিঃ রায়?

উঁ।

আপনি জানলেন কি করে কথাটা—ঐ সিগারেটের টুকরোটা থেকেই?

না, বাগানে জুতোর ছাপ আর ঐ সিগারেট—দুই মিলে চার হয়েছে, তারপর এই চিঠি।

তা তো হল। ব্যাপারটা যেন কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে এখন।

কেন?

মিত্রাণী যদি সঞ্জীবকেই ভালবাসত, তাহলে—

শুনলেন তো, সেটা সম্ভবত সুশান্তবাবু এখনও জানেন না।

তা অবিশ্যি—তাহলে অন্য পক্ষের সক্রিয় সহযোগিতা না থাকলে—

অবনীবাবু, রহস্যের জালটা সবে একটু সরেছে, এখনও অনেকটা ঝাপসা অস্পষ্ট—

কিরীটীর কথা শেষ হল না, সুশান্ত এসে সামনে দাঁড়াল।

আপনারা!

হুঁ, বসুন।

সুশান্ত বসল চেয়ারটায়। সুশান্ত চেয়ারে বসে কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

তার মুখের দিকে তাকালে মনে হয় যেন সে একটু বিস্মিত হয়েছে। গত-রাত্রের অত্যধিক মদ্যপানের জন্য মাথাটা তখনও বেশ ভারী, চোখের পাতা থেকেও ঘুম একেবারে মুছে যায়নি।

কিরীটী মৃদু কণ্ঠে ডাকে, সুশান্তবাবু!

বলুন।

সঞ্জীব দত্ত বলে কাউকে চেনেন?

সঞ্জীব দত্ত!

হ্যাঁ, নামটা কখনও শুনেছেন?

না তো! কে সে?

নামটাও শোনেননি তাহলে? মিত্রাণীর মুখেও কখনও শোনেননি?

না।

বুঝতে পারছি আপনি জানেন না, কিন্তু সেই ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে এখানে আসতেন।

এখানে আসতেন মানে? আপনার কথা তো কিছু বুঝতে পারছি না।

এখানে আসতেন মানে মিত্রাণী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে—

মিত্রাণীর সঙ্গে।

হ্যাঁ, আর সেই দুর্ঘটনার রাত্রেও সেই সঞ্জীব দত্তই মিত্রাণী দেবীর ঘরে এসেছিল।

সে কি! কেন?

কারণ সেই যুবক দীর্ঘদিন থেকে মিত্রাণীর সঙ্গে পরিচিত এবং ওদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতাও আছে।

না, না—মিথ্যা—

মিথ্যা নয় সুশান্তবাবু, নিষ্ঠুর নির্মম সত্য। কথাটা বলেই হঠাৎ উঠে দাঁড়াল কিরীটী। আচ্ছা আজ এবার আমরা উঠব। আর একটা কথা, অবনীবাবুকে না জানিয়ে কলকাতার বাইরে আপাততঃ কোথাও আপনি যাবেন না যেন।

যাব না?

না, তাতে কিন্তু আপনার বিপদ ঘটতে পারে!

তারপরই কিরীটী অবনী মিত্রের দিকে তাকিয়ে বলে, উঠুন অবনীবাবু—যাওয়া যাক।

সুশান্ত স্থাণুর মত চেয়ারটার ওপর বসে রইল। তার মাথার ঝিমঝিম ভাবটা তখন কেটে গিয়েছে। চোখের ঘুম-ঘুম ভাবটাও চোখ থেকে সম্পূর্ণ মুছে গিয়েছে।

মিত্রাণী—তার কাছে সঞ্জীব দত্ত মধ্যে মধ্যে আসত! তারা অনেক দিনের পরস্পরের পরিচিত! মিত্রাণী—সঞ্জীব দত্ত—মাথাটার মধ্যে যেন আগুন জ্বলছে—সুশান্ত চেয়ারের হাতলটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে। চোয়াল দৃঢ় হয়—মিত্রাণী—সঞ্জীব!

কিরীটী আর অবনী সুশান্তর কোয়ার্টার থেকে বের হয়ে এল।

বেলা তখন সাড়ে বারোটা। আকাশের মেঘ তখনও কাটেনি। কিন্তু বৃষ্টিও আর নামেনি। কেবল একটা ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। দুজনে জীপে উঠে বসে। অবনীই স্টীয়ারিং ধরেন। কিরীটী পাশে বসে একটা সিগারেট ধরায়।

অবনী সাহা জীপ চালাচ্ছিলেন।

মৃদু কণ্ঠে একসময় কিরীটী ডাকে, অবনীবাবু!

বলুন? অবনী সাড়া দিলেন।

আজ একবার বিকেলের দিকে এক জায়গায় চলুন—

কোথায়?

মানিকতলা খালের ওপারে—শ্রীমান সঞ্জীবচন্দ্রের দেখা যদি পাওয়া যায়।

কিন্তু একটা ব্যাপার বুঝতে পারছি না কিরীটীবাবু!

কি?

সঞ্জীব দত্তর শকুন্তলা দেবীকে হত্যা করবার কি এমন কারণ থাকতে পারে?

কার কোথায় কি ইন্টারেস্ট থাকতে পারে, তা এত সহজেই বলা যায় না মিঃ মিত্র! চলুন না—আলাপ করে দেখাই যাক ভদ্রলোকের সঙ্গে আগে একটিবার।

বেশ।

।। উনিশ।।

ঐদিন সন্ধ্যার কিছু আগেই ওরা বের হয়ে পড়েছিল মানিকতলা খালপারের বস্তীর উদ্দেশ্যে।

বস্তীটা যেমন ঘিঞ্জি তেমনি বহু বিচিত্র লোকের বাস সেখানে। প্রায় দু-ঘন্টা খোঁজবার পর এক ছোকরার কাছে সঞ্জীব দত্তর সন্ধানটা পাওয়া গেল।

মাস্তান গোছের একটি বছর আঠারো-উনিশ বয়সের ছেলে। নাম জানা গেল সুবিমল। 'স' 'স' করে ছেলেটি কথা বলে। পরনে একটা ড্রেন-পাইপ প্যান্ট, গায়ে রংচঙে একটা হাওয়াই শার্ট। পায়ে চপ্পল। মাথার চুল সিনেমার অ্যাক্টরের ধরনের ছাঁটা।

সে কি নাম বললেন, স্যার? সুবিমল শুধায়।

সঞ্জীব দত্ত।

সে ভদ্রলোকের কত বয়েস হবে বলতে পারেন, স্যার?

বয়েস?

হ্যাঁ।

তা বয়েস—

মানে যা বলছিলাম—তিনি young না old?

এই ধরুন চব্বিশ-পঁচিশ!

সে তাহলে বলুন স্যার ইয়ংম্যান!

তাই হবে।

হুঁ, তা সে কোথায় চাকরি করে জানেন কিছু— মানে এখানে চারজন সঞ্জীব আছে কিনা—

চারজন!

হ্যাঁ।

এখানে কোন্ সঞ্জীব দত্ত পোর্ট কমিশনারে চাকরি করে?

তাই বলুন—সেই সঞ্জীব দত্ত 'নিউকামার' আমাদের এখানে। তা যান না, এগিয়ে ডানহাতি দশ-বারোটা বাড়ির পরে একটা টিউবওয়েল দেখবেন, তার ওপাশেই খান-দুই বাড়ির পরে রতন মিস্ত্রীর একটা ঘর নিয়ে থাকে।

ছোকরা মিথ্যা বলেনি। সেই মতই পাওয়া গেল সঞ্জীব দত্তর সন্ধান।

পর পর কয়েকটি ঘর। অন্ধকার আর ধোঁয়ায় ঝাপসা অস্পষ্ট। দু-একটা ঘরে তখন সবে আলো জ্বলেছে। সব ঘরে আলো জ্বলেনি। সামনের দিকেই একটা ঘর নিয়ে সঞ্জীব থাকে।

নাম ধরে ডাকতেই সঞ্জীব বের হয়ে এল।

কে?

আপনিই সঞ্জীববাবু? কিরীটী শুধায়।

সঞ্জীব বলে, হ্যাঁ, আপনি কে? আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

আমাকে আপনি তো চিনবেন না। একটু ভিতরে আসতে পারি?

আসুন।

ছোট অপরিসর একখানা ঘর। একটা উজ্জ্বল হ্যারিকেন বাতি জ্বলছিল ঘরের মধ্যে, তারই আলোয় ঘরটা বেশ উজ্জ্বল! একটা তক্তাপোশ, গোটা-দুই টুল, একটা সুটকেস, একটা সরাই, কাপ ডিশ ও জলের গ্লাস।

বসুন।

সঞ্জীব দত্ত ওদের ঐ চৌকির ওপরেই বসতে বলে।

কিরীটীর ইতিমধ্যে নজরে পড়েছিল ঘরের কোণে দু'জোড়া জুতো। একজোড়া চপ্পল সু ও একজোড়া কালো কাদা-মাখা কেডস। কিরীটী না বসে সেই জুতোর দিকে তাকিয়ে ছিল।

বসুন।

হ্যাঁ, বসি। কিরীটী বলে, আসুন পরিচয় করিয়ে দিই—

সঞ্জীববাবু—অবনীকে দেখিয়ে কিরীটী বলে, এই ভদ্রলোকও আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছেন। ইনি বেলেঘাটা থানার ও. সি.।

থানার ও. সি.!

একটা ঢোক গিলে কোনমতে যেন শুষ্কপ্রায় গলায় কথাটা উচ্চারণ করল সঞ্জীব দত্ত।

কিরীটী তখনও তাকিয়ে সঞ্জীবের দিকে। বয়েস কিরীটীর অনুমানে ভুল হয়নি।

চব্বিশ-পঁচিশের মধ্যেই হবে। বেশ সবল বলিষ্ঠ চেহারা। মাথায় পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল। নাকটা একটু ভোঁতা, কিন্তু দু চোখের দৃষ্টির মধ্যে একটা বুদ্ধির দীপ্তি। দৃঢ়বদ্ধ ওষ্ঠ। সরু চিবুক। দাড়িগোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। পরনে একটা পায়জামা ও শার্ট।

কিন্তু আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না মশাই! আমার কাছে আপনাদের কি দরকার থাকতে পারে!

আছে বৈকি। কিরীটী বলে।

কি দরকার?

মিত্রাণী বলে কাউকে আপনি চেনেন?

মিত্রাণী!

হুঁ।

কিন্তু কেন বলুন তো?

ভ্রূ কুঁচকে তাকায় সঞ্জীব ওদের মুখের দিকে।

জিজ্ঞাসা করছি, জবাব দিন। এবারে অবনী বলেন।

তা চিনব না কেন—

অনেক দিনের পরিচয় আপনাদের? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ।

আপনারা পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসেন?

এককালে বাসতাম।

মানে?

মানে বাসতাম—সেটা অতীতে—এখন আর বাসি না।

কেন?

সেটা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। ক্ষমা করবেন।

একটা কথা বোধ হয় আপনি জানেন না সঞ্জীববাবু! কিরীটী বলে।

কি কথা বলুন তো?

মিত্রাণীর দিদি শকুন্তলা দেবী দিন-কুড়ি আগেকার এক ঝড়জলের রাত্রে নিহত হয়েছেন!

সে কি?

হ্যাঁ, গলা টিপে শ্বাসরোধ করে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এবং সম্ভবতঃ যে সময় দুর্ঘটনাটা

ঘটে তার কিছু আগে বা পরে সে-রাত্রে আপনি মিত্রাণী দেবীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন যখন-তখন—

ননসেন্স! কি সব যা-তা বলছেন?

যা বলছি তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

সম্পূর্ণ মিথ্যা।

না। শুনুন সঞ্জীববাবু, প্রমাণ আমার হাতে আছে— আপনি সে-রাত্রে সেখানে গিয়েছিলেন এবং প্রমাণও আছে আমার—

প্রমাণ!

হ্যাঁ।

কি প্রমাণ?

ঐ—ঐ যে ঘরের কোণে আপনার কাদা-মাখা জুতো-জোড়া, ঐ তার সাক্ষী দিচ্ছে। আর শুধু তাই নয়, যার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন আপনি সেই রাত্রে—সেই মিত্রাণী তাঁর জবানবন্দিতে বলেছেন—

কি—কি বললেন? মিত্রাণী বলেছে?

হ্যাঁ।

সে বলেছে তার সঙ্গে আমি দেখা করতে গিয়েছিলাম সে-রাত্রে?

হ্যাঁ। অতএব বুঝতেই পারছেন, আর অস্বীকার করবার চেষ্টা করে কোন লাভ নেই।

বলতে বলতে এবারে কিরীটি পকেট থেকে সেই সিগারেটের টুকরোটা বের করল।

আর এই যে সিগারেটের টুকরো, এটাও মিত্রাণীর ঘরেই পরের দিন পাওয়া গিয়েছে। আমি ঘরে ঢুকেই লক্ষ্য করেছি, খাটের ওপরে আপনার ঐ সিগারেটের প্যাকেটটা—চার্মিনার সিগারেট—এটাও তাই, বলুন—এখনও বলবেন সে-রাত্রে আপনি সেখানে যাননি?

উপায় ছিল না আর অস্বীকার করবার।

সঞ্জীবকে—যাকে বলে কোণঠাসা—তাই করেছিল কিরীটি।

সঞ্জীব যেন চুপসে যায়।

সেই উদ্ধত প্রতিরোধ ঝিমিয়ে এসেছে তখন।

ধীরকণ্ঠে বলে, হ্যাঁ—মানে আমি গিয়েছিলাম—

কেন?

শুনবেন কেন?

হ্যাঁ।

তাকে—তাকে হত্যা করতে—সেই বিশ্বাসঘাতিনী—

সঞ্জীববাবু,—আপনি একটা মহা ভুল করতে উদ্যত হয়েছিলেন—

কি বললেন?

তাই—এবং সে ভুল করলে সারাটা জীবন আপনি হয়ত অনুতাপ করতেন।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ, কারণ মিত্রাণী সত্যিই আপনাকে ভালবাসেন।

হো হো করে হেসে ওঠে সঞ্জীব। বলে, কি বললেন—ভালবাসে?

হ্যাঁ।

মিত্রাণী আমাকে ভালবাসে?

হ্যাঁ।

না, না—আপনি জানেন না মশাই—ও সাক্ষাৎ কালসাপিনী—

না—সে আপনাকে সত্যিই ভালবাসে।

বিশ্বাস করি না।

বিশ্বাস করুন আমার কথা।

হঠাৎ যেন অতঃপর সঞ্জীব দত্ত কেমন স্তব্ধ হয়ে গেল।

এখন বলুন, ঠিক কটার সময় আপনি সেরাত্রে সেখানে গিয়েছিলেন সঞ্জীববাবু?

রাত তখন—

কত?

সম্ভবত দেড়টা দুটো হবে—প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে তখন—

কিরীটী এবারে বলে, ঐ রাত্রে—ঐ প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে অতটা পথ নিশ্চয়ই পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলেন, কারণ ঐ সময় যানবাহন পাওয়া কঠিন—

পায়ে হেঁটেই গিয়েছিলাম। সঞ্জীব দত্ত বলে।

তাই তো জিজ্ঞাসা করছি সঞ্জীববাবু, কি এমন জরুরী প্রয়োজন হয়েছিল যে অত রাত্রে ঐ দুর্যোগের মধ্যেও আপনাকে অতটা পথ যেতে হয়েছিল!

মিথ্যা বলব না মিঃ রায় আপনাকে—দিনের বেলা সবার চোখের উপর দিয়ে মিত্রাণীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করা আমার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।

কেন?

কারণ আমাদের পরস্পরের ভালবাসাটা কেউ ওর আত্মীয়স্বজন ক্ষমার চোখে দেখেনি। মালদহে আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও গোপনে এবং সর্বদা রাত্রির অন্ধকারেই পরস্পর আমরা পরস্পরের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতাম। তাছাড়া ঐ সুশান্ত চ্যাটার্জি—মিত্রাণীর জামাইবাবু লোকটার সঙ্গে যদিও আমার সাক্ষাৎ পরিচয় কোনদিনও হয়নি—হবার সুযোগও হয়নি, শুনেছিলাম ভীষণ নাকি রাগী প্রকৃতির—সাহস হয়নি তাই দিনের বেলা সেখানে যেতে।

এখানে আপনি কতদিন এসেছেন?

তা প্রায় মাস চারেক হবে। আমার এক মামা আমার পোর্ট কমিশনারের চাকরিটা যোগাড় করে দেওয়ায় এসেছি।

এই চার মাসের মধ্যে কবার আপনাদের পরস্পরের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছে?

তা দশ-বারো বার তো হবেই—বেশীও হতে পারে।

প্রত্যেক বারই বোধ হয় রাত্রে?

হ্যাঁ। মিত্রাণীর জামাইবাবুর রাত্রে নাইটডিউটি পড়লে সে চিঠি দিয়ে আমায় জানাত—আমি যেতাম।

।। কুড়ি।।

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, তাহলে পাকা ব্যবস্থা করেই যেতেন?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি একটু আগে যা বললেন তা কি সত্যি?

কি? মিত্রাণী সত্যি সত্যি আপনাকে ভালবাসে কিনা?

হ্যাঁ।

হ্যাঁ সঞ্জীববাবু, আমি যা বলছি সত্যি। কিন্তু এখনও তো বললেন না, কেন সেদিন ঐ ঝড়জলের রাত্রে অত দূরে গিয়েছিলেন?

একটা শেষ বোঝাপড়া করবার জন্যে।

বোঝাপড়া?

হ্যাঁ।

কিসের?

সে—

বলুন? থামলেন কেন?

কিছুতেই সে বিবাহের ব্যাপারে মত দিচ্ছিল না। কেবলই বলছিল, এখন নয় পরে— আর তাতেই আমার মনে সন্দেহ জাগে প্রথম। তারপর—

বলুন?

তারপর একদিন রাত্রে তার সঙ্গে পূর্ব ব্যবস্থা না করেই দেখা করতে যাই হঠাৎ, কিন্তু—

কী?

রাত তখন বোধ হয় সাড়ে বারোটা হবে, ভেবেছিলাম ওর ঘরের দরজায় টোকা দিয়ে ওর ঘুম ভাঙাব, কিন্তু তা আর করতে হল না—দেখলাম জেগেই আছে সে—তার ভগ্নীপতি আর সে—

কি—কি বললেন?

হঠাৎ যেন কিরীটী সজাগ হয়ে ওঠে—সোজা হয়ে বসে।

হ্যাঁ, সে আর তার ভগ্নীপতি ঐ সুশান্ত চ্যাটার্জি ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে—গায়ে গা ঘেঁষে হেসে হেসে আলাপ করছে।

কিন্তু সেটা শালী-ভগ্নীপতির রহস্যালাপও হতে পারে।

না মশাই না, রহস্যালাপ নয়—ও প্রেমালাপ—হলপ করে বলতে পারি প্রেমালাপ—

আপনি তাদের কোন কথা শুনেছেন?

না, দরকার মনে করিনি। ঘৃণায় ছুটে সেখান থেকে চলে এসেছি—আর তাই সেরাত্রে গিয়েছিলাম—

ঐ ব্যাপারটা কবে ঘটেছিল?

সেই ঝড়জলের রাত্রের দিন-চারেক আগের এক রাত্রে। তাই তো এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না। আপনি বলা সত্ত্বেও বিশ্বাস করতে পারছি না, কোথায় যেন একটা সন্দেহের কাঁটা খচখচ করছে—

প্রেমের ব্যাপারে অতি সামান্য কারণেই মনে সন্দেহ জাগে সঞ্জীববাবু—মন তখন বড় দুর্বল হয়ে পড়ে—

আমি দুর্বল নই কিরীটীবাবু—

কিরীটী হাসল, ব্যতিক্রম হবে না যে তা নয়, কিন্তু যাক সে কথা—দেখুন তো, এই খামের হাতের লেখাটা চিনতে পারেন কিনা?

কিরীটী পকেট থেকে বের করে মিত্রাণীর চিঠিটা সঞ্জীবের সামনে ধরল।—চিনতে পারছেন?

হ্যাঁ—মিতার—

রাখুন এটা আপনার কাছে—পরে পড়ে দেখবেন—কেমন? আচ্ছা সঞ্জীববাবু, আমরা এবারে উঠব—

কিরীটী উঠে দাঁড়ায়।

যাবেন?

হ্যাঁ—রাত হল। আপনি যেভাবে অকপটে সব জানিয়ে আমাদের সাহায্য করলেন তার জন্য ধন্যবাদ। চলি। নমস্কার।

নমস্কার।

কিরীটী ও অবনী বের হয়ে এল।

রাত প্রায় সোয়া দশটা তখন।

অবনী গাড়িতে উঠতে উঠতে শুধান, বাড়িতে যাবেন তো?

না।

তবে কোথায়?

সুশান্তবাবুর কোয়ার্টারে যেতে হবে একটিবার—

এখন! মানে এই রাত্রে—

হ্যাঁ—এখুনি একবার থানায় চলুন। তারপর সেখান থেকে সোজা সুশান্তবাবুর কোয়ার্টারে—

কিছু প্রয়োজন আছে নাকি সুশান্তবাবুর ওখানে?

আছে। চলুন দেরি করবেন না আর। যেতে যেতে সব বলব।

রাত সাড়ে দশটার একটু পরেই ওরা বেলেঘাটা পৌঁছে গেল। আগে-পিছে দুটো জীপ।

কিছুক্ষণ আগে থাকতে বেশ বৃষ্টি শুরু হয়েছিল। বৃষ্টির জন্য ঐ সময় ঐ জায়গাটা প্রায় নির্জন হয়ে গিয়েছিল। কোয়ার্টারের কাছাকাছি আসবার আগেই কিরীটী অবনীকে বললে, গাড়ির হেডলাইট নিভিয়ে দিন অবনীবাবু।

অবনী সুইচ অফ করে দিলেন।

ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে। গাঢ় অন্ধকার—সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে কিছু দেখা যায় না।

গাড়ি এখানেই থামান—হেঁটে যাব। কিরীটী বলে।

কিন্তু বৃষ্টি যে জোরে পড়ছে! অবনী বলেন।

পড়ুক।

কিরীটী বলতে বলতে নেমে পড়ল, আসুন।

অন্ধকারে কিরীটী এগিয়ে যায়—অবনী তাকে অনুসরণ করেন। কোয়ার্টারে পৌঁছতে পৌঁছতেই ওরা বেশ ভিজে যায়।

মিত্রাণীর ঘরে আলো জ্বলছিল। আর সব ঘর অন্ধকার। জানালা খোলা। সেই জানালা-পথেই কিরীটীর ঘরের মধ্যে নজরে পড়ে। মিত্রাণী ও সুশান্ত মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। মিত্রাণী মাথা নিচু করে আছে, সুশান্ত তাকে যেন কি বলছে। ওরা জানালার সামনে একেবারে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল।

সুশান্ত বলছে, তোমার আপত্তিটা কিসের? আমি কোন কথা শুনতে চাই না তোমার,

তোমাকে বলতেই হবে—

মিত্রাণী বলে, আপনাকে তো আমি বলেছিই জামাইবাবু—এ হতে পারে না।

পারে না—পারে না—সেই এক কথা, বাট হোয়াই?

সুশান্তর কণ্ঠস্বর রীতিমত অসহিষ্ণু।

মিত্রাণী মাথা নিচু করে থাকে। কোন জবাব নেই তার মুখে।

হুঁ, তাহলে আমার ধারণাটা মিথ্যা নয়!

মিত্রাণী সুশান্তর দিকে মুখ তুলে তাকাল।

সুশান্ত পূর্ববৎ অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলতে থাকে, মিঃ রায় এখন দেখছি ঠিক সন্দেহই করেছেন, সে-রাত্রে কেউ তোমার ঘরে এসেছিল! কে এসেছিল বল?

সঞ্জীব দত্ত।

কে?

বললাম তো—সঞ্জীব।

মানে সেই ছেলেটা—সেই মালদহের বখাটে ছেলেটা? সে তাহলে এখান পর্যন্তও ধাওয়া করেছে! ছিঃ ছিঃ, এই তোমার চরিত্র মিত্রাণী? এত ছোট প্রবৃত্তি তোমার? একটা বেকার লোফার—

জামাইবাবু!

সহসা মিত্রাণীর কণ্ঠস্বর যেন তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে ওঠে।—শুনুন, বেকার ও নয়, লোফারও সে নয়।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ।

প্রেমে একেবারে তাই হাবুডুবু খাচ্ছো! ঠিক আছে, তাহলে কাল সকালেই সেই নাগরের কাছে চলে যেও। এখানে আর তোমার স্থান নেই।

কাল সকালে কেন এখনি আমি চলে যাব।

তাই যাও। ইতর, বাজারের মেয়েমানুষ—

কি বললেন?

মিত্রাণী অকস্মাৎ ঘুরে দাঁড়ায় গ্রীবা বেঁকিয়ে।

যা তুমি তা-ই বলছি, একটা বাজারের মেয়েমানুষ—

তবু জানবেন আপনার মত হীন প্রবৃত্তি আমার নয়—

মুখ সামলে কথা বল মিত্রাণী!

কেন? একজন স্ত্রী-হত্যাকারীকে ভয় করতে হবে নাকি?

কি—কি বললি?

অকস্মাৎ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ল সুশান্ত মিত্রাণীর ওপর হিংস্র একটা জন্তুর মত অন্ধ আক্রোশে।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি—আমি স্বচক্ষে দেখেছি—

কিন্তু মিত্রাণীর বক্তব্য শেষ হয় না, সুশান্ত তার গলাটা দু-হাতে সজোরে চেপে ধরায় তার কথাগুলো গলার মধ্যে আটকে যায়।

কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে দরজায় ধাক্কা দিয়ে ডাকে, সুশান্তবাবু, মিঃ চ্যাটার্জী! দরজাটা খুলুন।

কে?

।। একুশ।।

কিরীটীর গলার স্বরে ও দরজার গায়ে ধাক্কার শব্দে সুশান্তর দুটো হাত সঙ্গে সঙ্গে মিত্রাণীর গলার উপর থেকে শিথিল হয়ে যায়।

মিত্রাণীও নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়।

বৈদ্যুতিক শক খেলে যেমন মানুষ হঠাৎ স্তব্ধ অনড় হয়ে যায়, সুশান্তও বুঝি তেমনি অসাড় নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছিল কিরীটীর কণ্ঠস্বরটা কানে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই।

সুশান্তবাবু দরজা খুলুন—আমি অবনী সাহা, থানার ও. সি.!

অবনী সাহা ঘন ঘন দরজার গায়ে ধাক্কা দিয়ে চলেন।

সুশান্তবাবু—মিঃ চ্যাটার্জী?

মিত্রাণীই দরজাটা খুলে দেয়।

কিরীটী ও অবনী সাহা ঘরে প্রবেশ করেন।

সুশান্ত তখনও যেন প্রস্তর-মূর্তির মত ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে।

শুনুন মিত্রাণী দেবী—সুশান্তবাবু—কিরীটী বলে ওদের লক্ষ্য করে, কেউ আপনারা আর পালাবার চেষ্টা করবেন না। অবনীবাবু প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। বাড়ি আপনাদের পুলিসে ঘেরাও করে আছে।

সুশান্ত ও মিত্রাণী নির্বাক।

সুশান্তবাবু, অবনীবাবু এসেছেন আপনাকে গ্রেপ্তার করতে আপনার স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যার অপরাধে—

না, না, আমি—আমি হত্যা করিনি, কুন্তকে হত্যা করেছে ঐ—ঐ নীচ চরিত্রের মেয়েলোকটা—সুশান্ত চিৎকার করে ওঠে।

না—কঠিন কণ্ঠে অবনী সাহা বলেন—হত্যা করেছেন আপনি। মিত্রাণীকে বিবাহ করবার জন্য আপনি প্যাশানে অন্ধ হয়ে নিজের রুগ্ন স্ত্রীকে হত্যা করেছেন সেরাত্রে গলা টিপে শ্বাসরোধ করে—

না, না, অবনীবাবু—

হ্যাঁ—কিরীটী বলে, হ্যাঁ—এবং হত্যা করবার জন্যই সে-রাত্রে আপনি রেস্টিং রুম থেকে এখানে এসেছিলেন—এসে নিঃশব্দে হত্যা করে যখন বের হয়ে যান মিত্রাণী দেবী আপনাকে দেখতে পান।

মিথ্যে কথা।

মিথ্যে কথা নয়—আরও প্রমাণ আমার আছে—আপনি স্ত্রীকে হত্যা করবার জন্যই সে-রাত্রে এসেছিলেন। তারপর নিঃশব্দে হত্যা করে ব্যাপারটাকে একটা সুইসাইড প্রমাণ করবার জন্য আপনার বাবার ঘরে যান মালিশের শিশিটা আনতে—

প্রমাণ আছে কিছু তার?

আছে। মালিশের ঔষধের শিশির গায়ে আপনার ফিঙ্গার-প্রিন্ট আছে।। তারপর আপনার কাদা-মাখা জুতো। আপনার বাড়ির সামনের রাস্তায় কোন কাদা নেই—কিন্তু সে-রাত্রে বৃষ্টির দরুন আপনার বাড়ির পিছনের বাগানে কাদা হয়েছিল, সেই কাদা আপনার জুতোয় লেগে যায়। স্ত্রীকে গলা টিপে হত্যা করবেন বলেই সে-রাত্রে সামনের রাস্তা দিয়ে না এসে গোপনে পিছনের রাস্তা দিয়ে এসেছিলেন।

হ্যাঁ, আমি এসেছিলাম—কিন্তু স্ত্রীকে হত্যা করতে নয়। তাকে আমি হত্যা করিনি। ঐ স্বৈরিণীর একটা চিঠি আমার হাতে পড়ে—ও আমার অনুপস্থিতিতে ওর নাগরকে ডাকে বলে ওদের হাতেনাতে ধরতে এসেছিলাম সে-রাত্রে।

মৃদু হেসে কিরীটী বলে, কিন্তু জানতেন না যে মিত্রাণী আপনাকে ভালবাসে না—সে মনে মনে অন্যকে ভালবাসে!

হ্যাঁ, জানতাম না—আমি সত্যিই জানতাম না।

জানলে হয়ত এত বড় ভুলটা আপনাকে করতে হত না! কিরীটী বলে।

ভুল!

নয়? নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে বসলেন—প্যাশানে অন্ধ হয়ে—

করিনি—আমি করিনি—সুশান্ত বলে।

করেছেন—ইউ—ইউ—আপনি—আপনিই আপনার স্ত্রীকে হত্যা করেছেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঐ—ঐ ইতরটাই করেছে!

সুকান্তর কণ্ঠস্বরে অকস্মাৎ সকলে ফিরে তাকাল।

দরজার ওপরে হাঁপানী রোগী বৃদ্ধ সুকান্ত—সুশান্তর বাবা দাঁড়িয়ে।

আমি—আমি জেগে ছিলাম তখন। ও মালিশের শিশিটা নিয়ে যায়—ও যে সত্যিই এত ইতর, এত ছোট হয়ে গিয়েছে কল্পনাও করতে পারিনি!

বাবা?

আমি তোর বাবা নই, তোর মুখ দেখতেও আমার ঘৃণা হয়।

কিন্তু কথাটা শেষ করতে পারে না সুকান্ত—হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কাশি ওঠে।

কাশতে কাশতে পড়ে যায় সুকান্ত।

সুশান্ত ছুটে এসে বাপের মাথাটা কোলে তুলে নেয়, বাবা, বিশ্বাস কর বাবা, বিশ্বাস কর, আমি কুন্তকে হত্যা করতে এসেছিলাম সত্যি কিন্তু আমার হাতের চাপে তার মৃত্যু হয়নি- -তার আগেই সে হার্টফেল করেছিল—নিজে নিজের গলা টিপে আত্মহত্যা করতে গিয়ে—

সুকান্তর চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে যায়।

সুশান্ত ডাক ছেড়ে কেঁদে ওঠে।

সুশান্তকে অ্যারেস্ট করে জীপে তুলে দেন অবনী।

অন্য আর একটা জীপে অবনী আর কিরীটী ফিরছিল।

অবনী বলেন, সুশান্ত যা বলেছে তা কি সত্যি কিরীটীবাবু?

মনে হয় তাই—তবে—

কি তবে?

তবে এও ঠিক, সুশান্তই তার স্ত্রীর গলা টিপে সে-রাত্রে ধরেছিল এবং শ্বাসরোধেই তার মৃত্যু হয়েছে—হার্টফেল করে নয়।

কিন্তু—

ভয় নেই অবনীবাবু, পাপ আর গরল কখনও চাপা থাকে না। একদিন সুশান্তকে স্বীকার করতেই হবে—ও পাপ সে স্বীকার করবেই—আজ হোক বা কাল হোক!

বসন্ত রজনী

।। এক ।।

মানুষের চেহারা—তার আকৃতি, গঠন এবং তার মুখের গড়ন দেখে কি একটা মানুষকে চেনা যায়— চেনা যেতে পারে?

আমার প্রশ্নের উত্তরে কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে, তোর কি মনে হয় সুব্রত?

আমি তো জিজ্ঞাসা করছি তোমাকে কিরীটী!

না!

চেনা যায় না—বোঝা যায় না?

না।

তবে যে অনেকে বলে মানুষের মনের ছবিই হচ্ছে তার মুখ?

আমি বিশ্বাস করি না।

কেন?

কারণ মানুষের মনটা এমন একটা বিচিত্র বস্তু যে, বিশেষ কোন একটা formula-র মধ্যে ফেলে তাকে বিচার করতে গেলে আমার মনে হয় ঠিক বিচার করা হবে না। হতে পারে না।

কিন্তু তুই তো অনেক সময় মানুষের বাইরের চেহারাটা দেখেই তার চরিত্রের analysis করেছিস!

করেছি, কিন্তু তাই বলে সেটা যে সর্বক্ষেত্রেই অবধারিত সত্য তাও তো নয়।

কিন্তু আমার মনে হয়—

কি মনে হয় সুব্রত? কিরীটী প্রশ্ন করে আমার মুখের দিকে তাকাল। অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি তার।

চেহারা—মানে বলতে চাই আমি, কারও চেহারা বিশেষভাবে খুঁটিয়ে দেখলে সবটা না হলেও তার চরিত্রের কিছুটা আভাস—বলতে পার মোটামুটি আভাস আমরা পেতে পারি।

কথাটা আমি বলেছিলাম অদূরে একজন লোককে সাগর-সৈকত ধরে আমাদেরই দিকে এগিয়ে আসতে দেখে।

কিরীটীর সেটা নজর এড়ায়নি। বলে, ঐ যে ভদ্রলোকটি এদিকে আসছে, ওকে দেখে তোর কি মনে হয় সুব্রত? নিশ্চয়ই একজন মার্ডারার, নয়?

যদি বলি তাই!

কিরীটী আমার কথায় হো হো করে হেসে ওঠে।

হাসছিস? বললাম আমি, কিন্তু লোকটার দিকে ভাল করে চেয়ে দেখ্ তো কিরীটী—ওর চেহারার দিকে তাকালে মনে হয় না কি, লোকটা কোল্ড ব্লাডে মার্ডার করতে পারে? অত্যন্ত শান্ত ও নির্বিকার ভাবে একজনের পিঠে ছুরি বসাতে পারে, গুলি চালাতে পারে বা চায়ের বা খাদ্যের সঙ্গে কোন তীব্র বিষ মিশিয়ে দিতে পারে?

যেহেতু লোকটার চেহারাটা তোর নয়নতৃপ্তিকর হয়নি! প্রথম দৃষ্টিতেই লোকটার চেহারা তোর বিচ্ছিরি লেগেছে, এটাই তো তোর একমাত্র যুক্তি সুব্রত!

আমি কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলি, না, না, ঠিক তা নয়—

তাই—অবিশ্যি অস্বীকার করব না যে, এমন চেহারা কারও কারও আছে যার দিকে তাকানো মাত্র মনে হয়, লোকটা বুঝি যে-কোন ক্রাইম অনায়াসেই করতে পারে। এমন কি

হত্যাও। মন ঘিনঘিন করে ওঠে। অথচ মজা হচ্ছে, খোঁজ নিলে হয়ত দেখা যাবে—সম্পূর্ণ বিপরীত। যা মনে হয়েছে আদৌ তা নয়। প্রকৃতিতে লোকটা হয়তো যেমন শান্ত, তেমনি নিরীহ, তেমনি ভীতু।

কিন্তু—

কিরীটী আমাকে বাধা দিয়ে বলে, ঠিক তাই সুব্রত। মানুষের চরিত্র বড় বিচিত্র, বড় দুর্বোধ্য। চেহারার ফরমূলায় ফেলে সেই দুর্বোধ্যকে solve করা যায় না। তারপরই একটু থেমে বলে, ঐ যে ভদ্রলোকটি—যাকে দেখে তোর মনে হচ্ছে কোল্ড ব্লাডে লোকটা মার্ডার করতে পারে, মনে হচ্ছে ওকে আমি চিনি—

চিনিস?

হ্যাঁ।

ভদ্রলোক তখন আরও এগিয়ে এসেছেন হাঁটতে হাঁটতে আমাদের দিকে।

কিরীটী তাঁর দিকে চেয়েই বলতে থাকে, ওঁর নাম কালীপ্রসাদ সরকার। নামকরা একজন জুয়েলার বংশের ছেলে। অমন নিরীহ, অমন গোবেচারা লোক বড় একটা দেখা যায় না। তাছাড়া লোকটা পরম বৈষ্ণব। মানুষ মারা তো দূরে থাক, একটা মাছিও কোনদিন মারতে পারবে কিনা সন্দেহ।

আমি আর কোন জবাব দিই না।

কারণ জানি, জবাব দিলেও কিরীটীর মতের এতটুকু পরিবর্তন তো হবেই না, উপরন্তু সে তার থিয়োরি আরো জোরালো কণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করবে। আমাকে নস্যাৎ করে দেবে।

তার চাইতে সামনে সাগরের দিকে চেয়ে থাকতে বেশ লাগছে।

পুরীর সাগর-সৈকতে স্বর্গদ্বারের কাছাকাছি দুজনে বসে ছিলাম।

সূর্য অনেকক্ষণ অস্ত গিয়েছে, কিন্তু অস্ত গেলেও সাগরের বুক থেকেও আকাশ থেকে আলোটা যেন মুছেও মুছে যায়নি। সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে তখনও যেন একটা আলোর রেশ· থেমে যাওয়া সঙ্গীতের রেশের মতই শেষ হয়েও শেষ হয়নি।

একজন নয় দুজন—কালী সরকার ও অন্য একজন। ভদ্রলোকরা আরও এগিয়ে এসেছেন ইতিমধ্যে এবং কিরীটীকে দেখে কালী সরকার হঠাৎ বলে ওঠে, কিরীটী না?

হ্যাঁ তারপর কালী, তুই এখানে এসময়ে?

এলাম। মাঝে মাঝে তো পুরীতে আসি—ঐ যে হোটেলটায়—

একটা হোটেল দেখায় কালী সরকার আঙুল তুলে। হোটেলটা নতুন এবং চোখ-ঝলসানো।

কালী জিজ্ঞাসা করে, উনি?

আমার বন্ধু—সুহৃদ—একমেবাদ্বিতীয়ম্ সুব্রত রায়—

নমস্কার। কালী সরকার হাত তোলে।

আমিও হাত তুলে নমস্কার জানাই। অন্য ভদ্রলোকটি কিন্তু আলাপ করলেন না আমাদের সঙ্গে, কেমন যেন অনিচ্ছুক ভাবে আমাদের দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে রইলেন সর্বক্ষণ।

অতঃপর দুজনে বালুবেলা দিয়ে এগিয়ে গেল। একসময় দূরে মিলিয়ে গেল।

ক্রমে ক্রমে সেই আলোর শেষ রেশটুকু আকাশ থেকে, প্রকৃতি থেকে মুছে যায়।

অন্ধকার নামে চারিদিকে। অন্ধকারে সমুদ্রের ঢেউগুলোর মাথায় শ্বেত ফেনার পুঞ্জ যেন

হিংস্র জন্তুর ধারালো দাঁতের মত মনে হয়। একটানা গর্জনে মনে হয় যেন কোন অবরুদ্ধ জন্তু প্রচণ্ড আক্রোশে ফুঁসছে।

কিরীটীর দিকে তাকালাম। মনে হল সে যেন কেমন একটু অন্যমনস্ক। মনে হল সে বুঝি কিছু ভাবছে। সমুদ্রের হাওয়ায় চুরোটটা বোধ হয় একসময় নিভে গিয়েছিল—কিরীটী ঘুরে বসে নিভে যাওয়া চুরোটটায় আবার অগ্নিসংযোগে তৎপর হয়।

হঠাৎ কিরীটীই আবার কথা বলে, সুব্রত!

কি?

কালী সরকার লোকটা নিঃসন্দেহে কোল্ড ব্লাডে কাউকে মার্ডার করতে না পারলেও, সঙ্গের ভদ্রলোকটির চোখের চাউনি কেন যেন আমার ভাল লাগল না।

ভাল লাগল না মানে? প্রশ্ন করলাম আমি।

চোখের দৃষ্টিটা দেখলি না ভদ্রলোকের, বেশ যেন বিরক্ত অপ্রসন্ন—মনে হল যেন কালীর আমাদের সঙ্গে আলাপ করাটা আদৌ তার মনঃপূত হয়নি।

হয়তো—

কি?

হয়তো দুজনের মধ্যে বিশেষ কোন জরুরী কথা হচ্ছিল, হঠাৎ সেই সময় আমরা সামনে পড়ায় এবং কালী সরকার আমাদের সঙ্গে কথা বলায় সে বিরক্ত বোধ করছিল—

স্বাভাবিক।

শুধু স্বাভাবিক নয়, তার চাইতে হয়তো—

কি?

কিছু বেশী। যাক গে, মরুক গে কালী সরকার আর তার সঙ্গে সেই অপ্রসন্ন লোকটি—

বলতে বলতে কিরীটী বালুবেলার উপরে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়ে, শিথিল অলস ভঙ্গীতে।

কিরীটী যাই বলুক, যাই তার থিয়োরি হোক—কি জানি কেন, লোক-দুটোর চেহারা কিন্তু মন থেকে কোনমতেই আমি মুছে ফেলতে পারি না।

কালীপ্রসাদ সরকার, আর সেই অপ্রসন্ন ভদ্রলোকটি।

সে-সময় সমুদ্র-সৈকতে বায়ুসেবনার্থী অনেক বয়সের অনেক স্ত্রী-পুরুষ ছিল এবং তাদের সেই ভিড়ের মধ্যেও ওদের দুজনকে দূর থেকে দেখেই ওদের দিক থেকে চট্ করে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে পারিনি, বিশেষ করে কালী সরকারের দিক থেকে।

দুজনেরই পরিধানে সুট ছিল। একজনের দামী সুট, কোনো নামকরা টেইলার্স শপের তৈরী। অন্যজনের বোধ করি সাধারণ কোন দোকান থেকে কেনা রেডিমেড সুট। একটু ঢিলে, ঝলমলে।

পরনে দামী সুট ছিল কালীপ্রসাদ সরকারের।

লোকটার বয়স পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশের মধ্যে হবে বলেই মনে হয়। বেশ মোটা চর্বিযুক্ত ভারী দেহের গড়ন। রীতিমত কালো গায়ের বর্ণ। ভারী ঈষৎ চৌকো মুখ। মোটা রোমশ ভ্রূ। কান দুটো বেশ বড় এবং কান-ভর্তি চুল। সুট পরা থাকলেও টাই না থাকায় খোলা শার্টের ফাঁক দিয়ে বুকের যে অংশটুকু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল সেটা রীতিমত রোমবহুল। বোঝা যায় মানুষটা রোমশ। গায়ে খুব বেশী লোম। হাসলেই উপরের মাড়ির অনেকটা বের

হয়ে পড়ে ও সেই সঙ্গে প্রকাশ পায় ঝকঝকে মোটা মোটা একসারি এলোমেলো দাঁত।

আর হাতের থাবা ও আঙুলগুলোই বা কি—যেমন চওড়া তেমনি মোটা মোটা ও বলাই বাহুল্য রোমশ।

লম্বায় লোকটা কিন্তু খুব বেশী নয়, পাঁচ ফুট দুই থেকে তিন ইঞ্চির বেশী কিছুতেই হবে না—অর্থাৎ পুরুষের পক্ষে বেঁটেই লোকটা। দূরে থেকে মনে হচ্ছিল, যেন ঠিক এক ভল্লুক থপথপ করে হাঁটছিল।

আর তার সঙ্গী! সেই অপ্রসন্ন ভদ্রলোকটি! কম দামের ঢিলে ঝলমলে পোশাকের মধ্য দিয়েও যেন তার রূপ, তার সৌন্দর্য ফুটে বের হচ্ছিল। সত্যিই লোকটা সুন্দর। মাঝামাঝি লম্বা। গায়ের রং বেশ ফর্সা। চকিতের জন্য দেখেছিলাম, তবু মনে পড়ে, বেশ ভাসা-ভাসা পিঙ্গল চোখ। মাথার চুল সামান্য কটা।

কিরীটীর দিকে তাকালাম। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে রয়েছে।

সন্ধ্যার আকাশে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কতকগুলো তারা। সমুদ্রতীরে বায়ুসেবনার্থীদের ভিড় একটু একটু করে পাতলা হয়ে আসছে। দূরে চোখে পড়ে 'সী সাইড' হোটেলের আলোগুলো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

আমিই প্রথমে কথা বলি, মনে হচ্ছে তুই যেন কিছু ভাবছিস কিরীটী!

য়্যাঁ! কিরীটী যেন চমকে ওঠে।

কি ভাবছিস?

ঐ কালী সরকারের কথাই ভাবছিলাম রে—

কালী সরকারের কথা!

হ্যাঁ, প্রেসিডেন্সীতে একসঙ্গে দুজনে বছর-তিনেক পড়েছিলাম। সেই সময়ই আলাপ। মনে আছে আজও, ম্যাথেমেটিক্সে ওর ব্রেন ছিল অদ্ভুত। ডাঃ সাহা বলতেন, একসেপসন্যাল। অথচ—

থামলি কেন, বল্?

কিরীটী আবার বলতে থাকে, কলকাতা শহরের বিখ্যাত ধনী জুয়েলার সরকার ফ্যামিলির ছেলে, যাদের বাড়ির কোনদিন কোন ছেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম চৌকাঠটিও ডিঙিয়েছে কিনা সন্দেহ, সেই বাড়ির ছেলে ম্যাথেমেটিক্সয়ে দুটো লেটার ও রেকর্ড মার্কস নিয়ে ম্যাট্রিক পাস করে আই-এস-সি পড়তে এল প্রেসিডেন্সীতে। বিরাট ঝকঝকে ওয়েলার ঘোড়া-বাহিত জুড়িগাড়ি করে আসত কলেজে। পরনে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, হীরের বোতাম আংটি, চকচকে তৈরী ঝক্ঝকে ডার্বি সু পায়ে—যেন জামাইটি। কিন্তু যেমনি লাজুক তেমনি নিরীহ শান্ত গোবেচারা টাইপের। প্রথম প্রথম তো কেউ ওর দিকে ফিরেও তাকায়নি। কিন্তু ডাঃ সাহার স্তুতির পর হঠাৎ যেন ক্লাসের সবার নজর গিয়ে কালীর উপর পড়ল—সার্চলাইটের মত। ও যেন সর্বসমক্ষে আবিষ্কৃত হয়ে গেল।

তারপর?

ইন্টারমিডিয়েটে ফিজিক্স, কেমিস্ট্রী ও ম্যাথেমেটিক্স্ তিনটেতেই ও লেটার পেয়েছিল মনে আছে এবং ম্যাথেমেটিক্সে রেকর্ড মার্ক। বি-এস-সি পড়তে শুরু করল ম্যাথেমেটিক্স্ নিয়ে এবং থার্ড ইয়ার থেকে ফোর্থ ইয়ারে ওঠার মাস-খানেক পর—

কি?

হঠাৎ কলেজে আসা বন্ধ করলে।

কেন?

কে জানে?

তারপর?

তারপর দীর্ঘ দশ বছর পরে একবার একটা একজিবিশনে দেখা হয়েছিল। তারপর আর ওর সঙ্গে দেখা হয়নি। বলতে গেলে ওর কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। আজ হঠাৎ—আরও কত বছর বাদে হঠাৎ আজ দেখা হল আবার। মনে মনে হিসাব করছিলাম, আরো দশ বছর পরে দেখা হল আজ।

বলিস কি!

তাই ভাবছিলাম। আমি ওকে চিনেছি যেহেতু ওর মুখের গঠনে কিছু peculiarities ছিল—যা আজো আমার মনে আছে, ভুলিনি এবং যে জন্য আজ দেখেই ওকে চিনতে পেরেছিলাম, কিন্তু ও আমায় সঙ্গে সঙ্গে চিনল কি করে তাই ভাবছি। ও বিশেষ তেমন বদলায়নি চেহারায়, কিন্তু আমি—

কিরীটীর কথা শেষ হয় না, হঠাৎ কালী সরকারের কণ্ঠস্বর শোনা যায়, কিরীটী!

কে?

আমি কালী।

ফিরে চেয়ে দেখি একা কালী সরকার, সঙ্গের সেই ভদ্রলোকটি নেই।

আয়, বস্। কিরীটী আহ্বান জানায়।

না ভাই, বসব না। হোটেলে ফিরব।

আচ্ছা কালী—

কি?

তুই আমাকে চিনলি কি করে বল্ তো, এত বছর পরেও?

বিলক্ষণ! তোকে চিনব না কি রে? দুর্জনেরা যে যাই বলুক, কিন্তু তোকে আজ অস্বীকার করবার ক্ষমতা কার বল্। তা তুই এখানে?

কাজ-কর্ম নেই হাতে। বসে বসে গাঁটে গাঁটে বাত ধরছিল, তাই—

সমুদ্র-সৈকতে! তা বেশ। বাত সারবে হয়তো নোনা হাওয়ায়!

হুঁ, সেই আশাতেই তো এলাম।

কিরীটী এবারে জিজ্ঞাসা করে, তোর সঙ্গে সেই তিনি কে? তাঁকে তো চিনলাম না?

আমার বিশেষ পরিচিত বন্ধু—নামকরা মুক্তার ব্যবসায়ী, পার্ল-মার্চেন্ট দোলগোবিন্দ শিকদার। হঠাৎ বেড়াতে বেড়াতে সমুদ্রের ধারে এই কিছুক্ষণ আগে এখানে দেখা হয়ে গেল।

তারপর কি করছিস? কিরীটীই কালীপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশ্নটা করে, বলতে গেলে একটা যুগ পরে দেখা।

বিজনেস মানে ব্যবসা।

কিসের ব্যবসা?

জুয়েলারী—হীরাজহরতের!

তাহলে শেষ পর্যন্ত অঙ্ক-শাস্ত্র—ম্যাথেমেটিক্স্ ছেড়ে ঐ জুয়েলারীর ব্যবসাই করতে গেলি?

উপায় কি বল্? আমাদের তিন-জেনারেশন ধরে ঐ জুয়েলারীর ব্যবসা, তুই তো জানতিস ভাই!

তা জানতাম। কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে।

হঠাৎ কিরীটীই প্রশ্ন করে, তা হ্যাঁ রে, তুই তো ঐ 'সী-সাইড' হোটেলটাতেই উঠেছিস, তাই না?

হুঁ। ওই হোটেলের ব্যবস্থাটা দেখলাম বেশ ভাল, তাই ওখানেই উঠলাম। তা তুই কোথায় উঠেছিস?

মিহিরবাবুর 'পুরী ভিউ' হোটেলে।

ঐ যে সামনের হোটেলটা?

হ্যাঁ।

আচ্ছা চলি ভাই—

আহা বস্ না। কতদিন পরে দেখা হল—

তুই তো আছিস, পরে দেখা হবে। আজ উঠি ভাই।

কালী সরকার উঠে পড়ে এবং অন্ধকারে বালুবেলার উপর দিয়ে হোটেলের দিকে এগিয়ে যায়।

মনে হল ভদ্রলোক একটু অন্যমনস্ক।

।। দুই ।।

পরের দিন সূর্যোদয় দেখব বলে অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠেছি দুজনেই আমরা। এবং কোনমতে দুজনে গায়ে জামাটা চাপিয়ে সূর্যোদয় দেখব বলে বের হয়ে পড়ি হোটেল থেকে।

রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে এবং পাতলা অন্ধকারের একটা পর্দা সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে যেন থিরথির করে কাঁপছে। তার মধ্যে অস্পষ্ট ঝাপসা সমুদ্র দেখা যায় যতদূর সামনের দিকে দৃষ্টি চলে ততদূর পর্যন্ত। একটানা গর্জন করে চলেছে এবং ঢেউ পড়ছে আর আকুল উচ্ছ্বাসে তীরভূমির উপরে এসে ভেঙে গুঁড়িয়ে ফেনায় লুটিয়ে পড়ছে পারাবারহীন সমুদ্রের জলরাশি।

অনেকেই সূর্যোদয় দেখবার জন্য বের হয়েছে। তাদের ঝাপসা ঝাপসা মূর্তিগুলো দেখা যায় এদিক-ওদিক। ভিজে নরম বালির উপর দিয়ে দুজনে পূবমুখো এগিয়ে চলি। একটানা সমুদ্রের গর্জন বাতাসে মর্মরিত হচ্ছে। একটা ক্রুদ্ধ দৈত্য বন্দী হয়ে যেন অবিশ্রাম মাথা কুটে চলেছে।

আধ মাইলটাক এগিয়েছি, হঠাৎ ঝাপসা ঝাপসা আলো-আঁধারিতে দূরে নজর পড়ল, তীরে একেবারে জল ঘেঁষে অনেকগুলো লোক। এক জায়গায় যেন গোল করে অনেকগুলো লোক ভিড় করেছে, হয়তো জেলেরা মাছ ধরেছে বা ধরছে—তাই ভিড়।

কিন্তু যত কাছে এগোই, সমুদ্রের একটানা গর্জনকে ছাপিয়ে মৃদু একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি কানে আসে আমাদের। পূর্ব গগনে সূর্য তখন দেখা দিয়েছে। ঠিক যেখানে আকাশ ও জলে মেশামেশি সেই আকাশ ও জলের মিলন-রেখাটি ছুঁয়ে যেন কোকনদটির মত। আরও কয়েক পা এগুতেই ব্যাপারটা আমাদের চোখে পড়ল। একটি দেহ সমুদ্রের বালুবেলায় পড়ে আছে আর তাকে ঘিরে দু-তিনটি নুলিয়া আর দশ-পনেরজন পুরীর চেঞ্জার।

গুঞ্জনটা তাদেরই কণ্ঠে। বিস্ময়ের গুঞ্জন।

কি ব্যাপার মশাই, পার্শ্ববর্তী একজনকে জিজ্ঞাসা করি আমিই।

মারা গেছে—

কে মরল?

কে জানে, জলে ডুবে মারা গেছে বলে মনে হচ্ছে।

জলে ডুবে?

তাই মনে হয়। নুলিয়ারা মাছ ধরতে গিয়েছিল, অনেকদূরে মৃতদেহটা ভেসে যাচ্ছে দেখতে পেয়ে তুলে এনেছে।

সমুদ্রতীরে ব্যাপারটা একটা নতুন কিছু নয়, বিস্ময়েরও কিছু নয়, মধ্যে মধ্যে দানব সমুদ্র দু-একজনকে যে গ্রাস করে না তা নয়। হয়ত তেমনি একজন কেউ। হঠাৎ ঐ সময় কিরীটীর বিস্ময়-স্ফুরিত কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হয়, এ কি, এ যে দেখছি আমাদের কালী সরকার।

কালী সরকার।

সঙ্গে সঙ্গে আমি আবার মৃতদেহের দিকে দৃষ্টিপাত করি, দু পা আরও এগিয়ে যাই। তাই তো—মিথ্যা তো নয়, কালী সরকারই তো!

সমুদ্র-সৈকতে ভোরের আলো আরও স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে তখন। সে আলোয় বালুবেলায় শায়িত মৃত কালী সরকারের দেহটির দিকে তাকিয়েই যেন আমরা কয়েকটা মুহূর্ত বোবা হয়ে থাকি। চিৎ করে শোয়ানো বালুবেলার উপর কালী সরকারের মৃতদেহটা। চোখের পাতা বিস্ফারিত—বিস্ময়ের দৃষ্টি যেন স্থির হয়ে আছে নিষ্পলক স্থির দুটো চোখের তারায়। মাথার চুল এলোমেলো। পরিধানে পায়জামা-পাঞ্জাবি। খালি পা। আর বাঁ হাতে সোনার ব্যাণ্ডে রিস্টওয়াচ বাঁধা।

ইতিমধ্যে ভিড় দেখে সেখানে আরও লোক জমতে শুরু করেছে। সবাই বিস্মিত হতচকিত। একই প্রশ্ন সকলের। তার মধ্যে কেউ কেউ সমবেদনাও প্রকাশ করে।

কিরীটী পায়ে পায়ে মৃতদেহের একেবারে খুব কাছে এগিয়ে যায়। তীক্ষ্ণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখতে থাকে। কি দেখছে কে জানে।

ক্রমেই মানুষের ভিড় একজন দুজন করে বাড়ছে।

হঠাৎ দেখি কিরীটী মৃতদেহের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে, ঈষৎ ঝুঁকে মৃতদেহে কি যেন লক্ষ্য করছে।

আমি একটু এগিয়ে যাই।

কিরীটী সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায় এবং কতকটা যেন আত্মগতভাবেই অত্যন্ত মৃদুকণ্ঠে বলে, হুঁ—

ওর মুখের দিকে সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকালাম ও প্রশ্ন করলাম, কি রে?

কিরীটী মৃতদেহের দিকে চোখের ইঙ্গিত করে বলে, দেখ্—

কী?

দেখ্, লক্ষ্য করে দেখ্ ভাল করে, কালীর গলায়—

কী—বলে তাকাতেই আমারও নজরে পড়ল। কালো একটা আধ-ইঞ্চি চওড়া সরু ফিতের মত দাগ গলায় ঠিক চিবুকের নীচে।

হঠাৎ দেখলে মনে হয় যেন আবছা আবছা একটা কালো ফিতে গলায় জড়ানো। প্রথমে তাৎপর্যটা মনের মধ্যে উদয় হয়নি। কিরীটীর দ্বিতীয় কথার সঙ্গে সঙ্গে যেন মনের মধ্যে একটা বিদ্যুৎ ঝলক দেয়।

স্ট্র্যাঙ্গুলেশন নয় তো!

কিরীটী স্বগতোক্তির মতই যেন ফিসফিস করে কথাটা উচ্চারণ করে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও কথাটা কানে আমার প্রবেশ করেছিল।

সত্যিই তো! সঙ্গে সঙ্গে মনে দেখা দেয় সন্দেহটা, গলা টিপে হত্যা করে কেউ কালীকে সমুদ্রের জলে রাতারাতি ভাসিয়ে দেয়নি তো!

সম্ভবতঃ তাই এবং তাহলে তো ব্যাপারটা নিষ্ঠুর একটা হত্যা! কালী সরকার তাহলে নিহত হয়েছে!

হঠাৎ কিরীটীর হাতের স্পর্শে ফিরে তাকাই।

কি?

চল্।

ভিড় ছেড়ে দুজনে খানিকটা এগিয়ে এলাম বালুর উপর দিয়ে হেঁটে। সূর্যোদয় আর দেখা হয়নি। ইতিমধ্যে সূর্যদেব অনেকটা উঠে গিয়েছে জলশয্যা ছেড়ে।

কিরীটী দেখি হনহন করে ক্রমশঃ সমুদ্রতীর ছেড়ে পাড়ের দিকে হেঁটে চলেছে। পাড়ে উঠে শহরের দিকে চলেছে।

কোথায় চলেছিস?

বিজয় মহান্তির ওখানে।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, বিজয় মহান্তির সঙ্গে মাত্র পরশুই ঘটনাচক্রে আলাপ হয়েছে। ওখানকার, ও. সি. বিজয় মহান্তি।

রিক্‌শাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে গোলমাল হওয়ায় কিরীটী সাইকেল-রিক্‌শাওয়ালাটাকে ধরে নিয়ে সোজা থানায় গিয়েছিল।

সেখানেই বিজয় মহান্তির সঙ্গে আলাপ। লোকটি বেশ ভদ্র ও অমায়িক এবং কিরীটীর পরিচয়টা আমি দিতে আমাদের সে কি সাদর অভ্যর্থনা!

কী সৌভাগ্য আমার! আপনাদের সঙ্গে আলাপ করে যে কি খুশি হলাম! তারপরই প্রশ্ন করেছিল, নিশ্চয়ই বেড়াতে এসেছেন মিঃ রায় পুরীতে?

হ্যাঁ। এবং সমুদ্র-দর্শন। কিরীটী জবাব দিয়েছিল, বেড়ানোটা গৌণ, সমুদ্রদর্শনটাই মুখ্য।

আসবেন কিন্তু মাঝে মাঝে।

কিরীটী প্রত্যুত্তরে হেসেছিল মৃদু, কোন জবাব দেয়নি।

আমি তো জানি, এতকাল খুন-জখম-চুরি-বাটপাড়ি এবং সেই কারণে থানা-পুলিস ঘেঁটে ঘেঁটে ওর ঐসবের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা জন্মে গেছে। পারতপক্ষে আজকাল ঐসব স্থানে ও যেন পা দিতেই চায় না।

তাহলেও সেদিন থানা থেকে বের হয়ে হোটেলের দিকে যেতে যেতে বলেছিল কিরীটী, মিঃ কাগতাড়ুয়া মনে হল বেশ সজ্জন ব্যক্তি। আর এদের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ যা হয় তাও নয়—ঘটে কিছু বুদ্ধি ধরে!

কাগতাড়ুয়া। সে আবার কোথা থেকে এল?

কেন রে! মহান্তি সাহেবকে কাগতাড়ুয়ার মতই দেখতে মনে হল না!

সত্যিই তো। বিজয় মহান্তির চেহারাটা মানসপটে সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

কাগতাড়ুয়াই বটে!

লম্বা দেহের অনুপাতে মাথাটা যেন বড়ই। বিশাল একজোড়া কনক-চাঁপা গোঁফ। সরু

সরু হাত-পা। ঝলঝলে একটা সুট পরিধানে। আবলুশ কাঠের মত কালো গাত্রবর্ণ।
মিথ্যা বলেনি কিরীটী—ক্ষেতের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখলে কাগতাড়ুয়াই মনে হবে।

থানার কম্পাউণ্ডে প্রবেশ করতেই বাঁদিকে মহান্তির কোয়ার্টারের সামনে নজরে পড়ল, মহান্তি তার কোয়ার্টারের সামনে পায়চারি করে বেড়াচ্ছে। পরনে একটা সবুজ লুঙ্গি, গায়ে একটা গেঞ্জি, পায়ে হরিণের চামড়ার চটিজুতো।

আমাদের এত সকালে থানায় আসতে দেখে মহান্তি যেন একটু অবাকই হয়।

তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানায়, আসুন আসুন, কিরীটীবাবু! এত সকালে? কি সৌভাগ্য!

বাইরের বারান্দায় চেয়ার পাতা ছিল। আমরা সেখানেই বসি।

বসুন, চায়ের কথাটা বলে আসি ভিতরে। হন্তদন্ত হয়ে মহান্তি ভিতরে গেল।

চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা শার্ট গায়ে চাপিয়ে এসে আমাদের মুখোমুখি একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে বসতে বললে, এদিকে বেড়াতে বের হয়েছিলেন বুঝি? তা এ সময়টা সমুদ্রতীর ছেড়ে ঘিঞ্জির মধ্যে এই শহরের দিকে?

আপনাকে একটা খবর দিতে এলাম মহান্তি সাহেব—কিরীটী মৃদু কণ্ঠে বলে।

খবর! কী খবর?

সমুদ্রের মধ্যে একটা মৃতদেহ যাচ্ছিল, নুলিয়ারা মাছ ধরতে গিয়ে তুলে এনেছে!

মহান্তি হেসে ফেলে, অ্যাক্সিডেন্ট—দুর্ঘটনা! এ তো এখানে সমুদ্রে আকছারই হয়। নতুন কিছু নয়। তারপরই হঠাৎ যেন থেমে গিয়ে কিরীটীর মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে বলে, আপনি কি সেইজন্যেই এসেছেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ। কারণ ব্যাপারটা আমার ধারণায় সাধারণ কোন একটা অ্যাক্সিডেন্ট বলে যেন মনে হল না।

কিরীটীর কথায় মিঃ কাগতাড়ুয়া—আমাদের মহান্তি সাহেব যেন একটু নড়ে-চড়ে বসল, তারপর কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে শুধালে, কিসে?

হ্যাঁ, তাই।

Simple drowning case নয় বলে আপনার মনে হচ্ছে, মিঃ রায়?

হ্যাঁ।

তবে কী?

মনে হচ্ছে ইট্‌স কেস অফ মার্ডার! লোকটাকে হত্যা করে তারপর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে বলেই যেন আমার ধারণা। অবিশ্যি—

আপনার তাই ধারণা?

হ্যাঁ, কারণ এক হতে পারে লোকটা সমুদ্রের জলে আত্মহত্যা করবার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কিংবা স্নান করতে গিয়ে আচমকা ঢেউয়ের টানে অগাধ জলে গিয়ে আর সামলাতে পারেনি। কিন্তু ভাবলে মনে হবে, দুটোই যেন কতকটা অসম্ভব।

কেন—অসম্ভব কেন?

প্রথমতঃ লোকটা আমার পরিচিত ছিল।

বলেন কী!

হ্যাঁ, গতকাল সন্ধ্যায়ও ওর সঙ্গে সমুদ্র-সৈকতে আমার দেখা হয়েছে। আত্মহত্যা যদি

সে করতও—সমুদ্রজলে ঝাঁপিয়ে তার পক্ষে সহজসাধ্য ছিল না আত্মহত্যা করাটা, যেহেতু লোকটা এককালে খুব ভাল চ্যাম্পিয়ান সাঁতারু ছিল। দ্বিতীয়তঃ স্নান করতে গিয়ে যদি স্লিপ করে থাকে—সেও নিশ্চয়ই শেষরাত্রে অন্ধকার থাকতে স্নান করতে যায়নি—কেউ যায় না—বিশেষ করে সমুদ্র-স্নানে—তাই যেন আমার মনে হচ্ছে ওকে কেউ হত্যা করেছে—

হত্যা করেছে—বলেন কী?

হ্যাঁ। অবিশ্যি হত্যাকারী হয়ত ভেবেছিল, নিঃশব্দে হত্যা করে রাতের অন্ধকারে একবার যদি মৃতদেহটা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়—তার কার্য-সিদ্ধি হবে এবং হত্যার সমস্ত প্রমাণ সমুদ্রের জল ধুয়ে-মুছে দেবে। কিন্তু—

মহান্তি কিরীটীর মুখের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাল।

কিরীটী বলে, কিন্তু বেচারীর বোধ হয় বিধি বাম। সমুদ্র তো বিশ্বাসঘাতকতা করেছেই—মৃতদেহটা বেশী দূরে টেনে না গিয়ে আশেপাশেই কোথাও ভাসছিল যার ফলে নুলিয়াদের নজরে পড়ে গেল, আর সেই সঙ্গে—

কি সেই সঙ্গে?

মহান্তি তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, কিরীটী রায়ের উপস্থিতি পুরীতে—কিন্তু সেজন্যও ঠিক নয় মহান্তি সাহেব। আমি এসেছি বিশেষ করে কথাটা আপনাকে জানাতে—একটু আগেই আমি আপনাকে বললাম না—আমি ওকে চিনতাম। লোকটার নাম কালী সরকার—কলকাতা শহরের একজন নামী ও ধনী জুয়েলার।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। মাঝখানে অবিশ্যি অনেকদিন আমার ওর সঙ্গে দেখা হয়নি, তবে দেখা না হলেও কাগজেই হয়ত আপনিও দেখে থাকবেন, ভাইয়ে ভাইয়ে গণ্ডগোল হয়ে বৎসরখানেক আগে সব পার্টিশন হয়ে আলাদা আলাদা হয়ে গিয়েছে—পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে পার্টিশন—

জাস্ট এ মিনিট মিঃ রায়, মহান্তি বাধা দেয় ঐ সময়, ওরই ভাইরা কি—রাখাল সরকার, বৃন্দাবন সরকার, গোকুল সরকার—

হ্যাঁ, কালী রাখাল বৃন্দাবন গোকুল আর দুর্গা সরকার। একদা কালীর সঙ্গে প্রেসিডেন্সীতে বছর তিন পড়েছিলাম। ম্যাথেমেটিকসে খুব মাথা ছিল ঐ কালীর।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। আর দেখতে লোকটা, মানে চেহারাটা, একটা বনমানুষ ও ভিলেনের মত হলেও খুব শান্ত নিরীহ প্রকৃতির ছিল বলেই জানতাম।

কথাগুলো বলতে বলতে কিরীটী আড়চোখে আমার দিকে তাকাল।

তাহলে তো একবার উঠতে হচ্ছে!

হ্যাঁ—চলুন একবার ঘুরে আসবেন।

কিরীটী উঠে দাঁড়াতেই মহান্তি বাধা দেয়, আরে উঠছেন কি, বসুন—বসুন—চা আসুক। আগে চা খান—মৃতদেহ যখন ডানা মেলে উড়ে যাবে না!

কিরীটী মৃদু হেসে বলে, তা অবিশ্যি যাবে না। কিন্তু আপনার একবার যত শীঘ্র সম্ভব মনে হয় সেখানে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত করে এলে ভাল হয়।

সে তো যাবই। বসুন—বসুন—

অগত্যা আমাদের পুনরায় বসতেই হল।

এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় চা এসে গেল। শুধু চা নয়, তার সঙ্গে প্রচুর জলখাবারও। চা ও জলখাবারের ব্যাপার শেষ করে আরও আধ ঘণ্টা পরে আমরা উঠলাম। আসবার সময় মিঃ মহান্তি বললেন থানায় মৃতদেহ এলেই আমাদের খবর দেবে।

।। তিন ।।

বেলা প্রায় নটা নাগাদ থানা থেকে আমাদের ডাকতে লোক এল। মহান্তি সাহেব ডেকে পাঠিয়েছে।

আমরা প্রস্তুতই ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে রওনা হলাম। থানায় পৌঁছে দেখি মহান্তি সাহেব বসে আছে মৃতদেহের অপেক্ষায়। মৃতদেহ তখনও এসে পৌঁছয়নি।

কালী সরকারের মৃতদেহটা থানায় এসে পৌঁছল যখন তখন বেলা প্রায় সাড়ে দশটা। একটা স্ট্রেচারে করে—একটা কম্বল দিয়ে ঢেকে মৃতদেহ থানায় বহন করে নিয়ে আসা হয়েছিল। বাহকরা এলে স্ট্রেচারটা সামনের বারান্দায় নামিয়ে রাখল মহান্তি সাহেবের নির্দেশে।

ইতিমধ্যে মহান্তি সাহেব সমুদ্রতীরে গিয়ে সরেজমিন তদন্ত করে এসেছিল। এবং সেই প্রসঙ্গেই ঐ সময় কিরীটীর সঙ্গে মহান্তি সাহেবের আলোচনা চলছিল।

মহান্তি সাহেবের ইঙ্গিতে বাহকদের মধ্যে একজন মৃতদেহের উপর থেকে কম্বলটা সরিয়ে নিল। কিরীটী উঠে দাঁড়ায় এবং স্ট্রেচারে শায়িত মৃতদেহের কাছে এগিয়ে যায়—বোধ করি মৃতদেহটা আর একবার ভাল করে দেখবার জন্য। বলাই বাহুল্য আমিও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে কিরীটীকে অনুসরণ করি।

আবার মৃতদেহের দিকে তাকালাম।

কিরীটীর সন্দেহ মিথ্যা নয়। গলার দাগটা সত্যিই সন্দেহজনক। এবং মনে হয় না অনেকক্ষণ মৃতদেহটা সমুদ্রের জলে ছিল। খুব জোর ঘণ্টা দেড়েক বা দুই। তার বেশী নয়। এবং মৃতদেহে রাইগার মর্টিস তখনও সেট-ইন করেনি পরীক্ষা করে বোঝা গেল। তাতেই অনুমান হয় রাত বারোটার পরে কোন এক সময় নিহত হয়েছে লোকটা সম্ভবত।

পরীক্ষা করা হয়ে গেলে কিরীটী কম্বলটা আবার টেনে দেয় মৃতদেহের উপরে। ফিরে এসে চেয়ারে বসল।

তাহলে মিঃ রায়, আপনি নিঃসন্দেহ—লোকটাকে হত্যাই করা হয়েছে! মহান্তি কিরীটীর মুখের দিকে চেয়ে আবার প্রশ্নটা করে।

হ্যাঁ, মহান্তি সাহেব। অবিশ্যি লোকটার মৃত্যুর কজ অর্থাৎ স্ট্র্যাঙ্গুলেশান—শ্বাসরোধ হয়ে না জলে ডুবে সেটা সঠিকভাবে ময়না তদন্তের দ্বারাই একমাত্র প্রমাণিত হবে। তবে—

তবে?

মৃতদেহ পরীক্ষা করে ও পারিপার্শ্বিকতা বিবেচনা করে যা মনে হচ্ছে—ব্যাপারটা দুর্ঘটনা নয়—নিষ্ঠুর হত্যা। সে বিষয়ে এখন কিন্তু আমি নিঃসন্দেহ।

নিঃসন্দেহ সত্যিই আপনি মিঃ রায়?

হ্যাঁ। সামান্যতম সন্দেহও আমার মনের কোথাও নেই ঐ সম্পর্কে।

কিন্তু আপনি এত ডেফিনিট হচ্ছেন কি করে?

কারণ প্রথমতঃ ধরুন—যদি অ্যাক্সিডেন্টই হত অর্থাৎ ড্রাউনিং-ই লোকটার মৃত্যুর কারণ

হত, সে নিশ্চয় স্নান করতে গিয়েই হত—কেমন কি না?

হ্যাঁ—সেটাই স্বাভাবিক।

তাই যদি হয় তো লোকটা নিশ্চয়ই পায়জামা-পাঞ্জাবি গায়ে ও হাতে ঘড়ি, বিশেষ করে অমন দামী একটা ঘড়ি বেঁধে নিশ্চয়ই সমুদ্রস্নান করতে যেত না! আই থিঙ্ক ইউ উড এগ্রি উইথ মি অন দ্যাট পয়েন্ট মিঃ মহান্তি!

হ্যাঁ।

আসুন এবার দ্বিতীয় পয়েন্টে আমার। মৃতদেহ দেখে বুঝতে কষ্ট হয় না—অন্ততঃ দেড় ঘণ্টা থেকে দু'ঘণ্টা মৃতদেহটা জলে ছিলই এবং আমরা যতদূর জেনেছি নুলিয়ারা ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ মৃতদেহটা জলে ভাসতে দেখে তুলে আনে ডাঙায়। তাই যদি হয় এবং লোকটা যদি স্নান করতে গিয়েই ডুবে গিয়ে মরে থাকে, নিশ্চয়ই সে রাত তিনটে সাড়ে তিনটে নাগাদ সমুদ্রস্নান করতে যায়নি—অবিশ্যি যদি না লোকটার মাথায় কোন গোলমাল থেকে থাকে। কিন্তু আগেই আপনাকে আমি বলেছি কালী সরকার আমার পরিচিত এবং মাত্র গতকালই ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সন্ধ্যায় সমুদ্র-সৈকতে দুবার এবং কথাবার্তাও হয়েছে আমার লোকটার সঙ্গে। এবং সেরকম কিছুই তো মনে হয়নি। অতএব—

আর—এনি আদার পয়েন্ট মিঃ রায়? এবারে মহান্তি প্রশ্নটা করে।

আছে। আমার তৃতীয় পয়েন্ট, যদি অ্যাক্সিডেন্টের কথা বাদ দিয়ে ভাবি লোকটার আত্মহত্যার কথা—সেটা অবিশ্যি আমার পক্ষে এত তাড়াতাড়ি বলা সম্ভব নয়—আরো প্রমাণ ও অনুসন্ধানের—ইনভেস্টিগেশন-এর প্রয়োজন, তবে এ কথাও তো আপনাকে আমি বলেছি, কালী সরকার খুব ভাল সাঁতারু ছিল। কাজেই সেটা তো আমরা উড়িয়ে দিতে পারছি না!

তা ঠিক।

নাউ দি ফোর্থ—চতুর্থ পয়েন্ট, মৃতের গলার দাগটা লক্ষ্য করুন মিঃ মহান্তি, ঠিক মনে হবে কোন কিছু ফিতে বা দড়ির মত গলায় বেঁধে শ্বাসরোধ করা হয়েছে লোকটাকে—

কিন্তু—

অবিশ্যি সেটাও ময়না তদন্তের ফলাফলের উপরই অনেকটা নির্ভর করছে নিঃসন্দেহে। তবু আপাতত এই পয়েন্টগুলোর উপরে নির্ভর করেই তো আপনি তদন্ত শুরু করতে পারেন মিঃ মহান্তি!

তা পারি—এবং তদন্ত তো করবই। তবে একটা কথা মিঃ রায়—

বলুন?

ঘটনাচক্রই বলুন আর যাই বলুন, আপনি যখন এখানে উপস্থিত আছেনই, আপনার সাহায্য এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই পাব আশা করতে পারি।

মোস্ট গ্লাডলি। আপনাকে আমার যথাসাধ্য—আমি শুধু নয়, আমরা দু'জনেই আমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করব মিঃ মহান্তি—কথা দিচ্ছি।

সত্যি বলছেন তো?

সত্যিই।

তাহলে এবারে কাজের কথায় আসা যাক মিঃ রায়—

নিশ্চয়ই, আপনি তাহলে তদন্ত—

শুরু করব এবং এখুনি। তাই ভাবছি কোথা থেকে শুরু করব—

একেবার মূল স্থান থেকেই শুরু করুন মিঃ মহান্তি। কিরীটী বলে।

মূল স্থান!

হ্যাঁ, সী-সাইড হোটেল থেকে—যেখানে আমরা জেনেছি কালী সরকার উঠেছিল।

সী-সাইড হোটেল মানে হারাধন অর্থাৎ হরডন বিশ্বাসের হোটেল!

বিজয় মহান্তিই তখন সংক্ষেপে পরিচয় দেয় ঐ হরডন বিশ্বাস লোকটার ও স্ত্রী রেণুকা বিশ্বাসের।

লোকটা ক্রিশ্চান—জাতে জেলে—গঞ্জাম জিলাতেই বাড়ি।

এক পাদ্রীর কৃপায় ক্রিশ্চান হয়ে তাঁরই দয়ায় লেখাপড়া শিখে চাকরি করছিল রেলেতে, তারপর ওর পালনকর্তা পাদ্রী ফারলোর মৃত্যুর পর কলকাতা হগ মার্কেটে তার ফুলের স্টল ও নার্সারি উইলে পেয়ে চাকরি ছেড়ে দেয়। ফুলের কারবার করেছে বছর-পাঁচেক, তারপর বছরখানেক হল ঐ হোটেল খুলেছে এখানে এসে-কলকাতার ব্যবসা বেচে দিয়ে।

হোটেলটা তো বেশ চমৎকার। অনেক টাকা ঢালতে হয়েছে মনে হয়! কিরীটী বলে।

তা হয়েছে বৈকি। পাদ্রীর নার্সারী ও ফুলের স্টলটা বিক্রি করেও শুনেছি নেহাৎ কম টাকা পেয়েছিল না—সেই বিক্রির টাকা দিয়েই নাকি এখানে এসে হোটেলটা খুলেছে।

হুঁ, ভাগ্যবান বলতে হবে।

তা ভাগ্যবান বৈকি! তাছাড়া মিসেস বিশ্বাস—

মিসেস বিশ্বাস কি—

শি ইজ অ্যান অ্যাসেট!

কি রকম?

দেখলেই বুঝবেন। চলুন না—উঠুন —হোটেলেই তো এখন যাব।

চলুন।

সী-সাইড হোটেল।

সী-সাইড হোটেলটি অনেকখানি জায়গা নিয়ে এবং অনেক টাকা খরচ করে তৈরী হয়েছে দেখলেই বোঝা যায়। একেবারে বলতে গেলে বীচের উপরে যে রাস্তা সেই রাস্তার উপরেই। বিরাট গেট। তারপরই খানিকটা খোলা জায়গা।

হোটেলের বাসিন্দাদের ছেলেমেয়েদের খেলবার ব্যবস্থা আছে সেখানে নানা ধরনের। তারপরই দোতলা বিল্ডিংটি।

ভিতরে প্রবেশ করলে বোঝা যায় ইংরাজী অক্ষর 'ই'-র প্যাটার্নে তৈরী বাড়িটা। উপরে ও নীচে ছোট-বড়য় মিলে প্রায় ত্রিশটা ঘর। ফোর সিটেড—সিঙ্গল সিটেড ও পুরো ফ্যামিলি থাকবার মত সর্বপ্রকার ব্যবস্থাই হোটেলটিতে আছে।

চার্জও একটা খুব বেশী নয়—মডারেট।

ম্যানেজার-প্রোপ্রাইটার মিঃ হরডন বিশ্বাস নীচের তলায় এক কোণে একেবারে খানতিনেক ঘর নিয়ে থাকে। লোকজনের মধ্যে সে নিজে, তার স্ত্রী রেণুকা বিশ্বাস ও একটি বেকার শ্যালক—রেণুকার ভাই রামানুজ।

তার পদবী যাই থাক, সবাই রামানুজ বলেই জানে এবং ডাকে। রামানুজই হোটেলের সুপারভাইজার ও কেয়ারটেকার।

রামানুজই আমাদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে গিয়ে ম্যানেজারের ঘরে বসাল, কাম—কাম, ওয়ান্ট রুম—সিঙ্গল—ডবল—ভেরি চিপ স্যার—ভেরি চিপ।

রামানুজের বয়স আটাশ-ত্রিশের বেশী হবে না।

অনর্গল ভুল ইংরাজী বলা তার মুদ্রাদোষ একটা। তবে সত্যিই সুশ্রী। লম্বা ঢ্যাঙা চেহারা। টকটকে রঙ—কটা চুল, কটা চোখ।

পরিধানে একটা স্ল্যাক—হাওয়াই শার্ট চিত্র-বিচিত্র অ্যামেরিকান টাইপের এবং পায়ে হাওয়াই চপ্পল। মুখে ধূমায়মান সিগারেট।

মিঃ মহান্তি শুধায়, মিঃ বিশ্বাস কোথায়?

হোয়াই স্ট্যানডিং? বসুন না বসুন, মিঃ বিশ্বাস মনে হয় থানাতেই 'গন'। এখুনি আসবেন-—কামিং সুন।

কথাটা শুনে আমরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

মহান্তি বলে, মিসেস বিশ্বাস নেই?

হ্যাঁ—কিচেনে আছে—কল হার?

হ্যাঁ, তাঁকে খবর দিন।

রামানুজ চলে গেল এবং মিনিট দশেক পরেই রেণুকা বিশ্বাস এসে ঘরে ঢুকল। নমস্কার মিঃ মহান্তি—কি খবর? মিঃ বিশ্বাস তো থানাতেই গিয়েছেন আপনার কাছে। দেখা হয়নি?

না। তার আগেই আমরা বের হয়ে পড়েছি।

ও, তাই বুঝি—

হ্যাঁ।

তবে বসুন না, এখুনি হয়ত এসে পড়বেন।

আমরা বসলাম।

একটু চায়ের কথা বলে আসি!

না, না—আপনাকে এই দুপুরে ব্যস্ত হতে হবে না। আপনি বসুন মিসেস বিশ্বাস—

মৃদু হেসে মিসেস বিশ্বাস একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসল।

পরে পরিচয় জেনেছিলাম মহান্তিরই মুখে ঐদিনই—মিসেস বিশ্বাসের মিশ্র রক্তে জন্ম। ওর মা ছিল আদিবাসী সাঁওতাল, আর বাপ একজন স্কচ মিশনারী ডাক্তার। জন্মসূত্রে কিন্তু স্কচ বাপের সব বৈশিষ্ট্যই পেয়েছিল মহিলা।

।। চার ।।

বেঁটেখাটো গড়ন রেণুকা বিশ্বাসের। এবং বয়স চল্লিশের নিচে নয় বলেই মনে হয়।

কিন্তু বয়েস হলেও বোঝবার উপায় নেই, কারণ ছেলেপিলে না হওয়ার দরুনই বোধ হয় দেহের গড়ন এখনও এ বয়সেও বেশ আঁটসাঁট এবং যৌবন যেন সমস্ত দেহে ছড়িয়ে আছে এখনও।

রীতিমত ফর্সা গাত্রবর্ণ। রামানুজের মতই কটা চুল, কটা চোখ। পরিধানে কিন্তু বাঙালী মেয়েদের মত ড্রেস করে একটি ভাল শাড়ি পরা। মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। খোঁপায় একটি ফুল গোঁজা। হাতে চারগাছা করে সোনার চুড়ি।

কথাটা মহান্তিকে তুলতে হল না—মিসেস বিশ্বাসই উত্থাপন করল। বললে, একটা বড় স্যাড ব্যাপার ঘটে গিয়েছে!

কি হল?

আমাদের হোটেলেরই একজন বোর্ডার মনে হচ্ছে গতরাত্রে সমুদ্রের জলে সুইসাইড করেছিল—

সুইসাইড! মহান্তি তাকাল মিসেস বিশ্বাসের মুখের দিকে।

তাছাড়া আর কি! কিন্তু বুঝতে পারছি না ভদ্রলোক হঠাৎ ওভাবে সুইসাইড করতে গেলেন কেন? অথচ পাঁচ-সাতদিন এখানে আছেন, খুব 'সোবার' ধীর-স্থির বলেই তো মনে হয়েছে ভদ্রলোককে।

তবে হঠাৎ সুইসাইড করতে গেলেন কেন?

তাই তো বলছি—কিছু মাথামুণ্ডু বোঝাই যাচ্ছে না। বলেছিলেন এক মাস থাকবেন—

কোন্ ঘরে থাকতেন? মহান্তি আবার প্রশ্ন করে।

দোতলার দুটো পাশাপাশি ঘর নিয়ে ছিলেন।

সঙ্গে আরও কেউ ছিল বুঝি?

না, একাই ছিলেন। বড়লোক মানুষ, তাই হয়তো একটু হাত-পা ছড়িয়ে থাকা অভ্যাস। দুটো ঘর হয়ত সেইজন্যই নিয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের তো চিনতে পারছি না—আপনার সঙ্গে এঁরা—

আমার বিশেষ বন্ধু—

ও—তা আপনি কি মিঃ বিশ্বাসের সঙ্গে দেখা করতেই এসেছেন?

হ্যাঁ। আপনার হোটেলের বোর্ডার কালী সরকারের ব্যাপারেই—

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করলাম, রেণুকা বিশ্বাসের কটা চোখের চাউনি যেন হঠাৎ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল এবং পর্যায়ক্রমে আমাদের সকলের মুখের উপর দিয়ে দ্রুত একবার ঘুরে গেল।

বুঝলাম ভদ্রমহিলাটি বুদ্ধি ধরে এবং সজাগ। অতঃপর রেণুকা বিশ্বাস একটু যেন নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে বললেন, কি ব্যাপার বলুন তো মিঃ মহান্তি? কোন রকম সন্দেহজনক কিছু কি?

তা একটু সন্দেহের কারণ ঘটেছে বৈকি মিসেস বিশ্বাস!

মিঃ মহান্তি, এটা আমার হোটেল, দশজন আসা-যাওয়া করছে সর্বক্ষণ এবং দশজনকে নিয়ে ব্যাপার। সেরকম কিছু হলে বুঝতেই পারছেন হোটেলের একটা দুর্নাম ছড়িয়ে পড়বে।

ব্যস্ত হবেন না মিসেস বিশ্বাস—কিরীটীই এবার কথাটা বললে, মিঃ মহান্তি যথাসাধ্য গোপনেই ব্যাপারটা অনুসন্ধান করবেন এবং আপনার যাতে করে কোন ক্ষতি না হয় সেটাও উনি দেখবেন বৈকি। তবে—

কী বলুন?

বুঝতেই তো পারছেন একটা সন্দেহজনক মৃত্যুর ব্যাপার—

সন্দেহজনক মৃত্যু! কি বলছেন আপনি?

দুঃখিত আমরা মিসেস বিশ্বাস, মহান্তিই এবারে বলে, কালী সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারে সত্যিই খানিকটা সন্দেহ রয়েছে, আমাদের ধারণা।

সন্দেহ! দুর্ঘটনা—মানে সুইসাইড নয় বলেই তাহলে আপনাদের ধারণা?

হ্যাঁ, দুর্ঘটনা অবশ্যই—তবে সুইসাইড কিনা সত্যি-সত্যিই এখনও সেটা প্রমাণসাপেক্ষ।

মানে?

বুদ্ধিমতী আপনি—কিরীটী বলে, আপনিই ভেবে দেখুন না, আপনি যা যা একটু আগে কালী সরকার সম্পর্কে বললেন, তাতে করে লোকটা হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সুইসাইড করে বসবে, সেরকম কিছু বলে কি আপনার মনে হয়?

না।

তাছাড়া কালী সরকারকে—কিরীটী বলে, আমি এককালে ভাল করে চিনতাম। আমার সহপাঠী ছিল।

হ্যাঁ। লোকটা অবস্থাপন্ন নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত স্থির বিবেচক বুদ্ধিমান।

কিন্তু—

হ্যাঁ, পরে তেমন কোন কারণ ঘটতে পারে এই তো বলতে চান! তা অবিশ্যি পারে। তবে আপাতদৃষ্টিতে তেমন কিছুই তো চোখে পড়ছে না বা মনেও আসছে না।

মিসেস রেণুকা বিশ্বাস আমাদের মুখের দিকে চেয়ে থাকে কিছুক্ষণ, তারপর আস্তে আস্তে বলে, তবে কি আপনারা মনে করেন, সত্যিই ব্যাপারটার মধ্যে কোন গণ্ডগোল আছে? মানে—

ঠিক, মিসেস বিশ্বাস, আপনার সন্দেহ মিথ্যা নয়। আমাদের ধারণা তাই। মিঃ মহান্তি জবাব দেয় এবারে।

রেণুকা বিশ্বাস হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে পড়ে। কপালে চিন্তার রেখা দেখা দেয়।

কিরীটীর ইঙ্গিতে অতঃপর মিঃ মহান্তি বলে, মিসেস বিশ্বাস, কালী সরকার যে ঘরে ছিল সে ঘরটা একবার দেখতে চাই আমরা।

নিশ্চয় নিশ্চয়—উঠুন, চলুন—

আমরা উঠে দাঁড়িয়েছি আর ঠিক সেই সময় হোটেলের মালিক মিঃ হরডন বিশ্বাস এসে ঘরে ঢুকল।

এই যে মিঃ মহান্তি, আপনি এখানে আর আমি থানায় গিয়ে—

কথাটা শেষ হয় না বিশ্বাসের। আমাদের দিকে নজর পড়ায় থেমে গেল যেন সঙ্গে সঙ্গে।

আপনি যে কারণে গিয়েছিলেন, আমরাও সেই কারণেই আপনার এখানে এসেছি মিঃ বিশ্বাস। কালী সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারটা তদন্ত করতেই এসেছি।

তদন্ত করতে?

হ্যাঁ।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তো আপনার কথাটা মিঃ মহান্তি!

জবাব দিল এবারে রেণুকা বিশ্বাস, ওঁদের ধারণা কালী সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারের মধ্যে কোন গোলমাল আছে—মানে সামথিং সাসপিসাস্—

সন্দেহজনক! সে কি?

ওঁরা তো তাই বলছেন।

মিঃ মহান্তি—

হ্যাঁ, মিঃ বিশ্বাস। মহান্তি বললেন, ব্যাপারটা আপনারা যা ভেবেছেন তা মনে হয় না।

তবে?

মনে হচ্ছে ইট্‌স এ কেস অব মার্ডার—হোমিসাইড। তাকে কেউ হত্যা করে জলে ভাসিয়ে দিয়েছে।

সে কি! একটা অর্ধস্ফুট চিৎকার বিশ্বাসের কণ্ঠ চিরে যেন বের হয়ে আসে।

আতঙ্ক—একটা বিস্ময় যেন ওর চোখে-মুখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমি দেখছিলাম লোকটাকে—মানে রেণুকা বিশ্বাসের স্বামী হরডন বিশ্বাসকে।

ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, রোগাটে, ডিসপেপটিক টাইপের চেহারা। মাথার চুল সামনের দিকে কিছু আছে। পিছনের সবটাই প্রায় বলতে গেলে ঘাড় পর্যন্ত কামানো। ছোট কুতকুতে একজোড়া চোখ। ধারালো খাড়া নাক। নাকের নীচে মাছির মত একটুখানি গোঁফ। বাদবাকি সব ক্লিন সেভ করা। ছোট ছোট দাঁত। দাঁত তো নয়—যেন মুক্তোর পংক্তি। পরনে প্যান্ট ও বুশকোট, পায়ে পাম্পসু।

হরডন বিশ্বাস তোতলাতে তোতলাতে বলে, মা-মার্ডার! আপনি কী বলছেন মিঃ মহান্তি?

বললাম তো আমার তাই ধারণা।

বাট স্লুউ অ্যাবসার্ড! এ যে অসম্ভব! কে—কে তাকে হত্যা করবে? আর হত্যা করতে যাবেই বা কেন?

কে হত্যা করবে, কেন হত্যা করবে তাকে এসব প্রশ্নের জবাব যদি পেতাম তবে আর ভাবনা ছিল কী মিঃ বিশ্বাস! সোজা খুনীকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে গিয়ে জেলে পুরতাম এতক্ষণে!

হরডন বিশ্বাস এবারে যেন একান্ত হতাশ এবং অন্যন্যোপায় হয়েই তার স্ত্রীর দিকে তাকাল। শুকনো গলায় বললে, কি হবে রেণু?

কি আবার হবে—তুমি অত নার্ভাস হয়ে পড়ছ কেন?

বোঝা গেল হরডন বিশ্বাস নার্ভাস হয়ে পড়লেও রেণুকা বিশ্বাস এতটুকু নার্ভাস হয়নি এবং তার কণ্ঠস্বরেই সেটা প্রকাশ পায়।

তুমি কি ব্যাপারটা কত সিরিয়াস বুঝতে পারছ না রেণু! অন্য কিছু নয়—মার্ডার—খুন ব্যাপারটা একবার জানাজানি হয়ে গেলে এবং জানাজানি হবেই—সমস্ত হোটেলে কিরকম একটা আতঙ্কের সৃষ্টি হবে তখন—

জানবে কী করে তারা? আর জানতেই বা যাবে কেন? রেণুকা বুঝি সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে তার স্বামীকে।

বুঝতে পারছ না কেন ডারলিং! এরকম একটা সাংঘাতিক ব্যাপার—এ তুমি কতক্ষণ চাপা দিয়ে রাখতে পারবে? কী হবে মহান্তি সাহেব? আমি কি তবে ধনেপ্রাণে মারা যাব! এত টাকা খরচ করে হোটেল করেছি—সবে জমে উঠেছে—

হরডন বিশ্বাসের প্রায় কেঁদে ফেলবার যোগাড়।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকায় মহান্তি।

কিরীটীই বলে তখন, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ব্যাপারটা মিঃ মহান্তি যথাসাধ্য গোপনে এবং সতর্কতার সঙ্গে ডীল করবেন।

আপনি-আপনি কে? হরডন কিরীটীর দিকে তাকাল।

আমি—আমি মানে—

কিরীটীকে ইতস্তত করতে দেখে মহান্তি বলে, মিঃ বিশ্বাস, ওঁর একটা বিশেষ পরিচয় আছে। বিখ্যাত ব্যক্তি উনি।

কে?

রহস্যভেদী কিরীটী রায়ের নাম শুনেছেন?

শুনিনি। বহুবার শুনেছি। আপনিই তাহলে সেই—

হ্যাঁ—উনিই তিনি। যাক, চলুন উপরে, একবার কালী সরকার যে ঘরে ছিল সে ঘরটা দেখে আসি।

চলুন।

তোমায় যেতে হবে না, তুমি থাক—আমি যাচ্ছি। রেণুকা বলে ওঠে।

তুমি যাবে? তবে তাই যাও রেণু। রামানুজ—রামানুজকে দেখছি না! সে কোথায় গেল? কোথায় যে থাকে সব! কাজের সময় কাউকে যদি সামনে পাওয়া যায়!

কেন, রামানুজকে দিয়ে কি হবে?

একটুকু চা—তাছাড়া সিগারেট আমার সব ফুরিয়ে গিয়েছে।

হেয়ার স্ট্যাণ্ডিং ব্রাদার—

দরজার বাইরে থেকে রামানুজের গলা শোনা গেল। সে ঘর থেকে গেলেও দূরে যায়নি। এতক্ষণ কান পেতে দরজার আড়ালেই দাঁড়িয়েছিল।

রামানুজ এসে ঘরে ঢুকল।

।। পাঁচ ।।

আমরা, বলাই বাহুল্য, আর অপেক্ষা করলাম না।

রেণুকা বিশ্বাসের সঙ্গে হোটেলের দোতলায় কালী সরকার যে ঘর দুটো নিয়ে ছিল, সেই ঘর দুটো দেখবার জন্য অগ্রসর হলাম। আগে আগে রেণুকা বিশ্বাস, পশ্চাতে আমরা তিনজন। গ্রীষ্মের সিজন, হোটেলে বোর্ডার্স একেবারে ভর্তি। গমগম করছে।

নানা জাতের নানা ধরনের লোক। স্নানের সময় এটা, তাই বেশীর ভাগ বোর্ডারই সমুদ্রস্নানে গিয়েছে। যারা ছিল তারা রেণুকা বিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের ও পুলিসকে দোতলার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে দেখে এদিক ওদিক থেকে কৌতূহলের সঙ্গে উঁকি দেয়।

কৌতূহলটা অবিশ্যি খুবই স্বাভাবিক।

হঠাৎ কিরীটীই প্রশ্নটা ফিসফিস করে করে রেণুকা বিশ্বাসকে, মিসেস বিশ্বাস, আপনার হোটেলের লোকেরা কি মিঃ সরকারের ব্যাপারটা জানতে পেরেছে?

পেরেছে—তবে তারা জানে ভদ্রলোক সুইসাইড করেছেন। রেণুকা বিশ্বাস জবাব দেয়।

আপনাকে ঐ ব্যাপারে কেউ কিছু প্রশ্ন করেছে?

না।

ইতিমধ্যে আমরা দোতলায় নির্দিষ্ট ঘরের সামনে পৌঁছে গিয়েছিলাম।

ঘরের দরজায় তালা দেওয়া ছিল, বাইরে থেকে মিসেস বিশ্বাস তালা খুলে দিল। আমরা সকলে একে একে ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকলাম।

ঘর দুটি চমৎকার। খোলা জানালা-পথে তাকালেই চোখে পড়ে সম্মুখে প্রসারিত আদিগন্ত সমুদ্র। দিগন্তবিস্তৃত নীল জলরাশি সূর্যকিরণে ঝলমল করছে—মুহূর্তে যেন সমগ্র দৃষ্টিকে গ্রাস করে। চোখের দৃষ্টি যেন আমার ফিরতে চায় না।

কিরীটীর প্রশ্নে ওর দিকে ফিরে তাকাই।

কিরীটী রেণুকা বিশ্বাসকে আবার প্রশ্ন করছিল, আপনিই বুঝি ঘরে তালা লাগিয়ে

দিয়েছিলেন মিসেস বিশ্বাস?

হ্যাঁ। ব্যাপারটা জানার পরেই তালা লাগিয়ে রাখি। ঘরে তার কি মূল্যবান জিনিস আছে-না-আছে কে জানে। যদি কিছু খোওয়া যায় তাই—

ভাল করেছেন।

পাশাপাশি দুটি ঘর। একটি বড় আকারের, অন্য সংলগ্ন ঘরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। দুই ঘরের মধ্যবর্তী একটা দরজা আছে, ঘরের মধ্যে তিনটি জানালা। তিনটি জানালাই খোলা ছিল এবং জানালাগুলি সমুদ্রের দিকে। খোলা জানালা-পথে হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া ঘরের মধ্যে ঢুকছিল। দেওয়ালে টাঙানো একটা ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলো ফরফর শব্দে উড়ছিল।

কিরীটী ঘরের চারিদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখতে থাকে।

আমি একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া আসছে ঘরে। সামনে যতদূর দৃষ্টি চলে—বালুবেলার পরেই আদিগন্ত সমুদ্র প্রখর সূর্যকিরণে নীল মরকত মণির মত যেন জ্বলছে। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটা হবে। অসংখ্য স্নানার্থী—সমুদ্রের তটে ও জলে।

ঘরের মধ্যে আসবাবপত্র সামান্যই। একধারে একটি খাটে শয্যা বিস্তৃত। তার পাশে একটি টেবিল একটি কাঠের চেয়ার ও একটি ক্যাম্বিসের ইজিচেয়ার। ইজিচেয়ারটার উপরিভাগে একটি তোয়ালে বিছানো—মাথার তেল লাগবার ভয়ে বোধ হয়।

টেবিলের উপরে কিছু ইংরাজী, বাংলা ম্যাগাজিন ও খান-দুই মোটা মোটা হায়ার ম্যাথামেটিক্‌সের বই। একপাশে একটা বড় চামড়ার দামী সুটকেস এবং তার উপর একটা অ্যাটাচি কেস।

পাশে দু'জোড়া জুতো। একজোড়া কাবুলী চপ্পল। আরও একজোড়া চপ্পল আমাদের চোখে পড়ল খাটের ঠিক সামনেই। মনে হয় যেন কেউ চপ্পলজোড়া পা থেকে খুলে রেখে দিয়েছে। শয্যাটার দিকে তাকালে মনে হয়—সেটা ব্যবহৃত হয়েছে। শয্যার চাদরটা কুঁচকে রয়েছে।

মধ্যবর্তী দরজার কবাট দুটো এদিক থেকে বন্ধ—শিকল তোলা ছিল। পাশের ঘরে গিয়ে দরজার শিকল খুলে ঢুকলাম আমরা। সে ঘরের ব্যবস্থাও ঠিক পাশের ঘরের অনুরূপ।

কেবল শয্যাটি সুজনি দিয়ে ঢাকা, এবং সেই শয্যার উপরে একটা রবারের বালিশ, একটা ৭৭৭ সিগারেটের কৌটো, একটা কাঁচের অ্যাসট্রে—অ্যাসট্রে ভর্তি সিগারেটের টুকরো ও ছাই। আর একজোড়া তাস।

সে-ঘর থেকে বেরুবার দরজাটা বন্ধই ছিল। দরজাটা খোলবার চেষ্টা করে খুলতে না পেরে কিরীটী রেণুকা বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে আবার প্রশ্ন করে, দরজাটা বুঝি বাইরে থেকে বন্ধ?

হ্যাঁ। বাইরে থেকে তালা দেওয়া। মিঃ সরকারই বলেছিলেন তালা দিয়ে দিতে। এ দরজাটা তো তিনি ব্যবহার করতেন না।

সে তালার চাবি? কিরীটী প্রশ্ন করে।

একটা মিঃ সরকারের কাছে ছিল। একটা আমাদের হোটেলের কী বোর্ডে আছে। আনব? রেণুকা বিশ্বাস কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

না, থাক এখন।

কিরীটী এদিক ওদিক তার স্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ খাটের দিকে এগিয়ে যায়।

তাসের প্যাকেটের পাশেই একটা সাধারণ একসারসাইজ খাতা ও একটা বল-পয়েন্ট দামী বিলিতি পেনসিল চোখে পড়ে। কিরীটী হাত বাড়িয়ে খাতাটা তুলে নিল। খাতার অনেকগুলো পাতায় নানা ধরনের হিসাব লেখা। হিসাবের অঙ্ক কষা। নানা অঙ্কের ফিগার- –সবই ইংরাজীতে।

আনমনে খাতার পাতাগুলো ওলটাতে ওলটাতে হঠাৎ এক জায়গায় যেন মনে হল কিরীটীর চোখের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। দু'চোখে অনুসন্ধিৎসার আলো।

কৌতূহলে এগিয়ে গেলাম ওর পাশে। কিন্তু তার আগেই খাতাটা মুড়ে কিরীটী জামার পকেটে রেখে দিল। তারপরই রেণুকা বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে মৃদু কণ্ঠে ডাকে, মিসেস বিশ্বাস!

বলুন?

আমাদের—মানে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর সঙ্গে কি কালী সরকারের পূর্বে কোন পরিচয় ছিল? কোন সূত্রে?

হঠাৎ যেন একটু চমকে ওঠে রেণুকা বিশ্বাস কিরীটীর আকস্মিক প্রশ্নে, বলে, পরিচয়।

হ্যাঁ, পরিচয় কি ছিল?

না তো!

কখনও কোনও পরিচয় ছিল না?

না।

এই হোটেলেই তাহলে তার সঙ্গে আপনাদের প্রথম পরিচয়?

হ্যাঁ।

ওঃ! আচ্ছা চলুন।

মধ্যবর্তী দরজা-পথে আবার আমরা প্রথম ঘরে ফিরে এলাম।

হঠাৎ কিরীটী রেণুকা বিশ্বাসের দিকে আবার ঘুরে দাঁড়াল, মিসেস বিশ্বাস!

বলুন?

আপনি প্রথম কখন জানতে পারেন এবং কেমন করে জানতে পারেন দুর্ঘটনার কথাটা?

বোর্ডারদের প্রাতঃকালীন চায়ের ব্যবস্থা করবার জন্য আমাকে খুব ভোরে উঠতে হয়। রাত থাকতেই বলতে গেলে আমি উঠি। কিচেনে চায়ের ব্যবস্থা করছিলাম। হোটেলের নুলিয়া আঁড়িয়া এসে খবরটা আমাকে প্রথম দেয়। আমি সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দেখি।

চিনতে পেরেছিলেন মিঃ সরকারকে?

হ্যাঁ।

তারপর?

হোটেলে ফিরে এসে ব্যাপারটা আমি আমার স্বামীকে জানাই। স্বামী তখনই সমুদ্রতীরে চলে যান।

আর আপনি?

আমি সোজা এ-ঘরে আসি।

কেন?

মনে হল ঘরটা দেখা দরকার, তাই।

এসে কি দেখলেন। ঘরের দরজা খোলা ছিল?

হ্যাঁ। তবে শিকল তোলা ছিল দরজার বাইরে থেকে।

অর্থাৎ তালা দেওয়া ছিল না?

না।

আপনি ঘরে ঢুকেছিলেন?

ঢুকেছিলাম।

কিছু উল্লেখযোগ্য আপনার নজরে পড়েছিল তখন এই ঘরে?

না। তাছাড়া মনের অবস্থা তখন আমার চঞ্চল। তাড়াতাড়ি কোনমতে ঘরে তালাটা লাগিয়ে নীচে চলে যাই।

তালার চাবিটা বুঝি উপরে আসবার সময় সঙ্গেই এনেছিলেন?

য়্যাঁ, কি বললেন?

বলছিলাম, তালার চাবিটা—

হ্যাঁ, সঙ্গেই এনেছিলাম।

হুঁ। আচ্ছা মিসেস বিশ্বাস, কতদিনের জন্য সরকার এই ঘর দুটো আপনার নিয়েছিল? কিরীটীই প্রশ্ন করতে থাকে পূর্ববৎ।

দিন পনেরোর জন্য।

আর একটা কথা, সরকারের কাছে এ ক'দিন ভিজিটার্স কেউ এসেছে জানেন?

কই, না তো!

কেউ আসেনি?

না। অন্ততঃ এলেও আমার নজরে পড়েনি। আমি জানতেও পারিনি। তাছাড়া আসবে কি, লোকজন উনি বড় পছন্দই করতেন না—ঘরকুনো ধরনের লোকটি ছিলেন বলে মনে হয়।

আচ্ছা একজন বেশ সুন্দর ফর্সামত লোক—কটা চুল, কটা চোখ, ঝলঝলে স্যুট পরনে—এমন একটা লোককে সরকারের কাছে আসতে দেখেছেন কি?

না। তাছাড়া মিঃ সরকার তো প্র্যাক্টিক্যালি তাঁর ঘর থেকে বেরুতেন না, একমাত্র ঘণ্টা-দেড়েক-দুয়েকের জন্য সন্ধ্যার মুখে ছাড়া—

এই ঘরেই বুঝি সব সময় থাকতেন?

হ্যাঁ। ঘণ্টায় ঘণ্টায় চা আর টিন টিন সিগারেট—এমন কি ডাইনিং হলেও এই কদিনে একবারও যাননি—খাবার এই ঘরেই পাঠিয়ে দিতাম আমরা।

আচ্ছা, আপনার স্বামীকে একবার উপরে পাঠিয়ে দেবেন গিয়ে?

দিচ্ছি।

মিসেস বিশ্বাস ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

কিরীটী ঘরের চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতে থাকে এবং তাকাতে তাকাতে হঠাৎ ইজিচেয়ারটার সামনে গিয়ে ঝুঁকে হাত বাড়িয়ে তার আঙুলের সাহায্যে কি যেন তোয়ালের উপর থেকে খুঁটে তুলে নিল।

কি রে? শুধালাম।

একটা চুল।

চুল!

হ্যাঁ। দেখতে বেশ লম্বা কোঁকড়া। কোন পুরুষের নয়—নারীর মাথার কেশ—

নারীর—

আমার মুখের কথা শেষ হয় না, খোলা দরজা-পথে এক সুবেশা নারী ঘরের মধ্যে এসে ঢোকে কথা বলতে বলতে এবং পশ্চাতে হরডন বিশ্বাস।

কি বলছেন ম্যানেজার আপনি পাগলের মত! কালী সরকার মারা গিয়েছে—অথচ কালও বিকেলের দিকে ট্রেনে চাপবার আগে তার সঙ্গে ফোনে কলকাতা থেকে এই হোটেলে কথা—

আগন্তুক ভদ্রমহিলার বোধ হয় এতক্ষণে আমাদের প্রতি নজর পড়ে। থেমে যায় সে। ভ্রূ কুঞ্চিত করে আমাদের দিকে তাকায় চশমার কাচের ভিতর দিয়ে। সরু ফ্রেমের সোনার চশমা চোখে।

আগন্তুক মহিলার বয়স চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশের নীচে কোনমতেই নয়। চেহারাটা সুশ্রী এবং সযত্ন-প্রসাধনও চোখে স্পষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও বয়সকে লুকোতে পারেনি মহিলা। কপালে বয়সের ছাপ পড়েছে। চোখে লাগে।

কিন্তু আশ্চর্য, চুল একেবারে মাথার কালো কুচকুচে—একটু যেন অস্বাভাবিক রকমেরই কালো! পরনে দামী শাড়ি, ক্রেপ সিল্কের ব্লাউজ। হাতে সাদা ব্যাগ।

মিঃ মহান্তি—হরডন বিশ্বাসই বলে, ইনি লতিকা গুই—কালী সরকারের কাছে এসেছেন। বলছেন উনি নাকি তাঁর বিশেষ পরিচিতা!

কিন্তু এঁরা কারা? লতিকা গুই-ই প্রশ্ন করল।

থানা অফিসার মিঃ মহান্তি—আর উনি মিঃ কিরীটী রায়।

তাহলে ব্যাপারটা সত্যি? যেন স্বগতোক্তির মতই বলে অতঃপর লতিকা গুই।

হ্যাঁ। জবাব দিল মহান্তি, কিন্তু আপনি কোথা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে।

আজই?

হ্যাঁ—আজই!

কলকাতার ট্রেন কি আজ লেট?

না, ঠিক টাইমেই এসেছে।

তবে আপনার আসতে—

আমি অন্য হোটেলে উঠেছি। কথা ছিল কাল আমাকে স্টেশনে রিসিভ করে আনতে যাবে। কিন্তু সেখানে তাকে না দেখে সোজা হোটেলে যাই। সেখান থেকে এই আসছি।

আপনার সঙ্গে মিঃ সরকারের অনেক দিনের পরিচয় বুঝি?

হ্যাঁ—বলতে পারেন অনেক বছর।

দীর্ঘদিনের পরিচয় তাহলে আপনাদের?

নিশ্চয়ই।

কালী সরকারের বাড়িতে কে কে আছেন জানেন—কিছু বলতে পারেন?

কে আর থাকবে—ব্যাচিলার!

বিয়ে করেননি?

না—তবে ওর বড় ভাইয়ের এক ছেলে সাধন সরকার ওর কাছে থাকে হাজরা রোডের বাড়িতে—

তারপরই একটু থেমে লতিকা গুই বলে, কিন্তু ব্যাপারটা যে এখনও আমার রীতিমত অবিশ্বাস্য—absurd বলেই মনে হচ্ছে মিঃ রায়!

কথাটা লতিকা গুঁই কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়েই শেষ করল।

আচ্ছা মিস্ গুঁই, আপনাকে যদি কয়েকটা প্রশ্ন করি?

কিরীটীর প্রশ্নে লতিকা গুঁই মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, নিশ্চয়ই, করুন না। কি জানতে চান বলুন? আমি জানলে এ ব্যাপারে আপনাকে যথাসাধ্য সাহায্য করতে প্রস্তুত।

আপনি তো বলছিলেন আপনাদের—মানে আপনার সঙ্গে মিঃ সরকারের অনেক দিন থেকেই আলাপ—

হ্যাঁ।

কতদিনের আলাপ?

তা বছর দশ-পনেরো তো হবেই।

মিঃ সরকার কেন আজ পর্যন্ত বিয়ে করেননি কিছু বলতে পারেন?

না।

কোন ভালবাসার ব্যাপার?

মনে তো হয় না।

কেন? তিনি কি ভালবাসতে জানতেন না?

তা জানবে না কেন—তবে সে ভালবাসাটা তার ছিল একমাত্র অঙ্কশাস্ত্রের প্রতি।

আচ্ছা পুরীতে এর আগে কখনো তিনি এসেছেন বলে আপনি কিছু জানেন?

জানি না।

।। ছয় ।।

কিরীটী আবার জিজ্ঞাসা করে, আপনি বলছিলেন না, আপনার সঙ্গে গতকাল বিকেলে কালী সরকারের ফোনে কথাবার্তা হয়েছিল?

হ্যাঁ, বললাম তো—

তাঁর সঙ্গে আপনার কি কথা হয়েছিল লতিকা দেবী?

সঙ্গে সঙ্গে লতিকা গুঁইয়ের ভ্রূ দুটো কুঁচকে ওঠে, সে বলে, কেন বলুন তো? আপনার তা দিয়ে কি দরকার?

প্রয়োজন আছে বলেই উনি কথাটা জিজ্ঞাসা করছেন মিসেস গুঁই! জবাব দিল এবারে মহান্তিই।

কোন দরকারই থাকতে পারে না ওঁর সেকথায়। তাছাড়া সে আমাদের নিজস্ব প্রাইভেট কথা। সে-সব ওঁকে বলতে যাবই বা কেন, আর উনিই বা কোন্ যুক্তিতে শুনতে চান? কণ্ঠস্বরে এবং বলবার ভঙ্গিতে লতিকা গুঁইয়ের রীতিমত বিরক্তি।

বেশ বলবেন না। কিন্তু আপনি পুরীতে এসেছেন কেন জানতে পারি কি? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

আপনারা কি জন্যে এসেছেন এখানে? সবাই কি জন্যে আসে পুরীতে? আমিও সেইজন্যই এসেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারি কি, এসব প্রশ্ন আমাকে করছেন কেন আপনারা?

জবাব দিলেন এবারে মহান্তিই, প্রশ্নগুলো করার কারণ হচ্ছে কালী সরকারকে কেউ হত্যা করেছে। হি হ্যাজ বিন ব্রুটালি মার্ডারড্।

কী—কী বললেন! তাঁকে ব্রুটালি হত্যা করা হয়েছে!

হ্যাঁ, মিস গুই। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়নি বা তিনি আত্মহত্যাও করেননি—হি হ্যাজ বিন মার্ডারড়। মহান্তি আবার বলে আস্তে আস্তে, পরিষ্কার ভাবে।

কিন্তু হোয়াই—কেন তাকে হত্যা করবে কেউ—কেন?

তা জানি না—তবে যা ফ্যাক্টস্ তাই বললাম। মহান্তি আবার বলে, কিন্তু আপনি মিঃ সরকারের সঙ্গে যখন এত পরিচিত, তখন এখানে এসে এই হোটেলে না উঠে অন্য হোটেলে উঠতে গেলেন কেন?

লতিকা মহান্তির ওই প্রশ্নে একবার অদূরে দণ্ডায়মান হরডন বিশ্বাসের দিকে তাকাল, তারপর বললে, এই হোটেলটা আমার একটুও পছন্দ হয় না।

কেন? হোটেলটা নতুন হলেও বেশ সুনাম হয়েছে ইতিমধ্যে!

হোক, বাট আই হেট দ্যাট উওম্যান। আমি ঐ স্ত্রীলোকটিকে ঘৃণা করি।

কোন্ স্ত্রীলোকটি? কার কথা বলছেন? কাকে ঘৃণা করেন আপনি? কিরীটীই এবারে প্রশ্ন করে।

দ্যাট রেণুকা বিশ্বাস! এই হারাধন বিশ্বাসের স্ত্রীকে।

কেন ভদ্রমহিলা তো—.

থামুন। ভদ্রমহিলা! সি ইজ এ ভাইপার।

আপনি তাহলে মিসেস বিশ্বাসকে চেনেন লতিকা দেবী?

চিনি না আবার—হাড়ে হাড়ে চিনি!

কতদিনের জানাশোনা আপনাদের?

তা দিয়ে আপনার প্রয়োজনটা কি শুনি? আমি চললাম। বলেই অতর্কিতে লতিকা গুই যেন সমস্ত কিছুর উপরে যবনিকাপাত ঘটিয়ে দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

আমরা সবাই ঘরের মধ্যে স্তম্ভিত হতভম্ব।

কিরীটীই প্রথমে কথা বলে, মিঃ মহান্তি, আপনি চট্ করে নীচে যান, সঙ্গে যে প্লেন ড্রেস কনস্টেবল আছে তাঁকে বলে আসুন—টু কিপ অ্যান আই—ওঁর উপরে যেন দৃষ্টি রাখে!

মিঃ মহান্তি তাড়াতাড়ি নীচে চলে গেল।

কিরীটী এবারে হরডন বিশ্বাসের দিকে তাকিয়ে বলে, আপনারা ওঁকে চেনেন মিঃ বিশ্বাস?

হ্যাঁ। মৃদু কণ্ঠে জবাব দেয় হরডন বিশ্বাস।

আপনাদের কতদিনের পরিচয়?

আমার সঙ্গে ঠিক পরিচয় নেই মিঃ রায়, পরিচয় আমার স্ত্রীর সঙ্গে—মানে যে স্কুলে লতিকা টিচারি করে সেই স্কুলেই আমার স্ত্রী রেণুকা একসময় বছরখানেক চাকরি করেছিল। সেই সময় ওদের পরস্পরের পরিচয়।

লতিকা দেবী তাহলে একজন স্কুল-টিচার?

হ্যাঁ।

কোন্ স্কুলের?

জগমোহিনী সরকার গার্লস হাই স্কুল, বৌবাজারে।

স্কুলটার সঙ্গে কি কালী সরকারের কোন সম্পর্ক—

স্কুলটা তো ওঁর মা'র নামেই ছিল, আর কালী সরকার তো সেই স্কুলের সেক্রেটারি।

আই সি! তাহলে দেখছি আপনি ও আপনার স্ত্রী কালী সরকারকে বেশ ভাল ভাবেই

চিনতেন?

হ্যাঁ—মানে—

কিন্তু আপনার স্ত্রী—কিরীটী ওর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, বলছিলেন আপনারা নাকি কালী সরকারকে আদৌ জানতেন না।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয় হরডন বিশ্বাস, ঠিক, ঠিক বলেছে তো রেণুকা—ঠিকই বলেছে—

ঠিকই বলেছেন?

হ্যাঁ—মানে এখানেই তো এবারে পরিচয় আমাদের সঙ্গে ওঁর—

তাই যদি হবে তো তাঁর জীবনের অত কথা জানলেন কি করে আপনি?

বুঝলেন না—ভদ্রলোক খুব মিশুকে ছিলেন তো! দুজনে আমাদের সন্ধ্যার পর খুব গল্প হত। গল্পে-গল্পেই সব বলতেন—বলেছেনও—

মিঃ বিশ্বাস!

বলুন?

আমি যদি বলি আপনি সত্যকে গোপন করবার চেষ্টা করছেন?

না, না—সে কি, তা কেন—তা কেন—

হ্যাঁ, আপনি বলছেন আপনি ও মিঃ সরকার প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় গল্প করতেন অথচ আপনার স্ত্রী বলে গেলেন—তিনি কারও সঙ্গে বড় একটা মিশতেনই না। তাছাড়া মাত্র কদিন তো এসেছিলেন তিনি, এর মধ্যেই এত ঘনিষ্ঠতা আপনাদের হওয়াটাও কি একটু অস্বাভাবিক নয় যে তাঁর জীবনের গোপন কথা পর্যন্ত আপনাকে বলে ফেলবেন!

না, মানে—

থাক, বুঝতে পেরেছি। আপনাকে আর কিছু বলতে হবে না। কিরীটী বাধা দেয়।

হরডন বিশ্বাস যেন একটু বিব্রত হয়েই অতঃপর চুপ করে থাকে।

কিরীটী একটু থেমে আবার প্রশ্ন শুরু করে পূর্বের মত হরডন বিশ্বাসকে, আচ্ছা মিঃ বিশ্বাস, আপনি যে বললেন আপনার স্ত্রী জগমোহিনী স্কুলের টিচার ছিলেন, সেটা কবে—কতদিন আগে?

আমাদের বিয়ের আগে।

বিয়ের আগে—মানে কতদিন আপনাদের বিয়ে হয়েছে?

বছর তিনেকের কিছু বেশী, মাস দু-তিন হবে।

মাত্র!

হ্যাঁ।

I see—যাকগে সে-কথা। আপনাকে আমি ডেকে ছিলাম একটা কথা জানতে মিঃ বিশ্বাস—

বলুন?

আচ্ছা একজন বেশ সুন্দরমত লোক—ফর্সা রঙ, কটা চুল, কটা চোখ, ঝলঝলে একটা স্যুট পরনে—কোন সময়ে কালী সরকারের কাছে আসতে দেখেছেন কি?

না।

মনে করে দেখুন!

না। কালী সরকার কারও সঙ্গে দেখা করতেন না। বেরুতেন না, সন্ধ্যায় ঘণ্টা দেড়েক-

দুয়েকের জন্য ছাড়া।

বেশ, কালী সরকারের কাছে না হোক আপনার হোটেলে বর্তমানে যে রকম description একটু আগে দিলাম সেরকম কোন বোর্ডার আছেন বা কেউ—

না, না—কই, সেরকম তো বোর্ডার নেই বর্তমানে আমার হোটেলে—

এবারে একটু যেন সংযত হয়েই কথাগুলো ধীরে ধীরে থেমে উচ্চারণ করে হরডন বিশ্বাস।

আপনি ঐ ধরনের দেখতে কোন লোককে—হোটেলে না হোক পুরী শহরে তো বাজার-হাট, এদিক-ওদিক যাতায়াত করেন—আপনার চোখে পড়েছে? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

কই না! মাথা নাড়ে হরডন বিশ্বাস।

হুঁ। আচ্ছা এবারে আপনি তাহলে যেতে পারেন।

যাব?

হ্যাঁ, যান।

হরডন বিশ্বাস চলে যাবার জন্য দরজা-পথে ঘরের বাইরে গিয়েও সঙ্গে সঙ্গে আবার ফিরে আসে। মনে হল সে যেন কি বলতে চায়।

কি হল? কিছু বলবেন? কিরীটীই পুনরায় প্রশ্ন করে।

না—মানে বলছিলাম কি—

বলুন—থামলেন কেন?

আপনাদের এভাবে হোটেলে আসায়, মনে হচ্ছিল যখন এ ঘরে আসি, হোটেলের অন্যান্য বোর্ডারদের মনে হয় কিছুটা সন্দেহ—ভয় দেখা দিয়েছে—

তা একটু তো হবেই, মিঃ বিশ্বাস। তবে পুলিসের দিক থেকে বেশী হৈ-চৈ করা হবে না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। কিরীটী আশ্বাস দেয়।

কিন্তু কি বিশ্রী ব্যাপার হল বলুন তো। মাত্র হোটেল এক বছর হল—এত খরচাপত্র করে করলাম—

ভাল কথা মিঃ বিশ্বাস, এই হোটেল খোলবার আগে আপনি কি কাজ করতেন?

ব্যবসা করতাম।

কিসের ব্যবসা?

ফুলের!

ফুলের ব্যবসা?

হ্যাঁ, একটা ফুলের স্টল ও নার্সারী ছিল আমার।

কোথায়?

স্টলটা ছিল নিউ মার্কেটে—নার্সারী বেহালায়।

সে ব্যবসা কতদিন করেছেন?

তা ধরুন বছর পাঁচেক হবেই। সে ব্যবসা করেছিলাম—আসলে ব্যবসাটা ছিল আমাকে যে পাদ্রী মানুষ করেন তাঁরই। তাঁর মৃত্যুর সময় ব্যবসাটা তিনি আমাকেই দিয়ে যান।

ব্যবসাটা লাভের ছিল নিশ্চয়ই?

তা ছিল।

তা সে লাভবান ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে হঠাৎ এই পুরী শহরে এসে হোটেল খুললেন কেন? ইতিমধ্যে মহান্তি ঘরে ফিরে এসেছিল, প্রশ্নটা সেই-ই করল।

আমার স্ত্রীর অনেকদিন থেকে একটা হোটেল খোলবার ইচ্ছা ছিল তাই। স্কুলের চাকরি

ছেড়ে দিয়ে কিছুদিন গোপালপুর-অন-সীতে একটা ইউরোপিয়ান হোটেলে সুপারভাইজারের কাজ করেছিল। তাই ধারণা হয়, ভাল কোন জায়গায় সমুদ্রের ধারে বা পাহাড়ে ভাল করে একটা হোটেল খুলতে পারলে প্রচুর আয় হতে পারে।

তাই এই হোটেল?

হ্যাঁ। সেই ব্যবসা বিক্রি করে দিয়ে এই হোটেল করেছি আমরা।

হোটেলের এই বাড়ী আপনাদের?

হ্যাঁ। একটা ছোট বাড়ি ছিল—বাড়ি সমেত জায়গাটা কিনে নিয়ে এক্সটেনশন করিয়ে নিয়েছি।

বেশ খরচা পড়েছে নিশ্চয়ই?

তা পড়েছে। কিন্তু ওসব খবর আমি ঠিক বলতে পারব না মিঃ মহান্তি। আমার স্ত্রীই সব কিছু করেছে—সেই-ই সব জানে—বলতে পারবে।

।। সাত ।।

অতঃপর তখনকার মত আমরা বের হয়ে এলাম সী-সাইড হোটেল থেকে। মহান্তির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে হোটেলে ফিরে স্নান-খাওয়া সারতে সারতে বেলা প্রায় দেড়টা হয়ে গেল।

আহারাদির পর গোবিন্দলালবাবুর একটা শারদীয়া 'রহস্য পত্রিকা' নিয়ে শয্যায় গিয়ে গা এলিয়ে দিলাম।

পুরী ভিউ হোটেলের একটা বিশেষত্ব হচ্ছে, একেবারে যেন পা বাড়ালেই সমুদ্র। মুহূর্তে মনটা ভরে ওঠে চোখ মেললেই। সামনের দিকে জানালাটা খুলে দিলাম। দুপুরের রৌদ্রে মরকতমণির মত জ্বলছে যেন সমুদ্র।

কী গাঢ় নীল! নীল সমুদ্রের প্রান্তে যেন নীল আকাশ অবগাহন করছে। সেই নীলের বুকে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের ভাঙা আর গড়া। শীর্ষে শীর্ষে তার শ্বেতশুভ্র যুঁইয়ের মত ফেনার মুঠো মুঠো অঞ্জলি। আর একটানা শব্দ—গোঁ-গোঁ-গোঁ। বইটা আর পড়া হল না—বুকের উপর পড়ে রইল। সামনে চোখ মেলে অলস শয্যায় পড়ে রইলাম।

সঙ্গে সঙ্গে মনের পাতায় ভেসে ওঠে কালীপ্রসাদ সরকারের প্রাণহীন দেহটা। মানুষটা কালও বেঁচে ছিল—আজ আর নেই। সমস্ত কিছুর উপরে অকস্মাৎ যেন একটা পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছে মৃত্যু।

সত্যিই কি লোকটার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে? তাকে নিষ্ঠুরভাবে কোন কিছুর সাহায্যে শ্বাসরোধ করে পৈশাচিক ভাবে হত্যা করা হয়েছে?

কিরীটীর ধারণা যখন তাই—নিঃসন্দেহে তাই ঘটেছে।

কিন্তু কেন? কে মারল—হত্যা করল অমন নিষ্ঠুরভাবে শ্বাসরোধ করে মানুষটাকে? বিয়ে-থা করেনি—ব্যাচিলার—নির্ঝঞ্ঝাট মানুষটা—পৃথিবীতে কেউই কি অজাতশত্রুর নয়? শত্রু সবারই আছে? কিংবা কোন পরশ্রীকাতর লোক হিংসার বশবর্তী হয়ে তাকে হত্যা করেছে? কিংবা শত্রুতাও নয়, হিংসাও নয়, কুটিল কোন স্বার্থের জন্য অমন নৃশংস কাজ করেছে কেউ?

কিন্তু কে? কে করল?

হরডন বিশ্বাস—তার স্ত্রী রেণুকা বিশ্বাস—রামানুজ—তস্য শ্যালক—কিংবা ঐ স্কুল-মিস্ট্রেস শ্রীমতী লতিকা গুই। আপাততঃ তো চোখের সামনে এই পাঁচজনকেই দেখা যাচ্ছে। তিনটি পুরুষ ও দুটি নারী।

যে কেউই কালী সরকারকে হত্যা করতে পারে। হঠাৎ মনে পড়ল আর একজন ক্ষণিক দেখা দিয়ে যে নেপথ্যচারী হয়েছে, সেই কশ্চিৎ মুক্তাব্যবসায়ী কালী সরকারের বিশেষ পরিচিত দোলগোবিন্দ শিকদার।

তাহলে হল চারটি পুরুষ—দুটি নারী। এই ছ'জনের মধ্যেই কি একজন হত্যাকারী ? কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কখন একসময় দু-চোখ ভরে তন্দ্রা এসেছিল, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম—ঘুম ভাঙল প্রায় তিনটে নাগাদ—ভৃত্যের ডাকে।

সে চা এনেছে।

কিরীটী ঘরে নেই। চেয়ে দেখি দরজা-পথে বারান্দায় ইজিচেয়ারটায় গা ঢেলে দিয়ে দূর সাগরের দিকে চেয়ে আছে। সত্যি, সামনের ঐ সাগর এমনি একটি বিস্ময়, এমনি অখণ্ড আনন্দ যে তার যেন শেষ নেই—কোন একঘেয়েমির ক্লান্তি নেই।

বাইরে এসে বসলাম কিরীটীর পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে।

অপরাহ্ণের রৌদ্রালোকে ঝলমল করছে যেন নীল সমুদ্রের। অবিশ্রাম ঢেউ একটার পর একটা আসছে, যাচ্ছে—ভাঙছে, গড়ছে, ভাঙছে।

অবিশ্রাম একটানা গর্জন।

কিরীটীই প্রথমে কথা বলে, একটা কথা ভাবছিলাম সুব্রত—

কি?

কালী সরকারের সঙ্গে লতিকার একটা ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল ঠিকই—সেই সঙ্গে বোধ হয় রেণুকারও ছিল।

কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম। কিরীটী দূর সাগরের দিকেই চেয়ে আছে। বললাম, লতিকা গুইকে তোর কি রকম মনে হয়?

ওখানে একটা জট পাকানো আছে বলেই আমার মনে হয় সুব্রত।

কেন, লতিকার সঙ্গে রেণুকার একটা রেষারেষির ভাব আছে এবং ওদের মাঝখানে কালী সরকার ছিল বলে কি?

ঠিক তাই। দুটি নারী এবং দুটি নারীই বিশেষ আকর্ষণীয়া। যৌবনবতী বল বা না বল, ব্যাচিলার একজন পুরুষের কাছে আকর্ষণীয়া।

তার মানে তুই বলতে চাস—

কিরীটী বাধা দিয়ে বলে, হ্যাঁ, বলতে চাই একা রামে রক্ষা নাই তায় সুগ্রীব দোসর! একা রেণুকা বিশ্বাসেই রক্ষা নেই, তায় আবার সঙ্গে এসে ভিড়েছে ঐ লতিকা দিদিমণিটি। তারপর একটু থেমে বলে, বুঝলি পুরুষের পক্ষে ব্যাচিলার থাকাটা এমন কিছু নিন্দনীয় নয়, কিন্তু বিশেষ একটা বয়েসে সে পুরুষ বাঘের মত হয়ে ওঠে যদি তার সামনে পড়ে লতিকা বা রেণুকার মত পুরুষ-লোভী নারী—

তাই বুঝি?

তাই। আর তাইতেই তো এখনও বলি তোকে, তোর সেই বয়েস এসে যাচ্ছে এবারে—

অতএব?

অতএব আর নয়—

বলছিস!

হ্যাঁ সর্বান্তঃকরণে কায়মনোবাক্যে—

তাহলে চল্ না হয় কলকাতায় গিয়ে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলি!

ফুল-চন্দন পড়ুক তোর মুখে, আজই কৃষ্ণাকে জানাব। কিরীটী বলে ওঠে।

তা জানাস, কিন্তু পাত্রী একটা চাই তো?

পাত্রী। পাত্রীর তোর অভাব আছে নাকি?

তোর মতলবখানা কী বল্ তো? আর ইউ থিঙ্কিং অফ দ্যাট লতিকা গুই!

তোর বন্ধু, কুন্তলা দেবী তো আজও বাসর-সজ্জা রচনা করে আশার প্রদীপটি জ্বালিয়ে—

আঃ কিরীটী!

কি হল?

মৃদুকণ্ঠে বলি, কিছু না।

কিছুই যদি না তো গলার স্বরটি অমন কেন বন্ধু? কেমন ভেজা—

ঠিক আছে, তুই বকবক কর্ আমি চললাম।

উঠে পড়লাম আমি। সোজা সমুদ্রতীরে নেমে গেলাম।

ভিজে বালুর বুকে অশান্ত ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে, তারপর আবার চলে যাচ্ছে।

কেমন করে কিরীটীকে বোঝাই, কুন্তলা আমার স্বপ্নের মধ্যে ধ্যানের মত রয়েছে। সে আমার সমস্ত জীবনসত্তার সঙ্গে জড়িয়ে আছে বলেই তো ভয় করে তাকে স্পর্শ করতে।

সে তো স্পর্শের নয়, সে যে ধ্যানের। সে আমার জীবনের একটি রঙ, একটি সুর, একটি সঙ্গীত। জীবনের দেওয়া-নেওয়া, প্রতিদিনের তুচ্ছতার মধ্যে মলিনতা ও অভিযোগের মধ্যে তাকে কি জড়াতে পারি!

জীবনে ঘর বাঁধবার মধ্যেই কি সব? সেখানে তো জীবন প্রতি মুহূর্তে সংকীর্ণ হয়ে যায়! না না, তার চাইতে এই তো ভাল। কুন্তলা আমার নাগালের মধ্যেই রইল। যখন ইচ্ছা পাব জানি, তাই তাকে তুচ্ছ পাওয়ার মধ্যে জড়ালাম না। সে থাক অধরা হয়ে—অপ্রাপণীয়া হয়ে।

মধ্যে মধ্যে এসে অশান্ত ঢেউগুলো ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পায়ের পাতা। আসছে যাচ্ছে ঢেউ নিরবধি, বিরাম নেই।

আবার মনে পড়ে কালী সরকারের কথা। মনের মধ্যে ভেসে ওঠে তার মৃত মুখখানা, আর তার পাশে পাশে ভেসে ওঠে আরও কয়টি মুখ।

হরডন বিশ্বাস, রামানুজ, দোলগোবিন্দ সিকদার, রেণুকা বিশ্বাস ও লতিকা গুই।

কে—এদের মধ্যে কে?

ঐ নেপথ্যচারী মুক্তা-ব্যবসায়ীই কি?

আশ্চর্য, কী বিচিত্র মানুষের হত্যালিপ্সা!

এই দিগন্তবিস্তৃত সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়েও মানুষের মনের মধ্যে দুঃস্বপ্ন নখর বিস্তার করে। গোপন লিপ্সা ক্রূর হিংসার হলাহলে ফেনিয়ে ওঠে।

কেন—কেন এমন হয়! দুদিনের জীবন—কেন মানুষ তাকে সুন্দর করে তোলে না। সমস্ত

অভাব-অভিযোগ মলিনতা ও কুশ্রীতার ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে পারে না!

গতকাল সন্ধ্যায় এই বালুবেলার উপর বসে বসেই আমাদের কথা হচ্ছিল। সেই কথাগুলোই হঠাৎ মনে হয়। কালী সরকারকে দেখে কী মন্তব্য আমি করেছিলাম, সেই মন্তব্যের কথাটা মনে হয়। যাকে দেখে আমার মনে হয়েছিল কোল্ড ব্লাডে মার্ডার করতে পারে সেই লোকটাই কিনা শেষ পর্যন্ত নিহত হল অন্যের হাতে। এবং একটা রাতও তারপর পোয়াল না, নিষ্ঠুর মর্মান্তিক ভাবে নিহত হল!

কথাটা আনমনেই ভাবতে ভাবতে সমুদ্রতীর ধরে ভিজে নরম বালুর উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চলেছিলাম।

হোটেল ছেড়ে অনেক দূর চলে গিয়েছিলাম পশ্চিমের দিকে। এসময়ে সমুদ্রতীর একেবারে নির্জন। কদাচিৎ কখনও একটা-আধটা মানুষ চোখে পড়ে। স্বর্গদ্বারের পরেই ক্রমশঃ সমুদ্রতীরে বাড়িগুলো কমে আসে।

একটা দুটো বাড়ি অনেক দূরে দূরে এতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল,, তাও আর চোখে পড়ছে না। বোধ হয় এদিকটায় তেমন লোকালয় নেই। সী-কোষ্ট ধরে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যাওয়া যায়! হয়ত মাদ্রাজ পৌঁছনো যায়। হেঁটে গেলে কেমন হয়!

সমুদ্র তো আমার পাশেপাশেই রয়েছে। অপরাহ্ণের আলোয় যেন নীল মরকতমণির মত জ্বলছে।

হঠাৎ চমকে উঠলাম।

একেবারে জলের ধার ঘেঁষে কে যেন বালুর উপর বসে আছে। বাতাসে তার আঁচল ও মাথার চুল উড়ছে। সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে অপলক বসে আছে এক নারী। কে ঐ নারী!

আরও কিছুটা এগিয়ে যেতেই দ্বিতীয়বার চমকে উঠি : লতিকা গুই!

এখানে এই নির্জন সমুদ্রতীরে লতিকা গুই!

আরও এগোব কি এগোব না ভাবছি।

লতিকা গুইয়ের কিন্তু কোন দিকে নজর নেই। সে যেন নিজ ধ্যানে মগ্ন। আরও একটু এগিয়ে গেলাম। কোন খেয়াল নেই লতিকা গুইয়ের। মধ্যে একআধটা ঢেউ এসে পায়ের কাছে একেবারে পড়ছে। সেদিকেও যেন খেয়াল নেই।

অপরাহ্ণের আলোয় সেই সমুদ্র-তীরবর্তিনী উপবিস্টা নারীকে মনে হল যেন বড় বিষণ্ণ, বড় ক্লান্ত, বড় একা। হঠাৎ যেন চোখে পড়ল, লতিকার দু চোখের কোণ বেয়ে ক্ষীণ অশ্রুর ধারা গড়িয়ে পড়ছে। লতিকা কাঁদছে।

আস্তে আস্তে নিঃশব্দে ফিরে এলাম। আর অগ্রসর হলাম না।

হোটেলে ফিরে দেখি কিরীটী আর এক কাপ চা নিয়ে বসেছে।

আমাকে ফিরতে দেখে বলে, মন শান্ত হল?

আমি কোন কথার জবাব দিই না।

তুই যে কুন্তলার ব্যাপারে এতখানি টাচি সুব্রত, জানতাম না তো। ক্ষমা কর ভাই।

আমি সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বললাম, লতিকা গুইকে দেখলাম।

কোথায়? নিস্পৃহ কণ্ঠে শুধায় কিরীটী।

সমুদ্রের ধারে। বসে বসে মনে হল যেন কাঁদছে।

পুওর গার্ল, কিরীটী বলে, শিক্ষকতা করতে করতেই জীবনটা গেল।

আমাদের কথা শেষ হয় না, দেখি একটা সাইকেল-রিকশা থেকে মহান্তি নামছে হোটেলের সামনে।

মিঃ মহান্তি যে, কি ব্যাপার?

আপনি আমাকে ট্রাঙ্ক কলটার খোঁজ নিতে বলেছিলেন না? সী-সাইড হোটেলে কাল যে ট্রাঙ্ক কল হয়েছে—

হ্যাঁ। খবর পেলেন কিছু?

পেলাম। দুটো ট্রাঙ্ক কল ছিল। একটা কলকাতা থেকে আর একটা রাউরকেল্লা থেকে। কিন্তু—

কি?

দুটো কলেই পি. পি.—পার্টিকুলার পারসন ছিল, কিন্তু তার মধ্যে তো কালী সরকারের নাম নেই!

।। আট ।।

কিরীটী মহান্তির মুখের দিকে তাকিয়ে শুধায়, তবে কার নাম আছে?

একটা কল ছিল এইচ. বিশ্বাসের নামে। আর একটা ছিল কোন্ এক গনেন ব্যানার্জীর নামে। লোকটা নিউজ-পেপার রিপোর্টার। লতিকা গুঁই যে ট্রাঙ্ক কলে কালী সরকারের সঙ্গে গতকাল বিকেলে কথা বলেছে বললে, এখন মনে হচ্ছে সেটা মিথ্যা। তাছাড়া—

থামলেন কেন বলুন? কিরীটী ওর দিকে তাকিয়ে তাগিদ দেয়।

মনে হচ্ছে লতিকা গুঁই যেন কিছু লুকোচ্ছে।

কি লুকোবে?

আমার যেন মনে হচ্ছে সে অনেক কিছুই হয়ত জানে এ ব্যাপারে।

তা যদি সে লুকিয়েই থাকে তো আমরা ঠিকই জানতে পারব মিঃ মহান্তি। ডোণ্ট ওরি। আপনাকে কতকগুলো কথা বলি, মন দিয়ে শুনুন।

বলুন?

এক নম্বর, কিরীটী বলে, ঐ সী-সাইড হোটেলটা তৈরী করতে মোটামুটি কত টাকা আন্দাজ খরচ হয়েছে এবং কত ট্যাক্স হোটেলের বাড়িটার জন্য দিতে হয়—

আর?

শুনুন দু নম্বর, খরচের টাকার অঙ্কটা তো জানতেই হবে, দ্বিতীয়তঃ কি ভাবে কনট্রাক্টারকে সে টাকা payment হয়েছে—by cheque or cash এবং তিন নম্বর—

বলুন?

বেহালার নার্সারী ও নিউ মার্কেটের ফুলের স্টল কত টাকায় বিক্রী হয়েছিল এবং কে কিনেছিল?

আর কিছু?

কিরীটী বলতে থাকে, চার নম্বর—জগমোহিনী স্কুলের চাকরি রেণুকা বিশ্বাস ছেড়ে দিয়েছিল নিজেই, না তাকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যদি ছাড়িয়ে দেওয়া হয়ে থাকে তো কেন? পাঁচ নম্বর—রেণুকা ও হরডনের বিয়ের পরে ও আগে কালী সরকারের সঙ্গে ওদের

দুজনের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা! ছয় নম্বর—কালীর ভাইপো সাধন সরকারকে একটি ইনটিমেশন দিতে হবে—

আর কিছু?

হ্যাঁ, আর একটা কথা, দোলগোবিন্দ সিকদার নামে একটি লোক—লোকটি দেখতে সুন্দর, ফর্সা রঙ, ভাসা-ভাসা বড় বড় চোখ, চোখের তারা কটা এবং মাথার চুলও কটা। ঝলঝলে একটা স্যুট পরনে—আর বাঁ কপালের উপর আধ-ইঞ্চি পরিমাণ একটি জড়ুল আছে। এই লোকটির সন্ধান এই পুরী শহরে করতে পারেন কিনা দেখুন।

কিন্তু—

সম্ভবতঃ লোকটা বিদেশী এবং শুনেছি ব্যবসায়ী। পার্ল-মার্চেন্ট অর্থাৎ মুক্তোর ব্যবসায়ী।

মুক্তো-ব্যবসায়ী!

হ্যাঁ। স্টেশনে একজন পুলিস নিযুক্ত করুন নজর রাখার জন্য।

যদি অলরেডি চলে গিয়ে থাকে পুরী ছেড়ে?

তাহলে আর কি করবেন!

খোঁজ করব কোথায় লোকটার?

আগে হোটেল ও ধর্মশালাগুলোতে করুন, তারপর শহরে করুন।

কিন্তু লোকটা কে?

বললাম তো মুক্তোর ব্যবসায়ী।

তা যেন বুঝলাম, কিন্তু এই মামলার সঙ্গে—

কালী সরকারের সঙ্গে লোকটার পরিচয় ছিল, আর গতকাল সন্ধ্যায় সী-বীচে লোকটাকে কালী সরকারের সঙ্গে আমরা দেখেছি।

তা না হয় খুঁজে দেখব, তবে আমার কিন্তু ধারণা—

কি ধারণা আপনার?

ঐ হোটেলওয়ালী রেণুকা বিশ্বাস স্ত্রীলোকটি আদৌ সুবিধার নয়।

কিন্তু তাতে করে আপনি কি খুব একটা এগুতে পারবেন মিঃ মহান্তি এই হত্যার ব্যাপারে?

মানে?

যদি আমাদের অনুমান সত্যিই হয় যে, তাকে স্ট্র্যাঙ্গেল করে অর্থাৎ গলা টিপে হত্যা করে পরে জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে আত্মহত্যা প্রমাণ করবার জন্য, সেক্ষেত্রে রেণুকা বিশ্বাসের মত একজন স্ত্রীলোকের পক্ষে কি—

অর্থাৎ আপনি বলতে চান সম্ভব কিনা? আপনি ঐ মেয়েমানুষটিকে চেনেন না, আমি কিছু কিছু জানি।

জানেন?

হ্যাঁ। এখানে জমি হোটেল ও লাইসেন্সের ব্যাপারে ওই স্ত্রীলোকটি মধ্যে মধ্যে আমার কাছে যেত। সেই সময় কথায় কথায় ওর অনেক পরিচয়ই আমি জানতে পারি।

কি জেনেছেন বলুন না!

সেদিন আপনাকে ঐ স্ত্রীলোকটি সম্পর্কে সব কথা বলিনি কিন্তু আজ বলছি শুনুন—বিয়ের আগে রেণুকা ছিল দাশ—রেণুকা দাশ নামেই অন্ততঃ পরিচয় ছিল, যদিচ ওর জন্ম মিশ্র রক্তে—

কি রকম?

ওর বাপ ডাঃ আর্থার মূর ছিল সাঁওতাল পরগণার এক মিশনারী হাসপাতালের ডাক্তার। জাতে স্কচ।

কার কাছে শুনলেন একথা?

ও নিজেই বলেছে।

কে, রেণুকা?

হ্যাঁ। কথায় কথায় একদিন ও আমাকে বলেছিল ওর জীবনটা নাকি বড়ই বিচিত্র। ছোটবেলায় ছিল প্রচণ্ড দস্যি মেয়ে। দৌড়, লাফ-ঝাঁপ, কুস্তি, ছোরা খেলা, লাঠি খেলা, বন্দুক ছোঁড়া—

বলেন কি!

হ্যাঁ! সব তার পালক বাপের উৎসাহে। আসলে ঐ মিশনারী ডাক্তারের ঔরসে রেণুকার জন্ম হলেও লোকে জানত ওর আড়াই বছর বয়সের সময় মা মরে যাওয়ায় ঐ মিশনারী ডাক্তারই তাকে অনুগ্রহ করে পালন করেছে। যা হোক যা বলছিলাম, গায়েও বেশ শক্তি ধরত। ডাক্তার বাপ অবিশ্যি ওকে যে কেবল খেলাধূলা, দৌড়ঝাঁপেই উৎসাহ দিয়েছে তাই নয়—লেখাপড়াও কিছু কিছু শিখিয়েছিল। কিন্তু লেখাপড়ায় ওর তেমন মন ছিল না।

তারপর?

পনের কি ষোল বছর বয়স যখন, এক সার্কাস পার্টির সঙ্গে ও পালিয়ে যায়। চার বছর ছিল সেই দলে। নানা ধরনের দৈহিক কসরত দেখাত। তারপর একদিন সার্কাস পার্টির ম্যানেজারকে ছুরি মেরে—

বলেন কি! এ যে রীতিমত এক উপন্যাস! তারপর?

সুব্রতই কথাটা বলে।

হ্যাঁ, সুব্রতবাবু। মহান্তি বলতে থাকে, ম্যানেজার রাত্রে ওর তাঁবুতে এসেছিল। ও ছুরি মেরে পালায় সেখান থেকে। ও ফিরে আসে আবার মিশনারী বাপের কাছে। ক্রমে ম্যাট্রিক ও আই-এ পাস করে। ট্রেনে একদিন কলকাতায় যেতে যেতে টি. টি. হারাধন বিশ্বাসের সঙ্গে ওর আলাপ হয়। আলাপ ক্রমে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। ঐ সময় ঐ মিশনারী ডাক্তার মারা যান এবং হারাধনের প্রচেষ্টাতেই জগমোহন গার্লস স্কুলে ও চাকরি পায়।

তারপর?

'কিন্তু সেখানে ও এক বছরের বেশী চাকরি করতে পারে না।

কেন?

হোস্টেলে থাকত ও—মানে ঐ স্কুলেরই হোস্টেলে। সেখানে কি একটা চুরির ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে এবং নিজে থেকেই ও চাকরি ছেড়ে দেয়।

সুব্রত বলে ওঠে, এ যে সত্যিই এক উপন্যাস দেখছি! মিশ্ররক্তে—জন্ম—একটি মেয়ে—কিছুদিন সার্কাসে—সেখান থেকে ম্যানেজারকে ছুরি মেরে পালালো—তারপর পড়াশুনা ও হোস্টেল—সেখানেও চুরি—theft—

সত্যিই উপন্যাস সুব্রতবাবু, মোহান্তি বলে—কিন্তু ঐ পর্যন্ত এসেই ওর জীবনের কিছুটা অংশ কেমন যেন ধোঁয়াটে—

মানে? কিরীটী প্রশ্ন করে।

ঐখানে বছর দুয়েকের কথা এলোমেলো ভাবে চলেছে। কেবল একটি কথা স্পষ্ট—

কী?

ঐ সময় ও হারাধন বিশ্বাসকে বিয়ে করে। হারাধন তখন তার পালক পিতার মৃত্যুতে বেহালার নার্সারী ও ফুলের স্টলটা পেয়ে সে দুটো নিয়ে মেতে আছে। তারপর ওদের বিয়ের পর কি হল—হঠাৎ ও চলে এল।

কে চলে এল? রেণুকা বিশ্বাস?

হ্যাঁ। চলে এল কলকাতা থেকে গোপালপুর-অন-সীর এক হোটেলে, চাকরি নিয়ে।

তারপর?

তারপর এক বছর পরে এই পুরী শহরে আবির্ভাব ও এই হোটেলের পত্তন—হারাধনের স্টল ও নার্সারী বিক্রি—

একটা কথা মিঃ মহান্তি! কিরীটী প্রশ্ন করে।

বলুন?

আচ্ছা ওর ঐ ভাইটি—

ঐ রামানুজ দাশের কথা বলছেন?

হ্যাঁ। ওর সম্পর্কে কি জানেন?

বিশেষ কিছুই জানি না। ওর সঙ্গে আজকেই তো হেটেলে প্রথম পরিচয় হল বলতে গেলে।

রেণুকা বিশ্বাসের মুখে ওর ভাই সম্পর্কে কিছু শোনেন নি?

না।

কিছু বলেনি সে?

না। তা না-ই বা জানা থাকল, কি জানতে চান ঐ রামানুজ সম্পর্কে বলুন? সব জেনে নেব।

বিশেষ কিছু না, এই হোটেলে ও কতদিন আছে, এর আগে কোথায় ছিল, কি করত!

ও আর এমন কি শক্ত, বলেন তো এখুনি ওকে এখানে ডেকে যা জানবার আমরা জেনে নিতে পারি মিঃ রায়।

না মহান্তি সাহেব, তাড়াহুড়ো নয়, ধীরেসুস্থে জানুন। ও যেন না কোনক্রমে আপনাকে সন্দেহ করতে পারে!

তবে কি মিঃ রায়, ঐ রামানুজকেই আপনি—

সন্দেহের কথা যদি বলেন মহান্তি সাহেব, অত্যন্ত সন্দিগ্ধ মন আমার—হরডন বিশ্বাস, রেণুকা বিশ্বাস, রামানুজ দাশ সকলকেই আমি—এমন কি কালী সরকারের দু'পাশের ঘরে যে বোর্ডার দুজন আছে, রামগতি কানুনগো ও সুধাপ্রিয় মল্লিক তাদেরও—

কিরীটীর কথা শুনে বিস্ময়ে মহান্তি মস্ত বড় এক হাঁ করে।

একেবারে স্তব্ধ, কোন রা নেই। অনেকক্ষণ পরে ঢোঁক গিলে বলে, তবে—

কি তবে?

নিশ্চয়ই। সকলকার উপরেই আপনার নজর রাখতে হবে—যাদের যাদের নাম এইমাত্র আমি করলাম। তারপর একটু থেমে কিরীটী বলে, মিঃ মহান্তি, এই দেখুন সী-সাইড হোটেলের কালী সরকার দুটো ঘর নিয়ে থাকত সেই ঘরের পারিপার্শ্বিকতা নিয়ে মোটামুটি একটা প্ল্যান আমি খাড়া করেছি। বলতে বলতে কিরীটী আমাদের সামনে একটা কাগজ মেলে ধরে।

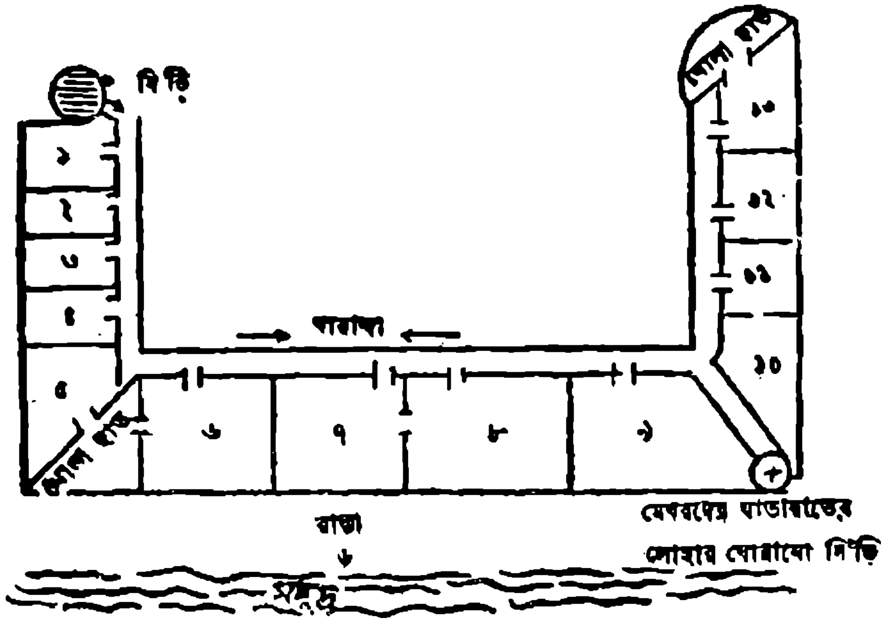

দেখলাম কাগজটায় একটা নকশা আঁকা আছে।

কিরীটী বলে, সাত ও আট নম্বর ঘর নিয়ে ছিল কালী সরকার। ছয় নম্বর ঘরে ছিল রামগতি কানুনগো, নয় নম্বর ঘরে সুধাপ্রিয় মল্লিক আর তের নম্বর ঘরে থাকেন আমাদের রামানুজ দাশ মশাই।

একটু থেমে আবার কিরীটী বলে, রামগতি কানুনগো আর সুধাপ্রিয় মল্লিক—রামানুজের সঙ্গে সঙ্গে ওদেরও সম্পর্কে যতটা জানা যায় জানতে চেষ্টা করুন এবং এই যাদের নাম করলুম ইনক্লুডিং আমাদের লতিকা গুই—আপাততঃ এই কয়জনের প্রত্যেকের উপর নজর রাখবেন এবং ওঁদের জানিয়ে দেবেন বিনানুমতিতে কেউ ওঁরা শহর ছেড়ে বাইরে যেতে পারবেন না।

বেশ, তাই হবে।

অতঃপর মহান্তি বিদায় নিল।

কিরীটী আর এক দফা চায়ের অর্ডার দিল।

চা-পানের পর বললে, চল, সমুদ্রের ধারে গিয়ে খানিকটা ঘোরা যাক। কালী সরকার সকাল থেকে স্কন্ধারূঢ় হয়ে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে। একেই বলে বরাত—বুঝলি সুব্রত! এলাম পুরীর সমুদ্রকে উপভোগ করতে কটা দিন, তা না, পঁচিশ বছর বাদে এক কালী সরকার এসে আবির্ভূত!

কেন, তুই তো বলিস ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে!

যা বলেছিস। নে চল।

কিছুক্ষণ অনির্দিষ্ট ভাবে ভিজে বালুর উপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে একসময় ক্লান্ত হয়ে আমরা বালুবেলার উপরেই বসে পড়ি।

সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। সমুদ্রতীর ঘেঁষে হোটেলগুলোতে সব আলো জ্বলে উঠেছে। রাস্তার আলো কিন্তু জ্বলেনি!

অন্ধকার সমুদ্রতীরে বহু লোক—আবছায়া ঘোরাফেরা করছে।

কিরীটী একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে বলে, লোকটা শুধু ম্যাথমেটিকসই জানত না, অঙ্কশাস্ত্রের মত টাকা-পয়সার হিসেবটাও বুঝত।

হঠাৎ কার কথা বলছিস?

কালী সরকার, আবার কে? তাছাড়া আরও একটা ব্যাপার কালী সরকার সম্পর্কে জানতে পেরেছি—

কি?

লোকটা স্টেকে ব্রীজ খেলত।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। চারজন কালী সরকারের ঘরে বসে খেলত।

কে কে?

মনে হচ্ছে কালী সরকার, হরডন বিশ্বাস ও শ্রীমতী বিশ্বাস তিনজন। বাকি চতুর্থজন যে কে বুঝতে পারছি না।!

রামানুজ নয় তো?

না।

তবে হয়ত হোটেলের বর্তমান বোর্ডারদের মধ্যেই কেউ!

তাই হবে। বলতে বলতে কিরীটী যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। অন্ধকারে ওর মুখের দিকে তাকালাম কিন্তু মুখটা ভাল দেখা গেল না। বুঝলাম কালী সরকারের মৃত্যু-ব্যাপারে--একমাত্র তাকে কেউ হত্যা করেছে, এ ছাড়া আর বিশেষ এখনও রহস্যের মীমাংসার ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারেনি। অন্ধকারেই এখনও ঘুরছে।

বললাম, হ্যাঁ রে, অঙ্কশাস্ত্রের মত টাকা-পয়সার হিসাবের কথা কি বলছিলি?

হ্যাঁ, একটা লেনদেনের ব্যাপার—

কার সঙ্গে কার?

কালী সরকারের সঙ্গে কারও বলেই মনে হয়!

তোর কি মনে হয়?

আপাততঃ চায়ের পিপাসা পেয়েছে—ওঠ চল্।

অগত্যা উঠতে হল।

।। নয় ।।

পরের দিনই দ্বিপ্রহরে পোস্টমর্টেম রিপোর্ট পাওয়া গেল।

কিরীটীর অনুমান মিথ্যা নয়। শ্বাস-বন্ধ করেই কালী সরকারের মৃত্যু ঘটানো হয়েছে--জলে ডুবে তার মৃত্যু হয়নি।

রিপোর্টটা নিয়ে এসেছিল মহান্তিই।

সে বলে, শেষ পর্যন্ত মনের মধ্যে সত্যিই কিন্তু একটু সন্দেহ ছিল মিঃ রায়। হয়ত স্ট্র্যাঙ্গুলেশান নয়। কিন্তু এখন বুঝতে পেরেছি আপনার অনুমানটা একেবারে নির্ভুল। এবং আরও একটা সংবাদ আছে মিঃ রায়—

কী? কিরীটী মহান্তির মুখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল।

লতিকা গুই নিরুদ্দেশ হয়েছে।

আমি বলি, সে কি! কোথায় গেল জানতে পারলেন না কিছু?

না। আজ সকাল থেকে তার কোন পাত্তা নেই। কাল রাত্রেও এগারটার সময় হোটেলের চাকর তাকে তার ঘরে দেখেছিল। আজ সকালে আর তাকে নাকি দেখা যায়নি। সুটকেস আর বিছানাটা ঘরের মধ্যে আছে এবং ঘরের বাইরে থেকে তালা দেওয়া।

কিরীটী এবারে কথা বলে, রাত এগারটা পর্যন্ত তাহলে সে হোটেলে ছিল?

হ্যাঁ। রাত দশটার সময় নাকি রেণুকা বিশ্বাস তার সঙ্গে দেখা করতে যায় ঐ হোটেলে।

কে কে গিয়েছিল দেখা করতে? কিরীটী উদগ্রীব হয়ে ওঠে।

রেণুকা বিশ্বাস।

হুঁ। তাহলে রেণুকা বিশ্বাস নিশ্চয় জানে লতিকা গুই কোথায়। চলুন, এখনি একবার সী-সাইড হোটেলে যাব।

এখুনি যাবেন?

আরও আগে যাওয়া উচিত ছিল। খবরটা আপনি কখন জানতে পারেন যে লতিকা গুই চলে গিয়েছে?

সকালেই। যে লোকটা হোটেলের সামনে প্রহরায় ছিল তার কাছে।

রাত্রে সেই হোটেলের সামনে কেউ প্রহরায় ছিল না।

ছিল। কিন্তু সে বলছে একমাত্র রেণুকা বিশ্বাস ছাড়া রাত দশটার পর কাউকে হোটেলে যেতে বা আসতে দেখেনি।

হোটেল থেকে বেরুবার অন্য কোন রাস্তা নেই?

আছে। পিছনের দিকে মেথরদের যাতায়াতের রাস্তা।

তাহলে সেই রাস্তা দিয়েই সে সরে পড়েছে।

আপনার কোনো রকম কিছু সন্দেহ হয় মিঃ রায়?

সী-সাইড হোটেলের দিকে যেতে যেতে মহান্তি কিরীটীকে প্রশ্নটা করে। কিরীটী চলতে চলতেই বলে, কি সন্দেহ?

ঐ লতিকা গুই কালী সরকারের হত্যার ব্যাপারে—

সন্দেহের তালিকার মধ্যে লতিকা গুই তো অন্যতমা, কথাটা ভুলে যাচ্ছেন কেন মিঃ মহান্তি?

হরডন বিশ্বাস হোটেলে ছিল না, বাজারে গিয়েছিল।

তবে রেণুকা বিশ্বাস ছিল।

সে তার ঘরের মধ্যে একটা চেয়ারে বসে কাঁটা দিয়ে লেসের মত কি একটা বুনছিল আর তার পাশে বসেছিল ছাব্বিশ-সাতাশ বৎসরের একটি সুশ্রী যুবক।

মহান্তিই দরজার বাইরে থেকে গলার সাড়া দেয়, ভিতরে আসতে পারি?

কে?

আমি মহান্তি।

আসুন।

আমরা ভিতরে ঢুকতেই যুবকটি উঠে দাঁড়ায়।

এই ছেলেটি কে মিসেস বিশ্বাস? মহান্তিই প্রশ্ন করে।

রেণুকা বিশ্বাস বলে, সাধন সরকার। কালী সরকারের ভাইপো। আমাদের টেলিফোন পেয়ে আজই সকালের এক্সপ্রেসে এসেছে। তুমি যাও সাধন, তোমার ঘরে যাও।

কিরীটী তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, সাধনবাবু, হোটেলের বাইরে যাবেন না কিন্তু আপনি, ঘরেই থাকবেন। আপনার সঙ্গে আমাদের কথা আছে। আমরা আপনার ঘরে আসছি একটু পরেই।

সাধন সরকার কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

সাধন সরকার ঘর ছেড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রেণুকা বিশ্বাসও উঠে দাঁড়ায় এবং বলে, তাহলে আপনারা একটু বসুন মহান্তি সাহেব, আপনাদের চায়ের কথাটা বলি—

কিন্তু কিরীটী রেণুকাকে কথাটা শেষ করতে দেয় না, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে ওঠে, মিসেস বিশ্বাস, ব্যস্ত হবেন না। চায়ের আপাততঃ আমাদের কোন প্রয়োজন নেই।

কিরীটীর কণ্ঠস্বরে একটা যেন চমকেই রেণুকা বিশ্বাস কিরীটীর মুখের দিকে তাকাল।

আপনি বরং ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিন। আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে।

কথা? আমার সঙ্গে? রেণুকার গলার স্বরে বিস্ময়।

হ্যাঁ।

বলুন?

আপনি নিশ্চয়ই জানেন, আজ সকাল থেকে লতিকা দেবী নিখোঁজ।

না তো—

জানেন না?

না। তাছাড়া লতিকার সঙ্গে আমার সম্পর্কই বা কি? সে নিখোঁজ হল কি না হল সে খবর রাখতে যাব—

কিন্তু একটা খবর আমরা যে পেয়েছি মিসেস বিশ্বাস—

কি খবর পেয়েছেন?

আপনি নাকি কাল লতিকা দেবীর হোটেলে রাত দশটার পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন?

কি বলছেন আবোল-তাবোল? লতিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছি আমি কাল রাত্রে দশটার পর?

যাননি আপনি?

নিশ্চয়ই না।

কিন্তু আপনাকে আমাদের লোক দেখেছে। মহান্তি বলে এবারে।

মাথা খারাপ। কাকে দেখতে কাকে দেখেছে আপনার লোক।

কিরীটী কথা বলে, আপনি তাহলে যাননি?

নিশ্চয়ই না।

আর ইউ সিয়োর?

নিশ্চয়ই।

কাল রাত্রে তবে ঐ সময় কোথায় ছিলেন?

কেন, এখানে আমার নিজের হোটেলে। রাত আটটা থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বোর্ডারদের খাওয়া-দাওয়ার পাট না চোকা পর্যন্ত আমার কি নিঃশ্বাস ফেলবারও সময় থাকে।

সাড়ে দশটার পর?

হোটেলেই ছিলাম।

হঠাৎ এবারে কিরীটী তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে, একটা কথা আপনার জানা দরকার মিসেস বিশ্বাস, কালী সরকারকে সত্যি সত্যিই শ্বাসরুদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে।

তাই নাকি।

হ্যাঁ, কিন্তু সে কথা যাক। আপনাকে আরো আমার জিজ্ঞাস্য আছে।

বলুন?

কালী সরকারের ঘরে রোজ রাত্রে স্টেকে ব্রীজ খেলা হত— কে কে খেলত জানেন?

কালী সরকার ব্রীজ খেলতেন, কথাটা আপনার কাছেই এই প্রথম শুনছি!

তাই নাকি?

কিরীটী মিসেস রেণুকা বিশ্বাসের দিকে তাকাল। আমি তো তাকিয়েই ছিলাম রেণুকার মুখের দিকে। একান্ত নির্বিকার ভাবলেশশূন্য মুখ। কোন একটা রেখার কুঞ্চন বা কম্প মাত্রও সেখানে যেন নেই। কিরীটী একটু থেমে বলে, তাহলে আপনি বলতে চান মিসেস বিশ্বাস, কালী সরকার ব্রীজ কোনদিনই খেলেনি বা জানত না খেলতে?

তা তো আমি বলিনি মিঃ রায়, আমি বলেছি তাকে হোটেলে কখনও খেলতে দেখিনি।

কি করে বুঝলেন? তাঁকে কি দিবারাত্র সদাসর্বদা পাহারায় রাখতেন নাকি আপনি মিসেস বিশ্বাস যে তিনি হোটেলে তাঁর ঘরে খেলতেন না সে বিষয়ে আপনি এত definite হলেন?

এবারে যেন মিসেস বিশ্বাসকে একটু কেমন বিব্রত বলে মনে হয়। কেমন যেন একটু থমকে গিয়েছেন।

কিরীটী আবার বলে, শুনুন মিসেস বিশ্বাস, সত্যকে গায়ের জোরে কখনও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। জানি না বলে আপনি ভান করতে পারেন, কিন্তু জানবেন সত্য যা একদিন তা প্রকাশ পাবেই। যাক, আপনি তাঁর ব্রিজ খেলা সম্পর্কে জ্ঞাত না হলেও একটা কথা কিন্তু সেদিন সত্য বলেননি—

সত্য বলিনি? কী কথা?

একসময় যে আপনার ঐ কালী সরকারের সঙ্গে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল সেই কথাটা—

কে বললে?

কেন, দুজন বলেছেন!

দুজন?

হ্যাঁ, লতিকা গুই ও আপনার হাজব্যাণ্ড মিঃ হরডন বিশ্বাস।

কিরীটীর মুখ থেকে কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেণুকা বিশ্বাস ওর মুখের দিকে তাকায় এবং কয়েক মুহূর্ত নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বলে, কি জানতে চান আপনি মিঃ রায়, বলুন তো? হোয়াট আর ইউ ড্রাইভিং অ্যাট?

আমার কথাটা তো অস্পষ্ট নয় মিসেস বিশ্বাস। আপনার সঙ্গে একসময় তার যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। এবং ছিল কিনা সেটাই আমি জানতে চাইছি।

দেখুন প্রশ্নটা আপনার অত্যন্ত ব্যক্তিগত হয়ে যাচ্ছে না, মিঃ রায়! মিসেস বিশ্বাসের কণ্ঠস্বরে যেন বেশ বিরক্তির সুর।

নিশ্চয়ই হচ্ছে। কিন্তু এটাও নিশ্চয় ভুলে যাবেন না আপনি মিসেস বিশ্বাস, আমরা একটা মার্ডার কেসের তদন্ত করছি। এবং সেই মার্ডারটা আপনারই এই হোটেলের মধ্যে একটা ঘরে হয়েছে। কিরীটীর কণ্ঠস্বরটাও যেন কঠিন বলে মনে হয়।

কি বলতে চান আপনি? আমার হোটেলে মার্ডার হয়েছে মানে?

আপনার হোটেলেই মার্ডারড হয়েছে কালী সরকার সেরাত্রে। তারপর তাকে হত্যা করে মৃতদেহটা সুইসাইড প্রমাণ করবার জন্য সমুদ্রে নিয়ে গিয়ে ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

না, না। আপনি—

শুনুন মিসেস বিশ্বাস, সেরাত্রে ঠিক যা ঘটেছে তাই বললাম। এবং আপনিও যে সেটা জানেন না তাও নয়।

আমি—

হ্যাঁ, আপনিও সেটা জানেন। শুনুন, যে রাত্রে কালী সরকার মার্ডার হয়, অনুমান রাত একটায় এবং সম্ভবতঃ তাকে নিদ্রার ঘোরে ফাঁস দিয়ে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হয়েছিল—

গলায় ফাঁস দিয়ে?

হ্যাঁ। এবং খুব সম্ভবত তাকে পূর্বেই চায়ের সঙ্গে কোন কড়া ঘুমের ঔষধ পান করানো হয়েছিল, যেটা প্রমাণিত সহজেই হবে হয়ত তার স্টমাক কনটেন্ট-এর কেমিক্যাল অ্যানালিসিসটা হলেই।

এ—এসব আপনি কি বলছেন?

মিসেস বিশ্বাসের কণ্ঠস্বরে এবার যেন কাঁপুনি টের পাওয়া যায়।

যা বলছি জানবেন তার একটি বর্ণও মিথ্যা নয়। নির্মম সত্য। এবারে আপনি বলুন, সে রাত্রে রাত বারোটা থেকে দুটো—এই দু ঘণ্টা আপনি কি করছিলেন?

কেন—রাত বারোটা থেকে দুটো তো আমি ঘুমোচ্ছিলাম।

ঘুমোচ্ছিলেন?

হ্যাঁ।

বেশ। সেরাত্রে শেষ কখন আপনি কালী সরকারের ঘরে যান?

সেরাত্রে আমি আদৌ যাইনি তার ঘরে।

কিন্তু আমি জানি আপনি গিয়েছিলেন।

না।

ইয়েস, গিয়েছিলেন। বলুন, কখন গিয়েছিলেন এবং কতক্ষণ ছিলেন?

আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি আপনার ঐ কথায়, মিঃ রায়! সহসা হরডন বিশ্বাসের কণ্ঠস্বর শোনা গেল!

চমকে আমরা ফিরে তাকালাম দরজার দিকে।

হরডন বিশ্বাস ঠিক দরজার উপর দাঁড়িয়ে। সে যে ইতিমধ্যে কখন ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে আমরা টেরও পাইনি।

আপনি প্রতিবাদ জানাচ্ছেন! কিরীটী বলে হরডনের দিকে তাকিয়ে।

হ্যাঁ। অত্যন্ত আপত্তিকর কথা।

কিন্তু আপত্তিকর হলেও কথাটা সত্য জানবেন মিঃ বিশ্বাস। কিরীটী শান্তকণ্ঠে জবাব দেয়।

অসম্ভব। কারণ আমি জানি ঐ সময় সে রাত্রে আমার স্ত্রী আমার পাশে শুয়েই নিদ্রা যাচ্ছিল।

কিন্তু আমি যদি বলি মিঃ বিশ্বাস, আপনার স্ত্রী কালী সরকারের ঘরে সে রাত্রে গিয়েছিলেন? আপনি নেশার নিদ্রায় টের পাননি? টের পাবার মত আপনার সে সময় অবস্থাও ছিল না?

রাবিশ!

রাবিশ! আপনি ড্রিঙ্ক করেন না?

করব না কেন? করি। কিন্তু তাই বলে—

মিঃ বিশ্বাস, বিশ্বাস করা না করা ব্যাপারটা আপনার ইচ্ছে। তাছাড়া আপনার স্ত্রীর উপরে কোন রিফ্লেকশন আনবার চেষ্টা করিনি। যা ঘটেছিল সেরাত্রে তাই বলেছি। Mere facts—

আপনি কি বলতে চান মিঃ রায়, আমার স্ত্রী রাতদুপুরে হোটেলের একজন বোর্ডারের ঘরে গেল আমার অজ্ঞাতে আর তার চরিত্রের ওপর সেটা একটা রিফ্লেকশন নয়?

কিন্তু আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন, একসময় আপনার স্ত্রীর সঙ্গে ঐ কালী সরকারের যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল?

অল ট্র্যাস! আমি ওকে দীর্ঘ দশ বছর ধরে জানি। তবে হ্যাঁ, একসময় ঐ কালী সরকারের স্কুলে আমার স্ত্রী কিছুদিন কাজ করেছিল। সে সময় একটু আধটু পরিচয় হয়ত ওর সঙ্গে হয়েছিল। কারণ আমি শুনেছিলাম সেক্রেটারী হলেও উনি প্রায়ই স্কুলে আসতেন এবং—

বলুন, থামলেন কেন? কি বলছেন বলুন?

ওঁর নারী সম্পর্কে বরাবরই একটা দুর্বলতা ছিল।

আপনি তাহলে জানতেন ব্যাপারটা মিঃ বিশ্বাস?

জানতাম বৈকি।

বেশ। মিসেস বিশ্বাস, এবারে আপনি বলুন তো সেরাত্রে শেষ কখন চা দিয়ে আসা হয় কালী সরকারকে? কারণ আমি জানি, সে ঘন ঘন চা-পান করত এবং আপনিও সেই কথা বলেছেন।

আমি জানি—হরডন বিশ্বাস বলে ওঠে, রাত তখন পৌনে এগারটা হবে। ও রান্নাঘরে একটু ব্যস্ত ছিল। রামানুজ এসে চায়ের কথা বলায় আমিই নিজে এক কাপ চা তৈরী করে তাকে দিয়ে আসতে বলি ঘরে।

তৈরী করেছিল কে চা-টা? আপনি নিজে?

না। মানে আমার স্ত্রীই করে দিয়েছিল।

নিশ্চয়ই চা-পানের পর খালি চায়ের কাপটা তার ঘর থেকে রামানুজ সেরাত্রে নিয়ে আসেননি?

না। আমি যতদূর জানি চা-টা দিয়েই চলে এসেছিল সে।

তাই যদি হয়, নিশ্চয়ই অত রাত্রে চা খাবার পর আপনারা কেউ কাপটা নিয়ে আসেননি। কাপটা সেখানেই থাকার কথা, কিন্তু আমি পরদিন সকালে গিয়ে তার ঘরেতে কোন কাপ দেখিনি। তবে কে সেই কাপটা নিয়ে এল ঘর থেকে? মিসেস বিশ্বাস, আপনি?

আ-মি—না—আ-মি কেন আনব। হয়ত কোন চাকর-বাকরই—

কোন্ চাকর সাধারণতঃ তার ঘরে যেত?

রঘুয়া।

ডাকুন তাকে।

সে তো নেই।

কোথায় সে?

কালই তাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছি। হরডন বিশ্বাস বলে।

চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছেন! কেন?

সে আমার ঘর থেকে পঞ্চাশটা টাকা চুরি করেছিল।

থানায় রিপোর্ট করেছিলেন?

না।

কেন?

গোলমাল হবার ভয়ে। তাছাড়া হোটেলের চাকর চোর—ব্যাপারটা বোর্ডারেরা জানতে পারলে খারাপ হবে তাই।

মিসেস বিশ্বাস, আপনি যখন পরের দিন সকালবেলা আট নম্বর ঘরে যান, চায়ের কাপটা দেখেছিলেন? কিরীটী আবার মিসেস বিশ্বাসকেই প্রশ্ন করে।

না।

হুঁ, আপনার ভাই রামানুজ কোথায়?

ওর মাছ ধরার বাতিক আছে। এ সময়টা প্রায়ই ও নুলিয়াদের সঙ্গে নৌকোয় চেপে সমুদ্রে মাছ ধরতে যায়। আজও গিয়েছে হয়তো।

রামানুজ আপনার নিজের ভাই?

হ্যাঁ।

আপন মায়ের পেটের?

হ্যাঁ, হ্যাঁ।

আপনার চেয়ে বয়সে কত ছোট?

তা অনেক হবে।

কত?

পনের-ষোল তো হবেই।

আপনার এখন বয়স কত?

বিয়াল্লিশ হবে।

ফরটি-টু?

ঐ রকমই হবে। বলে মাথাটা নীচু করল রেণুকা।

।। দশ ।।

কয়েকটা মুহূর্ত ঘরের মধ্যে অতঃপর অদ্ভুত একটা স্তব্ধতা যেন থমথম করে, কারও মুখে কোন কথা নেই।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আবার কিরীটীই।

এখানে আসবার আগে—কিরীটী আবার প্রশ্ন করে, আপনার ভাই কোথায় ছিল?

কলকাতায়। ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দেয় মিসেস রেণুকা বিশ্বাস।

কি করত সেখানে?

কোন একটা মিলে কি যেন সামান্য একটা চাকরি করত।

কি চাকরি করত?

বলতে পারি না।

জানেন না বলতে চান?

না, জানি না।

হুঁ। রামানুজ লেখাপড়া কতদূর করেছে?

সামান্যই।

মিঃ বিশ্বাস, সাধন সরকারকে একবার ডাকুন তো?

হরডন বিশ্বাস তখনই গিয়ে সাধন সরকারকে ডেকে নিয়ে এল।

বসুন সাধনবাবু—

সাধন সরকার চেয়ারটায় বসে।

আপনি এখনও শোনেননি বোধ হয় যে আপনার কাকা কালী সরকার—

উনি আমার কাকা নন—জ্যাঠামণি। সাধন বলে।

ও। তা শোনেননি বোধ হয় যে আপনার জ্যাঠামণিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে।

চমকে উঠে সঙ্গে সঙ্গে সাধন সরকর বলে, সে কি। তবে যে মিসেস বিশ্বাস বলছিলেন জ্যাঠামণি সমুদ্রে সুইসাইড করেছেন!

না, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। নিষ্ঠুর পৈশাচিক ভাবে গলায় ফাঁস দিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়, তারপর তাঁর দেহটা সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল এই প্রমাণ করবার জন্য যে, তিনি নিজেই আত্মহত্যা করেছেন।

সাধন সরকার একেবার বোবা। বিমূঢ়। বিহ্বল। পাথর।

সাধনবাবু। একটু পরে কিরীটী আবার ডাকল সাধন সরকারকে।

সাধন সরকার মুখ তুলে তাকাল কিরীটীর মুখের দিকে।

রামানুজ দাশকে আপনি চেনেন?

হ্যাঁ।

কতদিন চেনেন?

অনেক দিন। আমাদের কলকাতার বাসায় জ্যাঠামণির কাছে তো প্রায়ই আসা-যাওয়া করত।

প্রায়ই কেন আসা-যাওয়া করত? জানেন কিছু?

না, তা বলতে ঠিক পারব না। তবে জ্যাঠামণিকে মধ্যে মধ্যে রামানুজকে টাকা দিতে দেখেছি।

আর উনি—মিসেস বিশ্বাস? উনি যেতেন না?

যেতেন।

প্রায়ই?

না, তবে যেতেন। দু-একবার বোধ হয় যেতে দেখেছি।

শেষ কবে ওঁকে দেখেন আপনার জ্যাঠামণির কাছে যেতে?

মাস পাঁচেক আগে বোধ হয় শেষবার ওঁকে দেখেছি।

সে-সময় রামানুজ সঙ্গে ছিল ওঁর?

না তো।

লতিকা গুই নামে কোন মহিলাকে আপনি চেনেন?

চিনি।

তাঁকেও কি আপনি আপনার জ্যাঠামণির কাছে যেতে দেখেছেন?

হ্যাঁ।

কোথায়?

আমাদের জুয়েলারীর দোকানে দোতলায় জ্যাঠামণির বিশ্রামের দুটো ঘর ছিল, সেইখানে প্রায় ছুটির দিনেই দুপুরে তিনি আসতেন।

আপনার জ্যাঠামণির কোন উইল আছে জানেন?

উইল?

হ্যাঁ।

ঠিক বলতে পারব না। আমাদের সলিসিটার গিরীন সিংহ বলতে পারবেন। হি ইয়ুজড় টু ডিল উইথ হিস অল ম্যাটার্স।

হুঁ, ঠিক আছে। মিঃ বিশ্বাস, আপনার শ্যালক এলে অতি অবিশ্যি থানায় মহান্তি সাহেবের কাছে একবার পাঠিয়ে দেবেন।

কথাটা বলে কিরীটী যেন কিছুক্ষণ কি ভাবে, তারপর সহসা উঠে দাঁড়ায়।

মহান্তির দিকে তাকিয়ে বলে, চলুন মিঃ মহান্তি।

যাবেন?

হ্যাঁ, আমার যা জানবার জানা হয়ে গিয়েছে। যাবেন? চলুন যাওয়া যাক।

কথাটা বলে আমাকে চোখের ইঙ্গিত করে বের হয়ে যায় সোজা ঘর থেকে। আমি ওকে অনুসরণ করি।

থানাতেই এলাম আমরা।

সারাটা পথ কিরীটী একটা কথাও বলেনি। অসম্ভব গম্ভীর।

বুঝতে পারি ভিতরে ভিতরে কিরীটী অত্যন্ত উত্তেজিত। তা সে যে কারণেই হোক।

থানায় পৌঁছে চেয়ারে বসে কিরীটী বললে, চা বলুন মিঃ মহান্তি।

নিশ্চয়—

মহান্তি হন্তদন্ত হয়ে উঠে গেল।

চা-পানের পর একটা চুরুট ধরিয়ে ধীরে ধীরে ধূমপান করতে করতে কিরীটী বলে, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন সেরাত্রে কি ভাবে কালী সরকারকে হত্যা করা হয়েছিল!

না-ঠিক—

এখনও বুঝতে পারেননি? সুব্রত?

পেরেছি কিছুটা। হত্যাকারী প্রস্তুত হয়েই কাজে নেমেছিল।

সত্যিই তাই।

কিরীটী বলে, প্রথমে চায়ের সঙ্গে ঘুমের ঔষধ দিয়ে হত্যাকারী কালী সরকারকে ঘুম পাড়ায়। তারপর সময় বুঝে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে কালী সরকারের ঘরে প্রবেশ করে। একটা কর্ড বা সিল্কের মজবুত রিবনের মত কিছুর সাহায্যে স্ট্র্যাঙ্গল করে তাকে ঘুমের মধ্যেই শ্বাস-বন্ধ করে হত্যা করে। তারপর হত্যাকারী নিঃশব্দে ঘর থেকে ডেড বডিটা কাঁধে করে ঐ রাস্তা দিয়েই হোটেল থেকে বের হয়ে এসে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেয়।

ইট ওয়াজ ডেড অফ নাইট! মধ্যরাত্রি। কেউ কোথাও জেগে নেই। এবং এ থেকে হত্যাকারী সম্পর্কে আমরা কিছু guess করতে পারি—

কি? মহান্তিই প্রশ্ন করে।

প্রথমতঃ, কিরীটী বলতে থাকে, হত্যাকারী strong nerve-এর লোক ; দ্বিতীয়তঃ, গায়ে শক্তিও যথেষ্ট ছিল তার—

বাধা দেয় মহান্তি ঐ সময়, বলে, হত্যাকারী নিশ্চয়ই পুরুষ?

পুরুষ কি নারী সেটা immaterial, কারণ—

কি?

কারণ এমনও হতে পারে, হত্যার পরিকল্পনা বা brain ছিল একজনের এবং instrument ছিল অন্য একজন। তেমনি আবার একই ব্যক্তির brain-এ হয়ত বা কাজ হতে পারে। তবে এটা ঠিক, হত্যাকারী যেই হোক, দুটো মারাত্মক ভুল সে করেছিল।

ভুল।

হ্যাঁ।

কি ভুল করেছিল?

প্রথমতঃ ব্যাপারটা সুইসাইড প্রমাণ করাবার জন্য যেভাবে কালী সরকারকে হত্যা করেছিল, ঠিক সেই ভাবেই মৃতদেহটা জলে ভাসিয়ে দিয়ে। এবং দ্বিতীয়তঃ, ছদ্মবেশ ধরে—

কি—কি বললেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ, মিঃ মহান্তি। একবার নয়, আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো দু-দুবার সে ছদ্মবেশ ধরেছে ঐ রাত্রে এবং সেই ছদ্মবেশেই দুজনার সঙ্গে দেখা করেছে। কিন্তু কথা হচ্ছে, একজনের অন্ততঃ তার ছদ্মবেশের আড়ালে সত্য পরিচয়টা জানা উচিত ছিল। কিন্তু তার চাইতেও যেটা বেশী আমার কাছে পাজলিং মনে হচ্ছে এখনও—কেন—কেন হত্যাকারী তাকে হত্যা করল? হোয়াট ওয়াজ দি মোটিভ বিহাইণ্ড? কি উদ্দেশ্য ছিল? সেইটা—সেইটা জানতে পারলে—

তাহলে আপনি হত্যাকারী কে তা ধরতে পেরেছেন মিঃ রায়! উত্তেজনায় যেন মহান্তির গলা বুঁজে আসে।

পেরেছি বৈকি। শান্তকণ্ঠে কিরীটী বলে।

কে-কে? মহান্তি যেন উত্তেজনায় ফেটে পড়ে।

চোখ মেলে দেখবার চেষ্টা করুন। দূরেরও নয়। খুব ঝাপসা—অস্পষ্টও নয় সে। কাছের মানুষ—

কিন্তু কিরীটীর কথা শেষ হল না—বাইরে একটা গোলমাল শোনা গেল। তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠঃ ডোণ্ট টাচ মি, আমি—আমি নিজেই যাচ্ছি। দরজার দিকে আমরা তিনজনে তাকালাম।

একজন প্লেন ড্রেস অফিসার ও দুজন কনস্টেবল সমভিব্যাহারে লতিকা গুই এসে ঘরে প্রবেশ করল।

রুক্ষ মাথার চুল। সমস্ত চেহারা, পোশাক যেন এলোমেলো।

ঘরে ঢুকেই লতিকা গুই বলে, আমি জানতে চাই হোয়াট অল দিস? এসবের মানে কি? কেন ওরা আমাকে খুরদা রোড জংশন থেকে ধরে নিয়ে এল? হোয়াই?

বসুন লতিকা দেবী—কিরীটী বলে, আপনি মিথ্যে চটছেন। ওদের কোন দোষ নেই। দারোগা সাহেবের আদেশমতই ওরা—

শাট আপ! গর্জে ওঠে লতিকা, আদেশ! কিসের আদেশ? আমি কি চোরছ্যাঁচোড় না খুনী যে আমাকে এমনি করে বেঁধে নিয়ে এল ওরা?

আপনি মিথ্যে উত্তেজিত হচ্ছেন। ব্যাপারটা আপনি বোঝবার চেষ্টা করুন লতিকা দেবী। মহান্তি বলে।

কি বুঝব, শুনি? বোঝবার এর মধ্যে আছেটা কি? বলুন, কেন আমাকে ধরে এনেছেন?

আপনাকে বলা সত্ত্বেও হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে হোটেল ছেড়ে চলে গেলেন কেন আপনি?

বেশ করেছি গিয়েছি। একশবার যাব।

বেশ, যাবেন। আপনাকে আমরা আটকাব না যদি আমাদের কতকগুলো প্রশ্নের ঠিক ঠিক জবাব দেন! কিরীটী এবারে বলে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে লতিকা বলে, আপনি কি মনে করেছেন আমি কালী সরকারকে হত্যা করেছি?

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গে লতিকার গলার স্বরটা কেমন যেন ভার-ভার হয়ে ওঠে।

কিরীটী বলে, না।

তবে? তবে এসবের মানে কি?

বললাম তো, সেদিন ভাল করে আপনি আমাদের সঙ্গে কথাই বললেন না, তাহলে এ গোলমালটা হত না।

কি জানতে চান আপনারা?

ঠিক জবাব দেবেন তো?

ডোণ্ট ওয়েস্ট টাইম। বলুন কি জানতে চান?

সেরাত্রে কখন আপনি হোটেল ছেড়ে চলে যান?

রাত একটার পর পিছনের দরজা দিয়ে।

হঠাৎ কাউকে না বলে চলে গেলেন কেন?

যাব না তো কি করব—কালীর মত মরে জলে ভাসব!

কি—কি বললেন? কিরীটী চমকে ওঠে যেন।

হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক বলেছি। না গেলে এতক্ষণে আমাকেও মরে সমুদ্রের জলে ভাসতে হত।

তাহলে আপনি বলতে চান, দেন সামওয়ান থ্রেটেণ্ড ইউ? ভয় দেখিয়েছিল কেউ আপনাকে?

লতিকা চুপ।

কি—বলুন? চুপ করে রইলেন কেন?

লতিকা তথাপি চুপ।

লতিকা দেবী!

আঃ, আমি কিছু জানি না—জিজ্ঞাসা করবেন না।

বেশ।

কিরীটী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। এবং চুপ করে থাকার পর আবার শুরু করে, লতিকা দেবী, রামানুজকে জানেন?

কে?

রামানুজ দাশ—রেণুকা বিশ্বাসের ভাই।

রেণুর ভাই?

হ্যাঁ।

আমি তো জানি না, রেণুর কোন ভাই কোনদিন ছিল বলে! কখনও শুনিওনি!

কিরীটীর কণ্ঠস্বরে যেন একটা সুস্পষ্ট উত্তেজনার ইঙ্গিত পাই।

কিরীটী যেন সোজা হয়ে বসে।

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রশ্ন করে অতঃপর, আর ইউ সিয়োর? আপনি যা বলছেন ঠিক বলছেন?

মিথ্যা বলব কেন?

কিরীটী আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। কি যেন ভাবতে লাগল।

লতিকা দেবী, আপনার তো কালী সরকারের সঙ্গে দীর্ঘদিনের পরিচয়!

ডোন্ট টক অ্যাবাউট হিম এনি মোর! তিক্ত ঘৃণা যেন লতিকার কণ্ঠ থেকে ঝরে পড়ে, ঐ নোংরা লোকটা সম্পর্কে কোন আলোচনাই আর আমি করতে চাই না। এখন বুঝতে পারছি, এই ওর প্রাপ্য ছিল। হি হ্যাজ বিন রাইটলি সার্ভড! যে ওকে গলা টিপে মেরেছে সে খুব ভাল কাজ করেছে।

এ আপনি কি বলছেন লতিকা দেবী! মহান্তি বিস্ময়ের সঙ্গে বলে।

ঠিকই বলছি। আমি আগে যদি ঘুণাক্ষরেও জানতাম ঐ মেয়েমানুষটা এখানে এসে হোটেল খুলেছে, আর সেই হোটেলে ও এসে উঠেছে, এখানে আমি কি পা দিতাম? কখনও দিতাম না। কিন্তু কেন—কেন আপনারা আমাকে এখানে জোর করে ধরে নিয়ে এসে এভাবে যন্ত্রণা দিচ্ছেন বলুন তো? কি করেছি আমি আপনাদের—কি করেছি!

লতিকা গুই শেষ পর্যন্ত যেন ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। কান্নায় একেবারে ভেঙে পড়ল।

কিরীটী যেন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করে, বলে, I am really sorry—অত্যন্ত দুঃখিত আপনাকে এভাবে cross করবার জন্য, কিন্তু জানবেন একান্ত অনন্যোপায় হয়েই আপনাকে বিরক্ত করছি।

মাথা নীচু করে বসে থাকে লতিকা গুই। এবং বুঝতে পারি, প্রাণপণে উদ্গত অশ্রুকে দমন করবার চেষ্টা করছে।

লতিকা দেবী, আর দুটি প্রশ্ন আমার আছে—

বলুন? ধীরে ধীরে আবার মাথা তুলল লতিকা গুই।

সত্যি সত্যিই কি আপনি সেদিন ট্রাঙ্ক কলে কালী সরকারের সঙ্গে কথা বলেছিলেন?

লতিকা গুই একেবারে চুপ। যেন পাথর।

কি, চুপ করে রইলেন কেন, বলুন?

আমি—

আপনাদের পরস্পরের মধ্যে সেদিন অন্ততঃ ট্রাঙ্ক কলে কোন কথাই হয়নি আমি জানতে পেরেছি।

লতিকা পূর্ববৎ চুপ।

আর একটা প্রশ্ন—আপনি যে পুরীতে আসছেন কালী সরকার কি জানত?

এবারেও কোন সাড়া নেই শব্দ নেই লতিকার দিক থেকে।

কিরীটী অতঃপর কিছুক্ষণ লতিকার দিকে চেয়ে থেকে শান্ত কণ্ঠে বলে, আপনাকে আর আমরা ধরে রাখব না। আপনি যেতে পারেন। তবে অনুগ্রহ করে যদি অন্ততঃ আজকের রাতটা যে হোটেলে আপনি ছিলেন সেই হোটেলে থাকেন—কাল যেখানে আপনি যেতে চাইবেন, আমাদের লোক গিয়ে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।

জলে ভেজা দৃষ্টি তুলে তাকাল লতিকা গুই কিরীটীর মুখের দিকে, কিন্তু—

ভয় নেই আপনার, কেউ আপনার গায়ে যাতে এতটুকু আঁচড় না কাটতে পারে সে ব্যবস্থা আমরা করব।

কিন্তু আপনি—

আমি জানি লতিকা দেবী, কে আপনাকে সেরাত্রে প্রাণের ভয় দেখিয়েছিল।

আ—আপনি জানেন?

জানি—কিন্তু আর দেরি করবেন না। যান আপনি হোটেলে।

লতিকা শুই ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

।। এগার ।।

কিরীটী বললে, এবারে আমরাও গাত্রোত্থান করব মহান্তি সাহেব। কিন্তু আজ রাত্রে আপনাকে একটু প্রস্তুত থাকতে হবে।

প্রস্তুত থাকতে হবে!

হ্যাঁ।

কি ব্যাপারে?

লতিকা শুইয়ের ভীতি বা আশঙ্কাটা মিথ্যা নয়। এবং আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো নিশ্চয়ই হত্যাকারী তার ওপরে একটা অ্যাটেম্পট্ নেবে।

সত্যি তাই মনে করেন আপনি?

হ্যাঁ।

কিন্তু কেন?

আমার মনে হচ্ছে যেহেতু উনি হত্যাকারীর একটা পরিচয় জানেন—যেটা আমাদের কাছে ভাঙলেন না, জানি না বলে গোপন করে গেলেন, সেটা সর্বসমক্ষে প্রকাশ হয়ে পড়ুক এটা হত্যাকারী নিশ্চয়ই চায় না।

কি সে পরিচয়?

পরিচয়টা হচ্ছে আসলে সে কে! কিন্তু আর দেরি করা চলবে না। বেলা এখন প্রায় পৌনে পাঁচটা। সাড়ে পাঁচটা থেকে সাড়ে ছটার মধ্যে আমি একটা ট্রাঙ্ক কল কলকাতা থেকে এক্সপেক্ট করছি—

ট্রাঙ্ক কল! কার? প্রশ্নটা করলাম আমিই।

কালী সরকারের সলিসিটারের। চল। তারপরই ঘুরে তাকাল কিরীটী বিজয় মহান্তির দিকে। বলল, মহান্তি সাহেব, লতিকা দেবীর হোটেলে পাহারা রাখবেন। প্লেন ড্রেস পুলিস রাখবেন। আর রাত এগারটায় আমার হোটেলে আসবেন। চলি—

বের হয়ে এলাম আমরা থানা থেকে।

সী-সাইড হোটেলের কাছাকাছি এসেছি, হঠাৎ চোখে পড়ল একটা সাইকেলরিকসায় চেপে রামানুজ যাচ্ছে।

কিরীটী রামানুজকে দেখে হাতের ইশারায় থামতে বলল।

রিকশাটা থামল। আজ রামানুজের পরনে একটা আমেরিকান প্যাটার্ণের ড্রেন-পাইপ প্যান্ট ও চিত্র-বিচিত্র একটা সিল্কের হাওয়াই শার্ট। মুখে চিউয়িং গাম ছিল বোধ হয়। অনবরত চিবোচ্ছে।

রামানুজ সাহেব যে—কোথায় চলেছেন?

থানায় গোয়িং—

থানায় কেন বলুন তো?

হ্যাঁ—দিদির কাছে শুনলাম আপনিই তো অর্ডার করেছেন থানায় যেতে, আমাকে মহান্তি সাহেবের নাকি প্রয়োজন আছে। কিন্তু হোয়াই বলুন তো?

কোথায় গিয়েছিলেন আপনি দুপুরে?

ফিসিং করতে 'সী'তে। নাইস! চলুন না একদিন।

বেশ তো। যাওয়া যাবে।

হঠাৎ কিরীটী বলে ওঠে, আচ্ছা রামানুজ সাহেব, মনে হচ্ছে কি একটা বাংলা ফিল্মে অনেকটা আপনার মত একজনকে দেখেছিলাম—আপনি কি কখনও—

কিরীটীর কথা শেষ হয় না।

একগাল হেসে ফেলে রামানুজ, ইউ ঠিকই কট মি। ধরেছেন তো ঠিক। ইয়েস, একজন কমেডিয়ান হিসাবে আমার নাম আছে।

তাহলে আপনি একজন অভিনেতা বলুন? চিত্রাভিনেতা—ফিল্ম-আর্টিস্ট?

হেঁ-হেঁ—ঠিক ধরেছেন—রাইটলি কট!

আচ্ছা যান, আপনাকে আর আটকাব না। থানাতেই যাচ্ছেন তো?

হ্যাঁ।

রামানুজ চলে গেল।

আমি তখনও সেই দিকে তাকিয়ে।

কিরীটী শুধায়, কিরে—কি দেখছিস?

একটা ক্লাউন। মৃদুকণ্ঠে বললাম।

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, হ্যাঁ, কোন প্রেমিক-প্রেমিকার জীবনে হঠাৎ আসা কোন বসন্ত-রজনীর একটি ফল।

কি বললি?

চল, কিছু না। বড্ড চায়ের পিপাসা পেয়েছে। একটু পা চালিয়ে চল্।

কিন্তু হোটেলে আমাদের ঘরে ঢুকে থমকে দাঁড়ালাম। দরজা খোলা—ঘরে আলো জ্বলছিল। ঘরের মধ্যে একটা ইজিচেয়ারে বসে লতিকা গুই।

আমাদের পদশব্দে সে নিঃশব্দে মুখ তুলে তাকাল।

লতিকা দেবী—আপনি—

লতিকার দুচোখে টলটল করছে জল।

কিরীটীই আবার বলে, আপনি হোটেলে যাননি?

না—আপনাকে আমি একটা কথা বলতে এসেছিলাম—

কী কথা বলতে এসেছেন আমি জানি।

চমকে সঙ্গে সঙ্গে মুখ তুলে তাকায় লতিকা এবং ক্ষীণকণ্ঠে বলে, আ—আপনি জানেন!

জানি। কালী সরকারের-সঙ্গে আপনার সত্যকার পরিচয়টা দিতে এসেছেন।

লতিকা দেবী চুপ করে রইল।

তাই তো!

হ্যাঁ, মানে—আ—

আমি জানি, বললাম তো। আপনি—মানে কালীর সঙ্গে আপনার বিয়ে হয়েছিল।

কি—কি করে আপনি জানলেন?

দুটো জিনিস থেকে।

দুটো জিনিস! বিস্ময় লতিকার কণ্ঠে।

হ্যাঁ। প্রথমতঃ কালীর ঘরে যে নোট-বই একটা ছিল তার মধ্যে কালীর সলিসিটারের একটা চিঠি ছিল। যার মর্মার্থ হচ্ছে—সে আসছে দুচারদিনের মধ্যেই পুরীতে কালীর স্ত্রী লতিকা সম্পর্কে উইলের আলোচনা করতে।

আর—

আর আপনার হীরের লকেটটা যেটা আপনার হোটেলের ঘরের মেঝেতে কুড়িয়ে পেয়েছেন মিঃ মহান্তি—এই যে আপনাদের দুজনের ফটো এর মধ্যে—বলতে বলতে লকেটটা এগিয়ে দেয় কিরীটী লতিকার দিকে।

লতিকা বোকার মতই যেন হাত বাড়িয়ে লকেটটা কিরীটীর হাত থেকে নেয়।

কিরীটী বলে, এখন তো বুঝতে পারছেন কেন হত্যাকারী আপনাকে threaten করেছিল? তার সেটা জানবেন কেবল মৌখিক threaten-ই নয়—তার intention-ও তাই ছিল এবং তাই করতও। কিন্তু আর সে হবে না—হবারও নয়। আপনি নির্ভাবনায় হোটেলে ফিরে যান মিসেস সরকার। হত্যাকারীকে ধরা দিতেই হবে—তার পালাবার কোন পথই আর নেই। যান—বরং সুব্রত তুই যা ওঁকে একটু এগিয়ে দিয়ে আয়।

চলুন। আমি বলি।

লতিকা উঠে দাঁড়াল।

আমরা ঘর থেকে বের হয়ে গেলাম।

।। বারো ।।

ঠিক সাড়ে ছটায় কিরীটীর ট্রাঙ্ক কল এল।

ঘরের দরজা বন্ধ করে প্রায় সাত মিনিট কিরীটী কালী সরকারের সলিসিটারের সঙ্গে কথা বলে বেশ হৃষ্টচিত্তেই ঘর থেকে বের হয়ে এল। মুখে পরিতৃপ্তির হাসি।

বলি, কি ব্যাপার?

হারানো সূত্রটি মিলে গিয়েছে। কিরীটী বললো।

কিসের হারানো সূত্র?

হত্যার উদ্দেশ্যটা অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছিলাম। উদ্দেশ্যটা কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছিলাম না।

পেয়েছিস?

হ্যাঁ। আমি একটু বেরুচ্ছি। ঘণ্টাখানেক বাদে ফিরব। কথাটা বলে কিরীটী বের হয়ে গেল।

মনে হল, বাইরে খুশি-খুশি হলেও ভিতরে সে যেন তখনো আগের মতই উত্তেজিত।

রাত সাড়ে এগারটায় আমি, কিরীটী ও মহান্তি পূর্ব-পরিকল্পনা মত লতিকার হোটেলের দিকে চললাম।

যেমন যেমন বলেছিলাম, সেইভাবে সব ব্যবস্থা করেছেন তো মিঃ মহান্তি? কিরীটী শুধাল।

হ্যাঁ। কিরীটীর প্রশ্নের উত্তরে জানাল মহান্তি।

অন্ধকার রাত।

বীচের রাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটির আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু সে আলো এতই সামান্য যে থাকা-না-থাকা বোধ হয় দুই-ই সমান। অন্ধকারে সমুদ্র দেখা যায় না বটে, তবে গর্জন শোনা যাচ্ছে।

বীচের একেবারে গোড়ায় ফ্ল্যাগস্টাফের কাছে একটু ভিতরের দিকে লতিকার হোটেলটা। বীচে তখন একটি জনপ্রাণী নেই। ঐ সময় থাকার কথাও নয়। পিছনের দরজা-পথে আমরা নিঃশব্দে লতিকা যে হোটেলে ছিল সেই হোটেলে প্রবেশ করলাম।

একতলার একটা ঘরে আলো জ্বলছিল।

কিরীটী বললে চুপিচুপি, ঐটাই লতিকার ঘর।

হঠাৎ কানে কথা এলে—নারী-কণ্ঠ এবং লতিকার কণ্ঠ।

দাঁড়াও—আমি জানতাম তুমি আসবে।

নারীকণ্ঠের জবাব এল, জানতে?

হ্যাঁ, জানতাম। আর কেন যে এসেছ তাও জানি।

তবে তো খুবই ভাল।

এগিও না বলছি। স্টপ—স্টপ!

কিন্তু লতিকার কথা শেষ হল না। সহসা একটা শব্দ—

তারপরই একটা ধস্তাধস্তির শব্দ ও সেই সঙ্গে কেমন যেন একটা চাপা গোঁ গোঁ শব্দ।

কিরীটী যেন ছুটে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল দরজার উপর, এবং আমাকেও বললে, সুব্রত উই-উই মাস্ট গেট ইন! দরজাটা ভাঙ। মহান্তি কুইক্—

তিনজনের মিলিত চাপে দরজাটা ভেঙে পড়ল।

হুড়মুড় করে ঘরের মধ্যে তিনজন ঢুকে পড়ি। দেখি শয্যার উপর পড়ে আছে লতিকা, আর এক নারী তার উপরে ঝুঁকে রয়েছে তখনও।

কিরীটী ছুটে গিয়ে এক ঝটকায় সেই দ্বিতীয় নারীকে সরিয়ে দিয়ে লতিকার গলা থেকে সিল্কের রিবনের ফাঁসটা টেনে খুলে ফেলল তাড়াতাড়ি।

লতিকা নেতিয়ে পড়ে আছে তখনও শয্যার উপরে। সংজ্ঞাহীনা।

দ্বিতীয় নারী তখন ঘর থেকে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কিরীটী গর্জে ওঠে, নো ইয়ুজ-—পালাবার চেষ্টা এখন বৃথা।

মহান্তির বিস্ময়-বিস্ফারিত কণ্ঠ থেকে বের হয়, এ কি, মিসেস বিশ্বাস?

কিরীটী বলে, না।

মিসেস বিশ্বাস নয়?

না—তার ছেলে রামানুজ।

রামানুজ! রেণুকা বিশ্বাসের ছেলে।

হ্যাঁ। খুব দক্ষ অভিনেতা রামানুজ। মিসেস বিশ্বাসের ছদ্মবেশে প্রথম রাত্রে উনিই এখানে এসেছিলেন এবং সেই সময়ই লতিকা দেবী ওঁকে চিনতে পারে আর তাই রামানুজ ওঁকে প্রাণের ভয় দেখিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে লতিকার চোখে-মুখে জলের ছিটে দিয়ে হাওয়া করতে সে চোখ মেলে তাকায়।

আমি—, ক্ষীণ কণ্ঠে লতিকা সাড়া দেয়।

ভয় নেই মিসেস সরকার—you have been saved—কিরীটী বলে, হত্যাকারী ধরা পড়েছে—

ধরা পড়েছে! লতিকা ভাঙা গলায় প্রশ্ন করে।

হ্যাঁ—ওই যে দেখুন, পালাতে পারেনি।

ঘরের এক কোণে রামানুজ তখনো একটা চেয়ারে পুলিসের প্রহরায় বসে।

কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না মিঃ রায়! ক্ষীণকণ্ঠে লতিকা বলে, রামানুজ—

হ্যাঁ, রেণুকার ছেলে রামানুজ—

রেণুকা বিশ্বাসের ছেলে—রামানুজ! কেমন যেন আমার গোলমাল হয়ে যাচ্ছে!

হ্যাঁ—জট ঐখানেই পাকিয়ে ছিল এবং হত্যার বীজও ঐখানেই ছিল।

হত্যার বীজ!

তাছাড়া কি? সত্যিই বিচিত্র নাটক! ওই রামানুজ কে জানেন? আসল পরিচয়—অর্থাৎ রেণুকার গর্ভজাত হলেও ওর জন্মদাতা বাপ কে জানেন?

কে? লতিকা ক্ষীণকণ্ঠে প্রশ্ন করে।

সে হচ্ছে আপনারই স্বামী—কালী সরকারের অপরিণামদর্শিতার ফল—দুষ্কৃতির ফল—কালী সরকার ও রেণুকার ক্লেদাক্ত, কামনা-পঙ্কিল অন্ধকারময় জীবনের কোন এক বসন্ত রজনীর স্বাক্ষর!

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়? সত্যি?

সত্যি—নিষ্ঠুর মর্মান্তিক সত্যি লতিকা দেবী! কিন্তু ঐ হতভাগ্য সেটা কোন দিনই জানতে পারেনি। ও চিরদিন জেনেছে ও রেণুকার ভাই।

কিন্তু আপনি—আপনি সে কথাটা জানলেন কি করে? মহান্তি প্রশ্ন করে।

প্রথমটায় অবিশ্যি নিছক অনুমানের উপরে নির্ভর করে—এবং যা চোখে দেখেছি তাই বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে।

কি রকম?

কিরীটী বলে, আপনারাও যদি চোখ মেলে দেখতেন তবে দেখতে পেতেন—রামানুজ রেণুকা ও কালী সরকারের চেহারার মধ্যে similarity দেখতে পেতেন, কেমন করে রেণুকা ও কালী সরকারের চেহারার ছাপ পড়েছে ঐ রামানুজের চেহারায়—

কিন্তু—

শুনুন মিঃ মহান্তি—

কিরীটীই বলতে থাকে, প্রথম দিন দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, কারণ রামানুজের কটা চুল, চোখ ও গৌর গাত্রবর্ণ রেণুকার মত হলেও মুখের গঠনটা অবিকল কালী সরকারের মত। এবং কথাটা যে সত্য সে সম্পর্কে আমি স্থির-নিশ্চিত হই আজই সন্ধ্যায় কালী সরকারের অ্যাটর্নীর সঙ্গে কথা বলে। কালী সরকারের উইলে লেখা আছে, পুরীর সী-সাইড হোটেলটার একমাত্র মালিক কালী সরকার নিজে।

সে কি! মহান্তি বলে ওঠে, হোটেলটা তবে—

না, আসলে হোটেলটা কালী সরকারেরই। রেণুকা বিশ্বাসের সঙ্গে একটা চুক্তিপত্র আছে। যদিও সবাই জানে রেণুকা ও হরডন বিশ্বাসই হোটেলের মালিক। যাই হোক, যা বলছিলাম,

ঐ হোটেলটা রামানুজ দাশকে দিয়েছে লেখা আছে।

রামানুজ ঐ সময় চেঁচিয়ে ওঠে, মিথ্যে কথা!

কিরীটী বলে, মিথ্যা কথা নয়। তোমার জননী দেবী ওইখানেই ভুল করেছে রামানুজ সাহেব। পাছে হোটেলটি হাতছাড়া হয়ে যায় কালী সরকারের মৃত্যুর পর, কালী সরকারকে নিয়ে এসে কৌশলে সেরাত্রে তোমাকে দিয়ে হত্যা করিয়ে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে দেয়। অ্যাণ্ড ইউ ফুল—ইউ কিলড ইয়োর ওন ফাদার—নিজের বাপকে তুমি হত্যা করেছ—যে বাপ তোমার ভালটাই চেয়েছিল শেষ পর্যন্ত।

না, না—হঠাৎ চিৎকার করে ওঠে রামানুজ যেন পাগলের মতই—মিথ্যা—এ মিথ্যা—

না রামানুজ সাহেব, এ মিথ্যা নয়। কালী সরকারের অ্যাটর্নীও জানে সে কথা—তুমি তার অবৈধ সন্তান হলেও তোমার প্রতি তার একটা দুর্বলতা ছিল, মমতা ছিল।

কিন্তু আমি—I never dreamt of it— লতিকা বলে।

একমাত্র কালী সরকারের অ্যাটর্নী ছাড়া আর যারা জানে সে হচ্ছে ঐ রেণুকা বিশ্বাস।

হরডন বিশ্বাস জানে না?

না, সে জানে না। তবে না জানলেও তার মনে বোধ হয় ইদানীং একটা সন্দেহ দেখা দিয়েছিল—

সন্দেহ?

হ্যাঁ মহান্তি সাহেব—সন্দেহ। সন্দেহ হচ্ছে তার স্ত্রী ও কালী সরকারকে নিয়ে—তাই সে কালী সরকারকে ডেকে পাঠায় পুরীতে।

তারপর?

কালী সরকার অবিশ্যি ব্যাপারটা বুঝতে পারেনি—মানে সন্দেহ করেনি। সে সরল মনেই এসেছিল। তারপর আমার যা অনুমান, খুব সম্ভবতঃ কালী সরকারকে চেপে ধরে হরডন বিশ্বাস এবং তখন অনন্যোপায় কালী সরকার ব্যাপারটা মিটিয়ে নেবার জন্য কলকাতা থেকে তার অ্যাটর্নীকে আসতে বলে নতুনভাবে উইল করবার জন্য।

সত্যি?

বললাম তো, সবটাই আমার অনুমান। যা হোক, সমস্ত শলাপরামর্শ হত কালী ও হরডনের মধ্যে, তার ঘরে বসে ব্রীজ খেলতে খেলতে। আসলে ব্রীজ খেলাটা ছিল সম্ভবতঃ eye-wash—এবং ঐ সময় কোন একদিন রাত্রে হয়ত রেণুকা আড়িপেতে ব্যাপারটা জানতে পারে—যার ফলে সে অনন্যোপায় হয়ে তখন ছেলেকে পরামর্শ দেয় কালীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবার জন্য, হতভাগ্য রামানুজকে হয়ত বুঝিয়েছিল, অন্যথায় হোটেল থেকে সে বঞ্চিত হবে।

হরডন তাহলে ব্যাপারটা জানে না বলতে চান?

সম্ভবতঃ না।

।। তেরো ।।

মহান্তি অতঃপর শুধায়, আপনি কি রামানুজকে প্রথম থেকেই সন্দেহ করেছিলেন মিঃ রায়?

হ্যাঁ। তাকে দেখবার পর থেকেই বলতে গেলে। তবে সন্দেহটা ঘনীভূত হয় আপনার

মুখ থেকে রেণুকার ইতিহাসটা শোনবার পর।

কেন—কেন ওকে সন্দেহ করলেন?

প্রথমতঃ ও আমার চোখে ধুলো দিতে পারেনি। কারণ ওকেই আমি আগের দিন বৈকালে সমুদ্রতীরে কালী সরকারের সঙ্গে যখন প্রথমে দেখি—

তবে কি—

হ্যাঁ, ওই দোলগোবিন্দ সিকদার—পার্ল-মাচেণ্ট! মানুষকে একবার দেখলে বড় একটা আমি ভুলি না। পরের দিন হোটেলে ওকে দেখে তাই আমি চমকে উঠেছিলাম। দ্বিতীয়তঃ, ওর মুখের সঙ্গে কালী সরকারের মুখেরও একটা ক্লোজ রিজেমব্লেন্স দ্বিতীয় দিন আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি।

একটু থেমে আবার বলতে থাকে কিরীটী, ওকে দেখার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনে হয়েছিল কোথায় যেন একটা আশ্চর্য রকমের মিল, একটা সাদৃশ্য আছে কালী সরকারের মুখের সঙ্গে ঐ রামানুজের মুখের। মনের চমকের সঙ্গে সঙ্গে ওর প্রতি দৃষ্টিটা আমার আরও আকর্ষিত হয়। রং, চুল, চোখ সব রেণুকার মত, অথচ চেহারায় আশ্চর্য রকম আদল কালী সরকারের মত। এবং এও বুঝতে আর আমার বাকি ছিল না, রামানুজ যেই হোক, দোলগোবিন্দ সিকদার ও রামানুজ এক এবং অভিন্ন।

একটু থেমে কিরীটী একটা সিগার ধরাল—সিগারে একটা মৃদু টান দিয়ে পুনরায় বলতে শুরু করে, কিন্তু ব্যাপারটা এখনও আমার কাছে একটা মিস্ট্রিই রয়ে গেল। কালী সরকার কেন হঠাৎ রামানুজ সম্পর্কে আমার কাছে মিথ্যে কথা বলতে গেল!

হয়তো এমনও হতে পারে, পাছে তোর মনে কোনরকম কোন কিউরিয়োসিটি রামানুজ সম্পর্কে জাগে তাই একটা মিথ্যে পরিচয় দিয়ে ওর ব্যাপারটা তোর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে চাপা দিতে চেয়েছিল। আমি বলি।

কথাটা যে আমারও মনে হয়নি সুব্রত তা নয়। কিন্তু কেন—কি প্রয়োজন ছিল তার? তবে সে কি তার বিপদ অ্যাপ্রিহেণ্ড করতে পেরেছিল।?

হয়তো।

তাই যদি হবে তো সে সাবধান হল না কেন নিজে?

সাবধান!

হ্যাঁ, সাবধান হওয়া উচিত ছিল তার নিজের চা-পান সম্পর্কে।

কি বলতে চাস তুই কিরীটী? আমি প্রশ্ন করি।

মনে আছে নিশ্চয়ই তোদের, সেরাত্রে চা-টা রেণুকা বিশ্বাস তৈরী করে দিলেও, রামানুজ চা-টা কালী সরকারের ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। হরডন বিশ্বাসের কথা থেকেই আমরা জেনেছি।

মনে আছে।

আমার মনে হয় সেই সময়ই চায়ের সঙ্গে ঘুমের ঔষধ মিশিয়ে দেয় রামানুজ।

তাহলে রেণুকা বিশ্বাস নয়? মহান্তি প্রশ্নটা করে।

না, সে মিশোয়নি। আমি অবিশ্যি বুঝেছিলাম মিঃ মহান্তি—রেণুকাকে ঘিরে আপনার সন্দেহটা সবচাইতে বেশী দানা বেঁধে উঠেছিল, কিন্তু আমার তা হয়নি।

কেন?

তার কারণ রেণুকার মত এক স্ত্রীলোকের পক্ষে একজন বয়স্ক পুরুষকে গলায় ফাঁস দিয়ে হত্যা করা যেমন সম্ভব নয়, তেমনি তাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রের জলে ভাসিয়ে

দেওয়াও সম্ভব নয়। তবে হত্যার ব্যাপারের সঙ্গে সে যে জড়িত সেটা তার জবানবন্দি থেকেই আমি বুঝতে পেরেছিলাম। কালী সরকারের মৃত্যুর ব্যাপারটা জানবার সঙ্গে সঙ্গে সে গিয়ে কালী সরকারের ঘরে তালা দিয়ে দিয়েছিল। আসলে সে তালা দিতে চায়নি, গিয়েছিল ঘরের মধ্যে যদি কোনরকম সন্দেহজনক কিছু রামানুজ ফেলে এসে থাকে, সেটা সরিয়ে ফেলবার জন্য।

কেন?

কারণ সে ভাবতেই পারেনি, যে দেহটা তারা সমুদ্রের জলে ফেলে দিয়েছে রাত্রির অন্ধকারে—নির্মম ভাগ্যের ফলে সেই দেহটাই আবার নুলিয়াদের হাত দিয়ে ফেরত আসবে সমুদ্রের জল থেকে! তাই ভয় হয়েছিল তখন, যদি ব্যাপারটা হত্যা বলে কারও সন্দেহ হয় এবং পুলিস শেষ পর্যন্ত নাড়াচাড়া করে ব্যাপারটা নিয়ে, তাহলে যেন কোন প্রমাণ তারা ঘরে না পায়। চায়ের কাপটাও হয়ত সেই কারণেই সরিয়ে ফেলেছিল রেণুকা বিশ্বাস।

তারপর?

তারপর আর কি—ঘুমের ঔষধের প্রভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুচ্ছে দেখেই মধ্যরাত্রে কোন এক সময় রামানুজ গিয়ে ঘরে ঢোকে এবং নির্মমভাবে একটা চুলের রিবন গলায় ফাঁস দিয়ে নিজের জন্মদাতা বাপকে হত্যা করে মায়ের অনুরোধে। পাছে হোটেলের সম্পত্তিটা হাতছাড়া হয়ে যায়, এই ভয়েই হত্যা করাল রেণুকা কালী সরকারকে। অথচ ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস দেখ—কালী সরকার সজ্ঞানেই সে সম্পত্তি রামানুজকে দিয়ে গিয়েছিল উইল করে—পাকাপোক্ত ভাবে।

রিয়ালি ইট ইজ অ্যান আইরনি অফ ফেট! মৃদুকণ্ঠে আমি বলি।

কিরীটীর অনুমানটা যে মিথ্যা নয়, সেটা ঐদিনই রাত্রে জানা গেল।

আমরা সকলে গিয়ে একসঙ্গে হানা দিলাম সী-সাইড হোটেলে।

রামানুজকে পুলিস দিয়ে থানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল কিরীটীর পরামর্শে আগেই।

রেণুকা একটা চেয়ারে বসে হিসাব কষছিল আর হরডন একটা কাণ্ট্রি-লিকারের বোতল নিয়ে মদ্যপান করছিল।

আমাদের দেখে ওরা অবাক।

কি ব্যাপার? এত রাত্রে মহান্তি সাহেব? রেণুকাই প্রশ্ন করে।

শুনে নিশ্চয়ই খুশি হবেন, কালী সরকারের হত্যাকারী ধরা পড়েছে মিসেস বিশ্বাস।

ধরা পড়েছে?

হ্যাঁ।

কে—কে? প্রশ্ন করে হরডন বিশ্বাস।

কালী সরকারের ছেলেই—

কি বললেন—কালী সরকারের ছেলে। সে তো বিয়েই করেনি! হরডন বলে।

সেটা অবিশ্যি সঠিক বলতে পারবেন কালীর ছেলের গর্ভধারিণী। রেণুকার দিকে বাঁকা দৃষ্টিতে তাকিয়ে কথাটা বলে কিরীটী।

কালীর ছেলের গর্ভধারিণী—but who—কে?

রেণুকা—আপনার স্ত্রী।

What ! চিৎকার করে ওঠে হরডন বিশ্বাস।

সত্যি কি মিথ্যা ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন না মিঃ বিশ্বাস।

সত্যি? বাঘের মত ঘুরে দাঁড়ায় হরডন রেণুকার দিকে—দু'চোখে অগ্নিঝরা দৃষ্টি।

রেণুকা স্থির, বোবা—যেন পাথর।

চুপ করে আছিস কেন হারামজাদী, বল্—জবাব দে?

রেণুকা তথাপি নিশ্চুপ।

হঠাৎ হরডন বাঘের মতই ঝাঁপিয়ে পড়ল রেণুকার উপরে—কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা আর্ত চিৎকার করে নেতিয়ে পড়ল।

রেণুকা বিশ্বাস ছুরি বসিয়ে দিয়েছে হরডনের পেটে।

রক্তাক্ত ভূলুণ্ঠিত হরডনের দেহটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠল রেণুকা।

কালো পাখী

।। এক ।।

ইউসুফ মিঞাকে আমি অনেক দিন থেকেই চিনি।

বয়স পঞ্চাশের ঊর্ধ্বে, প্যাকাটির মত সরু লম্বা চেহারা। দেহের কোথাও মাংস বলে কোন পদার্থ আছে বলে মনে হত না ওকে দেখলে। কেবল যেন কতকগুলো হাড়, তার উপরে চামড়া। ছোট ছোট করে ছাঁটা কাঁচাপাকা দাড়ি। মধ্যে মধ্যে মেহেদীতে সে তার সেই দাড়ি রাঙিয়ে নিত। পরনে একটা চেককাটা লুঙ্গি, গায়ে হাফহাতা পাঞ্জাবির মত একটা জামা ; ঐ ছিল তার পোশাক।

টেরিটি বাজারে ওর একটা দোকান ছিল চিড়িয়ার। নানা ধরণের দুষ্প্রাপ্য পাখী কেনাবেচা করত ইউসুফ মিঞা। ও পাখী বলত না। বলত, চিড়িয়া।

চিড়িয়ার জাত চিনতে ইউসুফ মিঞা ছিল অদ্বিতীয়। সামান্যক্ষণ পাখীটাকে পর্যবেক্ষণ করেই বলে দিতে পারত ইউসুফ, কোন্ জাতের কোথাকার পাখী আর তার কিম্মত কত হতে পারে বা হওয়া উচিত।

বাজারে ঢুকতেই বাঁ-হাতি দুটো ঘরে তার দোকান ছিল। সামনের ঘরটার পিছনে আর একটা মাঝারি সাইজের ঘর। দুটো ঘর ভর্তি নানা ধরনের ছোট বড় মাঝারি খাঁচায় নানা ধরনের পাখী। সর্বক্ষণই কিচিরমিচির শব্দ করছে বা শিস দিচ্ছে কিংবা মধুর শব্দে ডেকে ডেকে উঠছে।

একপাশে একটা চৌকি পাতা। সেই চৌকির উপরেই বসে থাকত ইউসুফ মিঞা সারাটা দিন। সামনে থাকত তার টাকা-পয়সার ক্যাশ বাক্সটা। রাত্রে ঐ চৌকিটার উপরেই শুয়ে ঘুমাত, দোকানের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে ভিতর থেকে।

পিছনদিকে ঘর দুটোর একটা সরু ফালি বারান্দা মত—তাও প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। তার একদিকে রান্নার ব্যবস্থা, অন্যদিকে কলপায়খানার ব্যবস্থা।

মোটমাট সামনের দরজা বন্ধ করে দিলে ঐ ঘর দুটির মধ্যে প্রবেশের কোন দিক দিয়ে আর কোন রাস্তা ছিল না।

ইউসুফ মিঞা চট্টগ্রামের লোক—তবে ব্যবসার খাতিরে কলকাতার টেরিটি বাজারে এসে ঐ ঘর দুটিতে আস্তানা গাড়বার পর থেকে দেশ চট্টগ্রামের সঙ্গে আর কোন সম্পর্কই ছিল না দীর্ঘ অনেকগুলো বৎসর।

ইউসুফ মিঞার বিবি ছিল না, অনেক কাল আগেই গত হয়েছিল। ছিল একটি ছেলে--সুলতান। সুলতানের বয়েস বছর আঠারো-উনিশ এবং সেও তার শৈশব থেকে তার আব্বাজানের সঙ্গে থেকে চিড়িয়ার কারবার করতে করতে চিড়িয়া সম্পর্কে বেশ ওয়াকিবহাল হয়ে উঠেছিল।

বাপের মত ছেলে রোগা-শুটকো নয়। বেশ তাগড়াই জোয়ান।

অনেক বছর আগে কিরীটীর একবার একটি কাকাতুয়া পোষবার শখ জেগেছিল মনে এবং একটি বেশ ভাল কাকাতুয়ার সন্ধান করছে জেনে আমিই তাকে সেদিন টেরিটি বাজারে ইউসুফ মিঞার দোকানে নিয়ে গিয়েছিলাম।

কিরীটীর পরিচয় দিয়ে বলেছিলাম আমি, বাবুকে একটা ভাল কাকাতুয়া দিতে পার ইউসুফ মিঞা?

কেন পারব না আজ্ঞে—একটা ভাল কাকাতুয়ার বাচ্চাই আছে আমার কাছে—অস্ট্রেলিয়া

থেকে আনা—তার দামটা একটু বেশি পড়বে বাবু।

কিরীটী তখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চারপাশে ঘরভর্তি রাখা নানা ধরনের রঙ-বেরঙের বিচিত্র সব পাখী ও তাদের বিচিত্র কলকাকলী শুনছিল।

দামের জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না মিঞা। কোথায় তোমার কাকাতুয়া দেখাও। বললাম আমি।

দাঁড়ান, দেখাচ্ছি। উঠে দাঁড়াল ইউসুফ মিঞা।

পিছনের ঘর থেকে ইউসুফ একটি খাঁচা নিয়ে এল।

খাঁচার মধ্যে নীলচে সাদা রঙের কাকাতুয়ার বাচ্চা। ভাল করে এখনও শরীরে রোঁয়া গজায়নি। মানুষের মত এ কাকাতুয়া কথা তো বলবেই, তাছাড়া সর্বক্ষণ জেগে পাহারাও দেয়। ইউসুফ মিঞা বলে।

কিরীটী কথাটা বিশ্বাস করেনি অবশ্য সেদিন। মৃদু হেসেছিল।

বাবু হাসছেন! ঠিক আছে, মাস পাঁচ-ছয়ের মধ্যে যা বললাম তা যদি না হয় তো ইউসুফ মিঞার চিড়িয়া ফিরিয়ে দিয়ে যাবেন—দাম আমি ফেরত দিয়ে দেব। ইউসুফ মিঞা বলে।

জিজ্ঞাসা করলাম, তা কত চাও?

আজ্ঞে আটশো টাকা।

বল কি মিঞা।

আজ্ঞে যেমন চিড়িয়া তার দামও তেমনি।

আশ্চর্য! কিরীটী কিন্তু অতঃপর কোন দর-দাম করেনি।

বলেছিল কেবল, সঙ্গে অত টাকা নেই, পরের দিন এসে কাকাতুয়াটা নিয়ে যাবে। শ'খানেক টাকা অ্যাডভান্স রেখে চলে এসেছিল।

বলা বাহুল্য, পরের দিনই গিয়ে সেই কাকাতুয়াটা কিনে এনেছিল কিরীটী। এবং ইউসুফ মিঞা যে মিথ্যা বলেনি, মাস চারেকের মধ্যেই সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

সে কিরীটীকে কিরীটী এং কৃষ্ণাকে কৃষ্ণা বলে ডাকত।

আমাকে দেখলেই বলে উঠত, সুব্রত এসেছে কিরীটী, সুব্রত এসেছে!

কৃষ্ণা হাসত। কিরীটী হাসত।

কিন্তু জংলী ক্ষেপে যেতো যখন কাকাতুয়াটা চেঁচাতে শুরু করত, এই জংলী, বাবুকে চা দে, আমাকে জল দে। এই জংলী—জংলী! ভূত!

কৃষ্ণার জংলীর প্রতি সম্ভাষণটাকে চালাত।

কে বলবে একটা পাখী—ঠিক যেন একটা মানুষ কথা বলছে। কথাও স্পষ্ট।

পাখীটা কিন্তু বেশীদিন বাঁচেনি।

বছর দুই বাদে হঠাৎ কি হল—হঠাৎ মরে গেল এক সন্ধ্যায় পাখীটা।

দুটো দিন কিরীটী কেমন যেন গুম হয়ে রইল। মনে খুব লেগেছিল পাখীটার মৃত্যু কিরীটীর। খবর পেয়ে আমি গেলাম। বললাম, এর জন্য এত মুষড়ে পড়েছিস! চল, ইউসুফের কাছ থেকে আর একটা কাকাতুয়া যোগাড় করে নিয়ে আসি!

এ যেন গাছের ফল, আঁকশি দিয়ে টানলেই হাতের মুঠোর মধ্যে এসে পড়বে! ইউসুফ সত্যিই বলেছিল—এ পাখীর তুলনা নেই! কিরীটী বলে।

তা বলে তেমনটি আর মিলবেই না, তারই বা কি মানে আছে? চল্, ওঠ্!

গেলাম ইউসুফের ওখানে।

ইউসুফ ছিল। সব শুনে বললে, ও চিড়িয়া তো চট্ করে মেলে না বাবু! একটিই ছিল, আপনাদের দিয়েছিলাম। এখন কোথায় পাব?

আনিয়ে দিতে পার না একটা?

যে এনেছিল সে একজন জাহাজের খালাসী। তার জাহাজ অস্ট্রেলিয়ায় গেলে ওই রকম কাকাতুয়া সে এনেছে বার দুই।

সে আর আসবে না?

চিড়িয়া পেলেই আসবে। প্রায় বছরখানেক সে আসে না।

এক বছরের মধ্যে আর আসেনি সে?

না, তার জাহাজ তো এদিকে বড় একটা আসে না। মধ্যে মধ্যে কখনও আসে। একজন গোয়ানিজ—ডি'সিলভা নাম তার।

হতাশ হয়েই অতঃপর আমাদের ফিরে আসতে হয়েছিল।

অথ কাহিনীর উপক্রমণিকা বা মুখবন্ধ। অতঃপর দেড় বৎসরাধিককাল পরে যে কাহিনীর যবনিকা উত্তোলন করতে চলেছি তার সঙ্গে ঐ ইউসুফ মিঞার নামটা জড়িয়ে গিয়েছিল।।

।। দুই ।।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি সংবাদ সহসা আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সংক্ষিপ্ত সমাচার ঃ টেরিটি বাজারে নৃশংস খুন। টেরিটি বাজারের এক পাখীওয়ালা ইউসুফ মিঞাকে তার ঘরের মধ্যে গলাকাটা মৃতাবস্থায় রক্তাপ্লুত পাওয়া গিয়েছে।

বর্ষাকাল—এবারে বৃষ্টি বা মনসুন শুরু হয়েছে শ্রাবণের একেবারে শেষে। গতকাল বিকেল থেকে শহরে প্রবল বর্ষণ চলেছে একটানা প্রায় বলতে গেলে।

রাস্তাঘাট প্রায় জলমগ্ন। বৃষ্টি একবার সামান্যক্ষণের জন্য ধরে, আবার প্রবল বর্ষণ শুরু হয়। বিকেলে গতকাল এসেছিলাম কিরীটীর ওখানে কিন্তু গৃহে ফেরা হয়নি প্রবল বর্ষণের জন্য।

সকালবেলা তখনও আকাশটা যেন শ্লেটের মত ধূসর ও ভারি হয়ে আছে। থেকে থেকে বর্ষণ হচ্ছে। কিরীটীর বসবার ঘরে আমি কিরীটী ও কৃষ্ণা চা পান করছিলাম। আমার হাতে ঐদিনকার সংবাদপত্রটা।

সহসা পাতা ওলটাতে ওলটাতে সংবাদটি আমার চোখে পড়ল।

চমকে উঠলাম।

এ কি!

কি হল? কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকাল।

ইউসুফকে কে যেন তার দোকানঘরে নৃশংসভাবে খুন করে গিয়েছে।

ইউসুফ?

হ্যাঁ রে। সেই টেরিটি বাজারের চিড়িয়াওয়ালা—ইউসুফ মিঞা।

কি লিখেছে?

গতকাল সকালে তার দোকানঘরের মধ্যে তাকে রক্তাক্ত গলাকাটা মৃত পাওয়া গিয়েছে।

তার একটা ছেলে ছিল না—কি যেন নাম? কিরীটী মৃদুকণ্ঠে বললে।

সুলতান।

সুলতান ছিল না বুঝি ঐ সময়? সেও তো বাপের কাছেই থাকত?

সে রাত্রে সে দোকানে ছিল না। বরাহনগরে তার এক বন্ধুর ওখানে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিল। ভোররাত্রে গিয়ে দেখে দোকানের দরজাটা ভেজানো। দরজা ঠেলে খুলতেই একরাশ পাখী চারদিক থেকে তার চারপাশে ডেকে ডেকে উড়তে থাকে। ঘরের আলোটা নেভানো ছিল।

থতমত খেয়ে প্রথমটায় ব্যাপারটা না বুঝতে পেরে সে অন্ধকারে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। তারপর এগুতে গিয়ে পায়ে কি বেধে গিয়ে, মেঝের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তারপর কোনমতে উঠে আলো জ্বালতেই চোখে পড়ে তার বাপজান মেঝের উপর পড়ে আছে রক্তাপ্লুত অবস্থায়। তার গলাটা কাটা। সে তখুনি চিৎকার করে আশপাশের সকলকে ডাকে। অতঃপর পুলিস আসে। কাউকে এখনও গ্রেপ্তার করা হয়নি।

কিরীটী সংবাদটা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে, তারপর বলে, লোকটা তো যতদূর মনে পড়ে বেশ নিরীহ্ শান্তশিষ্ট টাইপের ছিল!

তাই তো ভাবছি, অমন একটা লোককে কে খুন করতে পারে? আর কেনই বা করল অমন করে?

কথা আমার শেষ হল না, জংলী এসে ঘরে ঢুকল, বাবু!

কি রে?

একটা লোক দেখা করতে চায়।

এত সকালে বৃষ্টি মাথায় করে আবার কে এল? বললাম আমি।

কিরীটী বলে, কি চায়? কোথা থেকে আসছে?

আজ্ঞে বললে, বিশেষ দরকার নাকি আছে আপনার সঙ্গে।

যা, কোথা থেকে আসছে, কি নাম—জিজ্ঞাসা করে আয়।

আজ্ঞে বললে, টেরিটিবাজার থেকে আসছে।

টেরিটিবাজার! চমকে উঠি।

হ্যাঁ—ইউসুফ মিঞার ছেলে সুলতান।

যা, এই ঘরে নিয়ে আয়। কিরীটী সঙ্গে সঙ্গে আদেশ দেয়।

জংলী চলে গেল।

একটু পরেই জংলীর পিছনে পিছনে যে যুবকটি এসে ঘরে ঢুকল তার বয়স বাইশ-তেইশের মধ্যে।

যুবকটি সুলতানই। বেশ কয়েক বছর পরে হলেও তাকে আমাদের কারোর চিনতে কষ্ট হয় না, কারণ বার-দুই ওকে ইউসুফের দোকানে দেখেছিলাম, তবে অন্য বেশভূষায়। তখন পরনে ছিল চেককাটা এক লুঙ্গি আর সাদা ময়লা পাঞ্জাবি। চুলের বাহারও বিশেষ ছিল না সে-সময়।

সাদামাটা চেহারা ও বেশ। আজ কিন্তু চেহারা ও বেশভূষায় অনেক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। মাথায় টেরি, কেয়ারী করে ছাঁট চুল ও ঠোঁটের উপরে বাটারফ্লাই গোঁফ, মেহেদী রাঙানো নূর দাড়ি। রংটা মাজা-মাজা। পেশল বলিষ্ঠ দেহের গড়ন। পরনে পায়জামা ও লক্ষ্ণৌ চিকনের পাঞ্জাবি।

চিড়িয়াওয়ালা ইউসুফ মিঞার বেটা বলে আজ যেন চিনবারই উপায় নেই সুলতানকে।

যেন কোন খানদানী মুসলমানের ঘরের ছেলে। বেশ সৌখীন, চেহারায় ও বেশভূষায়।

বাবুজী, আপনারা দুজনেই আছেন ভালই হল, সেলামালেকুম বাবুজী। আমাকে চিনতে পারছেন?

কিরীটী বললে, বস সুলতান।

কিরীটীর আহ্বানে কোনরকম সংকোচ না করে পায়ের জুতো খুলে ঘরের পুরু দামী কার্পেট মাড়িয়ে এসে একটা সোফার উপর আমাদের মুখোমুখি বসল, আপনারা যে গরীবকে চিনতে পারবেন বুঝিনি। বাবুজী, একটা বিশেষ কারণে আপনার কাছে এসেছি। সুলতান কিরীটীর মুখের দিকেই তাকিয়ে বলে কথাটা।

খবরের কাগজে একটু আগেই পড়ছিলাম, তোমার আব্বাজান—

হ্যাঁ বাবুজী, আমার আব্বাজানকে পরশু রাত্রে আমার অবর্তমানে কারা যেন শেষ করে রেখে গিয়েছে।

তুমি ছিলে না?

না বাবুজী, বরাহনগরে এক দোস্তের ওখানে গিয়েছিলাম। খানাপিনা শেষ হতে হতে অনেক রাত হল, তারপর কোন বাস বা গাড়ি পেলাম না, হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এসেছি।

কত রাতে পৌঁচেছিলে?

রওনা হয়েছিলামই তো রাত তিনটের পর, পৌঁছতে পৌঁছতে সেই প্রায় সাড়ে চারটে। আশেপাশে কোন জনমনিষ্যি নেই, দরজা ঠেলে আব্বাজানকে ডাকতে যাব, হঠাৎ দেখি দরজা খুলে গেল—হাতের ঠেকা লেগেই।

আমি শুধালাম তারপর।

চমকে গিয়েছিলাম। আব্বাজান তো কখনো দরজা খুলে শোয় না, খুব সতর্ক মানুষ! শোবার আগে দরজা ঠিক বন্ধ হল কিনা ভাল করে পরীক্ষা না করে কখনো শুতে যায় না। সেই মানুষ দরজা খুলে রেখেছে—কেমন যেন খট্‌কা লাগল।

দরজা খুলে যেতে প্রথমে তোমার চোখে কি পড়েছিল সুলতান? প্রশ্ন করে কিরীটীই এবারে।

অন্ধকার—পাখার ঝটপট শব্দ। মনে হল যেন অন্ধকার ঘরটার মধ্যে সব পাখীগুলো খাঁচা থেকে বের হয়ে পাখা ঝাপটাচ্ছে। প্রথমটায় কেমন যেন ভ্যাবাচাকা খেয়ে গিয়েছিলাম, অন্ধকারেই বোধহয় কয়েক পা এগিয়েছিলাম, হঠাৎ বাধা পেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম অন্ধকারে।

কিসে বাধা পেলে?

তখন বুঝতে পারিনি, পকেটে টর্চ ছিল না, তাই কোনমতে অন্ধকারেই উঠে দাঁড়িয়ে হাতড়ে হাতড়ে ঘরের দেওয়ালে আলোর সুইচটা টিপে দিতেই সব কিছু নজরে পড়ল। মেঝের উপর রক্তাক্ত অবস্থায় উপুড় হয়ে পড়ে আছে আমার আব্বাজান, ঘরের মেঝেতে চাপ-চাপ রক্ত আর ঘরের সব পাখীর খাঁচার দরজাই বলতে গেলে খোলা। উড়ছে, বসছে, ডানা ঝাপটাচ্ছে—সব যেন ওলটপালট তছনছ। কিন্তু সে-সব কিছু দেখবারও আমার সময় হয়নি। ছুটে গিয়ে আব্বাজানের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, আব্বাজান। আব্বাজান!

সেই সময় নজরে পড়ল আব্বাজানের গলাটা একেবারে দু-ফাঁক করে কাটা।

তারপর—তুমি কি করলে সুলতান?

আমার চেঁচামেচিতে আশপাশের দোকান থেকে সবাই ছুটে এল। তারাই তখন পুলিসে

খবর দেয়। পুলিস এল, সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করল, কিন্তু কেউ কোন হদিস দিতে পারল না। কেউ কিছু বলতে পারল না। কেউ কিছুই নাকি জানে না—জানতেও পারেনি।

সুলতানের মুখে সব কথা শুনে অনেকক্ষণ চুপ করে রইল কিরীটী।

তারপর একসময় প্রশ্ন করল, কিন্তু তুমি আমাদের কাছে এসেছ কেন?

বাবুজী, আমার আব্বাজানের কাছেই আপনার কথা শুনেছিলাম। আপনি খুব বড় একজন গোয়েন্দা, আব্বাজানই একদিন আমাকে বলেছিল। হঠাৎ কাল রাত্রে আপনাদের কথা আমার মনে পড়ল বাবুজী। কালই আসতাম, কিন্তু বৃষ্টির জন্য আসতে পারিনি। জানি না আমার আব্বাজানকে অমন করে কে খুন করেছে। কিন্তু যতক্ষণ না পর্যন্ত সে কথা জানতে পারছি আমার মনের দুঃখ যাবে না। কেবলই মনে হচ্ছে সে-রাতে যদি আমি বরাহনগরে না যেতাম তবে হয়ত ঐ ঘটনা ঘটত না। আমার আব্বাজানকে অমন করে প্রাণ দিতে হত না। মনে হচ্ছে তাই আমিই দায়ী—আমার আব্বাজানের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী। বলতে বলতে গলাটা যেন কান্নায় বুজে এল সুলতানের।

চোখের কোল বেয়ে দু ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

একটু থেমে হাতের পাতায় চোখের অশ্রু মুছে সুলতান বললে, জানেন বাবুজী, আব্বাজান সেদিন সন্ধ্যায় আমাকে যেতে দিতে চায়নি—বলেছিল আজ বরাহনগরে নাই গেলি বেটা, কিন্তু শুনিনি তার কথা। দোস্ত মুক্‌সুদ নিমন্ত্রণ করেছে—অনেককালের দোস্তী আমাদের—তাছাড়া অনেকদিন দেখাসাক্ষাৎ ছিল না—তাই আব্বাজানের কথায় কান দিইনি।

সুলতানের দু চোখের কোল আবার অশ্রুতে ভরে ওঠে।

বাইরে আবার বৃষ্টি নামল বেশ জোরে।

বাবুজী, আপনার যোগ্য পারিশ্রমিক হয়ত আমি দিতে পারবো না—তবে সাধ্যমত দেবো--কিছু টাকা আমি সঙ্গেই এনেছি। বলে একশো টাকার খান তিনেক নোট জামার পকেট থেকে বের করল সুলতান!

টাকা তুমি রাখ সুলতান। কিরীটী বললে।

বাবুজী, আপনি কি তাহলে আমাকে কৃপা করবেন না!

আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব তোমার আব্বাজানের হত্যাকারীকে খুঁজে বের করতে। আমার পারিশ্রমিকের জন্য তুমি ভেবো না, আগে কাজটা হোক তারপর যা খুশি তোমার তুমি দিও।

বাবুজী!

এখন কয়েকটা প্রশ্নের আমার জবাব দাও সুলতান!

বলুন?

তোমাদের কি কোন দুশমন বা শত্রু ছিল?

দুশমন!

হ্যাঁ, তোমার বা তোমার আব্বাজানের?

আমরা ঐখানে আজ বিশ সালেরও উপরে আছি। আব্বাজানকে সবাই ওখানে খুব ভালবাসত—কারণ দায়ে অদায়ে আব্বাজান সকলকেই অর্থ বা তাগদ দিয়ে সাহায্য করত। আমার সঙ্গে অবিশ্যি কখনও কখনও কারও ঝগড়াঝাঁটি মারামারিও হয়েছে, কিন্তু—

আচ্ছা ঐ ব্যবসায় তোমাদের লাভ হত কি রকম সুলতান?

মিথ্যে বলব না বাবুজী, আব্বাজান ঐ ব্যবসা করে বেশ কিছু জমিয়েছিল।

কত টাকা হবে?

তা দশ বারো হাজার তো হবেই।

সে টাকা কোথায় সে রাখত?

ঘরে একটা হাঁড়ির মধ্যে।

সে টাকাগুলো আছে তো?

হাঁড়িটা যেমন ছিল তেমনই আছে, সে আমি ঐদিনই দেখেছি।

তাহলে টাকার জন্য নয়!

কি বললেন বাবুজী?

না, তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে সুলতান, কেউ টাকা-পয়সার লোভে তোমার আব্বাজানকে খুন করেনি। আচ্ছা সুলতান!

বলুন বাবুজী?

।। তিন ।।

কিরীটী একটু থেমে বলে, কাউকে তুমি সন্দেহ কর, যে তোমার আব্বাজানকে খুন করতে পারে?

আমার মাথার মধ্যে তো কিছুই আসছে না বাবুজী, অমন নিষ্ঠুরভাবে কেউ আব্বাজানকে হত্যা করতে পারে!

আচ্ছা সুলতান?

বলুন বাবুজী।

পাখী কিনতে তো অনেকেই আসত তোমাদের কাছে?

তা আসত। অনেক সময় অনেক বড় বড় রহিস আদমীও আমাদের ঐ দোকানে পাখীর খোঁজে এসেছে।

গত সাতদিনের মধ্যে বা ধর দিন দশ-পনেরোর মধ্যে এমন কোন বিশেষ খরিদ্দার তোমাদের দোকানে এসেছিল কি, মানে আমি বলতে চাই সাধারণ পাখীর খদ্দের নয়, কোন দামী পাখী যা হয়ত এদেশে চট্ করে পাওয়া যায় না?

তেমনি তো কই কিছু মনে পড়ছে না বাবুজী।

সব সময়ই কি তুমি দোকানে থাকতে?

না, তা থাকতাম না বটে। আব্বাজানই সব সময় থাকত দোকানে। দোকান ছেড়ে কখনও আব্বাজান ইদানীং কোথায়ও যেত না।

হয়ত তুমি যখন ছিলে না, তখন আসতে পারে?

তা পারে হয়ত। ভাল কথা, মনে হচ্ছে কথাটা আপনার জানা উচিত।

কি কথা বল তো?

দিন পনের-ষোল আগের ব্যাপার। ডি'সিলভার সঙ্গে একটা লোক একটা সিঙ্গাপুরী ময়না নিয়ে এসেছিল। ঐ ধরণের ময়না আট-দশ বছরে হয়ত একটা-আধটা আসে।

সিঙ্গাপুরী ময়না?

হ্যাঁ। দেখতে ভারি সুন্দর। কালো কুচকুচে—ঠোঁটটা ঠিক সাধারণ ময়নার মত হলদে

নয়, হলদে আর সাদায় মেশানো, অনেকটা ফিকে সোনার মত রং, চোখ দুটো লাল। ঐ পাখীকে শেখালে সে যে কেবল মানুষের মত শেখানো বুলিই কপচায় তা নয়, মানুষের মত যা আপনি জিজ্ঞাসা করবেন তার মনিব সম্পর্কে, সব বলবে। মনিব যদি বেরুবার সময় কোথায় সে যাচ্ছে এবং কখন ফিরবে বলে যায়—কেউ এসে মনিব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে ঠিক বলে দেবে। অথচ না জানা থাকলে অন্য ময়না থেকে চট্ করে ঐ ময়নার পার্থক্য বোঝা যায় না।

ভারি আশ্চর্য তো।

হ্যাঁ বাবুজী, সত্যিই ওই পাখীর তুলনা নেই। দামও তেমনি।

কি রকম দাম?

দু হাজার তো বটেই—

বল কি সুলতান! একটা পাখীর দাম দু হাজার।

অমন চিজ, তার দাম হবে না! লক্ষ্ণৌর এক নবাবের ঐরকম একটা পাখী ছিল। নবাব মরবার পর সে পাখীটা চার হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছিল।

সেই রকম একটা ময়না এসেছিল তোমাদের দোকানে?

হ্যাঁ, ডি'সিলভার সঙ্গের লোকটি অমনি একটি ময়না এনেছিল।

ইউসুফ কিনেছিল ময়নাটা?

হ্যাঁ।

কতোয়?

হাজার টাকায়।

তারপর?

যে লোকটি ডি'সিলভার সঙ্গে এসেছিল ঐ ময়না নিয়ে, সে কিন্তু ঐ ময়নার গুণাগুণ জানত না। ডি'সিলভাও সঠিক জানত মনে হয় না। তবে ডি'সিলভা আব্বাজানের সঙ্গে ব্যবসা করে করে রীতিমত চালাক হয়ে উঠেছিল—আব্বাজানের মুখের হাবভাব দেখেই চিড়িয়ার দাম কিছুটা অনুমান করে নিত। তারপর দামদস্তুর শুরু করত। ঐভাবে দামদস্তুর করতে করতেই আঁচ করে নিলে ডি'সিলভা, চিড়িয়াটা দামী না সাধারণ চিড়িয়া একটা।

তারপর?

চিড়িয়া চিনতে আব্বাজানের জুড়ি এ শহরে ছিল না। আব্বাজানের মুখে শুনেছি প্রথম যৌবনে আব্বাজান লক্ষ্ণৌর এক সাহেবের কাছে চাকরি করত। তাঁর ছিল চিড়িয়া পোষার শখ। দেশ-বিদেশ ঘুরে ঘুরে নানা ধরনের চিড়িয়া এনে নিজের বাড়ির বাগানে বিরাট বিরাট খাঁচা তৈরী করে তার মধ্যে জড় করেছিলেন। সাহেবের যে চিড়িয়া পোষারই শখ ছিল তাই নয়, চিড়িয়া চিনতেও তাঁর জুড়ি দ্বিতীয় কেউ ছিল না। চিড়িয়া দেখেই তিনি বলে দিতে পারতেন কি জাতের কোন্ দেশের চিড়িয়া সেটা, তার কি গুণাগুণ। দীর্ঘ ছয় বছর তাঁর কাছে থেকে আব্বাজান চিড়িয়া সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছিল। পরে কলকাতা শহরে এসে চিড়িয়ার ব্যবসা শুরু করে।

কিন্তু সেই সিঙ্গাপুরী ময়নাটার কথা তুমি কি বলছিলে সুলতান? কিরীটী আবার প্রশ্ন করে।

সুলতান আবার বলতে শুরু করে, সেই লোকটা চিড়িয়া বেচে চলে গেলে আব্বাজানকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, অত দাম দিয়ে ঐ ময়নাটা কিনলে কেন? আব্বাজান বললে, যে

দামে কিনেছি তার তিন গুণ দামে চিড়িয়াটা বিক্রি হবে বেটা। তুই বরং এক কাজ কর, রায় সাহেবকে একটা খবর দিয়ে আয়।

মানে আমাকে!

হ্যাঁ, কিন্তু আসি-আসি করতে করতে আমার আসা হয়নি আপনার কাছে। ইতিমধ্যে একটা ব্যাপার ঘটেছিল—

কি?

চিড়িয়াটা কেনবার ঠিক দিন সাতেক পরে এক সন্ধ্যায় বিরাট একটা গাড়িতে চেপে একজন স্যুটপরা ভদ্রলোক আমাদের দোকানের সামনে এসে গাড়ি থেকে নামল। সে এসেই সেই চিড়িয়াটার খোঁজ করল। আব্বাজান বললে, আছে, কিন্তু দাম তিন হাজার টাকা পড়বে।

তারপর?

লোকটি চিড়িয়াটা দেখতে চাইল, আব্বাজান দেখাল, আর আশ্চর্য, খাঁচা সমেত চিড়িয়াটা তার সামনে এনে রাখতেই, চিড়িয়াটা হঠাৎ বলে উঠল, রবিন রবিন রবিন! আব্বাজান তখন শুধায় লোকটিকে, চিড়িয়াটা কি আপনার চেনা? আপনার নাম কি রবিন?

লোকটি কি জবাব দিল?

বললে না না, ওই চিড়িয়া আমি আগে কখনও দেখিইনি, তাছাড়া আমার নামও রবিন নয়। আব্বাজান আর কোন কথা বলে না। লোকটা দর-কষাকষি শুরু করল এবং শেষ পর্যন্ত দরে না পোষাতে লোকটা চলে গেল।

কত টাকা দিতে চেয়েছিল লোকটা?

দু হাজার পর্যন্ত দিতে চেয়েছিলি।

হুঁ। তারপর আর সে আসেনি?

না।

পাখীটা এখনও তাহলে বিক্রী হয়নি?

না। তবে—

কি?

সে রাত্রে আবার যখন একে একে চিড়িয়াগুলোকে খাঁচায় ভরলাম—সেই ময়নাটাকে কিন্তু দেখতে পেলাম না।

সে পাখীটা নেই?

না।

পুলিসকে কথাটা তুমি জানিয়েছিলে সুলতান?

না। মনে হয়নি। আজ আপনার কথা শুনে হঠাৎ মনে হওয়ায় কথাটা আপনাকে বললাম।

অনেকক্ষণ অতঃপর কিরীটী চুপ করে রইল। একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করে নিঃশব্দে ধূমপান করতে লাগল। মনে হল কিরীটী যেন কি ভাবছে।

সুলতান!

বাবুজী?

ডি'সিলভা কলকাতায় এলে কোথায় থাকে তুমি জান?

না তো বাবুজী। তবে সে আর কোথায় থাকবে—তার জাহাজেই থাকত।

আচ্ছা সেই লোকটিকে দেখলে তুমি চিনতে পারবে?

কেন পারব না—নিশ্চয়ই পারব।

লোকটা দেখতে কেমন বল তো?

লোকটা বেঁটে, গায়ের রং খুব ফর্সা, চ্যাপ্টা নাক, ছোট ছোট চোখ, পুরু ঠোঁট। ভারতীয় বলে ঠিক মনে হয় না।

বয়স কত হবে?

বছর চল্লিশ হবে।

আচ্ছা আজ তুমি যাও সুলতান, কাল হয়ত তোমার দোকানে একবার যেতে পারি। সন্ধ্যার দিকে দোকানে থাকবে তো?

থাকব।

অতঃপর সুলতান বিদায় নিল।

সুলতান বিদায় নেবার পরও অনেকক্ষণ কিরীটী নিঃশব্দে বসে বসে চুরোট টানতে থাকে। বুঝতে পারি কোন একটা চিন্তা কিরীটীর মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছে।

বাইরে বৃষ্টি সমানে ঝরতে থাকে। ঘণ্টাখানেক বাদে আমি বিদায় নিলাম।

কিরীটী তখনও পূর্ববৎ সোফাটার উপর বসে অন্যমনস্কভাবে ধূমপান করে চলেছে।

বাইরে বের হয়ে দেখি কিরীটীর বাসার সামনে বেশ জল জমেছে। প্রায় গোড়ালি ডুবে যায়। হীরা সিংকে ডাকলাম।

হীরা সিং আমাকে একটু বাসায় পৌঁছে দেবে?

কেঁউ নেই সাব্—ঠারিয়ে, হাম অভি গাড়ি লয়তেহেঁ।

হীরা সিং শেষ পর্যন্ত আমাকে গৃহে পৌঁছে দিয়ে গেল।

সারাটা দ্বিপ্রহর আমি ইউসুফের হত্যার ব্যাপারটাই চিন্তা করতে লাগলাম। সুলতানের কথায় মনে হল কোন ডাকাতি বা রাহাজানির ব্যাপার নয়। ইউসুফকে হত্যা করার পিছনে কারও কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু সেটা কি? কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে?

সেই ময়নাটার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই তো?

ময়নাটা নিখোঁজ হয়েছে।

সুলতানের কথা শুনে মনে হয় ইউসুফ মিঞার নৃশংস হত্যার সঙ্গে হয়ত ঐ কালো পাখীটার কোন যোগসূত্র কোথাও আছে এবং ঐ হত্যার পিছনে কোন গভীর রহস্য লুকিয়ে আছে।

সন্ধ্যার দিকে আবার কিরীটীর ওখানে গিয়ে দেখি কিরীটী তার বসবার ঘরে বসে আপনমনে তাস নিয়ে একা একা পেসেন্স খেলার মধ্যে মগ্ন হয়ে আছে। পাশের সোফায় গিয়ে বসলাম।

আড়চোখে তাকালাম কিরীটীর মুখের দিকে, কিন্তু তার মুখের কোথাও কোন চিন্তার রেখা পর্যন্ত যেন নেই।

একটা ইংরাজী পিকটোরিয়াল টেনে নিয়ে সামনের সেন্টার টেবিলের উপর রেখে তার পাতা ওলটাতে লাগলাম।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একসময় কিরীটীই কথা বলল, তুই চলে যাওয়ার একটু পরেই পূর্ণ লাহিড়ী এসেছিলেন।

ডি. সি.?

হ্যাঁ।

হঠাৎ?

সঙ্গে এক ভদ্রমহিলা ছিলেন।

ভদ্রমহিলা?

হুঁ।

কে সে?

সিঙ্গাপুরের এক বিখ্যাত জুয়েল-মার্চেণ্ট মিঃ জোসেফের বর্মিনী স্ত্রী মা'থিন।

হঠাৎ কি ব্যাপারে তোর কাছে এসেছিলেন?

ভদ্রমহিলার একাট বহু মূল্যবান মুক্তার হার চুরি গিয়েছে।

মুক্তার হার!

হ্যাঁ—তাঁর ধারণা সেটা ভারতবর্ষে এসেছে।

হঠাৎ ঐ রকম ধারণার কারণ?

কারণ একটা আছে বৈকি।

কি রকম?

ভদ্রমহিলার রঘুনাথন নামে এক মালয়ালী ভৃত্য ছিল। মাসখানেক আগে হঠাৎ রঘুনাথন নিরুদ্দেশ হয়ে যায় এক সকালে—অনেক খোঁজ করেও তাকে পাওয়া যায় না এবং ঐ দিনই ভদ্রমহিলা জানতে পারেন তাঁর বহুমূল্যবান সেই মুক্তার মালাটিও পাওয়া যাচ্ছে না।

মালাটা কোথায় ছিল?

আগের দিন একটা পার্টিতে ভদ্রমহিলা ঐ মুক্তার মালাটি গলায় পরে পার্টিতে যান—ফেরেন অনেক রাত্রে একটু মত্ত অবস্থাতেই। তাঁর স্পষ্ট মনে আছে রাত্রে গৃহে ফিরে শয়নের পূর্বে মালাটি গলা থেকে খুলে নিজের মাথার বালিশের তলায় খুলে রেখে দিয়েছিলেন। দুপুরে সেই মালার কথা মনে পড়ায় মালার খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন বালিশের নীচে মালাটি নেই। তখন তিনি ঘরের সর্বত্র খোঁজেন, যদি অন্য কোথায়ও রেখে থাকেন রাত্রে, কিন্তু বহু অনুসন্ধান করেও সেটির আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

তারপর?

আরও একটা ব্যাপার ঘটেছিল—

কি?

ভদ্রমহিলার একটি ময়না পাখী ছিল—

ময়না পাখী?

হ্যাঁ, ঠিক যেমনটি আমরা আজ সুলতানের মুখে শুনেছি তেমনি একটি ময়না ঐ মহিলার ছিল। রঘুনাথনের নিরুদ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে খাঁচাসমেত ঐ ময়নাটিও নিখোঁজ।

সত্যি!

হ্যাঁ। আর সেই কারণেই পরশু সকালের প্লেনে ঐ মহিলা কলকাতায় এসে পৌঁচেছেন--এখানকার পুলিসের সাহায্যে যদি কোন উপায়ে বের করা যায় তাঁর মুক্তার মালাটি—কারণ তাঁর স্থির বিশ্বাস ঐ মুক্তার মালা, ময়না পাখীটি ও রঘুনাথনের সঙ্গে একটা যোগাযোগ আছে। পূর্ণ লাহিড়ী তাই মহিলাকে আমার কাছে নিয়ে এসেছিলেন।

তবে কি কিরীটী—

কি?

ঐ ইউসুফের হত্যার সঙ্গে—

আমার ধারণা তাই সুব্রত। এবং আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তো ইউসুফ ঐ ময়নাটিকেই কিনেছিল ডি'সিলভার সঙ্গের সেই লোকটির কাছ থেকে—ওই পর্যন্ত বলেই সহসা কিরীটী সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়।

সুব্রত!

কি?

চল, একবার বেরুব।

রাত তখন আটটা হবে। বাইরে বৃষ্টি নেই বটে তবে আকাশ মেঘে মেঘে থমথম করছে।

এ সময় কোথায় বেরুবি? বাইরে আকাশের অবস্থা ভাল নয়। বললাম আমি।

কিরীটী সে কথায় কর্ণপাত না করে বললে, তুই বস্ সুব্রত, চট্ করে জামাটা গায়ে দিয়ে আসছি আমি।

কিরীটী ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

গাড়ি যখন রসা রোডে পড়ল ওভারব্রীজটার তলা দিয়ে, ঝমঝম করে বর্ষণ শুরু হয়ে যায়।

কিন্তু চলেছিস কোথায় এই বৃষ্টির মধ্যে?

প্রশ্নটা করে তাকালাম আমি আমার পার্শ্বে উপবিষ্ট কিরীটীর মুখের দিকে। অন্ধকারে কিরীটীর মুখটা ভাল দেখা যায় না। কিরীটী আমার প্রশ্নের জবাব না দিয়ে একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করতে ব্যস্ত হয় লাইটারের সাহায্যে। চুরোটটা ধরানো হলে পর বলল, আমাকে নয় হীরা সিংকে উদ্দেশ করে, হীরা সিং, গ্র্যাণ্ড হোটেল।

হীরা সিং নিঃশব্দে কেবল একবার মাথাটা হেলাল।

প্রবল বর্ষণের মধ্যে দিয়ে গাড়ি এগিয়ে চলেছে—ওয়াইপার দুটো ঘন ঘন ওঠানামা করছে উইণ্ডস্ক্রীনের মসৃণ গাত্রের উপর কিন্তু তাতে করে সামনের রাস্তাটা যে খুব স্পষ্ট দেখা যায় তা নয় বরং ভিতরের বাষ্পে কেমন ঝাপসা ঝাপসা হয়ে যায়।

ট্রাম, লরি, বাস, ট্যাক্সি ও প্রাইভেট কারগুলো যথাসাধ্য নিজেদের বাঁচিয়ে এদিক ওদিক চলেছে।

তারই মধ্য দিয়ে ছাতা মাথায় পথিকের দল চলেছে। পথের দু পাশে দোকানের সামনে প্রবল ধারার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মানুষের ভিড় জমেছে।

ভাবছিলাম কিরীটী হঠাৎ গ্র্যাণ্ড হোটেলে এ সময় চলেছে কেন?

হঠাৎ কিরীটীর কথায় চমক ভাঙল।

সুব্রত!

কি?

ম্যাডাম মা'থিন গ্র্যাণ্ডে উঠেছেন—তাঁর ওখানেই যাচ্ছি। একদম মনে ছিল না রে—ভদ্রমহিলা আজ সন্ধ্যার সময় তাঁর সুইটে ড্রিঙ্কের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন।

কথাটা যদিও আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নয়—কারণ কিরীটী এই বৃষ্টির মধ্যে কেবল এক স্বল্পপরিচিতা মহিলার ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণে তাঁর হোটেল-সুইটে চলেছে, কথাটা আর যেই বিশ্বাস করুক আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

তাই চুপ করেই রইলাম।

তোকে কিন্তু একটা কাজ করতে হবে সুব্রত।

কি? আবার তাকালাম কিরীটীর মুখের দিকে অন্ধকারে।

আমি যখন ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা বলব, তুই যতটা সম্ভব চারদিক নজর দিয়ে দেখবি।

তুই কি ড্রিঙ্কের নিমন্ত্রণ রাখতেই চলেছিস?

তাছাড়া আর কি! ভদ্রমহিলা খুব অ্যাকমপ্লিশড়—আলাপ করে আনন্দ পাবি। চোখে-মুখে একটা বুদ্ধির প্রাখর্য আছে।

আমি কোন জবাব দিই না।

হোটেলে পৌঁছে—লিফটে তিনতলায় উঠে লম্বা করিডোরটা অতিক্রম করে নির্দিষ্ট সুইটের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম।

বেল টিপতেই ভিতর থেকে নারীকণ্ঠে আহ্বান এল, কাম ইন!

।। চার ।।

ভিতরে প্রবেশ করে সুইটের সিটিং রুমেই ভদ্রমহিলার সঙ্গে মুখোমুখি হলাম।

ভদ্রমহিলা সত্যিই সুন্দরী—দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত নিঃসন্দেহে।

বয়স চল্লিশের কাছাকাছি হবে। রোগা পাতলা গড়ন। গাত্রবর্ণ উজ্জ্বল গৌর। পরনে বর্মিনীদের ধরনে একটি দামী সিল্কের লুঙ্গি ও গায়ে আদ্দির ফুলহাতা জামা। মুখের গড়ন ঠিক বর্মিনীর মতই।

পাতলা একটা প্রসাধনের ছাপ মুখে। মাথায় বিরাট একটি প্যাগোডা খোঁপা। দু হাতে তিনগাছা করে হীরকখচিত চুড়ি, গলায় হীরার কণ্ঠি, কানে হীরার দুল। উজ্জ্বল আলোয় হীরকখণ্ডগুলি যেন ঝিলিক হানছিল।

গুড় ইভনিং—আসুন মিঃ রায়, আপনার জন্যেই আমি অপেক্ষা করছিলাম। কথাটা বলে মহিলা আমার দিকে একবার তাকিয়ে পুনরায় কিরীটীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।

আমার বন্ধু—সহকারী—সুব্রত রায়।

মহিলা প্রত্যুত্তরে মৃদু হেসে বললেন, আপনারা দুজনেই রায়?

হ্যাঁ। হাসল জবাবে কিরীটী।

বসুন।

মুখোমুখি দুটো সোফায় আমরা বসলাম। মহিলাও বসলেন মুখোমুখি।

বাইরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে, তাই না?

হ্যাঁ। কিরীটী জবাব দিল।

বৃষ্টি দেখে ভাবছিলাম বোধ হয় আসতে পারবেন না!

কিরীটী মৃদু হেসে বললে, এ সময় বৃষ্টি তো হবেই—মনসুন—

উনি যখন আপনার সহকারী—আমরা নিঃসংকোচেই কথাবার্তা বলতে পারি মিঃ রায়, তাই তো?

হ্যাঁ।

মালা!

মহিলার ডাকে ভিতরের ঘর থেকে একটি চব্বিশ-পঁচিশ বছরের বর্মী তরুণী বের হয়ে

এল।

ইয়েস ম্যাম্—

বুঝলাম মালা ঐ মহিলার পরিচারিকা।

মালাও দেখতে সুন্দরী এবং পরিচারিকা হলেও তার বেশভূষা দামী এবং চোখে-মুখে প্রসাধনের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

মালা, ড্রিঙ্কস্! কি দেবে বলুন মিঃ রায়—হুইস্কি?

আনুন।

আমার কাছে কিন্তু সব রকম ড্রিঙ্কসই আছে—অন্য কিছু যদি—

না, হুইস্কিই আনতে বলুন।

বলা বাহুল্য ইংরাজীতেই কথাবার্তা চলছিল। ভদ্রমহিলা চমৎকার শুদ্ধ ইংরাজী বলেন।

মালা চলে গেল।

আরও আধঘণ্টা পরে। দ্বিতীয় রাউণ্ড ড্রিঙ্কস চলেছে তখন। দেখলাম ভদ্রমহিলা বেশ ভালই ড্রিঙ্কস করতে অভ্যস্ত।

কিছুক্ষণ নানা ধরনের কথাবার্তার পর হঠাৎ একসময় ভদ্রমহিলা বলেন, মিঃ লাহিড়ী বলছিলেন, আপনি ঠিকই আমার হারটা উদ্ধার করে দেবেন।

কিরীটী কোন জবাব দেয় না।

মহিলা আবার বলেন, আমি যখন আমার স্বামীকে বললাম, এ আর কারও কাজ নয়—ওই রঘুনাথনেরই কাজ আর সে হারটা চুরি করে সোজা ইণ্ডিয়াতেই এসেছে, জোসেফ কি বলেছিল জানেন?

কি?

বলেছিল তাই যদি হয়ে থাকে তাহলে জেনো সে হার আর কোনদিনই ফিরে পাওয়া যাবে না। কারণ রঘুনাথনকে কোনদিনই আর trace করতে পারবে না। আচ্ছা মিঃ রায়—

বলুন?

একবার ওর দেশে গিয়ে খোঁজ করলে হত না?

একটা কথা মিসেস জোসেফ—

কি বলুন তো?

ওই রঘুনাথনের কোন ছবি আপনার কাছে আছে?

ছবি? You mean, Photo?

হ্যাঁ।

আমার album-এর মধ্যে থাকতে পারে। Yes—হ্যাঁ, মনে পড়েছে—আমার পাখীটার খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে ও যখন একদিন পাখীটাকে খাওয়াচ্ছিল আমি পাখীটার একটা ফটো নিয়েছিলাম—বোধ হয় সেটা আমার album-এ আছে।

রঘুনাথনই কি পাখীটাকে খাওয়াত নাকি?

হ্যাঁ। পাখীটা ওকে খুবই ভালবাসত। বেশীক্ষণ ওকে না দেখতে পেলেই পাখীটা চেঁচাত নাথন নাথন করে!

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। সামনে এলে চুপ করত।

মিসেস জোসেফ!

বলুন?

Album কি আপনার সঙ্গে আছে?

হ্যাঁ।

একবার দেখতে পারি album-টা?

আনছি আমি।

মহিলা উঠে গেল এবং একটু পরেই সুদৃশ্য চামড়ার দামী একটা অ্যালবাম হাতে ঘরে এসে ঢুকলেন।

এই যে—

মহিলা নিজেই পাতা উলটে ফটোটা বের করে দিলেন।

কিরীটী হাতে নিয়ে অ্যালবামের ফটোটা দেখতে লাগল। আমিও দেখি। হঠাৎ চোখ তুলতেই নজরে পড়ল দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে মালা।

মালার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে সরে গেল চট্ করে দরজার আড়ালে।

এই ফটোটা আমি নিতে পারি?

নিশ্চয়ই—খুলে নিন না।

কিরীটী অ্যালবাম থেকে ফটোটা খুলে নিল। পোস্টকার্ড সাইজের সিপিয়া প্রিন্টিং করা ফটোটা। খুব ভাল উঠেছে ফটোটা।

পাখীটার ক্লোজ-আপে ফটোটা তোলায় রঘুনাথনের মুখটাও স্পষ্ট উঠেছে। রঘুনাথন বোধ হয় ফটো তোলার সময় যে ফটো তুলছিল তার দিকেই তাকিয়ে ছিল।

মহিলা আবার বললেন, জোসেফ আমাকে ইণ্ডিয়াতে আসতে দিতে চায়নি—একপ্রকার জোর করেই আমি চলে এসেছি—কারণ হারটার সঙ্গে আমার একটা সেন্টিমেন্ট জড়িয়ে ছিল—

কি রকম? কিরীটী প্রশ্ন করে।

জোসেফ আমার স্বামী হলেও বলব, মানুষ বড় কৃপণ-প্রকৃতির।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। হাত দিয়ে তার কখনও একটা পয়সা গলে না। তবু গতবছর আমাদের ম্যারেজ-অ্যানিভারসারি ডে-তে সে ওই পার্লের হারটা আমাকে প্রেজেন্ট করেছিল—আর আমাদের এগার বছরের ম্যারেড লাইফে ওই প্রথম তার বিবাহ বার্ষিকীতে মূল্যবান প্রেজেন্ট আমাকে। যার দাম কমপক্ষেও ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা!

কিন্তু তাই যদি বলেন তো—

কিরীটী মুখের কথা শেষ হল না, মা'থিন বললেন, বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার এ হীরার সেটটার কথা বলছেন তো?

হ্যাঁ—মানে—

কিন্তু ওই সেটটা জোসেফের দেওয়া নয়।

যদি কিছু মনে না করেন তো—

মনে করবার কিছু নেই মিঃ রায়—মা'থিন হাসলেন। হেসে বললেন, এটা আমার বাবার বিয়েতে দেওয়া উপহার।

কিন্তু মনে হচ্ছে ও হীরাগুলো নকল নয়—অনেক দাম হবে।

আমার বাবার আমিই একমাত্র সন্তান। বাবারও জুয়েলারীর ব্যবসা আছে—রেঙ্গুনের একজন ধনী নামকরা জুয়েলার আমার বাবা।

একটা কথা বলব মিসেস জোসেফ?

বলুন?

অ্যালবামের প্রথম পাতাতেই যে ফটোটা দেখলাম আপনার পাশে—তিনি নিশ্চয়ই আপনার স্বামী?

হ্যাঁ, আমার স্বামী। তাহলেও আমিই কিন্তু প্রথম পক্ষ। আমাদের দুজনার মধ্যে বয়সের পার্থক্য অনেক। প্রায় বাইশ বছর।

বাইশ বছর!

হ্যাঁ। যখন আমাদের বিয়ে হয় আমার বাইশ আর আমার স্বামীর চুয়াল্লিশ—rather he was an old man at that time. বাবার এতটুকুও ইচ্ছা ছিল না আমাদের বিয়ের ব্যাপারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে মত দিতে হয়েছিল আমার একান্ত ইচ্ছা দেখে।

বলতে বলতে একটু থামলেন মা'থিন। হাতের গ্লাসটা তাঁর শূন্য হয়ে গিয়েছিল, একটা বড় পেগ গ্লাসে ঢেলে সোডা মিশিয়ে দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে বলতে লাগলেন আবার মা'থিন, জোসেফ দামী ও রেয়ার জুয়েলসের সন্ধানে বলতে গেলে সারা পৃথিবীটা ঘুরেছিল তার দীর্ঘ বাইশটা বছর—জীবনের বিচিত্র তার সে অভিজ্ঞতা। মধ্যে মধ্যে সে রেঙ্গুনে আসত, আমাদের মার্চেন্ট স্ট্রীটের বাড়িতে থাকত। ওই আসা যাওয়াতেই তার সঙ্গে আমার আলাপ হয়।

মা'থিন আবার থামলেন।

তারপর?

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর বাইরের ঘরে বসে বসে জোসেফ তার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা-নানা ধরনের দামী—রেয়ার জুয়েলসের বিচিত্র সব কাহিনী আমাকে শোনাত। গল্প-উপন্যাসের চাইতেও সে-সব রোমাঞ্চকর। আমি অদ্ভুত একটা thrill যেন অনুভব করতাম সেই সব কাহিনী জোসেফের মুখে শুনতে শুনতে। একটু একটু করে তার প্রতি আমি আকৃষ্ট হই—হয়ত সমস্ত ব্যাপারটা আপনাদের কাছে absurd—অবিশ্বাস্য মনে হবে, কিন্তু তবু আমি যেন কেমন একটা আকর্ষণ অনুভব করতাম, আর সেই আকর্ষণই আসলে তার প্রতি অনুরক্ত করে তোলে ক্রমশঃ।

আমি বললাম ঐ সময়, rather interesting!

মা'থিন বলতে লাগলেন, ও কয়েকদিন পরে চলে যেত, আমি কিন্তু ওর পথ চেয়ে থাকতাম। আবার কবে আসবে! লুকিয়ে আমি অবশেষে ওকে পত্র লেখা শুরু করি। ওর জবাব আসত আমার এক বান্ধবীর ঠিকানায়। বলতে পারেন ঐ চিঠি লেখালেখির মধ্যে দিয়েই আমাদের পরস্পরের মধ্যে নিবিড় এক ভালবাসা গড়ে ওঠে।

তারপর?

তারপর আর কি, একদিন আমাদের বিয়ে হয়ে গেল। বাবা-মা প্রথমটায় খুব আপত্তি করেছিল, কিন্তু আমার জেদের কাছে তারা হার মানতে বাধ্য হল। চলে এলাম স্বামীর সঙ্গে সিঙ্গাপুরে....কিন্তু বিয়ের পর পাঁচটা মাসও গেল না, আমার ভুল ভেঙে গেল।

ভুল!

তাই বলব—ভুলই। কারণ দেখলাম আমাদের গৃহে যখন সে গিয়ে অতিথি হত, তখনকার

আলাপ-আলোচনা ও পরবর্তীকালে চিঠিপত্রের লেনদেনের ভিতর দিয়ে যে আলাপ-আলোচনা আমাদের হয়েছে সেটা জোসেফের চরিত্রের একটা দিক মাত্র এবং সেটা তার চরিত্রের আদৌ আসল দিক নয়।

কি রকম?

জিজ্ঞাসা করলাম আমিই মা'থিনের মুখের দিকে তাকিয়ে।

যদিও ইতিমধ্যে আমরা—আমি বা কিরীটী দুটো পেগের বেশী খাইনি, মা'থিন কিন্তু ছ'টা পেগ শেষ করে সপ্তম শুরু করেছিলেন।

লিকারের প্রভাবে তখন তাঁর মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। চোখের তারা দুটো চক্‌চক করছে। বেশ নেশা হয়েছে—আর হবারই কথা।

অনর্গল সে বকে চলেছে। নেশার প্রভাবে মানুষ এমনিই হয়—বল্গাহীন হয়ে পড়ে।

হাতের গ্লাসে আর একটা চুমুক দিয়ে মা'থিন বললেন, মানুষটা দেখলাম জীবনে দুটি বস্তুই ভালবেসেছে—আর তা হচ্ছে ঐসব জুয়েলস ও অর্থ। তার মনের সমস্ত কোমলতা- —সেন্টিমেন্ট—আশা-আকাঙ্ক্ষা সব যেন ঐ নীরস পাথরগুলো এবং অর্থকে ঘিরেই। অবিশ্যি সে যে আমাকে কোনরকম অবহেলা বা অযত্ন করত তা নয়—কিন্তু একজন অল্পবয়সী যুবতীর পক্ষে তার কি মূল্য বলুন—স্বামীর অবহেলা বা অযত্ন তবু সহ্য হয়—কিন্তু ক্যালাসনেস সহ্য হয় না।

মা'থিন আবার থামলেন।

একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন, আমি যেন দিন-কে-দিন হাঁফিয়ে উঠতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত বাড়িতে আর টিকতে পারতাম না—আমি বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়াতে শুরু করলাম। ক্লাবে-পার্টিতে যোগ দিয়ে সময় কাটাতে লাগলাম। অবশেষে ড্রিঙ্ক করতে শুরু করলাম।

আপনার স্বামী জানেন না এসব?

সব জানে। কিন্তু সে কখনও আজ পর্যন্ত আমার কোন ব্যাপারে ইন্টারফিয়ার করেনি। সেই থেকে গত কয় বছর ধরে সে আছে তার জুয়েলস আর অর্থ নিয়ে, আর আমি আছি আমার নিজস্ব জীবন নিয়ে। গত বছর আমাদের ম্যারেজ-অ্যানিভারসারিতে আমি বলেছিলাম, আমাকে তো আজ পর্যন্ত কিছুই প্রেজেন্ট করলে না—এবারে এমন কিছু দাও যাতে অন্তত মনে হয় আমারও একটা প্রয়োজন তোমার জীবনে আছে।

তারপর?

ও বললে, কি চাও বল?

যা চাই প্রাণে ধরে দিতে পারবে তো।

পারবো—বল।

তোমার সিন্দুকের মধ্যে একবার একটা বাক্সে তুমি কতকগুলো সেরা মুক্তো দেখিয়েছিলে- —ঐ মুক্তোগুলো দিয়ে আমাকে একটা হার করে দাও।

বেশ—দেব। বললে জোসেফ।

সেই মুক্তো দিয়েই বোধ হয় হারটা তৈরী হয়েছিল?

হ্যাঁ।

কিন্তু এক কথায় মুক্তোগুলো তিনি আপনাকে প্রেজেন্ট করে দিলেন, আশ্চর্য লাগছে।

প্রথমটায় আমারও তাই মনে হয়েছিল, পরে মনে হল ওই মুক্তোগুলো সারা পৃথিবী

ঘুরে ঘুরে জোসেফ সংগ্রহ করেছিলো—ওগুলো সে বেচত না। অনেক টাকার অফার পেয়েও কখনও বেচেনি।

কেন?

সত্যিই আশ্চর্য ছিল যেন সেই মুক্তোগুলো। সাদা মুক্তোগুলোর ভেতর থেকে যেন অদ্ভুত দ্যুতি বের হত—কোনটা নীল—কোনটা গোলাপী—কোনটা কমলালেবুর রঙ—জোসেফ বলত ওই ধরণের মুক্তো একই প্রকারের ও একই সাইজের বেশী হয় না। অত্যন্ত রেয়ার স্পেসিমেন সেগুলো। তাই ওর ওই মুক্তোগুলোর প্রতি একটা অদ্ভুত মমতা ছিল—প্রাণে ধরে কখনো বেচতে পারেনি। কিন্তু আমাকে দিলে সেগুলো বেচাও হল না, ঘরের জিনিস ঘরেই রইল তার চোখের সামনে—আমাকেও উপহারের সান্ত্বনা দেওয়া হল—তাই বোধ হয় সেগুলো দিয়ে আমাকে একটা হার করে দিতে তার আপত্তি হয়নি।

মুক্তোর হারটা চুরি যাবার পর নিশ্চয়ই তাহলে আপনার স্বামীর খুব লেগেছে?

শুধু লাগেনি মিঃ রায়, ও যেন পাগল হয়ে গিয়েছে মুক্তোর হারটা হারিয়ে যাওয়ায়। খায় না দায় না— কোথায়ও বের হয় না—এমন কি ব্যবসা পর্যন্ত গুটিয়ে বসে আছে সেই অবধি।

স্বাভাবিক। বলি আমি।

ছাব্বিশ বছর ধরে একটা একটা করে মুক্তোগুলো সে সংগ্রহ করে আগলে রেখেছিল যখের ধনের মত—কাজেই বুঝতে পারছেন সেই মুক্তোগুলো ওইভাবে চুরি যাওয়ায় তার মনের অবস্থা কি হতে পারে! সত্যি কথা বলতে কি মিঃ রায়, এখন আমার মনে হচ্ছে যদি মুক্তোগুলোর ওপরে লোভ না করতাম তবে তো সে আমাকে দিত না আর সেগুলোকে অমন করে হারাতেও হত না। সব কিছুর জন্য আজ তাই আমার নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে। আমি যেন কিছুতেই নিজের মনকে সান্ত্বনা দিতে পারছি না।

মার্থিনের চোখের কোল দুটো জলে ভরে আসে। নেশায় রক্তিম চোখ দুটো জলে টলমল করতে থাকে। আর এও আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়, মুখে ওই মহিলা একটু আগে যাই বলুক—ওর স্বভাবে-চরিত্রে যতই অসামঞ্জস্য থাক, ও ওর স্বামী জোসেফকে সত্যিই ভালবাসে। আর হয়ত নিজেও সে কথাটা নিজে জানে না।

কথা বলা বোধ হয় শেষ হয়ে গিয়েছিল মার্থিনের, সে অতঃপর কেমন যেন ঝিম দিয়ে বসে থাকে।

রাত বেশ হয়েছে। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলাম রাত তখন প্রায় সোয়া এগারোটা। বাইরে এখনও বৃষ্টি পড়ছে কিনা কে জানে।

শীততাপনিয়ন্ত্রিত হোটেলের ঘরের মধ্যে বসে সেকথা জানবারও উপায় ছিল না।

কিরীটীও চুপচাপ বসে।

তার বসবার ভঙ্গির মধ্যে শীঘ্র ওঠবার কোন লক্ষণই যেন পরিলক্ষিত হয় না।

ঘরের মধ্যে আমাদের তিনজনকে ঘিরে একটা স্তব্ধতা থমথম করছে।

হঠাৎ কিরীটীই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে বললে, আচ্ছা মিসেস জোসেফ, আপনার যে হারটা খোয়া গিয়েছে তার মধ্যে কতগুলো মুক্তো ছিল বলতে পারেন?

ওই মুক্তোর মালার মধ্যে যে মুক্তোর কথা একটু আগে বলেছি সব তা ছিল না।

তবে?

রেয়ার ও মূল্যবান মুক্তো ছিল গোটা-কুড়িক—তার মধ্যে ব্লু কুইন মুক্তোটি ছাড়াও গোটা

এগারোর দাম সব চাইতে বেশী—অন্তত বিশ হাজার তো তার দাম হবেই। বাকিগুলো ছিল যদিও আসল মুক্তো, তাহলে অত দামের নয়।

আর কতগুলো মুক্তো ছিল?

বোধ হয় সব সমেত আটচল্লিশটা। কিন্তু ও কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন মিঃ রায়?

কারণ মুক্তোগুলো সব হয়ত পারব না আমরা শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করতে।

পারা যাবে না?

না। কারণ আমার অনুমান—

কী?

মুক্তোর মালাটা যে চুরি করেছে সে সঙ্গে সঙ্গেই হার থেকে মুক্তোগুলো খুলে ফেলেছে।

কেন—ও কথা বলছেন কেন?

যেহেতু চোরের ঐ মালার মধ্যে সত্যিকারের আসল ও রেয়ার যে মুক্তোগুলো ছিল সেগুলোর উপরেই লোভ ছিল। সে হয়ত তাই মালাটা হাতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মালা থেকে সে মুক্তোগুলো খুলে নিয়েছে—আর সব মুক্তোগুলোও হয়ত একজনের কাছে নেই।

কি বলছেন আপনি মিঃ রায়?

মুক্তোগুলো লুকিয়ে রাখতে হলে সেটাই প্রকৃষ্ট উপায়। আচ্ছা যে বিশেষ মুক্তোগুলোর কথা একটু আগে আপনি বললেন তার এক-একটির সাইজ কি রকম হবে?

কম-বেশী এক একটা মটরের আকার হবে।

আচ্ছা মিসেস জোসেফ, আজ রাত অনেক হল, এবারে আমরা উঠব।

সে কি, এত রাত্রে কিছু না খেয়ে যাবেন?

আজ নয়—যদি আপনার মুক্তোগুলো উদ্ধার করতে পারি তাহলে একদিন সে ভোজ খাওয়া যাবে।

সে রাত্রের মত অতঃপর আমরা বিদায় নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

।। পাঁচ ।।

বাইরে বের হয়ে দেখি বৃষ্টি তখনও ঝরছে।

তবে বর্ষণ প্রবল নয়—ঝিরঝিরে বর্ষণ। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন কালো। এলোমেলো জলো হাওয়া বইছে। গাড়িতে উঠে বললাম, আমাকে নামিয়ে দিয়ে যা কিরীটী।

আর কৃষ্ণা হয়ত ওদিকে আমাদের জন্য গরম খিচুড়ি করে অপেক্ষা করছে। হীরা সিং, কোঠি চল।

আমি আর প্রতিবাদ করলাম না।

গাড়ি কিরীটীর গৃহের দিকেই চলল।

কিরীটী।

উঁ?

তুই কি সত্যিই মনে ভাবিস—

কী?

ঐ মুক্তোগুলোর সন্ধান করতে পারবি? সেগুলো হয়ত এতদিনে কোন্ সুদূরে পাচার

হয়ে গিয়েছে!

সম্ভব নয়।

কেন?

প্রথমতঃ ঐ মুক্তোগুলোর দাম একমাত্র সাচ্চা জহুরীর কাছেই—সবাই ওর মূল্য বুঝবে না ; দ্বিতীয়ত, যে মুক্তোগুলো সরিয়েছে সে ভাল করেই জানে জোসেফের প্রাণ ছিল ঐ মুক্তোগুলো এবং সে রীতিমত একজন জুয়েলার হিসাবে পরিচিত ব্যক্তি—তার অর্থও আছে, কাজেই সে এত সহজে ব্যাপারটা হজম করে নেবে না হয়ত ; তৃতীয়ত, ঐ মুক্তো ক্রয়ের জন্য উপযুক্ত খরিদ্দার চাই—

কিন্তু ধর, সে যদি সিঙ্গাপুরেই ওর খরিদ্দার পেয়ে গিয়ে থাকে?

পেলেও সে মুক্তোগুলো ঐ সিঙ্গাপুরে বসেই বেচা-কেনার সাহস পাবে না। কাজেই তাকে সিঙ্গাপুর ছেড়ে অন্যত্র যেতে হবেই এবং সেদিক দিয়ে ভারতবর্ষের মত জায়গাই হচ্ছে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান।

তাহলে মুক্তো-চোর বর্তমানে নিশ্চয়ই এখানেই এসেছে তোর ধারণা?

নিঃসন্দেহে।

কিন্তু ইউরোপেও তো সে যেতে পারে?

পারে, কিন্তু সেখানে বিক্রি করার চাইতে এখানে তার আরও সুবিধে হবে। তাছাড়া এই ব্যাপারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট আর একটা বিশেষ ব্যাপার তুই ভুলে যাচ্ছিস কেন সুব্রত?

কি?

সেই কালো পাখীটা!

কালো পাখী?

হ্যাঁ রে, সেই ময়না পাখীটা!

তোর কি ধারণা তাহলে সত্যিসত্যিই ঐ কালো পাখীটার সঙ্গে জোসেফের মুক্তোগুলো চুরি হওয়ার কোন যোগাযোগ আছে?

কেবলমাত্র ধারণা নয় সুব্রত, আমি বলনে পারি এখন একেবারে স্থিরনিশ্চিত।

সত্যি?

হ্যাঁ, যার প্রথম পর্বের মুক্তোর মালাটি চুরি—দ্বিতীয় পর্বে মার্থিনের ভৃত্য রঘুনাথনের অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ ও সেই সঙ্গে কালো পাখীটা—তৃতীয় পর্বে উভয়ের ভারতে আগমন—চতুর্থ পর্বে হতভাগ্য চিড়িয়া-ব্যবসায়ী ইউসুফ মিঞার অজ্ঞাতে অগ্নিতে হস্তপ্রসারণ—পঞ্চম পর্বে তার নৃশংস মৃত্যু ও সেই সঙ্গে পুনরায় কালো পাখীটির নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া—সব ঘটনাগুলোই যদি বিচার করিস তো দেখবি একের অন্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে এবং যা আমাদের চক্ষুকে অঙ্গুলি প্রদর্শন করে বলে দিচ্ছে মুক্তোগুলো সিঙ্গাপুর থেকে ভারতবর্ষেই এসেছিল।

তারপর?

তারপরের ব্যাপারটি অবশ্যই কিছুটা জটিল।

জটিল কেন?

জটিল হচ্ছে, ওই ঘটনার সঙ্গে ডি'সিলভা কেমন করে জড়িত হয়ে পড়ল! তারপর যে স্যুট-পরিহিত লোকটি—দেখতে বেঁটে, গায়ের রং ফর্সা, চেপ্টা নাক, ছোট ছোট চোখ, পুরু ঠোঁট, বছর চল্লিশ বয়স—যার বর্ণনা শুনে ভারতীয় বলে মনে হয় না, ময়নাটা কিনতে

ইউসুফের দোকানে এসেছিল দিনসাতেকের মধ্যেই—সে লোকটি কে? সে অবশ্যই ময়নাটার খোঁজ পেয়েছিল, কেমন করে পেল?

হয়ত ডি'সিলভার কাছে শুনেছিল সে।

না।

কেন?

তাই আমার ধারণা। সে কোনক্রমে জানতে পারে ব্যাপারটা। তাই ময়নাটা হাতাবার জন্য দু হাজার টাকা পর্যন্ত দর তুলে একটা চান্স নিয়েছিল মাত্র, তাতে যখন হল না সে চলে গেল। অবশ্যই সে চোখের আড়ালে গেলেও ময়নাটার লোভ ছাড়তে পারেনি এবং সুযোগের অপেক্ষায় ছিল।

তুই কি তবে বলতে চাস কিরীটী, সেই লোকটাই—

আমার অনুমান যদি মিথ্যা না হয় তো সুব্রত সে-ই ইউসুফের হত্যাকারী ও ময়না-চোর।

তাহলে ডি'সিলভা বা যে লোকটি ময়না বেচেছিল তারা কি—

না, তারা ময়নাটার সত্যিকারের দাম জানত না, কল্পনাও করতে পারেনি।

ডি'সিলভার সঙ্গে যে লোকটি ময়না বেচতে এসেছিল সে কি রঘুনাথন?

সম্ভবতঃ নয়।

তবে কে?

সে এক তৃতীয় ব্যক্তি। হয়ত—

কী?

ইউসুফের মত তাকেও বেঘোরে প্রাণ দিতে হয়েছে ওই ময়নাটার জন্যই।

বলিস কি।

হ্যাঁ—ময়নাটা চুরি পর্যন্তই তার শেষ কীর্তি। তারপরেই তাকে লোভের দণ্ড দিতে হয়েছে।

আমি তোর কথাটা ঠিক বুঝতে পারছি না এখনও। তাছাড়া তুই ধারণাই বা করছিস কি করে রঘুনাথন নিহত হয়েছে?

ঐ মুক্তোগুলো অভিশপ্ত রে।

অভিশপ্ত—মানে?

মানে সেই মুক্তোই রঘুনাথনের মৃত্যুর কারণ বলে।

মুক্তোগুলো।

হ্যাঁ—কিন্তু আর না, বাড়ি পৌঁছে গিয়েছি। কৃষ্ণার টেম্পারের মারকারী কলমটা হয়ত এখন শেষ ঊর্ধ্ব সীমানায় আরোহণ করেছে আমাদের বিলম্বের জন্য, চল্।

গাড়ি এসে ঐ সময় দোরগোড়ায় থামল।

বৃষ্টি তখনও ঝিরঝির করে অবিশ্রান্ত পড়ছে।

।। ছয় ।।

কৃষ্ণা সত্যিই চটে গিয়েছিল।

কারণ ইদানিং কিরীটীর রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় কিরীটীর খাওয়া বিশ্রাম সম্পর্কে সে অত্যন্ত সজাগ থাকত। এতটুকু অনিয়ম সে বরদাস্ত করতে পারত না।

দুজনকে ঘরে ঢুকতে দেখে কৃষ্ণা বলে, এই তোমাদের ঘণ্টা-দুই! তুমি একটা অঘটন না ঘটিয়ে ছাড়বে না দেখছি!

মরতে তো একদিন হবেই প্রিয়ে—তা সে মৃত্যু যদি 'করোনারী' হয় তার চাইতে সুখের মৃত্যু আর কি হতে পারে!

ঠিক আছে, একটা মুহূর্ত কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, মনে থাকবে কথাটা আমার।

ভুল হয়ে গিয়েছে—মুখ ফসকে বের হয়ে গিয়েছে, আর এমনটি হবে না—এবারটির মত ক্ষমা-ঘেন্না করে—

থাক, থাক। কৃষ্ণা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

দিলি তো চটিয়ে ওকে! বললাম আমি।

কিরীটী মৃদু হাসল।

চল্ আর দেরি করিস না, সত্যিই অনেক রাত হয়েছে—খাবার টেবিলে গিয়ে বসা যাক।

তুই যা, আমি আসছি—আমায় একটা জরুরী ফোন করতে হবে।

এত রাত্রে কাকে আবার ফোন করবি?

পূর্ণ লাহিড়ীকে।

এই রাত পৌনে বারোটায়?

কথাটা জরুরী, তাকে জানানো দরকার এখুনি।

কথাটা বলে কিরীটী এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভারটা তুলে নিয়ে ডায়েল করে।

একটু পরেই বোধ হয় অন্য পাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল।

হ্যাঁ আমি কিরীটী, লাহিড়ী সাহেব। রেঙ্গুনগামী জলযান জাহাজটা কবে ছাড়ছে ক্যালকাটা পোর্ট থেকে একটা খবর নিতে পারেন? এখুনি পারবেন? ঠিক আছে, জেনে এখুনি এই রাত্রেই আমাকে জানান।

জাহাজটা তো পোলিশ জাহাজ, তাই না? হ্যাঁ হ্যাঁ—আচ্ছা—

ফোনটা রেখে দিয়ে কিরীটী আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, চল্।

টেবিলে খেতে বসে দেখি দুজনার মত প্লেট।

বললাম সামনে দণ্ডায়মান কৃষ্ণাকে, কি ব্যাপার, তুমি খাবে না?

না। কৃষ্ণা বলে।

তাহলে আমিও খাব না। বললাম আমি।

আমি খেয়েছি। কৃষ্ণা জবাব দেয়।

বিশ্বাস করি না।

বাঃ, বিশ্বাস না করার কি হয়েছে, সত্যিই আমি খেয়েছি।

বিশ্বাস করব না কেন, সত্যিই তুমি খাওনি এখনও। বলি আমি, যাও তোমারটাও নিয়ে এস, একসঙ্গেই খেতে খেতে আজকের অভিযানের গল্প তোমায় শোনাব।

ও আমি শুনতে চাই না।

নাই শুনলে—কান বন্ধ করে খেয়ে যেও।

বলছি খেয়েছি আমি!

সত্যি তোমাকে নিয়ে পারি না সুব্রত!

অনেক দেরিতে বুঝেছ দেবী। যাও, ক্ষিধেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, ত্বরা কর দেবী।

কৃষ্ণা অতঃপর আর দেরি করে না—আমাদের সঙ্গেই বসে পড়ে।

খাওয়া প্রায় যখন শেষ হয়ে এসেছে—পাশের ঘরে ফোন বেজে উঠল। ক্রিং ক্রিং ক্রিং...।

কিরীটী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিল।

হ্যালো—হ্যাঁ কিরীটী, কি বললেন, কাল সকালে ভোর পাঁচটায় ছাড়বে জাহাজ। যেমন করে হোক আপনাকে পোর্ট পুলিসের সাহায্যে বাটোরির ডিপারচারের সময় অন্ততঃ ঘণ্টা কয়েক পিছিয়ে দিতে হবে। আরে পারবেন পারবেন—সবই জানতে পারবেন—শুনুন, ভোর পাঁচটা নাগাদ আপনি এখানে চলে আসবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই গরীবের গৃহে। হ্যাঁ, দুজন আর্মড কনস্টেবল নেবেন ও নিজে আগ্নেয় অস্ত্রের দ্বারা শোভিত হয়ে আসবেন। কিছু মুশকিল নয়- —আপনি অনায়াসেই ঐ ব্যবস্থাটুকু করতে পারবেন মিঃ লাহিড়ী। আচ্ছা, আপাততঃ গুড্ নাইট।

কিরীটী ফোনের রিসিভারটা নামিয়ে রেখে খাবার ঘরে আবার ফিরে এল।

সুব্রত!

কি?

রাত এখন সাড়ে বারোটা—ঠিক তিন ঘণ্টা সময় দেব—যা শুয়ে পড় গিয়ে—একটু ঘুমিয়ে নে—ঠিক ভোর চারটেয় উঠতে হবে।

ব্যাপার কি? অত ভোরে কোথায়ও যেতে হবে নাকি?

হ্যাঁ!

কোথায়?

কালই জানতে পারবি। যা, শুয়ে পড় গে।

কিরীটী কথাগুলো বলে আর দাঁড়াল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

লাহিড়ীর সঙ্গে ফোনে একটু আগে কিরীটীর যে কাটা-কাটা একতরফা কথাগুলো হল তাতে এইটুকু বুঝতে পেরেছি, কোন একটি জাহাজের সিডিউল ডিপারচার যাতে ক্যানসেল করা হয় সে সেইমত লাহিড়ীকে নির্দেশ দিল।

কিন্তু কেন? তবে কি ঐ জাহাজেই মুক্তা-চোর পগারপার দেবার মতলব করেছে? কিন্তু সে কে? লোকটা কে? সেই চ্যাপাটা মুখ—ভোঁতা নাক—কুতকুতে চোখ লোকটা যে ডি'সিলভার সঙ্গে এসেছিল ময়নার সওদা করতে ইউসুফের দোকানে, সে-ই তাহলে সকল নাটের গুরু?

কিরীটীর চোখমুখের চেহারা দেখে মনে হয় সে কোন একটা স্থির সিদ্ধান্তে ইতিমধ্যে পৌঁচেছে। কোন রহস্যের শেষ মীমাংসার কাছাকাছি এসে চিরদিন কিরীটী সহসা অমনি গম্ভীর হয়ে যায়। মনের মধ্যে একটা অস্বস্তি নিয়ে নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শয্যায় আশ্রয় নিলাম, কিন্তু ঘুম আসে না।

বাইরে আবার বৃষ্টি জোরে শুরু হল। হয়ত কালকের রাতের মত আজও সারাটা রাতই বৃষ্টি ঝরবে।

এখন অন্ততঃ বুঝতে পারছি—মা'থিনের সেই বহুমূল্যবান মুক্তোর মালার সঙ্গেই জড়িত আছে সেই আশ্চর্য ময়না পাখীটির চুরি যাওয়া এবং হতভাগ্য ইউসুফের হত্যা।

কিন্তু যোগসূত্রটা কোথায়? কোথায় মুক্তোর মালার সঙ্গে সেই ময়না পাখীটার যোগাযোগ রয়েছে? কোন্ অদৃশ্য সূত্রে দুটি ব্যাপার ঘনিষ্ঠভাবে পরস্পরের সঙ্গে বাঁধা রয়েছে?

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মত যেন একটা সম্ভাবনা মনের পাতায় উঁকি দিয়ে যায়।

তবে কি—

কিন্তু পরক্ষণেই আবার মনে হয় অত গুলো মুক্তো—

তাছাড়া—

নাঃ, সব যেন কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতে থাকে।

চিন্তা করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। একে দু'পেগের নেশা—তার উপরে ভরপেট গরম খিচুড়ি ও মাংসের কোর্মা—আপনা থেকেই কখন দু চোখের পাতা ঘুমে ভারী হয়ে বুজে এসেছিল।

কিরীটীর ডাকে ঘুমটা ভেঙে গেল।

এই সুব্রত, ওঠ্ ওঠ্!

ধড়ফড় করে শয্যার ওপর উঠে বসলাম।

তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নে—কৃষ্ণার চা রেডি—এখনি হয়ত লাহিড়ী সাহেব এসে যাবেন।

।। সাত ।।

রাত তখন তিনটে পঁয়ত্রিশ।

বাইরে তখনও বৃষ্টি ঝরছে—তবে খুব প্রবল বর্ষণ নয়। আকাশ কালির মত কালো।

হাত মুখ ধুয়ে চায়ের টেবিলে এসে দেখি চা ও প্রাতঃরাশ ইতিমধ্যেই কৃষ্ণা প্রস্তুত করে ফেলেছে।

কিরীটী তখনও টেবিলে এসে পৌঁছয়নি। একটু পরেই কিরীটী ঘরে এসে ঢুকল একেবারে বেরুবার জন্য প্রস্তুত হয়েই। গরম গরম ওমলেট ও টোস্ট শেষ করে চায়ের কাপে যখন আমরা চুমুক দিচ্ছি, নীচে লাহিড়ী সাহেবের জীপের হর্ন শোনা গেল।

ভদ্রলোক খুব পাংচুয়াল, এসে গেছেন। কিরীটী বলে।

আমি কোন জবাব দিই না। চায়ের কাপটায় চুমুক দিতে থাকি।

কৃষ্ণা!

কী?

জংলী হীরা সিংকে তুলে দিয়েছে তো গাড়ি বের করবার জন্য?

হ্যাঁ।

তোর গাড়িতে যাবি নাকি? প্রশ্নটা আমিই করি কিরীটীকে।

হ্যাঁ।

তবে লাহিড়ী সাহেবকে জীপ আনতে বললি?

প্রথমতঃ জীপ গাড়িটাই তো একটা মার্কামারা গাড়ি, তার উপরে পুলিসের জীপ! আমরা আমার গাড়িতেই যাব।

নীচে নেমে এসে দেখি লাহিড়ী সাহেব জীপ থেকে নেমে সিগারেট টানছেন। পাশেই কিরীটীর গাড়ি দাঁড়িয়ে।

সুপ্রভাত।

কিরীটীই প্রথমে স্বাগত জানায়।

সুপ্রভাত।

লাহিড়ী সাহেব?

বলুন।

আপনার জীপ আমাদের ফলো করবে একটু দূরত্ব রেখে।

সেইমত ব্যবস্থা হল, লাহিড়ী কোন প্রতিবাদ জানালেন না।

ট্রামরাস্তায় এসে আমাদের গাড়ি পড়ল। যতদূর দৃষ্টি চলে একেবারে জনহীন রাস্তা। ঝিরঝির বৃষ্টি যেন একটা কুয়াশার পর্দার মত থিরথির করে কাঁপছে। পথের দু'পাশে ইলেকট্রিক আলোগুলো ঝাপসা-ঝাপসা মনে হয়।

হীরা সিং?

জী সাব্!

গাড়ি চালাতে চালাতেই সাড়া দিল কিরীটীর ডাকে হীরা সিং।

আউটট্রাম ঘাট চল।

নিঃশব্দে মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানাল হীরা সিং।

বুঝতে পারলাম প্রশ্ন না করেও, গতরাত্রে কিরীটী ফোনে যে রেঙ্গুনগামী জলযান জাহাজটির কথা বলেছিল লাহিড়ীকে এবং যেটা আজই প্রত্যূষে ছাড়বার কথা, সেই জাহাজেই আমরা চলেছি।

কিরীটী কিছু একটা মনে মনে স্থির করেছে।

একবার আড়চোখে অন্ধকারে কিরীটীর মুখের দিকে তাকালাম, কিন্তু বোঝবার উপায় ছিল না কিছু তার মুখের দিকে চেয়ে।

রাত প্রায় চারটে বাজে। হু-হু করে ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া চলমান গাড়ির জানলা-পথে আমাদের চোখেমুখে এসে ঝাপটা দিচ্ছে। ডানদিকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বাঁয়ে রেস কোর্স--দেখতে দেখতে মিলিয়ে যায় আমাদের চোখের সামনে।

গাড়ি একটু পরেই আউটট্রাম ঘাটের সামনে এসে দাঁড়াল। সকলে গাড়ি থেকে নামলাম। বিরাট জাহাজের মাস্তুলের লাল নীল বাতি চোখে পড়ে। জেটির মুখেই জলপুলিসের অফিসার মিঃ সুন্দরম দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিরীটী ও লাহিড়ীকে দেখে বললেন, গুড্ মর্ণিং!

লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করলেন, সব ঠিক আছে তো মিঃ সুন্দরম?

হ্যাঁ।

ক্যাপ্টেন?

তাঁকে আগেই সংবাদ দিয়েছি, তিনি জাহাজে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।

চলুন তাহলে জাহাজে যাওয়া যাক।

সুন্দরমের কথা মিথ্যা নয়, ক্যাপ্টেন মিঃ বার্টন ডেকের উপরেই দাঁড়িয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন।

সাদা নেভি ড্রেস পরিহিত দীর্ঘকায় পুরুষ মিঃ বার্টন।

রাতের আকাশে শেষ অন্ধকারে আলোর ছোপ ধরেছে—বৃষ্টি তখনও ঝিরঝির করে পড়ছে।

লাহিড়ী জিজ্ঞাসা করেন, কোন্ কেবিন?

চোদ্দ নম্বর কেবিন। মিঃ বার্টন জবাব দিলেন।

এমবারকেশন কখন শুরু হবার কথা? কিরীটী প্রশ্ন করে।

ভোর পাঁচটা থেকে। আর ঘন্টা দেড়েক আছে বাকি।

চলুন তাহলে আমরা চোদ্দ নম্বর কেবিনেই যাই লাহিড়ী সাহেব!

চলুন। লাহিড়ী বলেন।

ক্যাপ্টেন বার্টনই আমাদের চোদ্দ নম্বর কেবিনের দিকে নিয়ে চললেন। সিঁড়ি দিয়ে আমরা দোতলায় উঠলাম। লাউঞ্জ ডেক পার হয়ে সরু প্যাসেঞ্জের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলাম।

শেষ প্রান্তের ডান দিকের কেবিনটাই চোদ্দ নম্বর কেবিন। কেবিনের দরজায় কার্ড ঝুলছে দেখলাম একটা।

মিঃ ও মিসেস থি'ব।

ক্যাপ্টেনের কাছেই কেবিনের চাবি ছিল। তারই সাহায্যে কেবিনের দরজা খুলে কেবিনের মধ্যে আমরা চারজন প্রবেশ করলাম। আমি, কিরীটী, লাহিড়ী ও ক্যাপ্টেন।

আপনারা তো মিঃ লাহিড়ী এই কেবিনেই এখন থাকবেন? ক্যাপ্টেন প্রশ্ন করলেন।

হ্যাঁ মিঃ বার্টন, আপনি যেতে পারেন এখন। তবে একটা কথা, আমরা না বলা পর্যন্ত জাহাজ ছাড়বেন না।

না না, ছাড়ব না।

ঠিক আছে, তাহলে আপনি এখন যেতে পারেন।

ক্যাপ্টেন বার্টন কেবিন থেকে বের হয়ে গেলেন।

লাহিড়ী এবারে কিরীটীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, মিঃ রায়, এবারে অন্ততঃ আপনার এই বিচিত্র অভিযানের রহস্যটা যদি খুলে বলেন—

বলছি, কিন্তু মিঃ জোসেফকে যে কলকাতায়ে পাঠিয়ে দেবার জন্য সিঙ্গাপুর পুলিসকে একটা ওয়ারলেস্ মেসেজ পাঠাতে বলেছিলাম, পাঠিয়েছেন তো?

হ্যাঁ, কাল রাত্রেই মেসেজ পাঠানো হয়ে গিয়েছে। এবারে কিছু আলোকসম্পাত করুন!

মিঃ জোসেফের যে মূল্যবান ও রেয়ার পার্লসগুলো খোয়া গিয়েছে তার মধ্যে সবচাইতে মূল্যবান ও পৃথিবীর অন্যতম রেয়ার যে মুক্তোটা তার নাম হচ্ছে ব্লু কুইন।

ব্লু কুইন!

হ্যাঁ। তার ওজন হবে প্রায় দেড়শ গ্রামের উপর। ঐ মুক্তোটি সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী আছে।

কি রকম?

খুব lucky ঐ মুক্তোটি—অর্থাৎ যার কাছে ঐ মুক্তোটি থাকবে, ভাগ্য তাকে চারদিক থেকে ঐশ্বর্য এনে দেবে।

এ কাহিনী আপনি কোথায় শুনলেন?

ম্যাডাম মা'থিনের মুখেই শুনেছি। তিনিই আমাকে বলেছিলেন কথাটা আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে।

তাই বুঝি?

হ্যাঁ। জোসেফ তার স্ত্রীকে তার বার্থ-ডেতে রেয়ার মুক্তোগুলো দিয়ে মালা করে দিয়েছিল, তার মধ্যস্থলে লকেটের মত ছিল ঐ মুক্তোটি—ব্লু কুইন। মালা চোর বিশেষ করে ঐ ব্লু কুইনের লোভেই মালাটি চুরি করেছিল।

কে সে?

রঘুনাথন।

তাহলে সেই রঘুনাথনই—

হ্যাঁ, তবে শেষ পর্যন্ত সে সেটি হজম করতে পারবে না।

কেন?

কারণ সে এখনও বুঝতে পারেনি যে তার প্রেমই তার গলায় ফাঁস হয়ে এঁটে বসতে চলেছে।

প্রেম?

হ্যাঁ।

তাহলে এর মধ্যে নারীও আছে?

আছে বৈকি। আর নারী একজন ছিল বলেই শেষ পর্যন্ত আমরা হয়ত মুক্তোগুলো উদ্ধার করতে পারব।

কিন্তু আপনি যে বলেছিলেন, ঐ মুক্তোর মালার সঙ্গে ইউসুফ মিঞার হত্যার ব্যাপারটা জড়িয়ে আছে!

মিথ্যে আমি বলিনি লাহিড়ী সাহেব, ঠিকই বলেছি। কালো পাখীটাই ইউসুফের মৃত্যু-পরোয়ানা নিয়ে তার সামনে গিয়ে হাজির হয়েছিল।

কালো পাখী।

সেই ময়নাটার কথা ভুলে গেলেন?

না ভুলিনি, কিন্তু সেই ময়নার সঙ্গে ইউসুফের মৃত্যুর কী সম্পর্ক তা তো বুঝতে পারছি না! লাহিড়ী ববেন।

মুক্তোর মালাটা রঘুনাথন চুরি করে মালা থেকে সম্ভবত মুক্তোগুলো খুলে ফেলে।

কেন?

কিরীটী বলে, তার কারণ মালার সব মুক্তোগুলোই সমান মূল্যের ছিল না। তার মধ্যে যে মুক্তোগুলোর দাম বেশি, সেগুলো ঐ ব্লু কুইনের সঙ্গে ময়নার খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে রঘুনাথন সম্ভবত ময়নাকে খাইয়ে দেয়।

বলেন কি?

আমার অনুমান তাই।

তারপর?

রঘুনাথন দলে নিশ্চয়ই একা ছিল না—আর ঐ ধরনের চুরির ব্যাপারে সাধারণতঃ একাধিক লোকই থাকে। সেই কারণেই বিশেষ করে রঘুনাথনকে হয়ত ঐ বিশেষ পন্থাটা নিতে হয়েছিল, তার ভাগিদারের হাত থেকে কিছু দামী মুক্তো অন্ততঃ সরিয়ে ফেলবার জন্য। তবে নিঃসন্দেহে যে পদ্ধতিটা সে মুক্তোগুলো সরিয়ে ফেলবার জন্য গ্রহণ করেছিল সেটা সত্যিই অভিনব তো বটেই, সেই সঙ্গে রঘুনাথনের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিরও পরিচয় তা থেকে আমরা পাই।

লাহিড়ী প্রশ্ন করেন ঐ সময়, কিন্তু ওই ভাবেই যে রঘুনাথন কিছু দামী মুক্তো সরিয়েছিল, আপনি অনুমান করলেন কি করে?

অনুমান করেছি দুটো ঘটনা থেকে।

কোন্ দুটো ঘটনা?

প্রথম ঘটনাটা হচ্ছে, মুক্তোর মালাটি অদৃশ্য হওয়াতে সঙ্গে সঙ্গে রঘুনাথন ও সেই অত্যাশ্চর্য ময়না পাখীটিরও অন্তর্ধান—

দ্বিতীয়?

দ্বিতীয় হচ্ছে, সেই পাখী কিনে ইউসুফ মিঞাকে মৃত্যুবরণ করতে হল বলে। ইউসুফের মৃত্যুর ব্যাপারটা ভেবে দেখুন—হত্যাকারী একাই একজন বা একাধিক থাকুক সেরাত্রে নিশ্চয়ই এসেছিল পাখীটা সরিয়ে নেবার জন্য। হয়ত ইউসুফ মিঞা জেগে উঠে বাধা দেয়—যার ফলে তাকে নৃশংসভাবে খুন হতে হয়।

কিন্তু আপনার অনুমানই যদি সত্য হয় মিঃ রায়—রঘুনাথন পাখীটা বেচবে কেন?

রঘুনাথন বেচেছে কে বললে আপনাকে? সুলতানের মুখে, পাখীটা যে বেচতে এসেছিল, তার চেহারার যে বর্ণনা আমরা পেয়েছি, তার সঙ্গে রঘুনাথনের চেহারার মিল তো আমরা পাইনি!

তবে? কে এসেছিল পাখী বেচতে?

রঘুনাথন নয়—তৃতীয় কোন ব্যক্তি যে পাখীর পেটে ঐ মুক্তো আছে নিশ্চয়ই জানত না।

তাই যদি হয় তো সে পাখীটা পেল কোথা থেকে? রঘুনাথন কি পাখীটাকে প্রহরায় রাখেনি?

নিশ্চয়ই রেখেছিল।

তবে?

সে ব্যাপারটা জানতে হলে আমাদের ডি'সিলভাকে প্রয়োজন। কারণ ডি'সিলভার সঙ্গেই সে লোকটা ইউসুফ মিঞার কাছে পাখীটা বেচতে গিয়েছিল। কিন্তু আর না—চুপ—ওরা বোধ হয় এসে গেছে—পায়ের শব্দ পাচ্ছি!

সত্যিই প্যাসেজে পায়ের শব্দ পাওয়া গেল।

কুইক্—দরজার দুপাশে সব সরে দাঁড়ান! কিরীটী চাপা গলায় নির্দেশ দিল।

সঙ্গে সঙ্গে আমরা দরজার দুপাশে—একদিকে কিরীটী ও অন্যদিকে আমি ও লাহিড়ী সরে দাঁড়ালাম। একটু পরেই দরজা খুলে গেল কেবিনের।

প্রথমে একজন দামী স্যুট পরিহিত পুরুষ ও তার পশ্চাতে এক বর্মিনী নারী কেবিনের মধ্যে প্রবেশ করল। এবং তারা কিছু বোঝবার আগেই চকিতে কিরীটী ওদের সামনে এগিয়ে কঠোর কণ্ঠে নির্দেশ দিল, মিঃ থি'ব, কোন রকম পালাবার চেষ্টা করো না বা গোলমাল করো না, পুলিস কমিশনার মিঃ লাহিড়ী তোমাকে অ্যারেস্ট করতে এসেছেন।

।। আট ।।

আমি তখন বিস্ময়ে যেন একেবারে অভিভূত।

থি'ব নামধারী লোকটিকে না চিনলেও তার সঙ্গিনী নারীকে চিনতে পেরেছিলাম—ম্যাডাম মা'থিন।

থি'বর নার্ভের কিন্তু সত্যিই প্রশংসা করতে হয়। নিঃশব্দে সে তখন কিরীটীর মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার দেহের গঠন বেশ বলিষ্ঠ। তার চ্যাপ্টা মঙ্গোলিয়ান টাইপের হলদেটে মুখ দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না সে একজন বর্মীই।

পূর্ণ লাহিড়ী ইতিমধ্যে থি'বর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, তাঁর হাতে পিস্তল। বলা বাহুল্য

লাহিড়ীর অঙ্গে পুলিস অফিসারের ইউনিফর্মই ছিল।

অল্প দূরে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে মা'থিন। সেও কিরীটীর মুখের দিকেই চেয়ে ছিল।

থি'বই প্রথমে কথা বললে, কিন্তু আমি তো এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না মশাই। এভাবে আমার বিনা অনুমতিতে আমার রিজার্ভড কেবিনে অনধিকার প্রবেশই বা করেছেন কেন আর আমাকে এভাবে ইনসাল্ট করবারই বা দুঃসাহস হল কি করে আপনাদের?

কিরীটী পূর্ণ লাহিড়ীর দিকে তাকিয়ে বললে, মিঃ লাহিড়ী, arrest him !

তাই নাকি? ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে ওঠে থি'ব, কিন্তু কেন জানতে পারি কি?

ব্লু কুইন ও অন্যান্য কিছু মূল্যবান মুক্তো সরানোর জন্য এবং টেরিটিবাজারের ইউসুফ মিঞাকে হত্যা করবার অপরাধে।

মশায়েরা কি গাঁজায় দম দিয়ে এসেছেন। আবার ব্যঙ্গভরা কণ্ঠে বলে ওঠে থি'ব।

মিসেস জোসেফ, কিরীটী এবারে অদূরে দণ্ডায়মান নির্বাক মা'থিনের দিকে তাকিয়ে বললে, আপনার বুদ্ধির তারিফ করি ম্যাডাম—কিন্তু তাহলেও বলব—

কিরীটীর কথা শেষ হল না। আমাদের সকলের দৃষ্টি তখন মা'থিনের উপর গিয়ে পড়েছিল মুহূর্তের জন্য, আর সেই মুহূর্তটুকুরই সুযোগে অঘটনটা ঘটে গেল।

একটা তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার করে টলে পড়ল মা'থিন। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বাঘের মত ঐ বয়সেও কিরীটী থি'বর উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে যুযুৎসুর প্যাঁচে ধরাশায়ী করে।

শীগগিরি হাতকড়া লাগান মিঃ লাহিড়ী! কিরীটী চেঁচিয়ে ওঠে।

পূর্ণ লাহিড়ী মুহূর্ত দেরি করেন না—পকেট থেকে হাতকড়া বের করে থি'বর হাতে পরিয়ে দেন।

হিংস্র দুটো চোখের দৃষ্টিতে মনে হচ্ছিল, থি'ব যেন কিরীটীকে সুযোগ পেলে মুহূর্তে শেষ করে দেবে—

কিরীটী থি'বর হাতে হাতকড়া পরানো হতেই এগিয়ে যায় ভূপতিত মা'থিনের দিকে।

রক্তে তার সমস্ত জামা লাল হয়ে উঠেছে।

একটা ছোট ছোরা তার বামদিককার বক্ষে সমূলে বিদ্ধ।

থেকে থেকে মা'থিনের সমস্ত দেহটা আক্ষেপ করছে।

হঠাৎ ঐ সময় কেবিনের দরজাটা খুলে গেল, জাহাজের একজন খালাসী একটা খাঁচা হাতে কেবিনের মধ্যে এসে ঢুকল—তার পশ্চাতে ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন কেবিনের মধ্যে পা দিয়েই বলে ওঠেন, Good God ! এ কি?

ক্যাপ্টেন, শীগগিরি আপনার জাহাজের ডাক্তারকে ডাকুন—বাঁচবে না বুঝতে পারছি, তবু let us try !

ক্যাপ্টেন ছুটে কেবিন থেকে বের হয়ে গেলেন।

মা'থিন—মা'থিন!

চমকে আমরা ফিরে তাকালাম।

খাঁচার মধ্যে কালো ময়না পাখীটা বলছে, মা'থিন—মা'থিন!

খালাসীটা তখনও হতভম্ব হয়ে খাঁচাটা হাতে ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মিনিট দশেকের মধ্যেই জাহাজের ডাক্তার এল। কিন্তু বাঁচানো গেল না মা'থিনকে। সে মারা গেল।

শুধু মৃত্যুর আগে একটা কথা সে কোনমতে টেনে টেনে জড়িয়ে জড়িয়ে বলে গেল,

কিরীটী যেন মুক্তোগুলো পেলে তার স্বামী জোসেফকে পাঠিয়ে দেয়। সে পারল মুক্তোগুলো উদ্ধার করতে।

স্ট্রেচারে করে ঢাকা দিয়ে মা'থিনের মৃতদেহটা জাহাজ থেকে নামিয়ে আনা হল এবং থি'বকে হাতকড়া পরা অবস্থায় পুলিস-ভ্যানে সশস্ত্র প্রহরীর জিম্মায় তুলে দেওয়া হল।

ঐদিনই দ্বিপ্রহরে। গরাদের মধ্যে হাতকড়া অবস্থায় থি'ব। কিরীটী নানাভাবে তাকে প্রশ্ন করল, কিন্তু থি'ব একেবারে যেন বোবা। তার মুখ থেকে একটি কথাও বের করা গেল না। এবং মুক্তোগুলো যে কোথায় আছে তারও কোন সন্ধান করা গেল না।

অবশেষে কিরীটী বললে, ও মুখ খুলবে না মিঃ লাহিড়ী। ডি'সিলভার সন্ধান যতদিন না পাওয়া যায় আমাদের অপেক্ষাই করতে হবে। আপনি সমস্ত জাহাজে জাহাজে ওয়ারলেস মেসেজ পাঠিয়েছেন তো?

হ্যাঁ, আশা করছি দু-চারদিনের মধ্যেই ডি'সিলভার সন্ধান পাব।

ঠিক আছে চলুন, আপনার অফিস-ঘরে যাওয়া যাক। কিরীটী বললে।

সকলে আমরা লাহিড়ীর অফিস-ঘরে এসে ঢুকলাম। চেয়ারে বসে একটা চুরোটে অগ্নিসংযোগ করতে করতে কিরীটী বললে, পাখীটা কোথায়?

আমার কোয়ার্টারেই আছে। কিন্তু পাখীটা যেন ক্রমশঃ কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে মিঃ রায়—কিছু খাচ্ছেও না!

স্বাভাবিক। মুক্তোগুলো হজম করতে পারবে কেন? বেচারী! ইচ্ছা ছিল অমন একটা rare specimen যদি বাঁচানো যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হচ্ছে তা আর সম্ভব হবে না। ও না মরলে আমাদেরই ওকে মারতে হবে—মুক্তোগুলো ওর পেট থেকে উদ্ধার করবার জন্য!

কিন্তু থি'ব যদি জানতই পাখীটার পেটেই মুক্তোগুলো আছে, পাখীটাকে মারেনি কেন? লাহিড়ী প্রশ্ন করে।

এমন একটা আশ্চর্য পাখী—ওর দামও তো কম নয়—তাই ভেবেছিল হয়ত পাখীটার পায়খানার সঙ্গে যদি মুক্তোগুলো বের হয়ে আসে, তাহলে মুক্তোগুলোও পাওয়া যায়, পাখীটাকেও মারতে হয় না।

পরের দিনই পাখীটা মারা গেল। পাখীটার পেট চিরে ফেলা হল—বারোটা বড় আকারের মুক্তো ও ব্লু কুইন পাখীটার পেটের মধ্যেই পাওয়া গেল। নাড়ীর মধ্যে ঘা হয়ে গিয়েছিল। সেই ঘা-ই পাখীটার মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।

লাহিড়ী বলেন, চমৎকার পন্থা নিয়েছিল দেখছি লোকটা মুক্তোগুলো সরাবার অন্যের দৃষ্টি থেকে!

নিঃসন্দেহে। আর তারও হয়ত পাখীটার উপরে লোভ ছিল বলে শেষ পর্যন্ত পাখীটা মারতে পারেনি।

।। নয় ।।

তিনদিন পরেই তার পওয়া গেল, জোসেফ কলকাতায় আসছে সিঙ্গাপুর থেকে দিন দুয়েকের মধ্যেই এবং ওই দিনই ডি'সিলভার সন্ধান পাওয়া গেল।

অস্ট্রেলিয়ার বন্দরে এম. এস. বাটোরি জাহাজে সে ছিল। অস্ট্রেলিয়া সরকার তার কলকাতায় আসার ব্যবস্থা করেছিলেন।

পরের দিন ডি'সিলভাও এসে পৌঁছাল।

ডি'সিলভাকে রঘুনন্থনের ফটো দেখানো হল, কিন্তু ফটো দেখে সে বললে, তার সঙ্গে গিয়ে ইউসুফ মিঞারে ময়নাটা বিক্রি করেছিল সে ওই লোক নয়।

কিরীটী প্রশ্ন করল তবে সে লোকটা কোথায়?

সে তো হুজুর কলকাতাতেই থাকে।

কলকাতায় থাকে?

আজ্ঞে।

কোথায় থাকে কলকাতায় জান?

খিদিরপুরের এক বস্তিতে। তার নাম রতিলাল—জাহাজের মাল খালাস করে।

তারপর কিরীটীর প্রশ্নের উত্তরে যা বললে ডি'সিলভা, রতিলালকে ডি'সিলভা অনেক দিন আগে থাকতেই চেনে—তার বস্তীর বাসায় সেবার গিয়ে তার ঘরে ওই ময়নাটা সে দেখতে পায়। রতিলাল বলে, জাজের মাল খালাস করতে করতে খাঁচাসমেত ঐ পাখীটা সে দেখতে পায়। পাখীটা 'রবিন' 'রবিন' বলে ডাকছিল।

পাখীটা দেখেই চিনতে পারে ডি'সিলভা পাখীটা মূল্যবান। সে-ই তখন রতিলালকে বলে, পাখীটা বেচলে সে অনেক টাকা পাবে। আর সে যদি চায় তো ডি'সিলভা পাখীটা বিক্রী করে দিতে পারে।

রতিলাল সম্মত হয়। তখন ডি'সিলভা তাকে নিয়ে ইউসুফের কাছে যায়।

ইউসুফ পাখীটার দাম পাঁচশো টাকা দিতে চায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত হাজার টাকায় পাখাটী ইউসুফ কিনে নেয়।

তারপর?

তারপর আর আমি কিছু জানি না হুজুর, তবে রতিলাল আমাকে পাখীটা হাজার টাকায় বিক্রী করে দেওয়ার জন্য একশো টাকা দিয়েছিল।

কিরীটী অতঃপর মিঃ ইড়ীর দিকে তাকিয়ে বললে, চলুন একবার রতিলালের ওখানে যাওয়া যাক এখুনি!

তখুনি ওরা জীপে করে রওনা হল রতিলালের সন্ধানে।

রতিলাল তার ডেরায় ছিল না।

সূলতান যেমন বর্ণনা দিয়েছিল, রতিলালকে দেখতে ঠিক তেমনই। তার জন্ম জানা গেল পেগুতে।

তার মা ছিল বর্মী এবং বাপ ছিল এক পাঞ্জাবী।

মোচির মাইনে সে কাজ করত। চুরির ব্যাপারে তার চাকরি যায়। তারপর সে জাহাজের খালাসী হয়ে কলকাতায় চলে আসে।

তার কাছে আরও একটা কথা জানা গেল।

যেদিন সে ইউসুফকে ময়নাটা বিক্রী করে আসে, সেইদিনই সন্ধ্যার দিকে এক সাহেব খোঁজ করতে করতে তার ডেরায় আসে পাখীটার সন্ধানে।

তারপর?

আমি বলে দিলাম, পাখীটা ইউসুফ মিঞাকে বিক্রী করেছি। শুনে সে চলে গেল।

কিরীটীর পরামর্শে রতিলালকে লালবাজারে নিয়ে আসা হল।

থি'বর ফটো তাকে দেখানো হল।

ফটোটা দেখেই রতিলাল বললে, ওই লোকটাই পাখীর সন্ধানে তার কাছে গিয়েছিল।

একজন সার্জেন্ট এসে ঘরে ঢুকে স্যালুট দিল মিঃ লাহিড়ীকে, স্যার!

ইয়েস!

মিঃ জোসেফ বলে এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

নিয়ে এস এই ঘরে।

জোসেফ এসে ঘরে ঢুকল।

বয়েস হয়েছে লোকটার। মাথার চুল প্রায় অর্ধেক পেকে সাদা হয়ে গিয়েছে।

মিঃ লাহিড়ী?

আমিই লাহিড়ী। বলুন!

আমার মুক্তোগুলো পাওয়া গিয়েছে?

পেয়েছি, বারোটা।

ব্লু কুইন?

সেটাও পাওয়া গিয়েছে।

আঃ, আপনি আমাকে নিশ্চিন্ত করলেন।

কিন্তু আর মুক্তোগুলোর কোন সন্ধান এখনও করতে পারিনি।

না পেলেও ক্ষতি নেই—ব্লু কুইন পাওয়া গিয়েছে তাতেই আমি খুশি। ভাল কথা, আমার কোথায় জানেন? গ্রাণ্ডে খোঁজ করেছিলাম কিন্তু তাঁরা বললেন কয়েকদিন আগেই নাকি হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছে।

মিঃ জোসেফ?

কিরীটীর ডাকে ওর মুখের দিকে তাকাল জোসেফ।

দেখুন তো এই ফটোটা—এই লোকটাকে আপনি চেনেন?

থি'বর ফটোটা এগিয়ে দিল কিরীটী জোসেফের সামনে।

এ কি! এ ফটো আপনি কোথায় পেলেন? জোসেফ বলে ওঠে।

চেনেন ফটোর লোকটিকে?

নিশ্চয় চিনি—এ তো থি'ব।

কতদিন পরিচয় আপনার সঙ্গে থি'বর?

তা বছর দুয়েক তো হবেই—সিঙ্গাপুরেই ও থাকে—আমার বাড়িতে কতদিন এসেছে।

আপনার স্ত্রীর সঙ্গেও ওর আলাপ ছিল?

ছিল বৈকি। অনেক দিনের আলাপ ওদের—রেঙ্গুন থেকেই।

লোকটা কি করত সিঙ্গাপুরে?

ওরও জুয়েলারী ব্যবসা ছিল ; কিন্তু ওর সম্পর্কে এত কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?

কারণ আমাদের ধারণা—

কী?

ওরই পরামর্শে রঘুনাথন, আপনার ভৃত্য, মুক্তোর হারটা চুরি করেছিল।

সর্বনাশ। কি বলছেন আপনি?

তাই।

রঘুনাথনও ধরা পড়েছে নিশ্চয়ই?

না। যতদূর মনে হচ্ছে সে হয়ত আর বেঁচে নেই।

বেঁচে নেই?

না। থি'বই সম্ভবত—হয়তো তাকে হত্যা করেছে।

বলেন কি?

আরও একটা দুঃখের সংবাদ আছে মিঃ জোসেফ!

দুঃখের সংবাদ?

হ্যাঁ, আপনার স্ত্রী বেঁচে নেই।

মা'থিন নেই?

অস্ফুট একটা আর্তনাদ করে ওঠে জোসেফ।

না, তাকে ঐ থি'বই হত্যা করেছে।

সংক্ষেপে মিঃ লাহিড়ীই তখন সেদিনকার জাহাজের কেবিনের ঘটনাটা বিবৃত করেন।

জোসেফ সব শুনে যেন স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

তার দু চোখের কোলে জল টলমল করতে থাকে।

ব্যাপারটা মোটামুটি অতঃপর সব বোঝা গেলেও, থি'ব কিন্তু কিছুই স্বীকার করল না। সে যেমন চুপ করে ছিল তেমনই চুপ করে রইল।

জোসেফ মুক্তোগুলো আইডেনটিফাই করার পর মুক্তোগুলো তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হল।

সেদিন সন্ধ্যায় কিরীটীর গৃহে তার বাইরের ঘরে বসে ওই মুক্তো-চুরির কাহিনীই কিরীটী বলছিল।

মিঃ লাহিড়ী প্রশ্ন করেন, কিন্তু আপনি জেনেছিলেন কি করে যে পরের দিন জাহাজেই মা'থিন ও থি'ব যাচ্ছে রেঙ্গুনে?

কিরীটী বললে, সেরাত্রে মা'থিনের অ্যালবাম ঘাঁটতে ঘাঁটতে তার মধ্যেই আমি টিকিট দেখতে পাই জাহাজের। একটা খামের মধ্যে টিকিটটা ছিল—খামের উপরে লেখা ছিল, মিসেস থি'ব—আর জাহাজের ডিপারচারের তারিখ ও সময় লেখা ছিল। তারপর মা'থিনের মুখে সব কথা শুনে আমার ধারণা হয়, মা'থিনই মিসেস থি'ব পরিচয়ে রেঙ্গুনে পালাচ্ছে। কিন্তু একটা ব্যাপারে মনের মধ্যে আমার খটকা ছিল তখনও।

কী?

মা'থিনও কি তবে ঐ চুরির ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট? থি'ব নামটা কোন বর্মীর—মনে হয়েছিল বুড়ো জোসেফকে ছেড়ে হয়ত মা'থিন থি'বর সঙ্গে পালাচ্ছে। কিন্তু পরে মা'থিনের চোখে জল দেখে বুঝতে পেরেছিলাম ধারণাটা আমার ভুল। মা'থিন সত্যি-সত্যিই তার স্বামীকে ভালবাসত—আর তার জন্যই সে মুক্তোগুলো উদ্ধারের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

তারপর?

তারপরও আমার ধারণা যে মিথ্যা নয়, সেটা তো প্রমাণই হয়ে গেল, যখন থি'ব মা'থিনকে হত্যা করল আমাদের চোখের সামনে। এবং তার শেষ কথাগুলোও তাই প্রমাণ করেছে।

থি'বই শেষ পর্যন্ত মুক্তোগুলো হাতিয়েছে জানতে পেরে সে হয়ত থি'বর সঙ্গে প্রেম প্রেম অভিনয় করেছিল এবং রেঙ্গুন পর্যন্ত তার সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল।

যদিও সঠিকভাবে কিছুই জানা গেল না, তাহলেও কিরীটীর অনুমান যে মিথ্যা নয় তা আমাদের সকলের মনে হয়।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত